# পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ

# পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ

মেসবাহুল হক

# পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ

# ও

# নীল বিদ্রোহ

মেসবাহুল হক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ
মেসবাহুল হক

ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১৪১৫/২
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার : ৯৫৪.০৩/মেস-প

প্রকাশকাল :

তৃতীয় সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৯৪
রমজান ১৪০৭
মে ১৯৮৭

প্রকাশক :
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

প্রচ্ছদ :
কে. জি. মুস্তাফা

মুদ্রণ :
সোহায়েব প্রিন্টার্স
১৭, ডি, আই, টি, রোড,
মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা।

বাঁধাই :
নান্নু খান
৪২ নারিন্দা রোড, ঢাকা।
মূল্য : আটষট্টি টাকা মাত্র।

---

Palasey Juddhottar Muslim Samaj O Neel Bidroha : Muslims after the Battle of Palassey and the Indigo Mutiny, written in Bengali by Mesbahul Haque. Published by Prof. Abdul Ghafur, Director Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, May, 1987.
**Price : 68.00** U. S. Dollar **5.00**

আমার আব্বা
মরহুম ফয়েজউদ্দীন ভূঁইয়ার
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

**লেখকের অন্যান্য বই**

জীবনী:

ছোটদের নজরুল

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মচরিত (অনুবাদ)

উপন্যাস:

দুষ্টগ্রহ

আরেক পৃথিবী

শতাব্দীর ডাক

পূর্বদেশ

কমলা লেবুর ভোজবাজি (কিশোর-গল্প)

জাহাঙ্গীর নগর থেকে রাজমহল

অনুবাদ গ্রন্থ:

জীয়ন কাঠি

তুহীন মেরুর অতল তলে

বন্ধ্যা ধরণী

## আমাদের কথা

জনাব মেসবাহুল হকের 'পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে। প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় সুধী মহলে এ গ্রন্থের বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে। একটু বিলম্ব হলেও এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়ায় পরম করুণাময়ের দরবারে আমরা অশেষ শুকর গোযারী করছি।

গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর সুধী সমাজের অনেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন মূল্যবান বক্তব্য দেন। দ্বিতীয় সংস্করণে সে সবের আলোকে কিছু পরিবর্তন ছাড়া বেশ কিছু সংযোজন সাধন করা হয়েছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি চাপা-পড়া অধ্যায় পুনরুদ্ধারে এসব সংশোধন ও সংযোজন যথেষ্ট মূল্যবান প্রমাণিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। অতীতের ন্যায় বর্তমান সংস্করণও সকলের সুদৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে বলে আমাদের আশা। আল্লাহ্ হাফিজ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।। ১০-৫-৮৭

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

## প্রসঙ্গ কথা

কোন দেশ ও জাতি একবার তার স্বাধীনতা হারালে সে কেবল তার ধন-সম্পদ হারায় না, তার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ধারণের ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলে। পরদেশী শক্তি কোন দেশ অধিকার করলে প্রথমেই সে তার অর্থনৈতিক অবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। যার ফলে জাতি তার ধর্ম চর্চা, সংস্কৃতি-চর্চা এবং শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি চারুকলার-চর্চা করতে অপারগ হয়—ফলে অর্থনৈতিক জীবনে যেমন সে দরিদ্র হয়ে পড়ে তেমনি দরিদ্র হয় মনন ও চিন্তার জগতে। জাতি হিসেবে ক্রমে সে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং বিজাতীয় অনুকরণে সে আত্মতুষ্টি লাভ করতে থাকে। তাই কোন দেশ ও জাতি স্বাধীনতা হারাবার সাথে সাথে সর্বহারায় রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই সে পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে ফেলতে তৎপর হয়ে ওঠে। এটা কখনও তাৎক্ষণিক-ভাবে ঘটে যায়, কখনও চেতনার গতিধারার সঙ্গে তাল রেখে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। কিন্তু যেভাবেই হোক এবং যখনই হোক সেই শক্তি যখন জাগ্রত হয় তখন প্রভুত্বের সিংহাসন কেঁপে ওঠে এবং সেই সিংহাসনের অধিকারী সকল শক্তি নিয়োগ করে এই জাগ্রত চৈতন্যকে টুঁটি টিপে মারতে চায়। উপমহাদেশে ইংরে-জের আগমনে একদা এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে।

ইংরেজ প্রায় অনায়াসে ভারতবর্ষ জয় করলেও তার আত্মিক স্বাধীনতাকে সে অপহরণ করতে পারেনি। অল্পকালের মধ্যেই সে তা লক্ষ্য করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শাসকের শত কুটিল চক্রান্তের জাল বিছিয়ে সে সমগ্র জাতির চৈতন্যের উৎসমূলে কুঠারাঘাত হানার চেষ্টা করে। তার সে চেষ্টা দেশদ্রোহীদের জন্যে কখনও কখনও সফলতার মুখ দেখলেও দেশপ্রেমিকদের প্রবল প্রতিরোধ শক্তি তাকে নাজুক করে তোলে এবং একদা এই প্রতিরোধ শক্তি তাকে এই উপমহাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। 'পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ' নামক বর্তমান গ্রন্থে লেখক মেসবাহুল হক—সেই প্রতিরোধ শক্তির সংগ্রামের একটি অংশের সমুজ্জ্বল ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন। সে ইতিহাসে দেখা যায় উপমহাদেশের মুসলিমরাই শাসক শক্তির হাতে সবচেয়ে বেশী নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত। দেখা যায় বিভেদনীতির হাতিয়ার নিয়ে ইংরেজ হিন্দু সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার চেষ্টা করছে এবং মুসলিমদের বঞ্চিত করছে সকল রকম সামাজিক সুবিধা থেকে।

জনাব মেসবাহুল হক বহু পরিশ্রম ও গভীর অধ্যবসায়ের দ্বারা মুসলিম সমাজের সেই দীর্ঘকালের দুঃখের ইতিহাসকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন।

## এবারের কথা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় বইখানির পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ বের হ'ল। প্রথম মুদ্রণে যারা এই বইয়ের সমালোচনা করেছেন তাঁরা সবাই বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তি। বিজ্ঞ সমালোচনার জন্য তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সমালোচনায় তাঁরা যে সমস্ত দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, তার অনেকখানি সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার যেসব কথাকে তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেছেন ; আমার মনে হয় ওসব কথার প্রয়োজন সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কারণ, ধান ভানতে গিয়ে গাজীর গীত গাওয়ারও প্রয়োজন হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য যদিও ধান ভানা, গাজীর গীত তাতে স্পৃহা বাড়ায়। পরিবেশ মধুময় করে। কাজের ভার হালকা করে। তেমনি পূর্বাপর সম্বন্ধ জানার জন্যে অপ্রাসঙ্গিক কথাও বিশেষ সহায়ক।

বইখানি তৃতীয়বার ছাপিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতীয় কর্তব্য পালন করলেন। বিশেষ করে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর সাহেব— এই গ্রন্থ প্রকাশনায় যে উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা বিরল। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ।

মোসবাহুল হক

## লেখকের কথা

পশ্চাতের ইতিহাস না জানলে কোন জাতির যেমন আত্মপরিচয় ঘটে না, তেমনি আত্মোন্নতিও হয় না।

আমরা ফ্রান্স, বৃটেন, আমেরিকা, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস পড়ে রোমাঞ্চিত হই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা আমাদের নিজের দেশ ও জাতির ইতিহাস জানি না। যা জানি, যতটুকু জানি, তাও অনেকটা মিথ্যা-মলিন, যার রচয়িতা আবার স্বার্থ-সচেতন ইংরেজ লেখক কিংবা তাদের করুণা-লিপ্সু আত্মস্বার্থপরায়ণ দেশীয় ঐতিহাসিকরা। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের প্রয়োজনে সত্যকে চাপা দিয়ে নতুন করে ইতিহাসের ঘটনা সাজিয়েছেন তাঁরা। শীর্ষস্থানীয় হিন্দু ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই যা লিখেছেন তারও মুখ্য অংশ বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাসও ব্রিটিশ আমলে আশানুরূপ মর্যাদা পায়নি। অথবা সুপ্রচারিত হতে পারেনি।

একথা সত্য যে, সাধারণভাবে জ্ঞাত মুসলমান আমলের ইতিহাসেও দেশের শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ এবং সংগ্রামের কথা স্থান পায়নি। এখন যাঁরা লিখছেন, তাঁরাও সেই প্রচলিত অর্ধ-সত্য-ইতিহাস অনুসরণ ও অনুকরণ করেই লিখছেন এবং তাকেই আমরা আমাদের দেশের ইতিহাস বলে বিশ্বাস করছি।

দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে আমরা ভুলে গেছি আমাদের দেশ ও জাতির ইতিহাস। একথা সত্য যে, পরাধীন জাতির প্রকৃত ইতিহাস বন্দীকালীন অবস্থায় সৃষ্টি হয় না। সে ইতিহাস সৃষ্টি হয় সর্বাঙ্গীন মুক্তিলাভের পর। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তাকেও প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না, তবে কিছু কিছু প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ে হয়েছে এবং ইদানীং হচ্ছে। দু'-একজন নির্ভীক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন ইতিহাস রচনায় যাঁরা শরীক হয়েছেন আমি তাঁদেরই পথ অনুসরণ করে এক সমস্যাসংকুল সময়ের ইতিহাস লেখায় অগ্রসর হই। বর্তমান গ্রন্থ আমার সেই পরিশ্রমের ফল।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর অনেককে বলতে শুনেছি, ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের মুসলমানের কোনো অবদান নেই। এই অসত্য উক্তিতে

আমি ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি। কারণ ইতিহাসে অজ্ঞতা ব্যতীত এ ধরনের উক্তি সম্ভব নয়। এই দুঃখজনক অজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ— এই একশ' বছরের মুসলমান তথা এ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি, পরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি নীল বিদ্রোহ নিয়ে। ব্রিটিশ শাসিত গত দু'শ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় এ দেশের ইতিহাস শোষক-শোষিতের সংগ্রামের ইতিহাস, উৎপীড়ক জমিদার-তালুকদার আর মহাজন শ্রেণীর সাথে শ্রমজীবী জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। বিদ্রোহী মুসলমানদের সাথে স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর সংগ্রামের ইতিহাস।

১৭৫৭ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এ দেশের বুকে অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। এসব বিদ্রোহকে এক কথায় বলা চলে গণবিদ্রোহ। ব্রিটিশ সৃষ্ট-সামন্ত-তান্ত্রিক শক্তি অর্থাৎ ভূস্বামী শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণ তাদের অসহায় শৃঙ্খলিত হাতে হাতিয়ার তুলে ধরেছে বহুবার; বারবার পরাজিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে; তবুও সংগ্রাম থেকে সরে যায়নি।

ব্রিটিশ শাসনারম্ভের প্রাথমিক একশ' বছরের বেশী কাল ধরে মুসলমানরা অবিরাম নিঃশঙ্কচিত্তে ও নিঃশেষে আত্মদানের আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করেছে স্বৈরাচারী ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। মুসলমানদের বিরামহীন বেপরোয়া সংগ্রামকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী একটা ভয়াবহ বিপদের উৎস বলেই মনে করত। তাই ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন, "মহারাণীর বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করাই কি মুসলমানদের ধর্মের অনুশাসন।"[১] ঠিক অন্যদিকে দু'-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিবেশী হিন্দুরা এই একশ' বছর আন্তরিক সহযোগিতা করেছে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের সাথে। আর ঘৃণায় এড়িয়ে চলেছে মুসলমানদের সাহচর্য। ইংরেজী শিখে দালালী আর মুৎসুদ্দীগিরীর মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের আসন তারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সুপরিকল্পিত চক্রান্ত আর কর্নওয়ালিস সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে দেশের প্রায় প্রতিটি জমিদারী করায়ত্ত করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে একচেটিয়া অধিকার।

বলা বাহুল্য, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ কৃষক। শ্রমিক শ্রেণীর জন্মও এই কৃষক সম্প্রদায় হতে। দেশের সার্বিক অগ্রগতির মূল উৎস কৃষক।

---

১. The Indian Musalmans. Preface : W. W. Hunter.

জীবনধারণের মূল উপকরণ খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগায় এই কৃষক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জমিদার-মহাজন আর শাসক গোষ্ঠীর শোষণের প্রধান শিকার হল এই কৃষক শ্রেণী।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের জমিদার মাত্রই ছিল হিন্দু। আর কৃষক শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তাই স্বাভাবিক কারণে শোষণের মাত্রা ছিল অত্যধিক। জমিদার-মহাজনের শোষণ-পীড়নের সাথে শুরু হয় ব্রিটিশ নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার। ত্রিমুখী শোষণ-পীড়ন আর অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার কৃষক। একই সঙ্গে চাকরি হতে বিতাড়িত হাজার হাজার বেকার সৈন্য, শিল্প-ধ্বংসের ফলে বিভিন্ন পেশা হতে বঞ্চিত অগণিত দিন-মজুর এই সংগ্রামে শরীক হয়। ফলে সংঘটিত হল 'ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ', 'ত্রিপুরার শমসের গাজীর বিদ্রোহ', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ', 'ওহাবী আন্দোলন', 'ফরায়েজী আন্দোলন', 'সন্দ্বীপের বিদ্রোহ' এবং '১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ' ও 'নীল বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ। এ সব সংগ্রাম প্রাথমিকভাবে কৃষক-জনসাধারণের মুক্তির জন্য সংঘটিত হলেও মূলত ছিল দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। এসব বিদ্রোহের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, অধিকার ও স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস ছিল সুস্পষ্ট। এ সব সংগ্রাম ও বিদ্রোহ সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্যকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। হাজার হাজার কৃষক জেল খেটেছে, মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু আপোস করেনি। কৃষকদের এসব আপোসহীন সংগ্রামে হিন্দু ভূ-স্বামী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে চেষ্টা করেছে সংগ্রাম বানচাল করার। সংগ্রামী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির অন্যতম কারণ—দেশের ভূ-স্বামী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকগণ কিছুটা নিরপেক্ষ কূটনীতি গ্রহণ করল এবং চিরবিদ্রোহী মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতি ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সুবিধাদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল। চেষ্টা করল মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হতে বিচ্ছিন্ন রাখার। এতদিনের একচ্ছত্র আধিপত্যে মুসলমানদের ভাগ বসানোর ব্যাপারটা হিন্দুরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না। অর্থাৎ শাসক গোষ্ঠী এবার সাম্প্রদায়িকতাকে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল।

ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিপ্লবের প্রস্তুতিকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় এ সময় শাসক গোষ্ঠী এক নতুন পন্থা উদ্ভাবন করল। হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। বলা বাহুল্য, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন একজন ইংরেজ, এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—দেশের বুকে ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের প্রস্তুতি প্রতিরোধ করা এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করা। ১৮৯৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আনন্দ মোহন বোস পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী (হিন্দু অর্থে) ইংল্যাণ্ডের শত্রু নয়, বরং বন্ধু।" ভারতীয় কংগ্রেসের জনক দাদাভাই নওরোজী শাসকগোষ্ঠী সমীপে এক আবেদনে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে না রেখে কাছে টেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। বিশিষ্ট নেতা ও স্বনামধন্য বক্তা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি জনগণকে ব্রিটিশ শক্তিকে দমিয়ে দেওয়ার সংগ্রাম না করে, তাকে প্রসারিত করার জন্যে আন্তরিকভাবে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছেন।১

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসকদের সাথে বরাবরই একটা আপোসমূলক নীতি গ্রহণ করে চলেছে। সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়, জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সেই নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়াস ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে বারবার সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। এই সহযোগিতার শর্ত হিসাবে এবং জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক গণশক্তির নিজস্ব বৈপ্লবিক পন্থায় অংশগ্রহণে ভীত হয়ে কংগ্রেসকে বার বার অর্ধপথে জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ অর্ধপথে প্রত্যাহার এবং শাসকগোষ্ঠীর দিকে আপোসের হস্ত প্রসারণ ইহাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চিরাচরিত নীতি ও পদ্ধতি।২

বলা বাহুল্য, ১৯৪৭ সালে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশ ভাগ এবং ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কংগ্রেস ব্রিটিশ রাজশক্তির সাথে আপোস নিষ্পত্তির চূড়ান্ত পরিচয় দান করেছিল।

১৮৫৭ সালের পর হিন্দুদের ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের এই ছিল নমুনা। সত্যিকারভাবে হিন্দুরা ইংরেজ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করল ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকে।

---

১. India Today: R. P. Dutta, P. 322.

২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ৩১৬।

মহাবিদ্রোহের মাত্র তিন বছর পর ১৮৬০ সালে সংঘটিত হল 'নীল বিদ্রোহ। এদেশে সংঘটিত অসংখ্য বিদ্রোহের মধ্যে একমাত্র নীল বিদ্রোহ-ই ব্যাপক এবং সফল গণ-বিদ্রোহ।

নীল বিদ্রোহের সফলতার মূল কারণ চাষীদের একতাবদ্ধ ব্যাপক প্রচেষ্টা। দীর্ঘদিন যাবত জমিদার-মহাজনদের শোষণ-পীড়নে বাংলার চাষীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারপর এল নীলকরেরা। সব শোষণ পীড়নকে ছাড়িয়ে গেল নীল-করদের অমানুষিক বর্বরতা। সবার উপরে ছিল রাজশক্তির রোষানল। মার খেতে খেতে চাষীদের যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকলো, তখন বাধ্য হয়েই তারা হয়ে উঠলো মারমুখো, বেপরোয়া।

বলা বাহুল্য, এ বিদ্রোহে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুদের সহ-যোগিতা না থাকলেও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সহযোগিতা ছিল। তবে নীলকর-দের অত্যাচারে যেসব জমিদার কোণঠাসা হয়ে পড়ে, জমিদারী হারায় এবং নির্যা-তনের শিকার হয় এমন সব জমিদার—এ বিদ্রোহে চাষীদের সাথে সহযোগিতা করে। ইংরেজ রাজশক্তির এক চক্ষু পৃষ্ঠপোষকতাও তাদের শেষরক্ষা করতে পারেনি।

যোগ্য নেতৃত্ব ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকলে নীল বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণরূপ নিয়ে হয়ত আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করত এবং বহু পূর্বেই ব্রিটিশ রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হত। তবুও একথা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশে সংঘটিত অসংখ্য বিদ্রোহের মধ্যে নীল বিদ্রোহ একমাত্র সফল বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ চিরদিন সংগ্রামী জনতার প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে যাঁরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ঢাকা যাদুঘরের মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হক সাহেব সৎ পরামর্শ দিয়ে ও প্রয়োজনীয় কয়েকটি বইয়ের একটা তালিকা দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে উপকার করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব সাহেবও আমাকে কিছু তথ্যের সন্ধান দিয়ে সুপরামর্শদাতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

এ ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, রামমোহন পাঠাগার ও কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী প্রভৃতি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা অকৃপণভাবে আমাকে সাহায্য করে আমার গবেষণা-কর্মে সহযোগিতা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হয় যাঁরা বিভিন্ন জেলার রেকর্ডরুমে বসে কাজ করার এবং গ্রামাঞ্চলে তথ্য সংগ্রহের কাজে

সাহায্য করেছেন। আজ তাঁদের নাম স্মরণে না এলেও তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এই গ্রন্থ রচনার কাজে যিনি সবচেয়ে বেশী উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং নানা-ভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক বদরুল হাসান। ঋণ নয়, আমি তাঁর ভালবাসার জালে আবদ্ধ।

পরিশেষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং তার প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর সাহেবের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে এবং এই গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা করে তাঁরা জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। আমার সাধারণ কৃতজ্ঞতা তাঁদের অসাধারণ সাহায্যের ঋণ পরিশোধে অক্ষম।

এ গ্রন্থের রিভিউয়ার ডক্টর কে. এম. মোহসীন এবং এর সম্পাদক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁদের পরামর্শ ও সম্পাদনা এ গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বাসাবো, ঢাকা
১০. ১. ৮২

মেসবাহুল হক

# সূচীপত্র

পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ 	১-১৪২

ইংরেজ পূর্ব-কাল-১ ; ইংরেজ শক্তির আগমন-৫ ; কোম্পানী আমল-৭ ; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-১১ ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-১৫ ; ইংরেজ শাসন ও জমিদার-২৭ ; মহাজন ও বাংলার চাষী-৪৫ ; বাংলার শিল্প ধ্বংস ও ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব ৫৩ ; রেনেসাঁ বা নবজাগরণ-৬২ ; সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমান-৬৭ ; গেজেটের পদসমূহের তালিকা-৭৫ ; মফস্বল জেলাসমূহের অবস্থা-৭৬? মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা-৭৭ ; হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ৯৪ ; প্রথম কৃষক বিদ্রোহঃ ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—১১০ ; ইংরেজ শাসন ও ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র-১২৫ ; গণ-বিদ্রোহ-১৩৩।

নীল বিদ্রোহ 	১৪৩-৩৯০

নীলের আদি কথা-১৪৫ ; নীল প্রস্তুত প্রণালী-১৬৩ ; নীল চাষ ও বাংলার কৃষক-১৬৯ ; নীল চাষের স্বরূপ-১৮৬ ; নীলকরের অত্যাচার-২০১ ; কৃষক, জমিদার ও নীলকর-২২৩ ; তিতুমীরের ভূমিকা-২৪৬ ; ফারায়েযী আন্দোলনঃ হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ও দুদু মিয়া-২৫৮ ; নীলচাষীর সংগ্রাম ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান-২৭২ ; নীল কমিশন-৩০৬ ; নীল চাষ ও রামমোহন দ্বারকা নাথের ভূমিকা-৩১৭ ; নীল বিদ্রোহে ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা-৩২৯ ; সাহিত্যে নীল বিদ্রোহ-৩৪১ ; লঙ সাহেব-৩৫৩ ; ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ-৩৬২ ;

গ্রন্থপঞ্জী 	৩৯১
নির্ঘণ্ট 	৩৯৯

A true history of the Indian people under British rule has still to be pieced together from the archives of a hundred distant record rooms, with a labour almost beyond the powers of any single man, and at an expense almost beyond the reach of any ordinary private fortune.

Sir William Hunter

# পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ

# ইংরেজ-পূর্বকাল

মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম মুহূর্তে শাসকমন্ডলীর দুর্বলতার সুযোগে সমগ্র ভারত জুড়ে চলছিল রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও সামাজিক গোলযোগ। শাসন বিভাগের কর্মচারী, আমীর-ওমরাহ্, সুবেদার-জায়গীরদার, জমিদার, তালুকদার প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ অন্বেষণে মত্ত হয়ে উঠলো। ঠিক এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে বাংলার সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁ নিজেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন অধিপতি বলে ঘোষণা করলেন (১৭১৭)। সাধারণভাবে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবরূপে পরিচিত হলেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা নিজেদের বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী বলে ঘোষণা করলেন। এমনকি সে সময় যাঁরা বিভিন্ন রাজকার্য অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে এসে বাংলাদেশে বসবাস করছিলেন তাঁরাও নিজেদের এদেশের স্থায়ী অধিবাসী বলে প্রচার করার চেষ্টা করলেন।

মুসলিম শাসনের প্রারম্ভ থেকেই নানা কারণে মুর্শিদাবাদের নবাব বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শক্তি ও সম্পদে বাংলাদেশের খ্যাতি তখন বিশ্বের সর্বত্র। দু'শো বছর ধরে সুলতানি শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়, তারই ঐতিহ্য ধারণ করেই মুর্শিদাবাদের নবাবী শাসন চলে আসছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ নবাবদের অবিবেচনাপ্রসূত শাসনপদ্ধতি এবং অবহেলা হেতু বাংলাদেশের মুসলিম শাসনহস্ত ক্রমশ শিথিল হয়ে আসলো। বহিঃশত্রুর আক্রমণে নদীমাতৃক বাংলাদেশের একমাত্র রক্ষাকবচ ছিল নৌ-যুদ্ধে পারদর্শী বাংলার অজেয় নৌ-বাহিনী। মুর্শিদাবাদের নবাবদের অবহেলার দরুন সেই অজেয় নৌ-বাহিনী শত্রু মুকাবিলায় অক্ষমতার পরিচয় প্রদান করলো।

সর্বশেষে মুর্শিদকুলি খাঁর ভূমি-নীতির কবলে পড়ে বাংলার মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ভূমি-স্বত্ব হারিয়ে সহসা দুর্বল শ্রেণীরূপে পরিগণিত হল। তৎকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদারী-জায়গীরদারী ছিল মুসলমানদের আয়ত্তাধীন। মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাদেশের বহু জায়গীর স্থানান্তরিত করলেন

উড়িষ্যায়। এছাড়া অনিয়মিত খাজনা পরিশোধের অজুহাতে অনেক মুসলমান জমিদারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেই জমিদারী অর্পণ করলেন সামান্য রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীকে। এমনি করেই নদীয়া-যশোহরের স্বরূপপুরের, মাহমুদ-শাহী ও পুকুরিয়া এবং জামালপুর পরগণার জমিদারী চলে যায় নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রামজীবনের আয়ত্তে। মোমেনশাহী ও আলেপশাহী পরগণা ছিল ঈশা খাঁর বংশধরদের আয়ত্তাধীন। নবাবের ভ্রান্ত নীতির ফলে তা চলে যায় দু'জন হিন্দু রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীর হস্তে। এককালে এসব মুসলমান জমিদার ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবের শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। মুসলমান জমিদার-দের জমিদারী হস্তান্তর হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই নবাবের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায়।১

মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দু কর্মচারীদের যোগ্য ও বিশ্বাসী রাজস্ব আদায়কারী বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর একটা বিশেষ ধারণা ছিল যে, হিন্দু কর্মচারীরা স্বাভাবিক কারণেই অনুগত থাকবে। কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বা উস্কানিমূলক তৎপরতায় লিপ্ত থাকবে না। মুর্শিদকুলি খাঁর ভ্রান্ত নীতির ফলেই কালক্রমে সৃষ্টি হল নাটোর, দিগাপাতিয়া, মুক্তাগাছা ও মোমেনশাহী প্রভৃতি হিন্দু জমিদার। মুর্শিদকুলি খাঁর উদার নীতির ফলে দিনাজপুর ও বর্ধমানের হিন্দু জমিদাররা নিজেদের জমিদারির সীমা নানাভাবে পরিবর্ধন করে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। যার ফলে পরবর্তীকালে এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের আধিপত্য প্রবল আকার ধারণ করে।

মুর্শিদাবাদের নবাবদের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত হয় জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদের মত কুচক্রী ব্যবসায়ীরা। জগৎ শেঠ ছিল সরকারের অর্থ সরবরাহকারী। এ অর্থ-লগ্নি ব্যবসায় জগৎ শেঠ বাৎসরিক ৪০ লক্ষ টাকা মুনাফা আদায় করতো। সাম্রাজ্যের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি জগৎ শেঠের অর্থের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে যে কোন আমীর-ওমরাহ্ অপেক্ষা জগৎ শেঠের আধিপত্য ছিল অনেক বেশী। নবাবের যে কোন জরুরী প্রয়োজনে অর্থের যোগান দিত জগৎ শেঠ। উমিচাঁদকে ক্ষমতা ও যোগ্যতার আসনে বসিয়েছেন নবাব

---

১. M.A. Rahim : Social and Cultural History of Bengal. P. 202-205.

আলীবর্দি খাঁ। নবাবের ছত্রছায়ায় থেকেই উমিচাঁদ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে ভূপৎ রায়, দর্পনারায়ণ, রঘুনন্দন, কিঙ্কর সেন, আলম চান্দ, লাহেড়ীমল ও দিলপৎ সিং হাজারীর মত বহু হিন্দু দেওয়ানী এবং শাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত হতে সমর্থ হন। এমনকি মুর্শিদ-কুলি খাঁ রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী হিসেবে হিন্দুদের অধিকতর যোগ্য বলে মনে করতেন। কারণ, তিনি মনে করতেন, হিন্দুরা স্বভাবতই ভীরু প্রকৃতির। শাস্তির ভয়ে তারা অন্যায় পরিহার করে চলত অথবা সহজেই অন্যায় স্বীকার করত। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার মত সাহস তাদের নেই।[১]

মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীনও অনুরূপ নীতি অনুসরণ করেছি-লেন। তাঁর আমলে আলম চান্দ, জগৎ শেঠ, যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভ, নন্দলাল এবং আরও বহু হিন্দু রাজ্যের শাসন বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে সংস্থাপিত হয়।

আলীবর্দি খাঁর শাসনকালে হিন্দুর প্রভাব ও আধিপত্য ব্যাপকতায় সুদৃঢ় আকার ধারণ করে। চিনরায়, বীরুদত্ত, কীরাত চান্দ ও উমিদ রায় প্রমুখ হিন্দুকে খালসার দেওয়ানী প্রদান করেন নবাব আলীবর্দি খাঁ। জানকী রায় ও রাম নারায়ণকে যথাক্রমে বিহারের দেওয়ানী এবং গভর্নর পদ অর্পণ করেন। রায়দুর্লভ উড়িষ্যার গভর্নর আর রাজবল্লভ জাহাংগীর নগরের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। একই সময় শ্যামসুন্দর পদাতিক বাহিনীর বক্শী ও রামবাস সিং নবাবের গুপ্তচর বাহিনী প্রধানের পদ অধিকার করতে সমর্থ হন। এছাড়া আরও বহু হিন্দু সামরিক ও বেসামরিক পদে নিযুক্ত হন।

নবাব সুজাউদ্দোলাও একই নীতির অনুসারী ছিলেন। তিনি মোহন লালকে প্রধানমন্ত্রী ও জানকী রায়কে দেওয়ান পদে এবং মানিক চাঁদ ও নন্দকুমারকে যথাক্রমে কলিকাতা ও হুগলীর ফৌজদারের পদ অর্পণ করেন। কিন্তু অতীব দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, মুসলমান নবাবদের সরলতা ও বদান্যতার কোন মূল্যই ছিল না হিন্দুদের কাছে। তারা বরাবরই মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও উস্কানিমূলক কাজে লিপ্ত ছিল। এদেশে বসবাসকারী ইংরেজরাও

---

১. M.A. Rahim : Muslim Society and Politics in Bengal, P.4-5.

হিন্দুদের হীন ষড়যন্ত্রমূলক কাজে বিস্মিত না হয়ে পারেনি। পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পূর্বে ১৭৫৪ সালে স্কট তাঁর এক বন্ধুকে পত্র লিখেছিলেন, হিন্দু রাজা ও জমিদাররা মুসলিম শাসকদের প্রতি সর্বদা হিংসাত্মক বিদ্রোহভাব পোষণ করতো। গোপনে গোপনে তারা মুসলিম শাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতো।১

প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদাবাদ রাজদরবারে হিন্দুদের আধিপত্য এতই প্রবল ছিল যে, তাদের না জানিয়ে বা তাদের অগোচরে রাজ্যের কোনপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার উপায় ছিল না। রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা সর্বত্র ছিল হিন্দুদের আধিপত্য। যার ফলে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সাথে হিন্দু ব্যবসায়ীদের সার্বক্ষণিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের সবই ছিল হিন্দু।২

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীকার রাজীবলোচন স্পষ্টভাবে বলেছেন, ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিলেন হিন্দু জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।৩

ইংরেজ ব্যবসায়ীরা হিন্দুদের মনোভাব অনুধাবন করেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে অনায়াসে হিন্দুদের স্বীয় দলভুক্ত করতে পেরেছিল। আলীবর্দি খাঁর সময় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল স্কট বিলেতে কর্তৃপক্ষের কাছে এক পত্রে উল্লেখ করেছেন—"যদি ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে সঠিকভাবে চলতে পারে এবং হিন্দুদের উৎসাহিত করতে পারে তবে হিন্দুরা অবশ্যই যোগ দেবে তাদের সাথে। উমিচাঁদ এবং তার সহযোগী হিন্দু রাজা ও সৈন্যবাহিনীর উপরে যাদের বিশেষ আধিপত্য কাজ করছে তাদেরও টানা যাবে এ ষড়যন্ত্রে।"৪ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েই আলীবর্দি খাঁর অন্তিম মুহূর্তে ইংরেজরা তাদের যুদ্ধংদেহী-ভাবের পরিচয় দিতে সাহসী হয়েছিল। নবাব প্রেরিত দূতকে অপমান করে তারা পরিচয় দিয়েছিল চরম ঔদ্ধত্যের। এমনকি তারা গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল ঢাকায় রাজবল্লভের সাথে।

১. H. C. Hills : Bengal in 1756-57, p. XXIII.
২. H. C. Hills : P. CII. CXVI,CLIX.
৩. K.K. Dutta : Alivardi and his Times, Cal. 1939. P. 118.
৪. M.A. Rahim : Muslim Society and Politics in Bengal. p. 7.

মোটকথা, মুসলিম শাসকদের উদারতার সুযোগে ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানী ও হিন্দু প্রতাপশালী ব্যক্তিদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ফলে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, তারই বিষ-ফল এদেশের বুকে ইংরেজ আধিপত্য।

## ইংরেজ শক্তির আগমন

ভারতের ১ বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা।২

ভারতে ইংরেজ আধিপত্য শুরু হয় বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে। ইংরেজদের ঔদ্ধত্য চরম আকার ধারণ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়। এমন কি সিরাজউদ্দৌলার অভিষেকের সময় প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সাধারণ উপঢৌকন পর্যন্ত পাঠাল না তারা। পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনা, দস্তকের অপব্যবহার। কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে দস্তক প্রদান করা হয়েছিল নদীপথে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধার জন্যে। কোম্পানী সেই দস্তক অন্যদের প্রদান করায় শুল্ক আয়ের ক্ষেত্রে নবাবের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। ঠিক একই সময় ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে এবং উক্ত টাকাসহ পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ও পরিবারের সবাইকে গোপনে কলি-কাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে প্রেরণ করে। নবাব দস্তক অপব্যবহারের কৈফিয়ত তলব করেন এবং কৃষ্ণবল্লভকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করার জন্যে এক আদেশ জারি করেন। ইংরেজ সে আদেশ অমান্য করায় নবাব কলিকাতা আক্রমণ করেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার না করেই নবাব কলিকাতা দখল করেন। মানিক চাঁদের উপর কলিকাতার শাসনভার অর্পণ করে নবাব ফিরে

---

১. ভারত বলতে বর্তমানের পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ নামক উপমহাদেশ বুঝতে হবে।

২. In the history of the world there is no more wonderful story than that of the making of the British Empire in India.
Colonel G. B. Malloson : The Indian Mutiny of 1857, p.1.

গেলেন মুর্শিদাবাদ। কলিকাতা পতনের পর ড্রেক ও তার সহকর্মীদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু উমিচাঁদ, নবকৃষ্ণ, মানিকচাঁদ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ ও অন্যান্য প্রভাবশালী জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার ফলে ইংরেজদের আত্মসমর্পণ করতে হল না। এমন কি, ইংরেজদের পুনঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিতেও বাধ্য হলেন নবাব।

কলিকাতা সংঘর্ষের খবর মাদ্রাজ পৌঁছতেই কোম্পানীর মাদ্রাজ কাউন্সিল রবার্ট ক্লাইভকে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রার আদেশ দিলেন। ক্লাইভ ৯ শ' ইংরেজ ও ১২ শ' দেশীয় সৈন্য নিয়ে এডমিরাল ওয়াটসনসহ কলিকাতা যাত্রা করল। বিনা বাধায় ইংরেজ সৈন্য কলিকাতা দখল করে নিল। পূর্ব হতে মানিক চাঁদের সাথে ক্লাইভের পত্রালাপ থাকায় মানিক চাঁদ কোন বাধাই দিল না। এরপর ইংরেজ বাহিনী অধিকার করল হুগলী। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই কলিকাতা পরিত্যাগ করল। ফরাসী সৈন্য পরাজিত হল অতি সহজে।

## পরবর্তী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত

পলাশী প্রান্তরে সংঘটিত হল জঘন্যতম এক যুদ্ধ প্রহসন। নবাবের ৫০ হাজার সৈন্য পরাজিত হল ইংরেজদের মুষ্টিমেয় সৈন্যের হাতে। সফল হল উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ প্রমুখের সুদীর্ঘকালের ষড়যন্ত্র। ক্ষমতালোভী মীরজাফর পৃথিবীর ইতিহাসে রেখে গেল বিশ্বাসঘাতকতার এক নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ কিন্তু এই হীন ষড়যন্ত্র ধামা-চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক ছাফাই গেয়েছেন। ইংরেজ-বীরত্বের মহিমা কীর্তনে তারা পঞ্চমুখ। সত্য বটে, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি। একজন সেনাপতিও প্রাণ হারাল না এই যুদ্ধে। অথচ পলাশী যুদ্ধের মাত্র ছ'বছর পর সংঘটিত ফকীর-সন্নাসী বিদ্রোহে কমপক্ষে ছয়জন বৃটিশ সেনাপতি ও কয়েক হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল। যেখানে মাত্র পাঁচশ ফকীর-সন্নাসীকে শায়েস্তা করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হল চার ব্যাটেলিয়ন ইংরেজ সৈন্য, সেখানে পলাশীর যুদ্ধে নবাবের ৫০ হাজার সৈন্য কি করে পরাজিত হল কয়েকশ ইংরেজ সৈন্যের হাতে? এ এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ক্ষমতা দখলের পর কোম্পানী সৈন্য হীনকৌশল আর ষড়যন্ত্রে অধিকার করলো বেনারস ও অযোধ্যা ; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করলো মারাঠাদের, অধিকার করলো পাঞ্জাব ও আফগানিস্তান।

মোগল সম্রাটদের দুর্বলতা ও ভারতীয় সমাজের বিপর্যয়ের সুযোগে ইংরেজ শক্তি অতি সহজে সমগ্র ভারত গ্রাস করে বসলো।

## কোম্পানী আমল

পলাশী যুদ্ধের প্রহসনের মাধ্যমে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা ও বিহারে আধিপত্য স্থাপন করলো।

১৭৫৭ সাল থেকে শুরু হলো ইংরেজ কোম্পানী রাজত্বের। কিন্তু সত্যি-কারভাবে ইংরেজ কোম্পানী রাজদণ্ড ধরল ১৭৬৫ সালে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর থেকে। ইতিহাসগতভাবে ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত কালকে বলা হয় 'কোম্পানীর আমল।' ১৭৭৩ সালের 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' এবং ১৭৮৪ সালের 'পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট'-এর কৌশলে বণিক কোম্পানী চলে গেল বৃটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে।

কূট-কৌশল আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ক্ষমতা দখল করলো বটে, কিন্তু প্রথমেই তারা দেশের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সাহসী হল না। ভয় ছিল, মানুষ সহজে মেনে নেবে কিনা তাদের শাসন। তাই প্রথমে কয়েকজন সাক্ষী-গোপালকে নবাবের গদিতে বসিয়ে আড়াল থেকে চালাতে থাকল শাসন, শোষণ আর উৎপীড়ন। ধনসম্পদ লুণ্ঠনের আসল চাবি-কাঠি রাখল নিজেদের হাতে। দেশের প্রকৃত নবাব হয়ে থাকল পলাশী যুদ্ধের নায়ক রবার্ট ক্লাইভ।[১]

---

১. After the battle of palassy, the Nawab had became a tool ; a cypher in the hands of foreigners, who was allowed to govern, never to rule—C. B. Malloson—The Decisive Battle of India, p. 70.

বিজয়ের সাথে সাথে ক্লাইভ ও তাঁর অনুচররা সমগ্র দেশের উপর কায়েম করলো লুন্ঠন ও অত্যাচারের বিভীষিকা। পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভ মীর কাসেমের নিকট থেকে উৎকোচ স্বরূপ লাভ করলেন দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড। রাতারাতি লর্ড ক্লাইভ গণ্য হলেন ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন। নবাবী লাভের ইনাম স্বরূপ মীর জাফরের কাছ থেকে কোম্পানীর কর্মচারীরা গ্রহণ করলো ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড এবং চব্বিশ পরগণা জেলার জমিদারী। এর পর এক-টানা গতিতে চললো উৎকোচ গ্রহণ, লুন্ঠন ও ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায়। ১৭৬৬ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি ইংরেজ কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে দেখা যায়—১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলাদেশ ও বিহার থেকে মোট নয় কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিল।[১] লুন্ঠনের এমন জঘন্য উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইংরেজদের এ সর্বগ্রাসী লুন্ঠনে সহায়ক ছিল তাদেরই এদেশীয় কয়েকজন চাটুকার গোমস্তা, বেনিয়ান, দালাল ও মুৎসুদ্দি। পরবর্তীকালে এরাই দেশের বুকে জমিদাররূপে কায়েমী আসন লাভ করেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে অত্যাচারের বিভীষিকা সঞ্চার করেছিল।

ইংরেজ শাসন ও শোষণের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লর্ড মেকলে তাঁর Essays on Lord Clive গ্রন্থে বলেছেনঃ "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থে নয়, নিজেদের জন্যেই কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দেশীয় লোকদের তারা দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য অল্প দামে বিক্রয় ও বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বেশী দামে ক্রয় করতে বাধ্য করলো। কোম্পানীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত দেশীয় কর্মচারীরা সমগ্র দেশে সৃষ্টি করেছিল শোষণ ও অত্যাচারের ভয়াবহ বিভীষিকা। কোম্পানীর প্রতিটি কর্ম-চারী ছিল তার প্রভুর (উচ্চপদস্থ কর্মচারী) শক্তিতে শক্তিমান, আর এইসব প্রভুর শক্তির উৎস ছিল স্বয়ং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। কলিকাতায় ধন-সম্পদের পাহাড় তৈরী হল, অপরদিকে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ স্তরে উপনীত

---

১. Fourth Parliamentary Report, 1773.
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৮।

হল। সত্য কথা যে, বাংলার মানুষ শোষণ-উৎপীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্ত, কিন্তু এমন ভয়াবহ শোষণ ও উৎপীড়ন তারা কোনদিন দেখেনি।"১ মোটকথা একমাত্র শোষণ, উৎপীড়ন এবং অত্যাচারের উপর ভিত্তি করেই চলছিল স্বৈরাচারী কোম্পানীর শাসন।

সমগ্র দেশের উপর শাসনক্ষমতা লাভের সাথে সাথে বেনিয়া কোম্পানীর শাসকরা চেষ্টা করলো বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে শোষণের ব্যবস্থাকে আরও পাকাপাকিভাবে কায়েম করার। তাই প্রথমেই তারা গ্রাম্য চাষীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথা চালু করল। বাতিল করে দিল সমষ্টিগতভাবে গ্রাম্য সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রচলিত প্রথা। মোগল আমলে নিয়ম ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে সরকারের তহবিলে জমা দেওয়া। ইংরেজ কোম্পানী সেই প্রথাও বাতিল করে দিল। ফসলের পরিবর্তে প্রচলন হল মুদ্রার অর্থাৎ মুদ্রাই হল রাজস্ব আদায়ের একমাত্র মাধ্যম। এই ব্যবস্থার ফলে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপনের পথ হল সুগম এবং সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইংরেজ এদেশে এসেছিল ধনিক শোষণ ও বণিক শাসন বিস্তার করে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা নিয়ে। এদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে শোষিত সমাজকে শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ করে স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। ফলে সমাজের চিরকালের সামন্ত-তন্ত্র গেল ভেঙ্গে। ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাও গড়ে উঠতে পারল না সেখানে। কুচক্রী ইংরেজ সমাজের বুকে দাঁড় করিয়ে রাখলো একটা আধ-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। এক দুঃসহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে।

মোগল আমলে যারা ছিল রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তা মাত্র, ইংরেজ শাসকরা এসব গোমস্তা বা খাজনা আদায়কারী কর্মচারীদের জমিদার বা জমির মালিক বলে ঘোষণা করলো। যেখানে ছিল না কোন গোমস্তা, সেখানে গ্রামের সমাজ-পতি বা মাতব্বরকে জমিদার বানিয়ে দেয়া হল। এসব জমিদার শ্রেণীর প্রধান

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৮।

কাজ হল কৃষকের নিকট হতে খুশীমত খাজনা বা কর আদায় করা এবং আদায়ী অর্থের একটা নির্দিষ্ট অংশ ইংরেজ সরকারের তহবিলে জমা দেয়া। এর সাথে সাথে ইচ্ছামত জমি ক্রয়, বন্টন বা বন্ধক রাখার অধিকারও লাভ করলো তারা। জমিদার জমি বিলি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি করলো পত্তনিদার, দরপত্তনিদার ও তালুকদার নামক একদল উপস্বত্বভোগী বা নির্মম শোষক। এইসব জমিদার, তালুকদার পত্তনিদার এবং তাদের নায়েব-গোমস্তাদের অমানুষিক শোষণ, পীড়ন আর অত্যাচারই বাংলার কৃষক জনসাধারণের দুর্ভোগ-দুর্দশার মূল কারণ।

ইংরেজ বণিক সরকার এসব জমিদারদের কাছ থেকে যথাসময়ে রাজস্ব আদায়ের জন্যে নিযুক্ত করল দস্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রতিনিধি। এরাই হল কুখ্যাত 'নাজিম'। বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের জন্যে নাজিম নিযুক্ত হল কুখ্যাত রেজা খাঁ এবং বিহারের নাজিমরূপে সনদ পেল সীতাব রায় ও দেবীসিংহ নামক ভয়ঙ্কর দুই দস্যু-সরদার, অর্থাৎ বাংলা-বিহারের হতভাগ্য কৃষক জনসাধারণকে অবাধে লুঠ করার অধিকার লাভ করল নাজিমরা। এই নাজিম দস্যুদের অত্যাচারের ভয়ে বাংলা-বিহারের নিরীহ চাষীরা সদা তটস্থ থাকত। এমনকি জমিদারদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হত নাজিমদের ভয়ে। নাজিমদের উৎপীড়ন ও অবাধ লুন্ঠন শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যে, নাজিমদের প্রভু ইংরেজ শাসকরা তা সহজে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৭২ সালে বাংলা ও বিহারের রাজস্ব কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ইংলন্ডে কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরসকে লিখেছিলেনঃ

"নাজিমরা জমিদার ও কৃষকদের নিকট হতে যত বেশী পারে অর্থ আদায় করে নিচ্ছে। জমিদারগণও নাজিমদের নিকট হতে নীচের দিকে (চাষীদের) অবাধ লুন্ঠনের অধিকার লাভ করছে। নাজিমরা তাদের সকলের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার রাজকীয় বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত রেখেছে এবং তারই মারফতে দেশের ধন-সম্পদ অবাধে লুন্ঠন করে বিপুল ঐশর্যের অধিকারী হয়েছে।"[১]

---

১. Letter dt. 3rd Nov. 1772ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়।

এরপর স্থাপিত হল জেলায় জেলায় রেভিনিউ বোর্ড। রেভিনিউ বোর্ডের বদৌলতে চাষীদের দেয় করের ভার আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। সরকার ঘোষণা করলেন যে, কর না দিতে পারলে তাদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করা হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বেড়েই চলল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে পেঁাছল যে, সঠিকভাবে কর আদায় করা আর কারও পক্ষেই সম্ভব হল না। এমনকি রেজা খাঁ, সীতাব রায় আর দেবী-সিংহের মত কঠিন-হৃদয় নাজিমরাও পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হল।

## ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৬৯-৭০)

আগেই বলা হয়েছে যে, বণিক-শাসক ফসলের পরিবর্তে মুদ্রাকেই রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করল অর্থাৎ হিন্দু ও মোগল আমলের প্রচলিত ফসল দ্বারা রাজস্ব আদায়ের প্রথা বাতিল বলে গণ্য হল। এবার থেকে কৃষক-দের রাজস্ব আদায় করতে হবে মুদ্রার সাহায্যে। এতদিন তারা রাজস্ব দিয়ে আসছিল সমবেতভাবে, এবার তাদের রাজস্ব দিতে হবে ব্যক্তিগতভাবে মুদ্রার আকারে। কৃষক-শোষণের নতুন এক পন্থা উদ্ভাবিত হল।

পূর্বে মুদ্রার প্রচলন থাকলেও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থার ফলে মুদ্রা সংগ্রহের প্রয়োজনে কৃষকদের ফসল বিক্রি করা ছাড়া উপায় থাকল না। খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্যে কৃষককে তার সারা বছরের খাদ্য ফসল বিক্রি করতে হতো।

এই সুযোগে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলা-বিহারের নানা জায়গায় ধান-চাল ক্রয়-বিক্রয়ের একচেটিয়া ব্যবসাকেন্দ্র খুলে বসল। বেশী মুনাফা লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা কৃষকদের কাছ থেকে ধান-চাল ক্রয় করে গুদামজাত করতে লাগল। পরে সময় ও সুযোগমত উচ্চমূল্যে সেই চাষীদের নিকটই আবার তা বিক্রয় করত। এভাবে সারা দেশে একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে সমগ্র বাংলা-বিহারে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনিয়ে আনল। কোম্পানীর লোকেরা ১৭৬৯ সালে

কৃষকদের কাছ থেকে সমস্ত ফসল ক্রয় করে রাখল এবং ১৭৭০ সালে সেই ফসলই চাষীদের নিকট বেশী দামে বিক্রি করতে লাগল। কিন্তু যে হতভাগ্য কৃষক ইংরেজ সরকারের ধার্যকৃত খাজনা পরিশোধ করতে অক্ষম, সে আবার বেশী দাম দিয়ে ফসল কিনবে কি দিয়ে? ফলে ১৭৭০ সালে বাংলা-বিহার জুড়ে নেমে এল ভয়াল ভয়ংকর এক দুর্ভিক্ষ। সেই দুর্ভিক্ষে মারা গেল এ দেশের কয়েক লক্ষ হতভাগ্য চাষী। বাংলা ১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। তাই এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী এই দুর্ভিক্ষকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক ইয়ং হাসব্যান্ড এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে বিবরণ লেখেন তা নীচে উদ্ধৃত হ'লঃ

"তাদের (ইংরেজ বণিকদের) মুনাফার পরবর্তী উপায় ছিল চাল কিনে গুদামজাত করে রাখা। তারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এ দ্রব্যটির জন্যে তারা যে মূল্যই চাবে, তা পাবে।......চাষীরা তাদের প্রাণপাত কার পরিশ্রমের ফল অপরের গুদামে মজুদ থাকতে দেখে চাষ-বাস সম্বন্ধে একরকম উদাসীন হয়ে পড়ল। ফলে দেখা দিল ভয়ানক খাদ্যাভাব। দেশে যে সব খাদ্য ছিল, তা ইংরেজ বণিকদের দখলে। খাদ্যের পরিমাণ যত কমতে থাকল, ততই দাম বাড়তে লাগল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চির দুঃখময় জীবনের উপর পতিত হল এই পুঞ্জিভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু এটা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র।

এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তা ভারত-বাসীরাও আর কোনদিন চোখে দেখেনি বা কানে শোনেনি। চরম খাদ্যাভাবের এক ভয়ানক ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল ১৭৬৯ সাল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাদের সকল আমলা, গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান-চাল কিনতে লাগল। এই জঘন্যতম ব্যবসায়ে মুনাফা এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণ ছিল যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য

ভদ্রলোক এ ব্যবসা করে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রায় ৬০ হাজার পাউন্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) দেশে পাঠিয়েছিল।"১

পরিশেষে উক্ত লেখক মন্তব্য করেছিলেনঃ

"বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ এমন একটা নতুন অধ্যায় যোজন করেছে, যা মানব সমাজের সমগ্র সত্তা জুড়ে ব্যবসানীতির এই ক্রুর উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে ; আর পবিত্রতম ও অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকার-সমূহের উপর কত ব্যাপক, কত গভীর ও কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ লালসার উৎকট অনাচার অনুষ্ঠিত হতে পারে— এ নতুন অধ্যায়টি তারও এক কালজয়ী নিদর্শন হয়ে থাকবে।"২

বণিকরাজের সৃষ্ট এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুধুমাত্র বাংলাদেশের নয়— সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস কলঙ্কিত করে রাখবে। ইতিহাস যতদিন থাকবে, মানুষের মধ্যে যতদিন শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শ থাকবে, ততদিন পৃথিবীর মানুষ স্মরণ করবে বাংলার এ ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের তান্ডবলীলার কথা। হান্টার তাঁর 'Annals of Rural Bengal, গ্রন্থে এ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

"১৭৭০ সালের সারা গ্রীষ্মকালব্যাপী লোক মারা গিয়াছে। তাদের গরু-বাছুর লাঙ্গল-জোয়াল বেচে ফেলেছে এবং বীজধান খেয়ে ফেলেছে। অবশেষে তারা ছেলে-মেয়ে বেচতে শুরু করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সময় আর ক্রেতাও পাওয়া গেল না। তারপর তারা গাছের পাতা ও ঘাস খেতে শুরু করে এবং ১৭৭০ সালের জুন মাসে দরবারের রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোস্ত খেতে শুরু করে। অনশনে শীর্ণ, রোগে ক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষ দিনরাত সারি বেঁধে বড় বড় শহরে এসে জমা হতো। বছরের গোড়াতেই সংক্রামক রোগ শুরু হয়েছিল। মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদে পানি বসন্ত দেখা দেয় এবং বহু লোক এই রোগে মারা যায়। শাহজাদা সাইফুতও এই রোগে মারা যান। মৃত ও মরণাপন্ন রোগী স্তূপাকারে পড়ে থাকায় রাস্তাঘাটে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাশের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, তা পুঁতে ফেলার কাজও দ্রুত

---

১. Young Husband : Transaction in India (1786).
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়; পৃঃ ১১-১২।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের মেথর, কুকুর, শেয়াল ও শকুনের পক্ষেও এত বেশী লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্গন্ধযুক্ত গলিত লাশ মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল।"১

বাংলা ও বিহারের এক-তৃতীয়াংশ লোক স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের সর্ব-গ্রাসী শোষণ-পীড়নে আহুতি দিয়েও নিস্তার পায়নি। ১৭৭০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট লিখিত রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের এক পত্রে জানা যায়ঃ

"অবস্থা শোচনীয় হলেও কাউন্সিল এখনও রাজস্ব বা নির্ধারিত পরিমাণ আদায় কম হয়েছে বলে দেখতে পাননি।"২

অথচ এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলাদেশের অনেক জেলাই প্রায় জন-মানবশূন্য হয়ে পড়েছিল। আবাদী জমি বনে-জংগলে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক হান্টার সাহেবের বিবরণে জানা যায় যে," ১৭৭০ সালের মে মাস শেষ হওয়ার আগেই মোট জনসংখ্যার তিনভাগের এক ভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বলে সরকারীভাবে হিসাব করা হয়েছিল। জুন মাসে প্রতি ষোলজনের ছয়জন মারা গিয়েছিল বলে ধরা হয়। এই সময় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কৃষকদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, সমস্ত জমিতে আবাদ করার জন্যে তাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। এতো বেশী রায়ত মারা গিয়েছিল এবং জমি পরিত্যাগ করেছিল যে, ভূ-স্বামী-দের পক্ষে বকেয়া খাজনা আদায় করার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছিল।"৩

অন্যত্র বলেছেনঃ "যে দেশের অধিবাসীগণ সম্পূর্ণরূপে চাষাবাদের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, সেই দেশে জনশূন্যতার পর সেই অনুপাতে জমিজমা অনাবাদী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল, ফলে মোট জমির এক-তৃতীয়াংশ দ্রুত পতিত জমিতে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের তিন বছর পর এত বেশী পরিমাণ জমি অনাবাদী হয়ে পড়েছিল যে, স্থানীয় রাজাদের রাজ্য থেকে প্রজাদের প্রলুব্ধ করে এই সকল জায়গায় আনার জন্য কাউন্সিল উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিলেন।"৪

---

১. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal): হান্টার, পৃঃ ২২-২৩।
২. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal), পৃঃ ১৯।
৩. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal): হান্টার, পৃঃ ২৯।
৪. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal): হান্টার, পৃঃ ২৯।

কোম্পানী সরকারের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তবুও মেটেনি, শোষণ-পীড়ন চলছিল সমান গতিতেই। শকুনের মত লাশের উপর বসেও কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল মৃতপ্রায় চাষীদের উপর। তাই দেখা যায়, দুর্ভিক্ষের পূর্বে (১৭৬৮) যেখানে বাংলাদেশের রাজস্ব ছিল ১,৫২,০৪,৮৫৬ টাকা। দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭১ সালে সমগ্র দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মরে যাওয়ার পরও মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো, ১,৫৭,২৬,৫৭৬ টাকায়।১

সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইতিহাস 'সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খারিন' রচয়িতা ইংরেজ দস্যুদের এই বীভৎস শোষণ-উৎপীড়ন ও দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে সর্বহারা অসহায় জনগণের দুঃখ-দুর্দশায় আকুল হয়ে লিখেছিলেন, 'হে খোদা! তোমার দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট বান্দাদের সাহায্যের জন্যে একটিবার তুমি স্বর্গ হতে এ ধরার ধুলোয় নেমে এসো। রক্ষা কর তাদের এ অসহনীয় উৎপীড়নের হাত থেকে।২

## চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)

সর্বকালের ভয়ঙ্কর এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের অস্তিত্ব তো লোপ পেলই, তাছাড়া বহু প্রাচীন পরিবারও ধ্বংস হয়ে গেল। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ল, যারা বেঁচে থাকল তারাও শোষণ আর অত্যাচারের ভয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচল। এমতাবস্থায় খাজনা দেবে কে? বণিকরাজ তবুও কঠোর— যেমন করে হোক খাজনা আদায় করতে হবে। জমিদাররা ছিল বণিক সরকারের হাতের পুতুল। সাধারণ মানুষ সরকার বলতে বুঝতো জমিদার। জমিদারেরা ছিলেন বরাবরই বিত্তশালী ও সঙ্গতিপন্ন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বছর এবং তার পরের বছরগুলোতে জনসাধারণের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে না পারায় সে'সব জমিদারদের বরখাস্ত করা হয়, কেউ কেউ আবার

---

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষকঃ বদরুদ্দীন উমর, পৃঃ ৫।
২. Siyar-ul-Mutakharin, Translated by Ghulam Hussain Khan.

কারারুদ্ধ হলেন। তাদের জমিদারী বন্দোবস্ত দেয়া হল অন্যের কাছে। তাদের পরিবারবর্গকে কপর্দকশূন্য হয়ে পথে দাঁড়াতে হল। বাংলাদেশের যে সব প্রাচীন পরিবার মোগলদের কাছ থেকে আংশিক স্বাধীনতা ভোগ করত এবং বৃটিশ সরকার যাদের জমিদার বলে মেনে নিয়েছিল, তাদের অবস্থা হল আরও শোচনীয়। নিম্নবঙ্গের দুই-তৃতীয়াংশ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের পতন ১৭৭০ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল।[১]

এমনি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও বণিকরাজ সরকার তাদের কৃষক শোষণের ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে চিরস্থায়ী করার আয়োজন করল।

ভূমি রাজস্ব সংস্কারের প্রথম দিকে ব্যবস্থা ছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব বণিক রাজকোষে জমা দিতে না পারলে জমিদারী কেড়ে নেয়া হবে। এই ব্যবস্থার ফলে দেখা গেল যে, কৃষকদের নিকট হতে শত অত্যা-চার করেও পুরোপুরিভাবে খাজনা আদায় সম্ভবপর হচ্ছে না। ফলে জমিদারদের জমিদারী হস্তান্তর হতে লাগল। আজ যিনি জমিদার, কাল তিনি সাধারণ কৃষক। এ ব্যবস্থা চলতে থাকল কিছুদিন। কিন্তু পর পর জমিদারী হস্তা-ন্তর হওয়ার ফলে রাজস্ব আদায়ে ব্যাঘাত ঘটতে থাকল। রাজস্বের পরিমাণ গেল অনেক কমে। এ সংকট দূর করার ইচ্ছা নিয়েই কোম্পানী জমিদারদের সঙ্গে প্রথমে পাঁচসালা এবং পরে দশসালা বন্দোবস্ত কায়েম করল এবং ঘোষণা করা হল যে, 'কোর্ট অব ডাইরেকটরস' চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদন করলে 'দশসালা' বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বলে ঘোষিত হবে। তিন বছর পর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু করলেন। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী জমিদার হল জমির চিরস্থায়ী মালিক। সরকারের অনুমতি ছাড়াই জমি বিক্রয় করা, দান করা, বন্ধক দেয়া অর্থাৎ যে কোনভাবে জমি ব্যবহার করার অধিকার লাভ করল জমিদার। বছরের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমিদারী সরকারকে জমা দিতে পারলেই জমিদারী চিরস্থায়ী।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথমে কোম্পানী সরকার ঘোষণায় যে শাসনতান্ত্রিক ধারা প্রয়োগ করেছিল, তাতে দেখা যায়—জমিদারদের উৎপীড়ন থেকে প্রজাদের

---

১. পল্লী বাংলার ইতিহাসঃ হান্টার, পৃঃ ৪৯-৫০।

রক্ষা করার সদিচ্ছা ছিল কোম্পানী সরকারের এবং তাতে প্রজাদের উৎফুল্ল হওয়ার কারণ ছিল। তাই হয়ত দশসালা বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর থেকেই (১৭৯০) জমিদারেরা প্রচন্ডভাবে এ বন্দোবস্তের বিরোধিতা করতে থাকে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতিমালায় পরিষ্কার নির্দেশ ছিলঃ

১. 'খরা, বন্যা বা মহামারী—কোন অবস্থাতেই জমিদারের দেয় রাজস্ব কমানো বা মওকুফ করা যাবে না। জমিদার তার দেয় রাজস্ব সময়মত না দিতে পারলে আংশিক বা পুরো জমিদারী বিক্রি করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে'। (ধারা ৬, উপধারা ৭, রেগুলেশন নং ১, ১৭৯৩)

২. 'কোন জমিদার প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবে না বা প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। দৈহিক নির্যাতন করতে পারবে না। জমিদারের অভিযোগ থাকলে সে যেন দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করে। জমিদার বা তালুকদার যদি এ আদেশ অমান্য করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রজা অভিযোগ করে, তবে দোষী সাব্যস্ত হলে জমিদারকে প্রজার মামলার সমস্ত খরচ বহন করতে হবে।' (ধারা ৩, ৪, ৫, ২৮; রেগুলেশন নং ৭, ১৭; ১৭৯৩)।

৩. 'ন্যায্য খাজনা ছাড়া অতিরিক্ত কোন প্রকার কর বা আয়কর আদায় করা চলবে না। এখন থেকে জমিদারকে প্রজাদের পাট্টা দান করতে হবে। উক্ত পাট্টায় পরিষ্কারভাবে খাজনার পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে। প্রজাদের উপর শোষণের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে জমিদারকে বেআইনী অর্থ আদায়ের তিনগুণ দিতে হবে।'

(ধারা ৫ রেগুলেশন ৮ ও ধারা ৫৭; উপধারা ১, রেগুলেশন নং ৮,১৭৯৩৮.

৪. 'জমিদারদের অধীনস্থ তালুকদারদের এখন থেকে আলাদাভাবে গণ্য করা হবে এবং তাদের সাথে আলাদাভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে।[১] (ধারা ৫, রেগুলেশন ৮, ১৭৯৩)

---

১. ইতিহাস সমিতি পত্রিকা (Vol. 5 or 6, 1976-1977)ঃ ডঃ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তঃ জমিদারদের প্রতিক্রিয়া।'

দেখা যাচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা অনুযায়ী প্রজাদের কিছুটা সুবিধা ছিল। জমিদারদের ধ্বংস হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ ছিল।

কাজেই জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারা পরিবর্তনের আবেদন জানাল। তাদের দাবী ছিল (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সরকারী খাজনা মওকুফ (খ) অসম রাজস্ব হ্রাস (গ) তালুক জমিদারীর অধীন রাখা (ঘ) পাট্টা প্রথা রদ করা এবং (ঙ) প্রজাদের উপর শক্তি প্রয়োগের অধিকার বজায় রাখা।[১]

এসব দাবী আদায়ের জন্যে জমিদাররা আন্তরিকভাবে সংগ্রাম চালাতে থাকে এবং দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শাসনতন্ত্র যাতে সঠিক কার্যকর না হতে পারে তার জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। বিশেষ করে পাট্টা প্রথা জমিদার বা প্রজা কেউ মানতে রাযী ছিল না। প্রভাবশালী রায়ত যারা, তাদের জমি অনেক। তারা যে পরিমাণ খাজনা দিত, জমি ছিল তাদের তার চেয়েও অনেক বেশী। পাট্টা নিয়ে তারা জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে রাযী হল না।

প্রজাদের স্বার্থরক্ষা ছাড়াও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় জমিদারী সৃষ্টির পেছনে ইংরেজ সরকারের অন্যরকম উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজ শাসকদের প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করা। কৃষক বিদ্রোহ এবং মুসলমানদের ইংরেজী বিরোধী সংগ্রাম দমনে জমিদারদের সহযোগিতা ইংরেজ সরকারের বিশেষ কাম্য ছিল। অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ায় ক্রমশঃ জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করল এবং কৃষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। কাজেই ইংরেজ সরকার তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে প্রজার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নতুন আইন পাস করল। ১৭৯৯ সালে সপ্তম রেগুলেশন পাশ করে সর্বক্ষমতা জমিদারদের হাতে তুলে দিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবার নতুন রূপ ধারণ করল। এবার জমিদার প্রজাকে দৈহিক নির্যাতন, বন্দী, বিষয়সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করার ক্ষমতা লাভ করল। জমিদার শুধু জমিরই নয়, প্রজারও একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসল।

---

১. পূর্বোক্ত।

এমন এক সংকটময় মুহূর্তে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করলেন, যখন সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম সংকটের সম্মুখীন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর থেকেই এমনি চরম সংকটময় অবস্থা চলে আসছিল। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করল, লাখ লাখ চাষী ঘর-বাড়ী ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেল। আবাদী জমি জঙ্গলে পরিণত হল। তবুও কোম্পানী সরকারের জুলুম কমলো না। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে হান্টার বলেছেনঃ 'রাজস্ব আদায় করাই ছিল কালেক্টরদের প্রধান কাজ এবং এই কাজে সাফল্যের উপরই অফিসার হিসেবে তার সুনাম নির্ভর করত, জনসাধারণের সমৃদ্ধির উপর নয়। এই সময়ও (দুর্ভিক্ষের পর) কাউন্সিল প্রায় মনে করতেন যে, বাংলাদেশ যেন এমন একটি বড় জমিদারী যেখানে প্রচুর খাজনা পাওয়া যায়, কিন্তু শাসনের কোন দায়িত্ব পালন করতে হয় না ; আর পল্লী বাংলার শাসকেরা (জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি) যেন পাইক বরকন্দাজ মাত্র, সরকারী রাজস্ব আদায় ও পুনর্বণ্টনের মাধ্যম নয়। অতএব প্রত্যেকটি জেলা থেকে যথাসম্ভব বেশী টাকা আদায় করা এবং জেলার উন্নতির জন্য যথাসম্ভব কম খরচ করাই ছিল সবচেয়ে প্রশংসনীয় কাজ।'১

এমনি একটি অবাস্তব ধারণার বশবর্তী হয়েই হয়ত লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন ২,৩৮,০০,০০০ টাকা। অথচ রাজস্ব নির্ধারণের পূর্বে জমির পরিমাপ বা তার উৎপাদন শক্তির হিসেব এবং চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য গ্রহণ করার চেষ্টা করা হল না। শাসনের কোন দায়িত্ব পালন করতে হত না বলেই বণিকরাজ কর্মচারীদের পক্ষে এমনি অন্যায় অবাস্তব পন্থা অবলম্বন সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত এদেশের চাষীরা জোর-জুলুমের ভয়ে হোক বা খাজনা আদায়ের তাকীদে হোক কোম্পানীকে দেয়-অর্থ কম দিত না বা দিতে পারত না। হান্টার সাহেবের ভাষায়, 'কৃষকায় খাজনা আদায়কারীরা চাষীদের উপর নিষ্পেষণ চালাত এবং তালুকদারগণ একদিকে শঠতার আশ্রয় নিয়ে সরকারকে কম রাজস্ব দিয়ে ঠকাত এবং অন্যদিকে কুমার,

১. পল্লী বাংলার ইতিহাসঃ হান্টার, পৃঃ ২২৭।

কামার, কারিগর প্রভৃতি ও চাষীদের কাছ থেকে ফন্দিফিকির করে নিত্য নতুন বেআইনী সেস্ আদায় করত।'১

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে, খাজনা আর আদায় হয় না। কোন কোন স্থলে চাষীরা সরাসরি খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানাল। এমনকি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়াতেও দ্বিধাবোধ করল না। যার ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বহু কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। কোম্পানীর শাসকদের অন্যায় জুলুমের ফলে বাংলাদেশের অনেক জমিদারকেও অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। কারণ, তারা কোম্পানীর দাবী অনুযায়ী প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ে অকৃতকার্যতার পরিচয় দিয়েছিল। এ বিষয়ে হান্টার সাহেবের বক্তব্য সুস্পষ্টঃ 'সরকারী পাওনা আদায় হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ কখনই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কোন ক্ষেত্রে বড় রকমের ঘাটতি হলে কালেক্টর জমিদারকে জেলে দিতেন এবং নিজেই জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবত ঘাটতি পড়াই অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল ; ফলে নাবালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক না হলে কোন জমিদার যে কতদিন জেলের বাইরে থাকতে পারবেন, তা তাঁরা নিজেরাও সঠিকভাবে বলতে পারতেন না।' ২

সরকারের ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রাব্যবস্থাও আশানুরূপ রাজস্ব আদায়ের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শস্যের পরিবর্তে মুদ্রা রাজস্ব আদায়ের নিয়ম প্রচলিত, তাই চাষীদের যেমন করে হোক মুদ্রা সংগ্রহ করতে হতো এবং এই মুদ্রা সংগ্রহ করতে গিয়ে চাষীরা অনেকভাবে নাজেহাল হতো। দেশে তখন বত্রিশ রকমের টাকা ছাড়াও কড়ি, তামার মুদ্রা, তামার পাত প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এ ছাড়া ছিল সোনার মোহর, প্যাগোডা,৩ ও ডলার। কোনো কোনো ট্রেজারীতে কড়ি নেয়া হতো। আবার কেউ কেউ তা নিতো না। কোনো কোনো কালেক্টর সোনা নিতেন, আবার

---

১. পল্লী বাংলার ইতিহাসঃ হান্টার, পৃঃ ২২৪।
২. পল্লী বাংলার ইতিহাসঃ হান্টার, পৃঃ ২৩১।
৩. ওজন বিনিময়ের হার অনুসারে প্যাগোডার মূল্য ছিল ৬ শিঃ ৮ পেঃ থেকে সাড়ে আট শিলিং।

অনেকে তা নিতেন না। এমনই দোটানা অবস্থায় পড়ে চাষীরা তখন নাজেহাল। চাষীরা ফসল বিক্রি করার সময় জানতেই পারতো না যে, ফসল বিক্রি করে যে মুদ্রা পেয়েছে তা খাজনা দেওয়ার সময় চলবে কি চলবে না।

এ ছাড়া হিন্দু আমলের মুদ্রাসহ বহু প্রকার মুদ্রা তখন চালু ছিল। এর মধ্যে আবার অধিকাংশ মুদ্রা ছিল ক্ষয়ে যাওয়া, কোনটা ছিল কাটা কিংবা ফুটো, কোনটায় হয়ত আসল ধাতুরই অভাব। এমতাবস্থায় রাজস্ব দেয়ার সময় চাষীরা পড়তো সংকটে। ট্রেজারীতে জমা দেয়ার সময় জমিদারদের নিকট থেকে এ সমস্ত মুদ্রার জন্যে বাট্টা আদায় করতেন। ক্ষয়ে যাক বা কাটা হোক বা না হোক তা এক বছরের পুরানো হলেই চাষীকে শতকরা ৩ টাকা বাট্টা দিতে হতো। দু'বছরের পুরনো মুদ্রার জন্যে দিতে হতো শতকরা ৫ টাকা। জমিদার তার অধীনস্থ তালুকদারদের কাছ থেকে এই হারে দ্বিগুণ এবং তালুকদার চাষীদের কাছ থেকে এই হারে ৪ গুণ বাট্টা আদায় করতেন। ১

মোটকথা কোম্পানী সরকারের শোষণ, পীড়ন ও অব্যবস্থার ফলে দেশের সর্বত্র তখন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই অস্বাভাবিক অবস্থারই পরিণতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনে ইংরেজ সরকারের বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ইংরেজ কোম্পানী সরকারের শোষণ ও শাসনের অব্যবস্থা এবং জমিদার মহাজনের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশে অনেক কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। একা ইংরেজ শক্তির পক্ষে এসব বিদ্রোহের মুকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। এসব গণ-বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই তারা জমিদার নামক একদল কায়েমী স্বার্থবাদী সমর্থক সৃষ্টি করল। কৃষকদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকবে এদের। আর থাকবে কৃষক শোষণের অবাধ অধিকার। কোম্পানী সরকারের ভূমিকা থাকবে এখানে বিশেষ নিরাপদ পর্যায়ের, কৃষকদের রোষানল থেকে দূরে। লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই জমিদারদের আমাদের সহযোগী

---

১. পল্লী বাংলার ইতিহাসঃ হান্টার, পৃঃ ২৪৯-২৫০।

করে নিতে হবে। যারা একটা লাভজনক ভূসম্পত্তি পরম আরামে ও নিশ্চিন্ত মনে ভোগ-দখল করবে, তাদের মনে পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা জাগতেই পারে না।"[১]

ইংরেজ সরকারের এই উদ্দেশ্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। পরবর্তী-কালে সংঘটিত বিদ্রোহগুলির ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও ১৮৫৯-৬১ সালের নীল বিদ্রোহে জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর গণসংগ্রাম বিরোধী ভূমিকা এদেশে ইংরেজ শাসন বিস্তারে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহের মুকাবিলায় এ দেশের জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতের জনদরদী ও সমাজ সেবক গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিং স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেনঃ

"আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ বা গণ-বিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। অন্যান্য বহু দিক দিয়ে এমন কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও, এর ফলে এমন একটা বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি হল, যারা এদেশের বৃটিশ শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল ছিল এবং জনগণের উপর যাদের অখন্ড প্রভুত্ব বজায় রইল।"[২]

জনগণের উপর জমিদার শ্রেণীর অখন্ড প্রভুত্ব বজায় না থাকলেও বৃটিশ শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়, এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকারযোগ্য। ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্য যে বিফল হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষক বিদ্রোহের বিপর্যয়ের মুখে জমিদার-তালুকদার শ্রেণীর প্রভুরক্ষার ভূমিকায়। প্রতিটি গণ-বিদ্রোহে তারা কৃষক জনগণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে এতটুকু কার্পণ্য করেনি।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও ১৮৫৯-৬১ সালের নীল বিদ্রোহে জমিদার শ্রেণীর ভূমিকায় উৎফুল্ল হয়ে ১৮৬২ সালে বৃটেনের ভারত সচিব ভারতবর্ষে তাঁদের প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে বলেছেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

---

১. Land Problem of India : A. K. Mukharjee P. 35.
২. Lord William Bantick : Speech (Quoted from R. P. Dutta's India Today, P. 233.

হতে যে বহুবিধ রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়, এতে মহারাণী সরকার কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেন না। যে শাসন ব্যবস্থা ভূ-স্বামীদের এরূপ একটা সুযোগ স্বেচ্ছায় দান করেছে এবং যে শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বের উপর ভূ-স্বামী-দের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সেই শাসন ব্যবস্থার প্রতি ভূ-স্বামীদের অনুরক্তি ও আনুগত্যের মনোভাব জাগ্রত না হয়ে পারে না।'১

১৯২৫ সালে যখন সমগ্র ভারতব্যাপী গণ-আন্দোলন চলছিল, তখন বৃটিশ সরকারকে আশ্বাস দিকে বঙ্গীয় জমিদার সংঘের (Bengal Land Holder's Association) সভাপতি বড়লাটকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেনঃ

'মহামান্য বড়লাট বাহাদুর। আপনি জমিদারদের পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বস্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারেন।'২

১৯৩৫ সালে শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে জমিদারদের জন্য আসন সুরক্ষিত রাখায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে জমিদার সংঘের তৎকালীন সভাপতি ময়মনসিংহের মহারাজা ঘোষণা করেছিলেনঃ

'শ্রেণী হিসাবে আমাদের (জমিদার শ্রেণীর) অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে ইংরেজ শাসনকে সর্ববিষয়ে শক্তিশালী করে তোলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।'৩

অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ সরকারকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদাররা ইচ্ছামত জমি ক্রয়-বিক্রয় ও বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার লাভ করলো, জমির ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির ফলে জমিদাররাই লাভবান হলো, কিন্তু সরকারী খাতে এক কানা কড়িও জমা হলো না। এছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে কোম্পানী জমি-জমা জরীপ করার ব্যবস্থা করেনি। ফলে যে সমস্ত জমি তখন পর্যন্ত অনাবাদী ছিল, সেসব জমিরও মালিক হলেন জমিদার। বন-জঙ্গলও থাকলো জমিদারের দখলে। কাজেই এ সত্য স্পষ্ট যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ সরকারকে যথেষ্ট আর্থিক

---

১. Letter dispatched from Secy. to state for India to the Govt. of India of July, 1862 (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১১১)।
২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১১২।
৩. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১১২।

ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। ভারতে গভর্নর থাকাকালে লর্ড ডারউইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন সরকারের আর্থিক ক্ষতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন:

'জমির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইহার (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের) অর্থ রাষ্ট্রের পক্ষে ত্যাগ।'১

ইংরেজ সরকারের ব্যক্তিবর্গের উক্তি ও বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট ভাষায় বলা চলে যে, শুধুমাত্র এদেশের ক্রমবর্ধমান কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-আন্দোলনের মুখে পড়ে বৃটিশ শাসন যাতে করে হুমকি বা বিপদের সম্মুখীন না হয়, তারই জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও জমিদার শ্রেণীকে হাতে রাখতে হয়েছে এবং শাসক শ্রেণীর উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত জমিদার শ্রেণী অতি বিশ্বস্ততার সংগে তাদের ইংরেজ প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন।

জমিদার শ্রেণীর বিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতা হেমচন্দ্র কানুনগো বলেছেন:

'এ কাজে (সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে) সরকারী ছোট-বড় কর্মচারীদের মধ্যে এমনকি পুলিশের কাছেও সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু জমিদার শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে কম সাড়া পেয়েছি।'২

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান অর্থ-চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালে বিহার ও বাংলাদেশে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্যে ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে যে পরিমাণ অর্থের চাহিদা দেখা দিয়েছিল তা ইংলন্ড থেকে প্রেরণ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। জমিদারদের নিকট থেকে আদায়ী অর্থ দিয়েই বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তারের খরচ যোগানো হতো। কৃষক জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে জমিদার গোষ্ঠী চিরকাল চেষ্টা করছে কোম্পানী সরকারের

---

১. Memorandum on the Permanent Settlement, P. 39.

২. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা: হেমচন্দ্র কানুনগো।

\ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক: বদরুদ্দীন উমর, পৃ: ৯।

রাজস্ব যোগাবার। অথচ একথা ইতিহাসগতভাবে সত্য যে ১৭৬৫ সালে নিম্ন-বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর কোম্পানীর হাতে প্রতি বছর এতো উদ্বৃত্ত টাকা থাকতো যে মূলধনের জন্য আর বিলেত থেকে রৌপ্য মুদ্রা আমদানী করতে হতো না।'[১] কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আদায়ী অর্থ বাংলাদেশে থাকতো না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঘাটতি পূরণের জন্য বাংলাদেশের অর্থ চালান হতো। ঐতিহাসিক হান্টার সাহেবের মতে, ইংরেজ আমলের পূর্ব হতেই বাংলাদেশের অর্থ অন্য প্রদেশে ঘাটতি পূরণের কাজে ব্যয় হতো। ইংলন্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরকে লিখিত বঙ্গীয় রেসিডেন্ট এন্ড কাউন্সিলের ১৭৭০ সালের ১৫ই আগস্ট ও ১৭৭২ সালের ৯ই মার্চের পত্রে কাউন্সিল অভিযোগ করেছেন, "অন্যান্য প্রেসিডেন্সিতে টাকা পাঠাতে পাঠাতে বাংলাদেশের ট্রেজারীগুলি শূন্য হয়ে গিয়েছে।"[২]

তাই বরাবরই কোম্পানীর সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যয়, বিদ্রোহ দমনের খরচ, অন্যান্য প্রদেশের ঘাটতি পূরণের খরচ তদুপরি কোম্পানীর অংশীদারদের লভ্যাংশ-- এত সব খরচের অর্থের যোগান দিতে হতো বাংলাদেশকে। মাদ্রাজে ব্যবসা চালানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে রূপা পাঠানো হতো। বোম্বাইয়ের রাজস্ব থেকে শাসন ব্যবস্থার ব্যয় সংকুলান হতো না বলে সেখানেও পাঠানো হত বাংলাদেশের রূপা। বস্তুত অতি প্রাচীনকাল থেকেই অন্যান্য প্রদেশগুলি নিজেদের ঘাটতি পূরণের জন্য বাংলাদেশকে দোহন করে আসছে।'[৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু পূর্ব থেকে বাংলাদেশের রাজস্ব থেকেই কোম্পানীর বাংলাদেশে মূলধন নিয়োগের ব্যবস্থা হয়ে যেতো। যার ফলে প্রতি বছর বিলেত থেকে যে সোনা-রূপা আসতো তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোম্পানী সরকার কামধেনু বাংলাদেশকে দোহনের লোভে পড়ে নিত্য নতুন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে থাকল। বিপুলভাবে ভূমিকর বাড়তেই থাকল। পূর্বেই বলেছি যে, শেষে

১. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal), হান্টার, পৃঃ ২৫৮।
২. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal), হান্টার, পৃঃ ২৫৭।
(বাংলাদেশের রাজস্ব থেকে কোম্পানীর বাংলাদেশে মূলধন নিয়োগের কাজ হয়ে যেতো, ফলে বিলেত থেকে সোনা-রূপা আসা বন্ধ হয়ে গেলো।)
৩. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal), হান্টার, পৃঃ ২৫৭।

অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে রেজা খাঁ, ডাঙ্গা গোবিন্দ সিংহ,দেবী সিংহ, হরে, রাম প্রমুখ কুখ্যাত উৎপীড়কের পক্ষেও কর আদায় করা আর সম্ভবপর হলো না। কৃষকদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ অসন্তোষ। চলতে থাকল দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এই সংকট মুহূর্তে কোন একটা প্রতিকার হিসেবে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামক ব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে এলেন লর্ড কর্নওয়ালিস।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানীর সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হলেও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। কৃষক জনসাধারণ কোম্পানীর কর পরিশোধ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে একথা সত্যি, কিন্তু কোম্পানী বঞ্চিত হয়েছে তার আসল পাওনা থেকে। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে আবওয়াব ইত্যাদি ছাড়া প্রজার খাজনা আদায় হতো ১৮ কোটি টাকা। কোম্পানী সরকার পেতেন তিন কোটিরও কম। বাদবাকী পেতো জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত অনুসারে কথা ছিল সরকারী পাওনার (মানে তিন কোটি) এক-দশমাংশের (অর্থাৎ ৩০ লক্ষের) বেশী জমিদারেরা প্রজাদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে না। কিন্তু জমিদারেরা আদায় করতো ৩ কোটি টাকা।'১ কারও কারও মতে— ১৭/১৮ কোটি টাকা। আবার কারও মতে— ৩০ কোটি টাকা।২

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে যে ভূমি ব্যবস্থা চলে আসছিল তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল। প্রচলিত কৃষকের স্বত্ব ও ভূমি ব্যবস্থার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকলো না। ভূমি-বিশেষজ্ঞ ফিল্ড সাহে-

---

১. সংস্কৃতির রূপান্তরঃ গোপাল হালদার, পৃঃ ২৩১।

২. India Today : R.P. Dutta: p. 23.

বঙ্গীয় আইন পরিষদের ১৯৩৭ সালের অধিবেশনে যখন প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে আলোচনা হয়, তখন তিনজন স্পীকার তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশের মোট আদায়ী খাজনা ২৯ কোটি টাকা (১৭ কোটি বৈধ এবং ১২ কোটি অবৈধ) ৩০ কোটি টাকা (২০ কোটি বৈধ ও ১০ কোটি অবৈধ) এবং ২৬ কোটি টাকা (২০ কোটি বৈধ ও ৬ কোটি অবৈধ)।

বের মতেঃ

'ভূমির উপর কৃষকের স্বত্ব এরূপভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল যে বর্তমান কালে উহার সামান্যতম চিহ্ন খুঁজে বের করা বা কোনরূপ ধারণা করাও অসম্ভব।'[১]

## ইংরেজ শাসন ও জমিদার

অতি সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভূমিস্বত্ব ও ভূমি ব্যবস্থার রদ-বদল হয়ে আসছে এবং এ নিয়ে বিভিন্ন ভূমি-গবেষকদের মধ্যে অনেক মত-বিরোধ বিদ্যমান। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে প্রচলিত সাধারণ একটা রূপ পরিলক্ষিত হয়। তাতে দেখা যায়, ১. গ্রামে জমি বিলি-ব্যবস্থার দায়িত্বভার অর্পিত ছিল দশজন বা পঞ্চায়েতের উপর। ২. জমি বন্টন করা হতো পরিবার হিসাবে। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব হাল-বলদ বা চাষের সাজ-সরঞ্জাম ছিল। ৩. রাজস্ব হিসাবে রাজার প্রাপ্য ছিল উৎপন্ন ফসলের একাংশ অর্থাৎ সত্যিকার-ভাবে জমির মালিক ছিলেন রাজা। প্রজা ছিল জমি ভোগ-দখলের অধিকারী মাত্র। রীতিমত রাজস্ব আদায় করতে পারলে প্রজার স্বত্বাধিকার লোপ করার ক্ষমতা রাজার ছিল না। প্রয়োজনে প্রজার নিজস্ব অধিকার হস্তান্তরের ক্ষমতা ছিল। অবশ্য হস্তান্তরকালে গ্রামের দশজন বা পঞ্চায়েতের অনুমোদনের প্রয়োজন হত। পরবর্তীকালে সামান্য কিছু রদ-বদল হলেও মোটামুটিভাবে ভূমি-স্বত্ব ও ভূমি-ব্যবস্থার রীতি মোগল আমল পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল।

জমিদার সৃষ্টি উপরিউক্ত ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তিত একটা দিক। মুসলিম শাসন যুগে বাংলাদেশে জমিদারদের সামাজিক ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। জমির উপর কর্তৃত্ব ছাড়াও তাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল। বস্তুত তারা ছিল বিভিন্নরূপে জমির অধিকারী এবং রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়কারী সরকারী কর্মচারীমাত্র। স্বীয় এলাকায় সাধারণ ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির অধিকার ছিল তাদের। অবশ্য গুরুতর শাস্তি বিধানের পূর্বে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ বাঞ্ছনীয় ছিল।

---

১. Land Holding : J. Field : P. 23 (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১১৩)।

শাসন বিভাগীয় আংশিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাদের উপর। এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে—প্রত্যেক জমিদারকে নিজস্ব পুলিশ বাহিনী রাখতে হত।[১] জমিদারী সনদ-এর শর্ত অনুযায়ী এলাকায় চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হলে চোর-ডাকাতসহ মালামাল উদ্ধার করার দায়িত্ব ছিল জমিদারের।

ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে অপরাধী বা সমাজবিরোধীদের সনাক্তকরণ এবং বিচারে আদালতকে সাহায্য করার দায়িত্ব ছিল জমিদারের।[২] মফস্বল এলাকায় জমিদার ছিল উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী এবং সরকারের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ দায়িত্বশীল। সনদ চুক্তি অনুযায়ী আজীবন অথবা নির্ধারিত কয়েক বছরের জন্যে জমিদারী ভোগ-দখলের রীতি প্রচলিত ছিল। অবশ্য রীতিমত রাজস্ব আদায় করতে পারলে জমিদারের উত্তরাধিকারীও জমিদার বলে গণ্য হত।

কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদার ছিল রায়তদের প্রতি নির্মম এবং সরকারের দৃষ্টিতে অবাধ্য। তাই সুশাসনের সুবিধার্থে সমগ্র দেশকে কয়েকটি ফৌজদারী বা জেলায় বিভক্ত করা হয়। ফৌজদারদের প্রধান কর্তব্য ছিল জমিদারদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রশাসনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা; এছাড়া, নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও স্থিতি বহাল রাখা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধী বা সমাজবিরোধীদের ধরিয়ে দেওয়া, রাস্তাঘাট মেরামত করা এবং যাতে জমিদার রায়তদের নিকট হতে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে বা তাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কোন কারণে জমিদার সরকারের অবাধ্য বা জনসাধারণের প্রতি অত্যাচারী বলে পরিগণিত হলে জমিদারী ছিনিয়ে নেওয়া হত।

১৭৬৫ সালে ইংরেজ বণিকরাজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটলো। প্রথমত শস্যের পরিবর্তে মুদ্রায় রাজস্ব দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হল। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণের উপর রাজার অংশ নয়, জমির উপর খাজনা। এ খাজনা না দিতে

১. Calcutta Review. 1849. P. 522-28.

২. Siyar-ul-Mutakharin, English Translation by M. Raymond. Cal, 1902. Vol. II. P. 178 and 204-205.

পারলে কৃষক উৎখাত হবে। দ্বিতীয়ত, জমির মালিকানায় কৃষক বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কোন অধিকার আর থাকলো না। তৃতীয়ত, বণিক সরকার খাজনা আদায়ের জন্যে জমির মালিকানা ইজারা দিল বিভিন্ন শ্রেণীর খাজনা যোগানদার-দের কাছে। **এই খাজনা যোগানদারেরাই হল জমিদার এবং জমির প্রকৃত মালিক।**[১] কালক্রমে এই খাজনা যোগানদারেরাই বাংলার চাষীদের সামনে হাজির হল এক বিভীষিকারূপে।

এ সব নব্য জমিদারদের কাছ থেকে আদালত ও ফৌজদারী মোকদ্দমার দায়িত্ব গুটিয়ে নিয়ে তা দেওয়া হল কোর্টের উপর। ১৭৯৩ সালে জমিদারী পুলিশ উঠিয়ে দিয়ে নিযুক্ত করা হল সরকারী পুলিশ। ১৮৯২ সালে চোর-ডাকাত ধরে সোপর্দ করার দায়িত্ব হতে জমিদারদের রেহাই দেওয়া হল :[২]

পূর্বে উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন সেস বা আবওয়াব বাবদ প্রজার খাজনা আদায় হতো প্রায় ১৮ কোটি টাকা অথচ সরকার পেতেন তিন কোটিরও কম। বাদবাকী ভোগ করতো জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা। কাজেই জমিদারী বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্পদশালীদের কাছে একটা বিরাট লাভের বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। দেওয়ান গোমস্তা বেনিয়ান মুন্শী, মুৎসুদ্দিরা কোম্পানীর কৃপায় নব্য ব্যবসায়ীরূপে পরিগণিত হল। কিন্তু বিদেশী বণিকদের আধিপত্য ছাড়িয়ে ব্যবসায়ে প্রসার লাভ বা ইচ্ছানুরূপ ব্যবসা করা কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না তাদের পক্ষে। তা ছাড়া বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা চিহ্নিত হল দালাল ব্যবসায়ীরূপে। কাজেই এবার তাদের দৃষ্টি পড়লো গ্রামের দিকে। টাকা খাটাতে লাগলো জমিজমার মাধ্যমে। হেস্টিংস-এর ইজারা চুক্তি (১৭৭২-১৭৯৩ ইং) এবং লর্ড কর্ণওয়া-লিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ ইং) ফলে এদেশের বুনিয়াদী পুরানো জমিদারদের ভাগ্যে নেমে এলো দুর্ভাগ্যজনক পরিবর্তন।

প্রথমত, নিলামের ডাকে প্রচুর অর্থ যে দিতে পারতো তাকেই জমিদারী ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। পুরানো জমিদারদের অর্থ দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। প্রচুর জমানো টাকা নিয়ে এগিয়ে এলো-বেনিয়ান গোমস্তা, মহাজন

---

১. সংস্কৃতির রূপান্তর, গোপাল হালদার : পৃঃ ১৬৭, ২৩১।
২. Calcutta Review. 1849. Vol. XII P. 523.

আর ব্যাঙ্কের মালিকরা। টাকার জোরে রাতারাতি জমিদার হয়ে বসলো তারা। বলা বাহুল্য, এদের সবাই ছিল হিন্দু অর্থাৎ দেব, মিত্র, বসাক, সিংহ, শেঠ মল্লিক, শীল, এমনকি তিলি আর সাহা ব্যবসায়ীরাও হঠাৎ বনে গেল জমিদার।

দ্বিতীয়ত, পুরনো জমিদারদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমিদারী বিক্রি করে দিয়েছিল এবং সেসব জমিদারী কিনে নিয়েছিল কলকাতার কথিত ব্যবসায়ীরা।১

তৃতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চক্রান্তে পুরনো মুসলমান এবং হিন্দু জমিদারদের নায়েব-গোমস্তারাই জমিদার হয়ে বসেছিল। এছাড়া মুসলমানদের যেসব জমিদারী ছিল, তাও যাতে তাদের হাতে না থাকে তার জন্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা পাদ্রীদের সহায়তায় এক ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললো, যার ফলে হঠাৎ কোম্পানী সরকার এক নোটিশ জারি করে বসলেন যে আয়না লা-খেরাজ ও তৌজী লা-খেরাজের দলিল-দস্তাবেজ ও সনদ-পাঞ্জা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোম্পানী সরকারে দাখিল করতে হবে। তা না হলে লাখেরাজ সম্পত্তি কোম্পানী সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। মুসলমানদের মধ্যে যারা এসব দলিল-দস্তাবেজ ২৪ ঘন্টার মধ্যে দাখিল করতে পারলো না, তাদের লা-খেরাজ জায়েদাদ বলতে কিছুই থাকলো না।

এ ছাড়া বাংলাদেশের মুসলমান জমিদারদের অধিকাংশ জমিদারী পাদ্রীদের সুপারিশে কোম্পানী সরকার খাস করে নিল এবং পরে তা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যদের বন্দোবস্ত দেওয়া হল।২

দেশীয় ব্যবসায়ীরা এবার জমিদার হয়ে বসলো। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি ব্যবস্থার দেড়শ' বছরেরর মধ্যে বাঙালী ব্যবসায়ী আর ব্যবসায়ী থাকলো না। গোপাল হালদারের ভাষায়ঃ 'বাঙালী স্বদেশী আন্দোলন করিল, স্বদেশী শিল্প গড়িতে পারিল না— ইহাও সেই জমিদারী প্রথার ফল।"৩

এসব নতুন জমিদাররা মূলত ছিল শহুরে ভদ্রলোক। মোগল যুগের ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী জমিদাররা কালক্রমে এসব শহুরে ব্যবসায়ী জমিদারদের নিকট তাদের জমিদারী বিক্রি করতে বাধ্য হল। শহরবাসী এইসব জমিদার

---

১. N. K. Sinha : Economic History of Bengal, from Palassy to Permanent Settlement, Cal. 1956. Vol. I. P. 4.

২. শহীদ তিতুমীরঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৪-৫।

৩. সংস্কৃতির রূপান্তরঃ গোপাল হালদার, পৃঃ ২৩৫।

'পত্তনিদার' নামক একটি 'উত্তরিকরপ্রাপ্ত' শ্রেণীর নিকট নির্দিষ্ট খাজনায় চিরকালের জন্য জমি পত্তনি দিল এবং নিজেরা স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করতে থাকলো। এসব পত্তনিদাররা তাদের অধীনে আরেক দল উপ-পত্তনিদার সৃষ্টি করলো।[১] জমিদার যেমন করে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেওয়ার অঙ্গীকারে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করলো, তেমনি এসব পত্তনিদাররা আসল জমিদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেওয়ার চুক্তিতে বাংলাদেশের কৃষক শোষণের অধিকার লাভ করলো। এসব পত্তনিদার গোষ্ঠীই হলো পরবর্তীকালের সুবিধাবাদী মধ্যশ্রেণী।

জমিদাররা বাস করে শহরে। কেবলমাত্র খাজনার টাকা হস্তগত করাই তাদের সাথে জমিদারীর সম্বন্ধ। পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার এবং জমিদারের প্রতিনিধি কর্মচারীরাই হল শহরবাসী জমিদারদের একমাত্র প্রতিনিধি।[২] এসব জমিদার প্রতিনিধিরাই ছিল বাংলাদেশের চাষীদের একমাত্র দন্ডমুন্ডের মালিক।

পূর্বে নিয়ম ছিল, ফসল যাই হোক তার একটা নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হত রাষ্ট্রকে (হিন্দু আমলে ছিল এক-দশমাংশ, মোগল আমলে এক-তৃতীয়াংশ), কিন্তু কোম্পানী আমলে মুদ্রায় রাজস্ব আদায়ের রীতি প্রচলিত হওয়ায় কোন অবস্থাতেই চাষীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতি পেতো না। ফসল ভাল হোক বা মন্দ হোক, কি পরিমাণ জমিতে চাষ করা হয়েছে বা হয়নি, চাষী নিজে জমি চাষ করে কি করে না ইত্যাদি কোন বিষয়ই বিচার-বিবেচনা ছিল না। প্রতি বছর ধার্যকৃত রাজস্ব যেমন করেই হোক জমিদারকে সরকারের নিকট জমা দিতে হবে।

তবুও চাষীদের শান্তিতে বসবাস করার উপায় ছিল না। খাজনা বা সেস্ জাতীয় অতিরিক্ত কর ছাড়া আরও বহু কিছু দিতে হত। জমিদারের নায়েব-গোমস্তাকে খুশী রাখা ছিল চাষীর একটা প্রধান কর্তব্য। কোন কারণে নায়েব-গোমস্তা যদি কখনও ক্ষেপে উঠতো, তাহলে চাষীকে নিঃসন্দেহে ভিটে ছাড়া হতে হতো।

"বাংলার চাষীর যত দুঃখ তার মূলে জমিদার। জমির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক শুধুমাত্র খাজনার সঙ্গে। অথচ এরাই জমির মালিক।

---

১. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৯-১০।
২. Land Problem of India : Radha K. Mukharjee : P. 91.

সেই মালিকত্বের জোরে রায়তের খাজনা এরা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। জমি যেন ইন্ডিয়া রবার। রায়ত ইচ্ছামত তার জমি বিক্রি করতে পারে না। জমিদারকে দিতে হবে উঁচু নজরানা। নইলে জমি থেকে উচ্ছেদ। নিজের জমির গাছ রায়ত নিজে কেটে নিতে পারবে না। ঝড়ে পড়ে গেলেও না। কারণ তারও মালিক জমিদার। নিজের জমিতে রায়ত ইচ্ছামত পাকা-বাড়ী করতে পারে না। এই রকম আইনী-অত্যাচার তো আছেই, তার উপর বে-আইনী অত্যাচারের শেষ নেই।১

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, তিনি চান ইংলন্ডের অনুকরণে এদেশে একদল ভূ-স্বামী গঠন করতে, যারা জমির উন্নতি বিধান করবে। তিনি চেয়েছিলেন রাজার কর্তব্য জমিদারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। জমিদাররা কৃষির প্রয়োজনে বড় বড় খাল-বিল খনন, সংরক্ষণ ও পানি নিষ্কা-শনের ব্যবস্থা করবে, রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও মেরামত করবে। কোম্পানী শুধুমাত্র জমির মালিকানা ও রাজস্ব ভোগ করবে। কিন্তু তাতে কোন সুফল ফললো না। সংস্কারের অভাবে একে একে খাল-বিল, নদী-নালা বন্ধ হয়ে গেল। রাজা বা জমিদার কেউই সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন না।২ পথ-ঘাট মেরামত বা পানি সংরক্ষণ ও নিষ্কাশনের দায়িত্বও কেউ গ্রহণ করলেন না। জমিদাররা শহরে থাকতেন, কাজেই পল্লীর উন্নতির মর্ম তাঁরা বুঝতেন না। নায়েব-গোমস্তা খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিয়েই ব্যস্ত।

মধ্যস্বত্বভোগী ক্ষুদে জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের নিখুঁত একটা বিবরণ পাওয়া যায় তৎকালীন পত্রিকায়ঃ

"ভূস্বামী তাহার (মধ্যস্বত্বভোগী) নিকট যাদৃশ নিকর্ষণ করিয়া কর আদায় করেন, তাহাতে তাহার লাভ ভাবের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তিনি (মধ্যস্বত্বভোগী) স্বীয় লাভ প্রত্যাশায় উপায়ন্ত চেষ্টা করেন, বিবিধ প্রকার কুটিল কৌশল কল্পনা করিতে থাকেন। প্রজার সর্বনাশই সেই সকল বিষম যন্ত্রণার একমাত্র তাৎপর্য। তাহারা ভূস্বামীকে যত রাজস্ব প্রদান করিত,

---

১. জমির মালিকঃ অতুলচন্দ্র গুপ্ত, পৃঃ ৬।
২. Public Works in India : Sir Arther Cotton. 1854.
Bengal Irrigation Committee Report. 1930.

ইজারাদারকে (মধ্যস্বত্বভোগী) তদপেক্ষায় চতুর্থাংশ অধিক দিতে হইবেক। কল্য যে ভূস্বামীর লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব ছিল, অদ্য তাহাতে আরও পঞ্চবিংশতি সহস্র যুক্ত হইল। অতএব ইজারার নাম শুনিলে প্রজাদের হৃৎকম্প না হইবে কেন? এক্ষণে যাহাদিগকে উপর্যুপরি জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার ও দর-ইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তাহাদের দারুণ দুর্দশা বাক্য পথের অতীত।" ১

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি বাংলার মান, কৃষক বাংলার প্রাণ। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জনই কৃষিজীবী। সমগ্র দেশ চলে কৃষকের শ্রমে; কৃষির আয়ে। কৃষকই জমিদারের খাজনা যোগায়; সরকারের রাজস্ব চালায়। অথচ সেই কৃষক আর কৃষির প্রতি সুদৃষ্টি কারও ছিল না। জমিদারেরও না; সরকারেরও না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার জমির উপর স্থায়ী অধিকার লাভ করলো, কিন্তু রায়তের দেয় খাজনার স্থায়ী কোন বন্দোবস্ত হলো না— জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে যখন যেমন খুশী রায়তের খাজনা বাড়িয়েছে। ইচ্ছা মত সেস্ বসিয়েছে। কর চাপিয়েছে।

সরকার, জমিদার ও ইজারাদারের মধ্যে জমির অধিকার হস্তান্তরের পরিণতিই রায়তের দুর্দশার কারণ। "জমিদার তার অধিকার স্থায়ীভাবে ইজারা দেয়, ইজারাদারও আবার অনুরূপভাবে ইজারা দেয় তার অধিকার। এইভাবে খাজনা গ্রাহক ও খাজনাদাতাদের একটা সুদীর্ঘ শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে।"২ এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ চাষী শোষণ নির্যাতনে সর্বস্বান্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর জমিদার গোষ্ঠী কিভাবে প্রজাপালন বা প্রজাপীড়ন করতো তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তার নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

"যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক" এই প্রবাদ বুঝি বাংলার ভূ-স্বামীদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূ-স্বামী স্বাধীকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাঃ কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে

---

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্রঃ বিনয় ঘোষ, (২য় খন্ড) পৃঃ ১১৩।
২. Problem in India : K. S. Shelvanker P. 111.

৩—

ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের যথাসর্বস্ব হরণে একাগ্র চিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন। তাহাদিগের দরিদ্রদশা, শীর্ণ-শরীর, ম্লান বদন, অতি মলিন চীর বসন, কিছুতেই তাহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না, কিছুতেই তাহার কঠোর নেত্রের বারিবিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ী রাজস্বে নিয়মতিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, আগমনি, পার্বনি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজানিপীড়ন করিতে থাকেন। অনেকানেক ভূ-স্বামী অনাদায়ী ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বরূপ গ্রহণ করেন। প্রতি শতে পঁচিশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি ইহা অপেক্ষা অনর্থমূলক ব্যবস্থা আর কি আছে? ইহাতে তাহাদের সর্বনাশের সূত্র সঞ্চয় হয়,— তাহাদিগকে যাতনাযন্ত্রে পেষণ করা হয়। ভূ-স্বামীর ভবনে বিবাহ আদ্যকৃত, দেবোৎসব বা প্রকারান্তরে পুণ্য ক্রিয়া উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত তাহাদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা 'মাঙ্গন' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করেন, ভিক্ষুক নাম গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি সাধন করেন। যে বৎসর দুই তিনবার এইরূপ ভিক্ষা না হয়, সে বৎসরই নয়। রাজস্ব সঙ্কলনের ন্যায় ইহাও নির্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে সংগৃহীত হয় এবং তৎপরিশোধে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি জন্মিলেও প্রজাদিগকে অতিশয় অনুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হয়।" ১

জমিদার, ইজারাদার, পত্তনিদার প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের মধ্যস্বত্বভোগী শোষক শ্রেণী কৃষক জনসাধারণের উপর যত প্রকার নির্যাতন চালাতো, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় তার একটা তালিকা দেখা যায়ঃ ১. দন্ডাঘাত বা বেত্রাঘাত, ২. চর্মপাদুকা প্রহার, ৩. বাঁশ ও লাঠি দিয়ে বক্ষস্থল দলন, ৪. খাপরা দিয়ে নাসিকা কর্ণ মর্দন, ৫. মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ, ৬. পিঠে হাত বেঁকিয়ে বেঁধে বংশদন্ড দিয়ে মোড়া দেওয়া, ৭. গায়ে বিছুটি দেওয়া, ৮. হাত-পা নিগড় বদ্ধ করা, ৯. কান ধরে দৌড় করানো, ১০. কাটা দু'খানা বাঁধা বাখারি দিয়ে হাত দলন করা, ১১. গ্রীষ্মকালে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে পিঠের উপর ও হাতের উপর ইট চাপিয়ে রাখা, ১২. প্রচন্ড শীতে

১. সংবাদপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (২য় খন্ড) বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১০৯-১০।

জলমগ্ন করা ও গায়ে জল নিক্ষেপ করা, ১৩. গোলাবন্ধ করে জলমগ্ন করা, ১৪. বৃক্ষ বা অন্যত্র বেঁধে লম্বা করা, ১৫. ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা, ১৬. চুনের ঘরে বন্ধ করে লঙ্কা মরিচের ধোঁয়া দেওয়া।[১]

উনিশ শতকের বাংলার চাষীরা এমনি অমানুষিক শোষণ, পীড়ন-নির্যাতনে দিশেহারা হয়েই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল। এসবই ছিল বাংলাদেশের সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহের কারণ। স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে প্রজাকুল যে অসন্তুষ্ট ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জমিদার-মহাজনের শোষণ-পীড়ন-অত্যাচার তাদের ক্ষিপ্ত করে তোলে ও বিদ্রোহী হতে বাধ্য করে।

১৮৭২ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে যে ভয়াবহ কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার মূল কারণ— জমিদার শ্রেণীর শোষণ ও উৎপীড়ন। সিরাজগঞ্জের এই কৃষক বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। সেখানকার চাষীরা প্রথম থেকেই এসব বে-আইনী অর্থ আদায়ের বিষয়টি সরকারকে জানিয়ে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করেছিল। কিন্তু শাসক শ্রেণী সেই প্রতিবাদে কান দেয়নি। সিরাজগঞ্জের জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে যেসব প্রক্রিয়ায় অর্থ আদায় করতো তার রকম ছিল নিম্নরূপঃ

১। টহুরী— বৎসরের শেষে প্রজাদের হিসাব-নিকাশের আদায়ী অর্থ।
২। বিয়ের সেলামী— জমিদার বাড়ীর কোন বিবাহ উপলক্ষে আদায়ী অর্থ।
৩। পার্বণী— জমিদার বাড়ীর পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে আদায়ী অর্থ।
৪। স্কুল খরচ— জমিদার সরকারী বিদ্যালয়ে অর্থ দান করতেন এবং তা আদায় করে নিতেন কৃষকদের কাছ থেকে।
৫। তীর্থ খরচ— জমিদার বা তার পরিবারের লোকজনকে তীর্থে যেতে হলে তার খরচ বাবদ আদায়।
৬। রসদ খরচ— জমিদার, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারী কোন কর্মচারীকে বাংলোতে থাকাকালীন খাওয়ার জন্য যে অর্থ ব্যয় করতেন তা আদায় করতেন চাষীদের কাছ থেকে।

---

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (২য় খন্ড)ঃ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৩৯,১২৩।

৭। গ্রাম খরচ— সবার জন্য জমিদার গ্রামে যে ব্যয় করতেন তা আদায় করতেন চাষীদের কাছ থেকে।

৮। ডাক খরচ— সরকার জমিদারের কাছ থেকে ডাক-কর আদায় করতেন এবং জমিদার তা আদায় করতেন চাষীদের কাছ থেকে।

৯। ভিক্ষা— জমিদার স্বীয় ঋণ শোধ করার জন্য এই নামে চাষীদের কাছ থেকে আদায় করতেন।

১০। পুলিশ খরচ— জমিদার পুলিশ পুষতেন এবং তার খরচ বহন করতে হতো চাষীদের।

১১। আয়কর— জমিদার আয়কর দিতেন সরকারকে এবং তা আদায় করতেন চাষীদের কাছ থেকে।

১২। ভোজ-খরচ— জমিদার বাড়ীতে যে ভোজ হত তার খরচ বহন করতে হত চাষীদের।

১৩। সেলামী— চাষী বাড়ী তৈরী করলে বা জমি 'লীজ' নিলে জমিদারকে সেলামী বাবদ অর্থ দিতে হত।

১৪। খারিজ দাখিল— জমিদারের খাতায় নাম তোলার জন্য চাষীকে অর্থ দিতে হত।

১৫। নজরানা— জমিদার বা নায়েব খাজনা আদায়ের জন্য এলাকায় বের হলে চাষীকে এই নামে অর্থ দিতে হত।[১]

এর উপর বিলম্বজনিত জরিমানা তো ছিলই। ইচ্ছাকৃত খাজনা বাড়ানো ছিল জমিদারদের নিত্যকার অভ্যাস।

প্রজাদের জমি জরীপ করার নামে আরেক রকম অত্যাচার করা হত। পূর্বে নলের মাপের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে তেইশ থেকে পৌনে চব্বিশ ইঞ্চি। কিন্তু সিরাজ-গঞ্জের জমিদাররা নতুন মাপ দিতে লাগল ১৮ ইঞ্চি নল দিয়ে। যার ফলে চাষীদের দখলীকৃত প্রায় চতুর্থাংশ জমি হাতছাড়া হয়ে গেল। অথচ খাজনা রয়ে গেল পূর্বের মত। জমিদাররা সেই 'উদ্বৃত্ত' জমি অন্য চাষীর নিকট পত্তন দিয়ে সেলামী ও খাজনা আদায় করতো।[২]

---

১. পাবনা জেলার ইতিহাসঃ রাধারমণ সাহা, পৃঃ ৯২।

২. Report of Mr. Nolan S. D. O. Serajganj. (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)

সরকার যখন রোড সেস্ আইন জারী করলো এবং জমিদারদের পথ-করের রিটার্নে প্রজার জমির পরিমাণ জানাবার জন্য আদেশ করলো, জমিদাররা তখন নিজেদের কুকীর্তি গোপন করার অভিপ্রায়ে প্রজাদের কাছ থেকে এক নতুন কবুলিয়ত নিতে লাগলো। এই কবুলিয়তে চাষীদের লিখে দিতে হল যে, অতিরিক্ত যত কর আদায় করা হয় তা চাষীদের ইচ্ছানুসারেই হয়। কিন্তু এই স্বীকৃতি পত্রের পরিবর্তে কৃষকদের জমি ভোগ দখলের অংগীকারপত্র দিতে তারা অস্বীকার করে। কবুলিয়তে আরও লেখা থাকত যে, এ নিয়ে যদি কোন প্রজা জমিদারের সাথে বিবাদ করে তবে প্রজাকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করা হবে।১

এমন আরও বহুবিধ পীড়ন সহ্য করতে হতো চাষীদের। এছাড়া মারপিট জোর-জুলুম, মামলা-মোকদ্দমা হামেশাই লেগে থাকত।

বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায় ছিল প্রধানত মুসলমান। আর জমিদার মহাজন শ্রেণীর বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু। এসব জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে এদেশের সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের মূল নিহিত রয়েছে জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যে।

ময়মনসিংহের জামালপুরের কৃষক-বিদ্রোহের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেনঃ

"জামালপুরের কৃষকগণ প্রধানত মুসলমান। এই মেলাটি (জামালপুরে প্রতি বছর একটি গরুর মেলা হত) ক্রমশ কৃষকদের পক্ষে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গরুর বাজার হইয়া ওঠে। এই মেলা হইতে তাহারা প্রতি বৎসর চাষের বলদ সংগ্রহ করে। ১৯০৭ সালে যথারীতি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি এবং জমিদার, মহাজন, সরকারী কর্মচারীদের ১৪ জনকে লইয়া মেলা কমিটি গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, সভাপতি এবং সভ্যদের সকলেই ছিলেন হিন্দু। এই সময় মেলাটি বসিত গৌরিপুর জমিদারির কাছারি বাড়ীর নিকটে।

প্রথমে নিয়ম ছিল, যে গরু বিক্রয় করা হইবে তাহার উপর এক আনা কর আদায় করা হইবে। ক্রমশ এই করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিক্রয়-কর দিলেই গরু বিক্রেতা কৃষকের অব্যাহতি মিলিত না। গরু বিক্রয়ের টাকা হইতে তাহার জমিদার কিছু সালামী এবং মহাজন ঋণের সুদ ও কিস্তি আদায় করিয়া

---

১. Mr. Nolan's report. (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ৩৪৯)।

লইত। কোন কৃষক ইহার প্রতিবাদ করিলে বা টাকা দিতে অস্বীকার করিলে তাহার জন্য বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও জমিদারের গুন্ডার ব্যবস্থা থাকিত। গরু বিক্রয়-কর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ইহার পরিমাণ হয় গরু প্রতি ১৪ আনা।"১

অত্যাচারের শেষ এখানে নয়। আরও অনেক প্রকার অত্যাচার কৃষকদের মুখ-বুজে সহ্য করতে হত। ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার-এ বর্ণিত আছেঃ

"কেবল ভীষণ প্রহারই নয়, জুতা দ্বারা প্রহার, কেবল উপবাস নয়, বলপূর্বক আটকের অপমান। তারা (চাষীরা) কাছারীতে খাজনা দিতে গেলে অনেক সময় একখানি টুলও দেওয়া হত না। এ সকল অত্যাচার-অপমানের ভয়েই তারা মাথা নত করতে বাধ্য হত। তাদের বাধ্য করা হত কবুলিয়ত লিখে দিতে। এসব কাজের পেছনে জমিদার ও নায়েবদের হাত এরূপভাবে কাজ করত যে, তা সকল সময়ই আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকত।"২

শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর দিয়ে জামালপুরের চাষীরা জমিদার, মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল। সমগ্র দেশে তখন চলছে স্বদেশী আন্দোলন। জমিদারের গুন্ডা-দল ও শান্তিরক্ষক পুলিশ কৃষকদের গরু আটক করলো, শুরু হল সংঘর্ষ। মেলা গেল ভেঙ্গে।

এদিকে হাওয়ার বেগে সমগ্র দেশ জুড়ে রটে গেল, মুসলমানরা হিন্দুদের উপর হামলা করছে। এমনকি হিন্দু-নারী ও শিশুদের উপরও হামলা চালিয়েছে মুসলমানরা। দেশের শিক্ষিত সমাজ হিন্দুরা। প্রচারযন্ত্র, সংবাদপত্র সবই তাদের হাতে। কাজেই মিথ্যা প্রচার চালাতে মোটেই অসুবিধা হল না তাদের।

সংবাদ পেয়ে লাঠি-ছোরা, এমনকি বন্দুক নিয়ে তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক দল পরদিন মেলায় মুসলমানদের উপর হামলা চালাল। কৃষকরাও তখন মার-মুখো। তাদের আক্রমণে ভদ্রলোক স্বেচ্ছাসেবক দল টিকতে না পেরে পালিয়ে বাঁচলো।

পরে এ খবর বেশ জোরালো রূপ নিয়ে কলকাতা পৌঁছালো। কলকাতার যুগান্তর দলের প্রধান স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ কলকাতা হতে ইন্দ্রনাথ নন্দী, বিপীন বিহারী গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার প্রভৃতি ৬ জন যুবককে বোমা, পিস্তল বা

১. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২৮৬-২৮৭।
২. Mymensingh District Gazetteer. P. 42.

রিভলবার নিয়ে ময়মনসিংহে হিন্দুদের রক্ষার জন্যে জামালপুর পাঠায়। এ ৬ জন এসে বোমা ও পিস্তল দিয়ে কৃষকদের ঘায়েল করে। অবশ্য পরে দাঙ্গা করার অপরাধে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এরা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপরও গুলী ছুঁড়েছিল।১ বলা বাহুল্য, উল্লিখিত ৬ জন অপরাধীকে অরবিন্দ ঘোষই পাঠিয়েছিলেন। যিনি পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ নামে খ্যাতি অর্জন করেন। ইন্দ্রনাথ নন্দী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন:

"স্বদেশী যুগে বাংলার সর্বত্র যে Riot হয়, সেই সময় অরবিন্দ ঘোষ ২০০ টাকা দিয়া আমাদিগকে পূর্ববঙ্গের লোকদের সাহায্যার্থে যাইবার ভাড়া দিলেন। ৬ জন এসে বোমা ও পিস্তল দিয়ে কৃষকদের ঘায়েল করে। অবশ্য পরে দাঙ্গা লক্ষে ধৃত হই। আমরা আত্মরক্ষার্থে ১৮টা গুলী দাগি।"২

জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই ন্যায্য সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িকতায় রূপ দিয়ে যারা জমিদার-মহাজনদের দুষ্ট চক্রান্তের সহায়তা করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে সুপ্রকাশ রায় দৃঢ়তার সাথে বলেছেন:

"বাংলাদেশের সেকালের যুগান্তর সমিতির সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়কগণ তাহাদের চিন্তাধারা ও আজন্ম পালিত সংস্কার অনুযায়ী ১৯০৭ খৃস্টাব্দের জামালপুরের ঘটনার যে বিকৃত ব্যাখ্যাই করিয়া থাকুক না কেন, এই ঘটনাটিও শ্রেণী-সংগ্রামের একটি বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত, জমিদার, মহাজন বিরোধী সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে।"৩

বলা বাহুল্য, সুপ্রকাশ রায় বঙ্গ-ভঙ্গের মূল কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন:

"বঙ্গদেশের সাম্প্রদায়িকতার মূল ইতিহাসের গর্ভে নিহিত। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ সেই বীজ হইতে মহীরুহের সৃষ্টি করিয়াছে, বৃটিশ শাসনের আরম্ভ কাল হইতে একশত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ প্রাণপণে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা এবং হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছিল। সুতরাং ১৭৯৩ খৃস্টাব্দের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' মারফত হিন্দুরাই প্রায়

---

১. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস: সুপ্রকাশ রায়, পৃ: ২৮৮-২৮৯।
২. ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম: ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, পৃ: ২০৪-২০৫।
৩. ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস: সুপ্রকাশ রায়, পৃ: ২৯০।

সকল জমিদারী হস্তগত করিয়াছিল। বাংলাদেশের জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের দুই-তৃতীয়াংশই মুসলমান। সুতরাং জমিদার গোষ্ঠী হইল হিন্দু আর মুসলমান চাষীরা তাহাদের অবাধ শোষণ উৎপীড়নের শিকার হইয়া রহিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম হইতেই শোষক হিন্দু জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুসলমান চাষীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালনা করিয়াই জীবনধারণ করিতে হইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল-রূপে শোষক হিন্দু জমিদার গোষ্ঠীকে মুসলমান চাষীরা চিরকাল শত্রুরূপে ভাবিয়া আসিয়াছে।[১]

মুসলমানদের বিরোধিতার ফলে যেহেতু বৃটিশ শাসকরা বহু বৎসর যাবৎ নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পারেনি, তাই মুসলমানদের তারা মনে করতো সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে একটা বিঘ্নস্বরূপ।[২] বলা বাহুল্য, মুসলমান সম্প্রদায় পরবর্তীকালে কেন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত 'স্বদেশী আন্দোলন'-এ সহযোগিতা করেনি তার পিছনে একটা ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান রয়েছে।

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল সাম্প্রদায়িক ভাব-চিন্তা। মুসলমান-প্রধান পূর্ব বঙ্গ অনুন্নত এবং এই পূর্ববঙ্গেরই সম্পদ নিয়ে হিন্দু-প্রধান পশ্চিম বঙ্গ তথা কলকাতা নগরী উন্নত। এই মূল ধারণার উপর ভিত্তি করেই বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব ওঠে। হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করায় শেষ পর্যন্ত বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয়। কিন্তু এই বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় এবং বাংলাদেশের অত্যাচারী জমিদার মহাজন ও নবজাত বুর্জোয়া, শহুরে হিন্দু মধ্যশ্রেণী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সুদীর্ঘ দিন পর্যন্ত যারা ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করে আসছিল এবং ইংরেজী শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে যারা সমাজের বুকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত ছিল, আজ তারাই হঠাৎ রাতারাতি ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে সনাতন পন্থী হিন্দু সেজে বসল। তারাই এবার

---

১. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২৮৩।
২. "The Musalmans of India are and have been for many years a source of chronic danger to British Power in India" The Indian Musalmans, Hunter. P. U.

যোগ দিল 'ইংরেজ তাড়াও' 'বৃটিশ পণ্য বর্জন কর' আন্দোলনে। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে এরা স্বদেশী আন্দোলনের মত সর্বদলীয় আন্দোলনের মধ্যে কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতা, জাতিভেদ, গো-হত্যা ও গো-মাংস ভক্ষণের বিরোধিতা, বাল্য বিবাহে সমর্থন প্রভৃতি সনাতন হিন্দু ধর্মের যাবতীয় কুসংস্কার এবং সকল রকমের প্রতিক্রিয়াশীলতা আমদানী করে এবং এটাকে হিন্দু স্বদেশী আন্দোলনে প্রতিপন্ন করে।১ তিলক এবং অরবিন্দ ঘোষ চেয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে এই আন্দোলন পরিচালনা করতে এবং হিন্দু ধর্মকে উজ্জীবিত করতে। কিন্তু এই নীতি অবলম্বনের ফলেই স্বদেশী আন্দোলনে তারা মুসলিম জনসাধারণের সমর্থন হারালেন।২

এমনকি গান্ধীজীর মত দেশবরেণ্য নেতাও তাঁর প্রচার এবং বক্তৃতায় হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য ও নীতি প্রচার করার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যখন গান্ধীজী সংযুক্ত জাতীয় আন্দোলনের নেতা, তিনি নিজেকে সনাতন ধর্মী হিন্দু বলে প্রচার করেছিলেন। উচ্চকন্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ

আমি নিজেকে 'সনাতন হিন্দু' বলেই ঘোষণা করছি। কারণ—

১। আমি বেদ উপনিষদ এবং পুরাণে আস্থাশীল, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মতে অবতার ও পুনর্জন্মে আমি বিশ্বাসী।

২। বর্ণাশ্রম ধর্মেও আমি বিশ্বাসী। তবে তা একান্তভাবে বৈদেশিক মতে, বর্তমানের অশোধিত ও প্রচলিত মতে নয়।

---

১. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২৮৫। "১৯০৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে হিন্দু জমিদার মহাজনের বিরুদ্ধ মুসলমান কৃষকেরা যে বিদ্রোহ করেছিল, তাতে সন্ত্রাসবাদী প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য একদল যুবকের সহিত ৩টি বোমা পাঠিয়েছিলেন। এই বোমা তিনটির নাম রাখা হয়েছিল 'কালী মায়ের বোমা'।

২. India Today : R. P. Dutta, P. 470.

৩। বর্তমানের প্রচলিত ধারণার চেয়েও বৃহত্তর ধারণা অনুযায়ী আমি গো-জাতি রক্ষার আদর্শে বিশ্বাসী।১

৪। আমি মূর্তিপূজায় অবিশ্বাসী নই।

এমন কি গান্ধীজী যখন হিন্দু-মুসলমানের একতার কথা জোর গলায় প্রচার করেছেন এবং জনগণকে একতাবদ্ধ হওয়াব আহবান জানিয়েছেন, সেখানেও তিনি নিজেক একজন জাতীয়-নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সেখানে তিনি ছিলেন 'হিন্দু সনাতনপন্থী' নেতা। তিনি হিন্দুদের 'আমরা' এবং মুসলমানদের 'তোমরা' বলে উল্লেখ করতেন।২

বলা বাহুল্য এই বিশেষ কারণে হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন গান্ধীজী। পূর্বে সদগুণসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী হিন্দু-মুসলমানের

---

১. হিন্দুদের গো-জাতি প্রীতি ও গো-জাতি রক্ষার কথা বলতে গিয়ে 'Freedom at Midnight' পুস্তকে এক চমৎকার তথ্য পরিবেশন করা হয়েছেঃ " India had in 1947 the largest bovine herd in the world, 200 million beasts, one for every two Indians, an animal Population larger than the human Population of the United States, 40 million cows produced a meagre trickle of milk averaging barely one Pint per animal per day, 40 or 50 million more were beasts of burden, tugging their bullock carts and ploughs. The rest, 100-odd million, were sterile, useles animal roaming free through the fields, villages and cities of India. Everyday their restless Jaws chomped through the food that could have fed ten milion Indian living on the edge of starvation.

"The instinct for survival alone should have condemend those useless beasts Yet, so tenacious had the superstition become the cow-slaughter remaind an abomination for those very Indians who were starving to death so that the beasts could continue their futile existence. Even Gandhi maintained that in protecting the cow it was all God's work that man protected." Larry Collins and Dominique Lapierre : Freedom at Midnight. p. 26-27.

২. India Tody : R. P. Dutta. P. 471.

মিলিত প্রচেষ্টা ছিল বিশেষ কোন কাজ করার পেছনে। গান্ধীজীর সনাতন হিন্দু ধর্ম প্রচারের সোচ্চারে হিন্দু-মুসলমানের পূর্বের সৌহার্দ্য ভাব অন্তর্হিত হল। অপরিহার্যভাবে গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন মোড় নিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে ; এবং তা মুসলমানদের বিশেষভাবে সন্দিগ্ধ ও ভীত করে তুললো। তারা ভাবলো—ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে হিন্দু ধর্মীয় শাসনের চাপে পড়ে মৃতপ্রায় হয়ে থাকতে হবে তাদের। এমন কি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাও দুষ্কর হবে।[১]

কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে ব্যক্ত করা যায় যে, সেদিনের স্বদেশী আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদের আন্দোলন। এহেন মহৎ অন্দোলনে মুসলমানরা কেন সর্বান্তকরণে যোগ দিতে পারেনি, কেন তারা এক মিছিলে থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিল তা সহজে অনুমেয়। এ আন্দোলনের পিছনে অন্য যেকোন উদ্দেশ্য থাক না কেন মুসলমানদের মঙ্গল করার মত কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছিল না।

এ কথা সত্য যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার মহীরুহ একদিনে বেড়ে ওঠেনি। বহুদিনের সযত্ন পালিত ঘৃণা বিদ্বেষ কালে বিরাট আকার ধারণ করেছে

---

১. Initially, the drive for Indian independence was confined to an intellectual elite in which Hindus and Muslems ignored communal differences to work side by side towards a common goal. Ironically it was Gandhi who had disrupted that accord .. .. .. He desperately wanted to associate the Muslims with every phase of his movement, but he was a Hindu, and a deep belief in God was the very essence of his being. Inevitably, unintentionally Gandhi's Congress Party movement began to take on a Hindu tone and colour that aroused Muslem suspicous .. .. A spectre grew in Muslem minds : in an independent India they would be drowned by Hindu majority rule, condemned to the existence of a powerless minority in the land their Moghul for bears had once ruled."—Freedom at Midnight, P. 27.

এবং স্বদেশী আন্দোলনকালে এই বৃক্ষ ডাল-পালা ছড়িয়ে বিস্তৃতি লাভের অবকাশ পেয়েছে।

যে জমিদার শ্রেণী একদা হাজী শরীয়াতুল্লাহ্, দুদু মিয়া ও তীতুমীরের বিদ্রোহ সমর্থন করতে পারেনি, যারা মহসিনউদ্দীন দুদু মিয়া ও তীতুমীরকে দমন করার অভিপ্রায়ে স্বৈরাচারী ইংরেজের সাথে হাত মিলাতেও কুন্ঠাবোধ করেনি, সে সব জমিদারই তো স্বদেশী আন্দোলনের কর্ণধার সেজেছিলেন। যে জমিদার একদা ঘোষণা করেছিলেন, "আমার জমিদারীর মধ্যে যারা ওহাবী মতাবলম্বী তাদের প্রত্যেকের দাড়ির উপর আড়াই টাকা করে খাজনা দিতে হবে।[১] সেই মুসলিম বিদ্বেষী জমিদাররা হলেন স্বদেশী আন্দোলনের নায়ক। এসব জমিদারই তো তীতুমীরের মত একজন স্বদেশ-প্রেমিক সাহসী বীরকে দমন করার উদ্দেশ্যে কলকাতার লাটু বাবুর বাসভবনে বসে প্রস্তাব করেছিলেন, 'পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের দ্বারা তীতুমীরকে দমন করতে হবে পার্শ্ববর্তী জমিদাররা যাতে ধন, জন ও পরামর্শ দ্বারা কৃষ্ণদেবকে সাহায্য করেন, সে চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে— তীতুকে দমন না করলে হিন্দু জাতির পতন অনিবার্য।'

'প্রচার দ্বারা হিন্দু জনসাধারণের মনে তীতুর ও তাহার দলের ত্রাস জন্মিয়ে দিতে হবে। প্রচার করতে হবে— তীতু অত্যাচারী, হিন্দুর সম্মান-সম্ভ্রম নষ্টকারী হিন্দুর জাতি নাশকারী, হিন্দু নারীর সম্ভ্রম নষ্টকারী'[২]

এরা সেই হিন্দু জমিদার যারা অত্যাচার, শোষণ-পীড়ন আর মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছুই জানত না। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তারা হলেন 'হিরো'। কাজেই মুসলমানেরা যদি সেই আন্দোলনে যোগ না দিয়ে থাকেন, তবে মুসলমানদের এর জন্যে দোষারোপ করা যায় না, বরং আহত ও অত্যাচারিত মুসলমানদের এই ধরনের বিমুখতাই ছিল স্বাভাবিক।

ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই মুসলমানরা ইংরেজদের বিরোধিত করেছে। বর্জন করেছে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সংস্পর্শ। সুযোগ পেলেই রুখে

---

১. তিতুমীরঃ বিহারীলাল, পৃঃ ৩৩-৩৪।
২. শহীদ তিতুমীরঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৫৪।

দাঁড়িয়েছে, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আর হিন্দুরা মুসলমান আমলে যেমন ফার্সী শিখে, শেরওয়ানী পাগড়ী পরে মুসলমানী শিক্ষা ও কায়দা রপ্ত করেছিল তেমনি ইংরেজ আমলে ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষায় আগ্রহী হয়ে ইংরেজ কোম্পানীর দালালী ও মুৎসুদ্দিগিরি করে সমাজে বিশিষ্ট আসন দখল করে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। নিজেদের স্বার্থেই পরবর্তীকালে মুসলমানদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ না দেওয়ার সংকল্পে মুসলমানদের উপর তারা নানা ধরনের চক্রান্তের যুলুম খাটাতে থাকে। বলা বাহুল্য, জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার-অবিচার ছিল তারই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

## মহাজন ও বাংলার চাষী

জমিদারদের সাথে ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের চিরাচরিত সামাজিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বৃটিশ পূর্বকালে জমির একমাত্র মালিক ছিল কৃষক। কৃষক তার জমির উৎপন্ন ফসলের একাংশ খাজনা বা কর হিসাবে রাজকোষে জমা দিত এবং তা দিত সমাজের যৌথ অধিকার ভোগী কৃষকগণ সমবেতভাবে। কোম্পানী সরকার প্রথম থেকেই ফসলের পরিবর্তে মুদ্রায় রাজস্ব দেওয়ার প্রথা চালু রাখলো। আইন করে দেওয়া হলঃ জমিতে ফসল ভাল হোক বা মন্দ হোক, হোক বা না হোক চাষীকে দায়কৃত খাজনা অবশ্যই দিতে হবে। কোনো প্রকার ওজর আপত্তি চলবে না অর্থাৎ যে চাষী ছিল জমির মালিক, এখন থেকে সেই চাষী হল রায়ত, রাজস্ব যোগানোর যন্ত্র।

অর্থ দ্বারা ভূমি রাজস্ব-প্রদানের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে বাংগার কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সৃষ্টি হল এক মহা বিপর্যয়। রাজস্ব প্রদান ও সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য চাষী বাধ্য হল তার উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করতে। কিন্তু অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা বা অন্য কোন কারণে ফসল যে বছর আশানুরূপ না হত সেই বছর অর্থ সংগ্রহের জন্য

মহাজনের স্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এমন কি ভাল সময়ের সব চাষীর পক্ষে ফসল বিক্রি করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছিল না। কাজেই মহাজন চাষীর জীবন ধারণের একমাত্র অব-লম্বন হয়ে দাঁড়াল। এককালে যে মহাজন ছিল কৃষকের ত্রাণকর্তা ও সমাজ-সেবক, মুদ্রায় রাজস্ব আদায়ের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে সেই মহাজনই গ্রহণ করলো সর্বগ্রাসী শোষকের ভূমিকা।

সেকালে মহাজনরা ঋণ দিয়ে সমাজের সেবা করতো। ঋণের দায়ে কৃষকের জমিজমা বা সম্পত্তি গ্রাস করতে পারতো না, কারণ গ্রাম-সমাজের অনুমতি ব্যতীত জমি গ্রাস করা তো দূরের কথা, হস্তান্তর করাও চলতো না। ব্রিটিশ শাসনের কৌশলে ঋণগ্রস্ত কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক ও জমি হস্তান্তরের অধিকার লাভ করলো মহাজন, সুযোগ পেল পুলিশ ও আইনের সক্রিয় সমর্থন লাভের। এভাবে মহাজন পরিগণিত হল কৃষকের ভূমি রাজস্ব আদায় ও জীবন ধারণের অপরিহার্য যন্ত্ররূপে।

বস্তুত মহাজন একদিকে কৃষকের ঋণ সরবরাহকারী অপরদিকে একচেটিয়া শস্য ব্যবসায়ী—এই উভয় ভূমিকাই পালন করতে লাগল। ভাণ্ডারে যখন ফসল মৌজুদ থাকে, তখন মহাজনের নিকট চাষীকে ফসল বিক্রি স্বারা অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, আবার অনটনের সময় থালা বাটি অথবা জমি বন্ধক রেখে ঋণ করতে হয় সেই মহাজনের কাছ থেকেই। পরে মহাজন ঋণ ও সুদ আদায়ে গ্রাস করে কৃষকের একমাত্র সম্বল জমি। এভাবে ক্রমশ মহাজন হয়ে ওঠে জমির মালিক, আর কৃষক পরিণত হয় কৃষি-শ্রমিক বা ভাগচাষী রূপে। "অর্থাৎ মহাজনই হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মহাজনী মূলধনের সমগ্র শোষণচক্রের মূলদণ্ড-স্বরূপ।"১ বৃটিশ কুশাসনে বাংলার কৃষকের ভাগ্য বিপর্যয়ের মূল কারণ এইখানে। সরকারের রাজস্ব, জমিদারের খাজনা আর মহাজনের ঋণের সুদ দিতে গিয়ে বাংলার হতভাগ্য চাষীরা দিনের পর দিন দেওলিয়া হয়ে উঠলো।

জমিদারের খাজনা আদায়ের দায়ে এবং স্ত্রীপুত্রের অনাহারক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে নিরুপায় চাষী ছুটে যেত মহাজনের গদীতে। মহাজন সমাদর না করলেও দুর্ব্যবহার করতো না। মৌখিক সমবেদনা দেখিয়ে কাছে টেনে বসাতো।

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়।

প্রথমেই সাদা কাগজে কিংবা স্ট্যাম্পে চাষীর বুড়ো আঙ্গুলের টিপসই আদায় করে নিত। অশিক্ষিত মূর্খ চাষী বিনা বাক্যব্যয়ে মহাজনের সামনে অপরাধীর মত মাথা নুইয়ে বসে থাকতো। অনেক কিছু খুইয়ে সামান্য কিছু অর্থ নিয়ে চাষী চেষ্টা করতো সাময়িক বিপদের হাত থেকে বাঁচতে। তারপর একদিন সেই ঋণের সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধিত হয়ে টান দিত চাষীর বাড়ী-ঘর, জমি-জমা ও থালা-বাটি ধরে। নিদারুণ এই অবস্থার বিপর্যয়কে চাষী ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস বলেই মেনে নিত। মহাজনের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ কিংবা অন্য কোনভাবে আইনের আশ্রয় নেওয়া সম্ভব ছিল না চাষীর পক্ষে। পাইক-বরকন্দাজ, দারোগা-পুলিশ, উকিল মোক্তার সবাই টাকা পায় মহাজনের কাছ থেকে। চাষীর পক্ষে দাঁড়াবার মত কেউ থাকে না তখন।

সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব এ সব হিন্দু মহাজনের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেনঃ

সাঁওতালেরা আজও কিন্তু সৎ, আর ব্যবসায়ী হিন্দু চালাক ও ধূর্ত।.... সাঁওতালদের সঙ্গে যোগসূত্রের ব্যাপারে হিন্দুরা সব সময় প্রতারক ; জোর করে টাকা আদায়কারী ও অত্যাচারী বলে পরিচিত ; এ দেশের মুষ্টিমেয় ইংরেজ অত্যাচারীর আচরণ যেমন সমগ্র ব্রিটিশ জাতির মুখে কালিমা লেপন করে দিয়েছে, এই বেনে হিন্দুদের আচরণও তেমনি সমগ্র জনসংখ্যাকে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় করে তুলেছে।....প্রত্যেকটি লেন-দেনে তারা গরীব সাঁওতালকে ঠকিয়েছে। সাঁওতালরা ঘি বেচতে এলে তা কেনার সময় হিন্দু তলা ফুটো চুঙ্গো দিয়ে তা মেপেছে, ধান চালের বদলে লবণ, তেল, কাপড় ও বারুদ নিতে এলে হিন্দু ভারী বাটখারা দিয়ে ধান চাল আর হাল্কা বাটখারা দিয়ে লবণ, তেল প্রভৃতি মেপেছে। সাঁওতালরা আপত্তি করলে হিন্দু বেনে তাকে বুঝিয়ে দিত যে লবণের উপর শুল্ক দিতে হয় বলে তার ওজনেও আলাদা বাটখারা ব্যবহার করতে হয়। এই দোকানদারীর লাভের সাথে সুদের কারবারের লাভও যোগ হতো। কোনো পরিবার নতুন বসতি স্থাপন করলে জংগল কেটে জমি তৈরী করার সময় খাওয়ার জন্য তাদের কিছু অগ্রিম ধান চালের দরকার। হিন্দু বেনে অল্প কিছু চাল দাদন দিতো, কিন্তু জমি তৈরী হয়ে তাতে ফসল বোনার সাথে সাথে জমি আটক করতো। একটি পরিবার মেহমানদারী করতে গিয়ে ভোজের আয়োজন করতে গিয়ে তাদের সমস্ত ফসল খরচ করে ফেলে এবং

হিন্দু মহাজনের বাড়ীতে গিয়ে পাকা খাতায় নাম লেখায়। মহাজন অবশ্য তাদের সারা বছর কোনমতে বেঁচে থাকার মত ধান দাদন দেয়, কিন্তু যে দিন থেকে চাষী এই দুর্দিনের ধান খেতে শুরু করে সে দিন থেকেই সে স্ত্রী-পুত্রসহ মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। চাষী তার পরিবারের জন্য যতো কমই ধান নিয়ে থাকুক না কেন, এবং অনাহারে অর্ধাহারে যতো কঠোর পরিশ্রম করেই দেনা শোধের চেষ্টা করুক না কেন মহাজনের হাত থেকে সে কোনমতেই রেহাই পাবে না ; মহাজন তার সমস্ত ফসল তো নেবেই এমন কি পরের ফসল থেকে আরও আদায় করার জন্য খাতায় বকেয়া লিখে রাখবে।[১]

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের চাষীকুলকে জমিদার মহাজনের অমানুষিক নির্যাতনে এমনি দুরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়েছে। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ী মহাজন মাত্রই ছিল হিন্দু, আর চাত্রীদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান, নিরক্ষর ও সরল। জমিদার মহাজনকে তারা ভয়ও করেছে আবার দেবতার মত ভক্তিও করেছে। সরল বিশ্বাসে নিজের শুভাশুভের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে মহাজনের উপর। সেই মহাজনই পরে তাকে সর্বহারা করেছে। তার জমি-জমা, থালা-বাটি সবই কেড়ে নিয়েছে। সংঘটিত হয়েছে মানব জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা।

ইংরেজ শাসকদের সৃষ্টি এসব জমিদার মহাজনরাই ছিল বাংলাদেশের নিরীহ সরল কৃষকদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তৎকালীন সমাজ সেবক ও বিশিষ্ট নেতারা অনেক বড় বড় কথা দিয়ে নিষ্ফল ধূম্রজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন সত্য, কিন্তু কৃষকের বড় শত্রু যে জমিদার মহাজন তাদের উচ্ছেদ করার প্রশ্ন কারও মনে জাগেনি। জমিদারী প্রথা বিলোপ কর, মহাজনদের অত্যাচার বন্ধ কর কিংবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা তুলে দাও—এ কথা কেউ বলেননি।

আগেই বলা হয়েছে যে ভারতীয় সমাজে (বাংলাদেশসহ) মহাজন ও ঋণের ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু ধনতান্ত্রিক শোষণের যুগে বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কালে মহাজনদের ভূমিকা নতুন আকার ও তাৎপর্য গ্রহণ করেছে।[২] বৃটিশ ভারতের একজন কৃষকের বাৎসরিক গড়পড়তা আয়ের

১. পল্লী বাংলার ইতিহাস(Annals of Rural Bengal) হান্টার, পৃঃ ১৯৩-৯৪।
২. India Today : R. P. Dutta P. 251.

পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৮ টাকা থেকে ৪২ টাকা, ট্যাক্স খাজনা এবং মহাজনের ঋণ বা ঋণের সুদ পরিশোধ করার পর কৃষকের হাতে অবশিষ্ট থাকত মাত্র ১৩ থেকে ১৭ টাকা, অর্থাৎ আয়ের এক-তৃতীয়াংশ হাতে নিয়ে কৃষককে সারা বছর কিভাবে চলবে সেই সমস্যার কথা ভাবতে হতো।১ এই সামান্য অংকের অর্থ দিয়ে কৃষককে খাওয়া-পরা, বিবাহ, আমোদ-উৎসব ও জমিদারের খাজনা ইত্যাদি ক্রিয়া-কর্ম চালাতে হতো। বিশেষ করে জমিদারের খাজনা ও বিবিধ প্রকার করের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি চাষীকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত মহাজনের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকতো না। অধিকাংশ চাষীকে মহাজনের ঋণের উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হতো। সুদের হার ছিল টাকায় ১ আনা ৬ পয়সা (দেড় আনা)।২ এই সামান্য সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলতো। বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়াতো আখেরে দেনার দায়ে চাষীকে বন্ধকী জমি হারাতে হতো। শেষ পর্যন্ত জমির মালিক হতো জমির সাথে কোনদিনই যাদের সম্পর্ক ছিল না সেই সব অর্থবান মহাজন ও মধ্যশ্রেণীর ভাগ্যবান ব্যক্তিরা। চাষী পরিণত হতো ভাগ-চাষী অথবা দিনমজুর রূপে।

চাষীদের এ দুরবস্থার মূলে রয়েছে অভাবনীয় ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি। জমিদারের ধার্যকৃত বিভিন্ন প্রকারের সেস বা কর ছাড়া মোগল আমলের শেষের দিকে ভূমি রাজস্বের বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ৮,১৮,০০০ পাউন্ড (১৭৬৪-৬৫) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াল ১৪,৭০,০০০ পাউন্ডে (১৭৬৫-৬৬) এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সেই রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৯১,০০০ পাউন্ড হল। ১৮০০-০১ সালে মোট রাজস্বেব পরিমাণ হল ৪,২০,০০০০ পাউন্ড। ১৮৫৭-৫৮ সালে তা বৃদ্ধি পেল ১,৫৩,০০,০০০ পাউন্ডে। ১৯০০-০১ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৫,০০,০০০ পাউন্ডে দাঁড়াল। এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে মোট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াল ২,৩৯,০০,০০০ পাউন্ডে।৩

---

১. India Today : R. P. Dutta P. 255-256.
২. do P-246-250.
৩. do P. 225-226.

উপরোক্ত রাজস্ব বৃদ্ধির পর্যালোচনায় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভূমি রাজস্বের অসম্ভব রকম বৃদ্ধিই চাষীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারণ, এমতাবস্থায় ঋণ করে রাজস্ব পরিশোধ ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ঋণদান ছাড়াও মহাজনের অন্য এক ভূমিকা ছিল, ফসল বিক্রি করতে হলে চাষীকে সেই মহাজনের কাছেই ধর্ণা দিতে হতো। ঋণ ও সুদের দাবী মেটাতে গিয়ে চাষীকে চিরদিন মহাজনের শোষণের শিকার হয়েই থাকতে হতো। মহাজনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করারও উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে গিয়ে চাষীরা যাতে মহাজন গোষ্ঠীর উপর হামলা চালাতে না পারে তার জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের সর্বশক্তি দিয়ে মহাজন শ্রেণীকে রক্ষার ব্যবস্থা করে।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সমগ্র ভারতের হতভাগ্য কৃষকদের উপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষকশক্তি তাদের সমস্ত ভার নিয়ে চেপে বসে। বৃটিশ শাসকরা আদায় করে তাদের ভূমি-রাজস্ব। এই ভূমি-রাজস্বের উপর বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন নামের জমিদার আদায় করে তাদের খাজনা ও বিভিন্ন প্রকার কর। আর মহাজন কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় সবটুকুই কেড়ে নেয় তাদের ঋণের সুদ হিসাবে।[১]

এদেশের ক্রমবর্ধমান কৃষক আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার চিন্তা ও পরিকল্পনা এতই গুরুতর ছিল যে ব্রিটিশ শাসকরা এর ফলাফল বা পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করার অবকাশ পেলো না। বস্তুত এদেশে 'বৃটিশ শাসনের ইতিহাস অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিষ্ফল ও অবান্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস।[২] গ্রাম বাংলার চিরকালের সমাজ ধ্বংস করে ভূমির উপর থেকে কৃষকের অধিকার হরণ করে শোষণের যন্ত্র মহাজন সৃষ্টি করে তারা এদেশের কৃষি ও কৃষকদের মধ্যে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলো, কিন্তু তারা ব্যর্থ হলো ভূমি সংস্কারে, ব্যর্থ হলো কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায়।

---

১. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৯।
২. Marx, (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)।

পরবর্তীকালে ১৮৮৫ সালে বিধিবদ্ধ হল 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'। জমির উপর প্রজার দখলীস্বত্বের এটাই প্রথম স্বীকৃতি। ১৭৯৩ সালে কৃষি-ভূমির পূর্ণস্বত্ব কৃষকের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার পর বৃটিশ সরকার এই প্রথম কৃষি-ভূমির উপর কৃষকের আংশিক স্বত্ব স্বীকার করে নিল।

ইম্পেরিয়াল গেজেটারের মতে "পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ সালের কৃষক বিদ্রোহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এই ঘটনার পরই কৃষি জমির উপর প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে পুরোপুরি আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং এই আলোচনারই চূড়ান্ত ফল ১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'।[১] অর্থাৎ কৃষকদের ভাগ্য নির্ধারণে তৎপর হল কৃষকরাই। ক্রমাগত কৃষক বিদ্রোহের ফল এই প্রজাস্বত্ব আইন। যদিও এই আইনের ফলে কৃষক জনসাধারণের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয়নি। কারণ, এই আইনের একমাত্র কথা ছিল এই যে, কৃষিজমি কৃষক বার বছর কাল নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগদখল করে আসছে, তাকে উচ্ছেদ করা চলবে না। বার বছরের কম হলে চলবে।

যাই হোক, মন্দের ভাল হিসেবেই চাষীরা এই আইন মেনে নিল। জমিদার মহাজনের শোষণ-যন্ত্র সমান তালেই চলতে থাকল।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হল এবং এ সময় থেকেই ভারতে মধ্য শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু বিশ শতকের গোড়া থেকেই হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে অনেক রকম জটিলতার সৃষ্টি করে। কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন বলে নিজেকে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তা সাম্প্রদায়িক প্রভাব-মুক্ত ছিল না এবং এই সংগঠনের আভ্যন্তরীণ চরিত্রের দরুন কৃষক শ্রমিকের শ্রেণী-শত্রুদের আধিপত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এরই ফলে ১৯০৬ সালে প্রথমে মুসলমান সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমান-দের একাংশ দ্বারা ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'।[২]

---

১. Imeperial Gazetteer E. B. and Assam. P. 285.
২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষকঃ বদরুদ্দীন ওমর, পৃঃ ৩৩।

এ সময় থেকেই কৃষকদের মধ্যে সাধারণ ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে গঠিত হয় কৃষক সমিতি এবং বৃদ্ধি পায় এদের সাংগঠনিক তৎপরতা।

১৯২৮ সালে বংগীয় প্রাদেশিক পরিষদে যখন প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের প্রশ্ন উঠলো এবং বিতর্ক আরম্ভ হল, তখন পরিষদে আইনসভা দুই ভাগে বিভক্ত হল। অধিকাংশ হিন্দু সদস্যরা ভোট দিলেন জমিদার পক্ষে এবং মুসলমানরা ভোট দিলেন প্রজার পক্ষে।১ একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হল পরিষদের অভ্যন্তরে এবং বাইরে কৃষক জনসাধারণের মধ্যে। এই সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহের মূল কারণ— জমিদাররা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই মহাজনের ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে জমিদার-মহাজন বিরোধী একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই জমিদার-মহাজনদের বৃহত্তর অংশ ছিল হিন্দু, আর কৃষক-খাতকদের অধিকাংশই মুসলমান। এরই ফলে জমিদার-মহাজন ও কৃষক-খাতকের শ্রেণী-বিরোধ বাহ্যত সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে।২

প্রাদেশিক পরিষদে হিন্দু সদস্যরা কেন সেদিন জমিদার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তারই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ সাহেব লিখেছেনঃ "জমিদারী প্রথা উঠে গেলে মুসলমান চাষীদের সাথে সাথে হিন্দু চাষীকুলেরও অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে একথা ঠিক, কিন্তু হিন্দু সমাজের যে স্তর রাজনীতিতে নেতৃত্ব করেন, তাঁরা তো চাষীদের কেউ নন। এ'রা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বর্ণহিন্দু মাত্র। জমিদারী প্রথা থেকে যে আট কোটির মত টাকা প্রতি বছর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় হয় তার দশ ভাগের নয় ভাগই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বন্টন হয়। জমিদারী প্রথা উঠে গেলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক জীবনে বিষম ফাঁকি লাগবে। কাজেই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে অর্থনৈতিক আত্মহত্যা করতে পারে না। আর এ'রাই হলেন হিন্দুদের রাষ্ট্রনেতা। কাজেই তাঁরা প্রজা আন্দোলনেও প্রজাসমিতি থেকে দূরে থাকলেন।"৩

বস্তুত এই একটি মাত্র কারণেই ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু জমিদার-মহাজন শ্রেণী কৃষক সম্প্রদায়ের উপর অনবরত অত্যাচার করে আসছিল। এই জমিদার-মহাজন শ্রেণীর

---

১. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরঃ আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৫৩।
২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষকঃ বদরুদ্দীন ওমর, পৃঃ ৩৪।
৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষকঃ বদরুদ্দীন ওমর, পৃঃ ৩৬।

মধ্যেই ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতা, যাঁরা কখনও জমিদারী প্রথা বা মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি, বরং কৃষক শ্রেণীর উপর অত্যাচারের প্লাবন সৃষ্টি করেছিল যে নীলকর দস্যুরা, তাদের এদেশে এনে সুবন্দোবস্ত করে দেয়ার ব্যাপারে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর সক্রিয় সহায়তা করেছেন।

অবশ্য এক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ না রেখেই বলা চলে যে, জনাব এ. কে. ফজলুল হক সহ যেসব মুসলিম নেতা কৃষকদের হয়ে কথা বলেছেন বা কৃষক সমিতি ও কৃষক প্রজাপার্টি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁরা যে শুধু কৃষকদের দুঃখে দুঃখী হয়ে এসব করেছেন তা নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁরা কৃষকদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। নিজেদের মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত 'ঋণ সালিসি বোর্ড' (১৯৩৮) গঠন এবং 'প্রজাস্বত্ব আইন' (১৯৩৯), 'মহাজনী আইন' (১৯৪০) প্রভৃতি কয়েকটি আইন পাস করাতে বাধ্য হন। এরই ফলে সাময়িকভাবে কৃষকদের একাংশ কিছুটা উপকৃত হয়।'[১] কিন্তু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বিলোপের প্রশ্ন সবাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই এড়িয়ে গেছেন। মোট কথা হিন্দু-মুসলমান— উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বরাবরই নিজেদের আখের গোছাবার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। গ্রাম্য অশিক্ষিত চাষীদের স্বার্থ নিয়ে মাতামাতি করার মত অবসর তাঁদের ছিল না। জমিদার-মহাজন বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি থাকলেও গ্রাম্য হিন্দু বা মুসলমান চাষীদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব বরাবরই বিদ্যমান ছিল।

## বাংলার শিল্প ধ্বংস ও ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব

লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা বাঙ্গালী জীবনের সর্বস্তরে তুমুল

---

১. 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষকঃ বদরুদ্দীন ওমর, পৃঃ ৩৮-৩৯।

বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে কৃষি-সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। মোগল আমলের জায়গীরদার, গোমস্তা, দেওয়ান প্রভৃতি যারা ছিল সমাজের বুকে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও অর্থশালী, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাদের বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের স্থান দখল করল কোম্পানীর অনুগ্রহপুষ্ট দালাল, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি শ্রেণী। অর্থের জোরেই এরা কোম্পানীর অনুগ্রহভাজন হয়েছিল এবং কোম্পানীকে নিয়মিত অর্থ সরবরাহ করার অংগীকারেই এরা জমিদার হয়েছিল। কোম্পানী চেয়েছিল ইংলন্ডের অনুকরণে একদল ভূ-স্বামী সৃষ্টি করে কৃষি ও কৃষকের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে। অবশ্য ক্রমবর্ধমান কৃষক বিদ্রোহ বানচাল করার ইচ্ছায় একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল অন্যতম। কোম্পানী ভেবেছিল এসব নব্য জমিদার শ্রেণী জমির উন্নতি সাধন করবে এবং কৃষকদের বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যশীল করে তুলবে।

বলা বাহুল্য, চরিত্রগতভাবে এরা ছিল ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানীর সাহেবদের অনুচর, মোসাহেবী দালাল। এরা বাজারে বন্দরে ঘুরে বেড়াতো নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে। অর্থ-চিন্তা ছিল এদের মজ্জাগত। অভিজাত শ্রেণীর পদবীতে উন্নীত হওয়ার মত কোন যোগ্যতা বা গুণ এদের ছিল না। কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিসের কৃপায় রাতারাতি জমিদার হয়ে এরা সেই অভিজাত শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। আভিজাত্যের চেয়ে মুনাফার উৎস জমিদারী তাদের কাছে ছিল আরও লোভনীয়।[১] পুরানো সমাজ সংস্কৃতি তারা পছন্দ করলো না। নব্য জমিদারদের শিক্ষা ও রুচিতে গ্রাম্য সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য হল না। শহরে বসে তারা অর্থের প্রত্যাশা করতো, জমিদারীর চিন্তা করতো না। জমির উন্নতি সাধনকল্পে কিছুই আর করা হল না। খাল-বিল, নদী-নালা ধীরে ধীরে মজে গেল। পথ-ঘাট নষ্ট হতে চললো। পানি সংরক্ষণের পুকুর বা দীঘি অকেজো হয়ে পড়লো। পানি নিষ্কাশনের খাল বা নালা ভরাট হয়ে গেল। এসবের দায়িত্ব তারা গ্রহণ করলো না। দেশ জুড়ে ঘনিয়ে এলো কৃষি শিল্পের ঘোর দুর্দিন। অতিরিক্ত করভার, পূর্তাভাবে কৃষির অব্যবস্থা ও নব্য জমিদারদের নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীসুলভ আচরণের দরুন কৃষি শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালো।

---

১. সংস্কৃতির রূপান্তরঃ গোপাল হালদার, পৃঃ ২৩৩।

বস্তুত এসব নব্য জমিদার শ্রেণী না পারলো সত্যিকার জমিদার হতে, না পারলো পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী হতে। ব্যবসায়ী হিসাবে এরা ছিল শুধুমাত্র দালাল। বহির্বাণিজ্যে এরা নাক গলাতে পারলো না কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্যের দরুন। আন্তর্বাণিজ্য ক্ষেত্রেও সাহেব ব্যবসায়ীরা বড় বড় দিক দখল করে বসে আছে। কাজেই বাধ্য হয়ে এরা ব্যবসাপত্র ছেড়ে বাড়ী-ঘর জমি-জমায় টাকা খাটাবার দিকে নজর দিল। বাংলার ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো অন্য দেশের ব্যবসায়ীরা। বাংলার ব্যবসা চলে গেল অবাঙ্গালীদের হাতে। বাংলার পুঁজিপতি ও শিল্পপতি হয়ে বসলো অবাঙ্গালীরা।

জমিদারী প্রথার সবচেয়ে বড় কুফল এইখানেই। বাঙালী জমিদার কৃষি ধ্বংস করলো, কৃষকের সর্বনাশ ঘটালো, ব্যবসা হারালো, শিল্পে অবহেলা করলো। রুদ্ধ হলো একটা জাতির সর্বাত্মক অগ্রগতি।

একদা এদেশের গ্রাম ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সমবায় কৃষি উৎপাদন এবং শিল্প পেশার উপর। প্রাচীন বাঙালী সমাজের অর্থকরী শিল্পের মূল ভিত্তি তাঁত আর চরকা। স্বৈরাচারী বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী সেই তাঁত ভেঙ্গে ছারখার করলো, চরকা ধ্বংস করে দিল। এভাবে বৃটিশ শাসন এমন এক সামাজিক বিপ্লব ঘটালো যার ফলে এদেশের শিল্প-কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে গেলো। শহরের শিল্পজীবী মানুষ গিয়ে ভিড় জমালো গ্রামে। তারা ধ্বংস করে দিল পল্লীর অর্থনৈতিক জীবনের স্থিতি। কৃষির উপর পড়লো ধ্বংসাত্মক চাপ এবং ক্রমবর্ধমান সেই চাপ হয়ে দাঁড়ালো এদেশের কৃষি-জীবনের হতাশা। এছাড়া কৃষির কোন প্রকার উন্নতি বা সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে সর্বাধিক হারে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ফলে কৃষির উন্নতি আরও ব্যাহত হল। ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গেল চিরকালের গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থা।[১]

কিন্তু যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগের সকল সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হল, সেহেতু বিত্তবানদের জমি ছাড়া টাকা খাটাবার অন্য কোন পথই থাকলো না এবং শ্রমজীবীদের জমি ছাড়া জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় ছিল না।

---

১. India Today : R. P. Dutta, P. 90.

ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি অপরাপর বণিকদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ কোম্পানী লাভ করলো বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বহির্বাণিজ্যের পূর্ণ অধিকার। তাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকল এদেশের বুকে বাণিজ্যাধিকার স্থাপনের প্রতি। তাই চললো সুযোগের অনুসন্ধান। ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্রোহে জয়লাভ করে আমেরিকা স্বাধীন হল। ফলে ইংরেজ বণিকদেব ঔপনিবেশিক বাজার হল সঙ্কুচিত। তাই এদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠলো অতি প্রয়োজনীয়। আবার অন্যদিকে এসব উৎসাহী বণিকদের প্রয়োজন মিটাবার তাগিদে বৃটেনে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হতে লাগল। সূচনা হল শিল্প বিপ্লবের।

শুধুমাত্র অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় ও নিরীহ প্রজাদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত ছিল না কোম্পানীর কর্মচারীরা। আদায়ী রাজস্বের অধিকাংশ দিয়ে নামমাত্র মূল্যে এদেশের পণ্যসম্ভাব ক্রয় করে চালান দিত ইংলন্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। এ ধরনের 'লগ্নি ব্যবসায়' বিপুল পরিমাণ মুনাফা লুটত তারা। ফলে কার্ল মার্কস এ প্রকাশ্য ব্যবসায়ের নাম দিয়েছিলেন 'প্রকাশ্য দস্যুতা'।

হান্টারের ভাষায় "১৭৬৫ সালে নিম্ন বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর কোম্পানীর হাতে প্রতি বছর এতো টাকা উদ্বৃত্ত থাকতো যে মূলধনের জন্য আর বিলেত থেকে রৌপমুদ্রা আমদানী করতে হতো না। কোন জেলায় যদি ৯০ হাজার পাউন্ড রাজস্ব আদায় হতো, তাহলে কাউন্সিল কড়া নজর রাখতেন যেনো সেই জেলায় শাসনকার্যের জন্য কোনোমতেই পাঁচ বা ছয় হাজার পাউন্ডের বেশী খরচ না হয়। অবশিষ্ট টাকার মধ্য থেকে দশ হাজারের মতো সাধারণ বেসামরিক ব্যয় এবং আরও দশ হাজার সামরিক ব্যয় বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত (ধরা যাক) ৬০ হাজার পাউন্ডের সাহায্যে রেশম, মসলিন, সুতীবস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য কেনা হতো। পরে কর্তৃপক্ষ এই সকল পণ্য বিলেত নিয়ে গিয়ে লিডেন হল ষ্ট্রীটে বিক্রি করতেন"।[১]

---

১. পল্লী বাংলার ইতিহাস(Annals of Rural Bengal) হান্টার, পৃঃ ২৫৮।

তৎকালে এদেশের পণ্যসম্ভার দিয়েই ইংলন্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। ইংলন্ড বা ইউরোপের অন্য কোন দেশ হতে পণ্যসম্ভার এনে এদেশের বাজারে বিক্রি করার কথা কল্পনাও করতে পারেনি তারা। বাংলাদেশের তথা ভারতের বস্ত্র-শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার মত উন্নত বস্ত্রশিল্প তখনও ইংলন্ড বা ইউরোপের কোন দেশে গড়ে ওঠেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ইংলন্ডের ব্যবসায়ের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রুকস এ্যাডাম্স লিখে-ছেন, "ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড স্থাপিত হওয়ার ৬০ বৎসর পরও ব্যাঙ্কের প্রচলিত নোটের মধ্যে সবচেয়ে বড় নোট ছিল ২০ পাউন্ডের নোট। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় নোট এবং এই নোট লোম্বার্ড স্ট্রীট ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারেনি। ১৭৯০ সালে বার্ক পরিস্থিতি বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ১৭৫০ সালে যখন তিনি ইংলন্ডে আসেন, তখন সমগ্র প্রদেশে বারটাব বেশী ব্যাঙ্ক ছিল না। আবার ১৭৯০ সালের বর্ণনায় দেখা যায় তখন শহরের প্রত্যেকটি বাজারেই ব্যাঙ্ক ছিল। এভাবে বাংলাদেশ থেকে রৌপ্য আসার পর শুধুমাত্র অর্থের প্রচলন বেড়ে যায়নি, আন্দো-লনও জোরদার হয়েছে। কারণ হঠাৎ দেখা গেল ১৭৫৯ সালে ব্যাঙ্ক ১০ পাউন্ড ও ১৫ পাউন্ডের নোট বাজারে ছেড়েছে।"১

শিল্প বিপ্লবের পূর্বেকার অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রুকস এ্যাডাম্স অন্যত্র বলেছেনঃ

"পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই বাংলাদেশের লুন্ঠিত ধনরত্ন ইংলন্ডে আসতে লাগল। এবং তখনই অবিলম্বে এর ফল বোঝা গেল। পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। তারপর থেকে (ইংলন্ডে) যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল তার তুলনা বোধহয় ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। ১৭৬০ সালের আগে ল্যাংকা-শায়ারে বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি এদেশের মতই সহজ সাধারণ ছিল এবং ১৭৯০ সালে ইংলন্ডে লৌহশিল্পের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়...ইংলন্ডে ভারতের ধন-সম্পদ পৌঁছার এবং ঋণব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত প্রয়োজন-অনুরূপ শক্তি (মূলধন) ইংলন্ডের ছিল না।"২

---

১. The Law of Civilization and Decay : Brooks Adams, p. 203-4
২. Ibid. P. 259-60.

বাংলাদেশ তথা ভারতের বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের একচেটিয়া চাহিদা দেখে বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকরা তাদের অনুন্নত বস্ত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে শুরু করলো আন্দোলন। ১৭৫৭ সালের পর থেকে দ্রুত বিস্ময়করভাবে দেখা দিল আমূল পরিবর্তন। ১৭৬০ সালে এলো তাঁতের উড়ন্ত মাকু এবং জ্বালানি হিসাবে পাটের পরিবর্তে কয়লা। ১৭৬৪ সালে হারগ্রীবস্ ও ১৭৭৬ সালে কম্পাটন তৈরী করলেন সুতা কাটার যন্ত্র 'জেনি' ও 'সিউল'। ১৭৬৮ সালে ওয়াট আবিষ্কার করলেন বাষ্পীয় যন্ত্র। এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে সাথে ভারতবর্ষ থেকে অফুরন্ত লুন্ঠিত ধন-সম্পদ পেঁাছতে লাগল ইংলন্ডে। ব্রুক এ্যাডামস্-এর মতে কোম্পানী সরকার কর্তৃক 'ভারতবর্ষ হতে যে পরিমাণ মুনাফা লুন্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর জন্ম থেকে এ পর্যন্ত তা সম্ভবপর হয়নি'।১

অর্থের প্রভাব ও বাষ্পীয় শক্তির একত্রিত মিলনে অসম্ভব সম্ভব হল। দৃঢ় ভিত্তিতে ইংলন্ডের বস্ত্রশিল্প উন্নতমাণে গড়ে উঠতে লাগল। ফলে ইউরোপের বাজারে এ দেশীয় বস্ত্রশিল্পের চাহিদা গেল কমে এবং এদেশের অন্যান্য পণ্যের সমতা রক্ষার জন্যে ইংলন্ডের পণ্য এদেশের বাজারে রফতানী করার প্রয়োজন দেখা দিল। সূচনা হল শিল্প বিপ্লবের।

১৮১৪ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে ইংল্যন্ড থেকে ভারতে কাপড় রফতানী বাড়ল ১০ লক্ষ থেকে ৫১০ লক্ষ গজেরও উপর। ভারতীয় কাপড়ের রফতানী কমে গেল—ত্রিশ বছরে (১৮১৫-১৮৪৪) সাড়ে বার লক্ষ থেকে তেষট্টি হাজারে।

মূল্যের পার্থক্য আরও মর্মান্তিক। ১৮১৫ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে ইংলন্ডে রফতানীকৃত ভারতীয় বস্ত্রের মূল্য নেমে এল ১৩ লক্ষ ডলার থেকে ১ লক্ষ ডলারে অর্থাৎ ১৭ বছরে ক্ষতির পরিমাণ ১২ থেকে ১৩ গুণ। অন্যদিকে একই সময়ে ইংলন্ড থেকে ভারতে পাঠানো বস্ত্রের মূল্য বেড়ে গেল ২৬ হাজার ডলার থেকে ৪ লক্ষ ডলারে অর্থাৎ বর্ধিত লাভের হার ১৬ গুণ। গত কয়েক শতাব্দী যাবত যে দেশ থেকে সূতীবস্ত্র রফতানী হত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, ১৮৫০ সালের মধ্যে সে দেশ আমদানী করতে লাগল ইংলন্ডে প্রস্তুত বস্ত্রের একচতুর্থাংশ। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের সেই আমদানী ৫২০০ গুণ বেড়ে

১. Ibid, P. 260.

গেল। বিদেশী শ্রমশিল্পের যান্ত্রিক আঘাতে বাংলার তাঁতীর মেরুদন্ড গেল ভেঙ্গে। একইভাবে একটির পর একটি শ্রমশিল্প ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল।১ সূতী-বস্ত্রের মত রেশমী বস্ত্র, পশমী বস্ত্র, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁচ ও কাগজ প্রভৃতি সব কিছুরই একই পরিণতি ঘটলো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়িক পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল এদেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে। শ্রমশিল্পের ধ্বংসের সাথে সাথে চাষের উপর পড়ল অস্বাভাবিক চাপ। কারুকারেরা শ্রমশিল্পী থেকে বিতাড়িত হয়ে কাজ নিল চাষী-মজুরের। নতুবা গ্রহণ করলো ভিক্ষাবৃত্তি। অভাব-অনটন আর অন্নাভাবে দেশ দিনের পর দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেতে লাগল। ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে মোট ৬টি দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ এবং ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে মোট ১৮টি দুর্ভিক্ষে দেড় কোটি লোক মারা গিয়েছিল।২ তখনও এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ছিল না। বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইংলন্ডের চেয়েও কম ছিল। দুর্গতির মূল কারণ পুরানো দেশী শ্রমশিল্পের ধ্বংস আর বিদেশী বণিক সর-কারের নির্মম শোষণ।৩

১৮৭৮ সালে দুর্ভিক্ষের কারণ ও সমস্যা অনুসন্ধানের জন্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়। ১৮৮৫ সালে কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে বলা হয়েছে যে এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া দেশের অন্য কোন শিল্প নেই—যার উপর লোকসংখ্যার একটা বিশেষ অংশ নির্ভর করতে পারে।৪ অর্থাৎ ইতিমধ্যে কোম্পানীর প্রবল অত্যাচার আর শোষণমূলক আধি-পত্যে এ দেশের সব শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

এ দেশের লুন্ঠিত পণ্যদ্রব্য ইংলন্ডের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল বলেই ইংলন্ডে 'শিল্প বিপ্লব' গড়ে উঠেছিল। "যে সময় পৃথিবীর

---

১. India Today : R. P. Dutta, P. 119.
২. India and its Problem : W. S. Lilley, Quoted from R. P. Dutta, India Today, P. 125.
৩. বাঙ্গালীঃ প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ৪২।
৪. Indian Famine Commission Report, 1880.

কোথাও (উৎপাদনের জন্য) মূলধনের জন্য লগ্নি আরম্ভ হয়নি, সে সময় ভারতবর্ষ (বাংলাদেশ ও বিহার) হতে লুন্ঠিত ধন-সম্পদ লগ্নি করে ইংলন্ড বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছিল। কারণ প্রায় ৫০ বছরকাল পৃথিবীর কোথাও ইংলন্ড কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়নি। ১৬৬৪ সাল থেকে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) পর্যন্ত ইংলন্ডে সমৃদ্ধির গতি ছিল অতি মন্থর, কিন্তু ১৭৬০ সাল হতে ১৮১৫ পর্যন্ত সেই গতি হয়েছিল অতি দ্রুত ও বিস্ময়কর।"১

১৮১৫ সালের শুভলগ্নে ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লব উঠল পুরোপুরি উচ্চশিখরে। উৎকর্ষের গুণে এ দেশের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা তখন পৃথিবীর সর্বত্র। তবুও এসব পণ্যের উপর ট্যাক্সের গুরুভার চাপানো হলো এবং ট্যাক্সের এ গুরুভার নিয়েও বিদেশের বাজারে এ দেশের বস্ত্রই ছিল সস্তা! কাজেই এ দেশের বস্ত্রের উপর শতকরা ৭০/৮০ ভাগ হারে শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া হল। অপরদিকে বিলেতী কল-কারখানার মালের জন্য কোন শুল্কই থাকলো না। ফলে দেশীয় বস্ত্র-শিল্প ধীরে-ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চললো। তার স্থান দখল করলো বিলেতী কাপড়। বিলেতী কাপড়ের আমদানী বাড়লো আর দেশীয় কাপড়ের রফতানি কমলো। এ দেশের তামা, সীসা, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রের উপর শতকরা ৪০০ টাকা হারে রফতানি-শুল্ক বসিয়ে রফতানি বন্ধ করে দেওয়া হল এবং বিলেত থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে আমদানী শুল্কে সে সব আসতে লাগলো।২ বস্ত্রশিল্পের স্বাধীন সওদাগর হল চুক্তিকারক দালাল, পরে গোমস্তা ও যাচনদার। দৈহিক অত্যাচার ও অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়ে তাঁতীরা তাঁত ছাড়লো। আঠারো শতকের প্রথমেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের উপর সারা ইউরোপে শুল্ক চাপলো, নষ্ট হল রফতানি। এভাবে ১৮৩৪ সালে এক কোটি টাকার বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেল। বিলেতী কাপড়ের আবির্ভাবে দেশীয় তাঁতীদের বিপর্যস্ত অবস্থা সারা দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার অন্যতম মূল কারণ। ক্রমাগত শিল্পনাশের ফলে জনসাধারণ ঝুঁকে পড়ল শেষ সম্বল কৃষির দিকে। ফলে শিল্পমৃত্যুর যুগে কৃষিরও অপমৃত্যু ঘটবার লক্ষণ ঘনিয়ে আসতে লাগলো।"৩

---

১. The Law of Civilization and Decay : Brooks Adams. P. 263-64.
২. History of British India : H. H. Wilson, P. 385.
৩. বাঙ্গালীঃ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ৩৪-৩৫।

যে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি একদা সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিল, সেই ঢাকাই মসলিনও বিলুপ্ত হল। ১৮৪৪ সালে ঢাকার অস্থায়ী কমিশনার মিঃ আই, ডানবার ঢাকার মসলিন বস্ত্রশিল্পের অবলুপ্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, বিলেতে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার এবং বস্ত্রশিল্পে আধুনিক কলকব্জার ব্যবহারই ঢাকার বস্ত্রশিল্পের রফতানী বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ। এ ছাড়া বিলেত থেকে সস্তা সুতা আমদানীর ফলে ঢাকার বাজারে দেশীয় সুতা অদৃশ্য হয়ে যায়। নামমাত্র শুল্কে আমদানীকৃত বিলেতী সুতা ছিল দেশীয় সুতার চেয়ে অনেক সস্তা। বিলেতী সস্তা সুতার সাথে পাল্লা দিয়ে ঢাকাই মসলিন টিকে থাকতে পারলো না। অপরদিকে উচ্চহারে শুল্ক আদায়ের ফলে বিদেশে ঢাকাই মসলিন রফতানী বন্ধ হয়ে যায়।[১]

১৭২০ সালে আইন পাস করে এ দেশীয় বস্ত্রের আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়। এসব কারণ ছাড়া আরেকটি বিশেষ কারণ হল— মোগল শক্তির পতনের সাথে সাথে মসলিন শিল্পের চাহিদাও অনেক কমে যায়। কারণ মসলিন বস্ত্রের মত দামী ও সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প রাজশক্তির পৃষ্টপোষকতা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে অর্থাৎ অতি লাভের আশায় ইংলণ্ডে রফতানী করার জন্যে শিল্পীদের জোর তাগাদা দিয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কাজ করতে হয়েছে। উপযুক্ত মজুরী দেওয়া হয়নি তাদের, ঠকিয়ে কম মূল্য দেওয়া হয়েছে। কাশিম বাজারের সিল্ক ব্যবসায়ীদের উপর এতো অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল যে, শিল্পীরা কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে নিজেরাই নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল।[২] সেই ইংরেজ রাজশক্তিই আবার মসলিন শিল্পের ধ্বংস কামনা করেছিল। রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রকৃত-পক্ষে নওয়াব, জমিদার ও শেঠ ব্যবসায়ীরাই ছিল মসলিন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ও অর্থ বিনিয়োগকারী। মসলিন সংগ্রহের জন্য ঢাকায় সব সময় এদের এজেন্ট বা গোমস্তা নিযুক্ত থাকত। অতিরিক্ত লাভের আশায় তাঁতীদের উপর জোর-জুলুম

---

১. Dhaka Commissioner's Letter dt. 22nd May, 1844 (Quoted ঢাকাই মসলিনঃ ডঃ আঃ করিম)।

২. ঢাকাই মসলিনঃ ডঃ আঃ করিম, পৃঃ ১২৩।

চালাত। তাঁতীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। অথচ উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিত না।

ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের পর ঢাকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে চার্লস ট্রেভল্যান (১৮৪০ খৃঃ) মন্তব্য করেছেন, "ঢাকা ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার, উন্নত অবস্থা থেকে নেমে গেছে দারিদ্র্যে, সেখানে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট।"[১] বৃটিশ আমলে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল কথাঃ সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী দীর্ঘ ইতিহাস। বাংলাদেশের অপরিমেয় সম্পদ লুণ্ঠনের মধ্যেই রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে বিরাট শ্রম-শিল্প যুগের আবির্ভাবের মূল।[২]

ইংলন্ডের শ্রমশিল্পের যান্ত্রিক আঘাতে বাংলার শিল্প ধ্বংস হল। দক্ষ কারিগর আর সুদক্ষ শিল্পীরা হল বেকার কিংবা দিনমজুর হয়ে অন্ন সংস্থানের সংগ্রামে বিপর্যস্ত। নিরুপায় শিল্পী, কারিগর, শ্রমিক ছুটে গেল গ্রামে। আঁকড়ে ধরলো কৃষিকে। কাঁচামাল সরবরাহ ও ইংলন্ডে তৈরী মাল ক্রয় বিক্রয়ের ঘোরালো ধনতন্ত্রের চাপে পড়ে বাংলাদেশ হলো কৃষিপ্রধান কিন্তু কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের উন্নতি সেকালেও হয়নি, একালেও হলো না। তাই কৃষি ও কৃষকের দুর্ভোগ চিরকালের।

## রেনেসাঁ বা নবজাগরণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রগতিশীল ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী যে বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালিত করেছিল, সেটাই ছিল ইউরোপের 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ আন্দোলন। ভূমি দাসত্বে আবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায় ছিল প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি এবং শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে জয় ঘোষিত হয়েছিল কৃষক-জনসাধারণের।

---

১. বাঙ্গালীঃ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ৪২।
২. পূর্বোক্তঃ পৃঃ ৩৯।

ইউরোপের এই রেনেসাঁস আন্দোলনের অনুকরণে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে তথাকথিত যে 'রেনেসাঁস' আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার গতি-প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। ভূমি-স্বত্বের অধিকারী জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃষক শোষণের ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা এবং ইংরেজ সৃষ্ট তৎকালীন নব্য সমাজে নেতৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া। উদ্দেশ্য ও শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণের দিক থেকে জমিদার ও মধ্যশ্রেণী পরিচালিত এই রেনেসাঁস আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের 'রেনেসাঁস' প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায়ের অভিমত, "বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলন ইউরোপের রেনেসাঁসের ন্যায় সমাজ কাঠামোর কোন পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় নাই। বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভূ-স্বামী শ্রেণীর নিজ শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিবার এবং আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। সুতরাং বাংলাদেশের তথাকথিত রেনেসাঁস আন্দোলন ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের বিপরীতধর্মী। বঙ্গদেশের ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর এই অসংহতি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেই আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত বুদ্ধিজীবী লেখকগণ ইউরোপের অনুকরণে 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা ও চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।"[১]

টমাস ব্যারিংটন মেকলের উদ্যোগে এবং এদেশের বিত্তশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় কেরাণী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। একমাত্র জমিদার ও ধনী মধ্যশ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর পক্ষে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। গ্রামের দরিদ্র কৃষক জনসাধারণের পক্ষে কলকাতার মত শহরে এসে এই ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণ করার প্রশ্ন ছিল একান্ত অবান্তর। তাছাড়া মেকলে সাহেব যে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন সেই উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী একমাত্র

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৫১।

জমিদার ও ধনী মধ্যশ্রেণীরই শিক্ষা গ্রহণ করার কথা। মেক্‌লে সাহেবের লক্ষ্য ছিল, এদেশে এমন একটি ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি করা, যারা অদূর-ভবিষ্যতে সর্ব বিষয়ে ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতা করবে এবং গণ-বিপ্লবের সময় সরকারকে সর্বান্তকরণে সাহায্য করবে। মেক্‌লে সাহেবের সে উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এদেশের বুকে সংঘটিত প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহে জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর বিরোধিতা এবং ইংরেজ সরকারের সাথে সর্ব বিষয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন দেশের সর্বত্র কৃষক বিদ্রোহের ঝড় বইছিল, তখন ইংরেজী শিক্ষিত জমিদার ও মধ্যশ্রেণী ইংরেজ প্রভুদের শাসনকে পরম সৌভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল এবং তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল এবং ঠিক এ সময়েই তারা নিজেদের ভাগ্য গড়ার তাগিদে গড়ে তুলেছিল রেনেসাঁস আন্দোলন। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রতী হলেন প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য সৃষ্টির কাজে। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ অর্থশালী ও শিক্ষিত সমাজকর্মী ব্রতী হলেন হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও হিন্দু সনাতন ধর্মকে উজ্জীবিত করার কাজে। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বিধবা বিবাহ চালু এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতা এবং কলকাতার মত কয়েকটি শহরে। ক্রমবর্ধমান কৃষক বিদ্রোহকে দমন করে ইংরেজ শাসনকে সুদৃঢ় করার পরিকল্পনায় পরোক্ষভাবে এ আন্দোলনকে কাজে লাগানো হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষ কোন অবস্থাতেই এ আন্দোলন শহর ছেড়ে গ্রামে বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮৫ ভাগই কৃষিজীবী এবং শহরের কলকারখানায় কার্যরত তাদের সন্তানেরাই শ্রমিক। কৃষক-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, কর্মস্পৃহা ও সুযোগ-সুবিধার উপর গোটা সমাজের স্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল। কৃষক-শ্রমিকরাই প্রকৃত অর্থে দেশ ও জাতির মেরুদন্ড। অথচ রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত বিত্তশালী সমাজ-দরদী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্য-সেবী কর্তৃক পরিচালিত তথাকথিত রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি সমাজের ৮৫ ভাগ

মানুষের কোনো উপকার করতে পারেনি। নবজাগরণ আন্দোলনের কোনো ছোঁয়াই লাগেনি তাদের গায়ে। উপরন্তু, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পর যেসব মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান বা দালাল ইংরেজ চক্রান্তে রাতারাতি জমিদার হয়ে বসেছিল, তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জমির খাজনা বৃদ্ধি এবং আবওয়াব ও সেচ প্রভৃতি ধার্য করে নির্বিবাদে কৃষক শোষণ চালাতে থাকে। তালুকদার, জোতদার, ইজারাদার প্রভৃতি একদল মধ্যস্বত্বভোগীকে নির্দিষ্ট অর্থ আদায়ের চুক্তিতে জমি ইজারা দিয়ে নিজেরা পরম আরামে শহরে বাস করতে থাকে। এসব মধ্যস্বত্বভোগীদের অমানুষিক শোষণ আর অত্যাচারে কৃষক সমাজ ছিল দুর্বিষহ জ্বালায় অতিষ্ঠ। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে নিরুপায় কৃষক সমাজ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।[১] বলা বাহুল্য, এদেশের বুকে সংঘটিত অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল তারাই, যারা তথাকথিত নবজাগরণ আন্দোলনের হোতা এবং ফল ভোগকারী।

এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের সেনসাস কমিশনার শ্রী অশোক মিত্র মহাশয় যে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করে গেছেন, তা রেনেসাঁসের আসল চরিত্র বিশ্লেষণে বিশষ উল্লেখযোগ্য ঃ

"লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভূ-স্বামী শ্রেণীই শহরে নিয়ে আসল সাংস্কৃতিক জাগরণ। তাদের মুখপাত্র ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই নবজাগরণকে অনেকে ভুলবশতঃ 'রেনেসাঁস' বলে থাকে। যারা এতে লাভবান হয়েছিল, তারাই আদর করে এর নাম দিয়েছিল 'রেনেসাঁস'। যে শ্রেণীর মধ্যে এ আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাদেরই অনুপনেয় ছাপ ছিল তথাকথিত এ রেনে-সাঁসে। জাগরণ এসেছিল প্রধানত শহরে এবং বেন্টিং সাহেব যাদের পরজীবী (Parasite) বলে অভিহিত করেছিলেন, সেই ভূ-স্বামী শ্রেণীর মধ্যেই এ আন্দোলন ছিল সীমাবদ্ধ। মুৎসুদ্দি জমিদার গোষ্ঠীর অন্তরের কামনা ছিল গ্রাম থেকে দূরে শহরে বসে শাসক গোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া। এটা ছিল রেনেসাঁসের এক বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্য পরিণতি লাভ করেছিল শাসক গোষ্ঠীর সাথে উক্ত পরজীবী জমিদার শ্রেণী ও ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দিদের

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৬৬-৬৭।

৫—

মৈত্রীর মধ্য দিয়ে। এ রেনেসাঁস আন্দোলন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আদৌ স্পর্শ বা প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে কতিপয় শহর ব্যতীত বাংলা-দেশের কোন অস্তিত্বই ছিল না এ রেনেসাঁসের নিকট।১

অত্যাচারী ইংরেজ শাসন আর জমিদার মহাজনদের শোষণের চাপে পড়ে যখন গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা জর্জরিত, কুশিক্ষা আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঠিক তখনই শহরে জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী সম্প্রদায়ের স্বার্থচক্রান্তের আবর্তে পড়ে জন্ম নিল রেনেসাঁস আন্দোলন। তাই রেনেসাঁস-এর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল— (ক) কৃষক শোষণের ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করা, (খ) শিক্ষা ও সভ্যতার আলো শুধুমাত্র সুবিধা-ভোগী একটা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অর্থাৎ জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা, (গ) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং ইংরেজ সর-কারকে সর্বাধিক সাহায্য করা, (ঘ) সমাজের সর্বক্ষেত্র হতে মুসলমানদের সরিয়ে দিয়ে হিন্দুদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা, (ঙ) সতীদাহ প্রথা বিলোপ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের মঙ্গল সাধন করা। তাই হয়ত দেখা যায়, শহর সীমার বাইরে যে সমস্ত স্থানে এ আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল তা ছিল মূলত হিন্দু মধ্যশ্রেণী অধ্যু-ষিত এলাকা।২ বলা বাহুল্য, সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকের। যিনি সমস্ত বাস্তব-মুখী প্রগতিশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন, 'নীলদর্পণ' ও 'জমিদার দর্পণের' মত বাস্তবমুখী সমাজসচেতনমূলক সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন প্রচারধর্মী সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে হিন্দু সনাতন ধর্মকে উজ্জীবিত করতে এবং হিন্দুদের মুসলমানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় নিরাপদ আশ্রয়। আরও প্রয়ো-জন হয়েছিল রামমোহন রায় আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত প্রভাবশালী জমি-দার ও সমাজ সংস্কারকের। যাঁরা চেয়েছিলেন ভূ-স্বামী ও মধ্যশ্রেণীর অক্ষুণ্ন

১. Census Report, 1951 : Vol. VI, Part 1A. P-437.
২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১৫১।

প্রতাপ এবং ইংরেজ শাসন আর শোষণের সুদৃঢ় রূপ। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজ শাসনই ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ। "তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, প্রচলিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে।"১

একথা সত্য যে, রেনেসাঁসের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। কিন্তু এদেশের শতকরা ৮৫ জন মানুষের কাছে তা ছিল নিরর্থক

## সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমান

কোম্পানী কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণের পর স্বল্পকালের মধ্যে মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিল উত্তরকালে তারই প্রতিক্রিয়া সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের উপপাদ্য। কোম্পানীর শাসন চক্রান্তের আবর্তে পড়ে মুসলমান হারাল তাদের রাজকীয় সম্মান, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আর সামাজিক জীবনে স্বস্তি। সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ' বছর যে জাতি ক্ষমতার দাপট আর গৌরবের সাথে এ দেশের বুকে শাসনচক্র চালিয়েছে, সে জাতির এ হেন ভাগ্য বিপর্যয় এক অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা। হান্টারের ভাষায়, একশ' সত্তর বছর আগে এদেশের একজন বর্ধিষ্ণু মুসলমানের হঠাৎ দারিদ্র্যের কবলে পড়ার ব্যাপার ছিল অকল্পনীয়, আজ তাদের এমনি শোচনীয় অবস্থা যে, আজ তাদের সম্পদশালী হওয়ার চিন্তাও অলৌকিক।২

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে বসলেন মীরজাফর। সর্বক্ষমতা তখন কোম্পানীর হাতে। কোম্পানীর নির্দেশে মীরজাফর ৮০ হাজার দেশীয় সৈন্য বরখাস্ত করলেন। দেশীয় সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের এ

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৫৪।
২. হান্টার—দি ইন্ডিয়ান মুসলমান (অনুবাদ—বাংলা একাডেমী) পৃঃ ১৩৬।

প্রয়োজন ছিল কোম্পানী শাসনের নিরাপত্তার খাতিরে। মীরজাফরের পুত্র নাজিমউদ্দৌলার সময় সৈন্য সংখ্যা আরও হ্রাস করে সামান্য সংখ্যক রাখা হল শুধুমাত্র নবাবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কান্ড নির্বাহের জন্য। এরপর ওয়ারেন হেস্টিংস যখন দ্বৈত শাসন বাতিল করে প্রকাশ্যভাবে সমগ্র দেশের শাসনভার গ্রহণ করল, সামান্য সংখ্যক সৈন্যও তখন বাতিল ঘোষণা করা হল। ফলে এক বিপুল মুসলিম জনসংখ্যা রাতারাতি বেকার হয়ে পড়ল। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট সামরিক সংস্থায় চাকরিরত আরও অসংখ্য কর্মচারী একই পরিণতির শিকার হল।

মুসলিম শাসন আমলে রাজস্ব আদায় ছিল সরকারী আয়ের বিরাট উৎস। রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন সংস্থায় উল্লেখযোগ্য উচ্চ পদসমূহে মুসলমান কর্মচারীই অধিষ্ঠিত ছিল। নগণ্য সংখ্যক হিন্দু ছিল নিম্নতর পদসমূহে। প্রদেশের প্রধান দেওয়ান পদে হামেশা মুসলমান কর্মচারী ছিল। প্রাদেশিক দেওয়ান অফিস ছিল এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন পদে শত শত মুসলমান কর্মচারী কর্মরত ছিল এই প্রতিষ্ঠানে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরও অনেক বছর পর্যন্ত কাজে বহাল ছিল এসব কর্মচারীরা। ইংরেজ কর্মচারীদের কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সরাসরি বরখাস্ত করা হল তাদের। নায়েব দেওয়ান পদে বহাল করা হয়েছিল মহাম্মদ রেজা খানকে। ১৭৭২ সালে রেজা খানকে বরখাস্ত করে নায়েব দেওয়ান হলেন স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস।

মুর্শিদাবাদ ছাড়া প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও ছিল দেওয়ানী অফিস। যেমন জাহাঙ্গীরনগর, আজিমাবাদ ও কটক। এসব স্থানে কর্মরত শত শত মুসলমান কর্মচারীকেও ক্রমে ক্রমে বরখাস্ত করা হল।

মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি মহলে বিভক্ত করা হয়েছিল।[১] মহলকে বলা হত পরগণা। প্রতিটি পরগণায় ছিল একটি করে রাজস্ব অফিস। আমিন, আমিল, কারকুন, খাজাঞ্চী এবং কানুনগো প্রভৃতি পদে হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী কাজ করতো। শুধুমাত্র ছোটখাট পদে

---

১. M. A. Rahim : Muslim Society and Politics in Bengal, P. 44.

কর্মরত ছিল কিছু সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী। কোম্পানীর শাসনগুণে এসব মুসলমান কর্মচারীরা চাকরি হারাতে বাধ্য হল।

কলকাতা নিজামও ছিল বিরাট এক প্রতিষ্ঠান। এখানে মন্ত্রীপরিষদ ও সেক্রেটারী ছাড়াও হাজার হাজার মুসলমান বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিল। এসব পদ থেকে মুসলমানদের অপসারিত করে হিন্দু কর্মচারী বহাল করা হল। হান্টারের ভাষায় 'কলকাতায় মুসলমানদের অবস্থা প্রেসিডেন্সী শহরের অপেক্ষাকৃত সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিয়োগ প্রায় সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় এখন কদাচিৎ এমন একটা সরকারী অফিস চোখে পড়বে, যেখানে চাপরাশী ও পিয়ন শ্রেণীর উপরিস্তরে একজনও মুসলমান কর্মচারী বহাল আছে।'[১]

মুর্শিদাবাদ নবাবের আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম ও গৃহকার্য নির্বাহের জন্য কয়েকশ' কর্মচারী ছিল, কোম্পানী সরকারের ইচ্ছায় তাদের বরখাস্ত করা হল। জাহাঙ্গীরনগর, আজিমাবাদ ও কটকের নায়েব নিজামের অফিস ও চাকলার ফৌজদারের অধীনে কাজ করত হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী। প্রতিটি শহরে ছিল একজন করে কোতওয়াল। এসব কোতওয়ালদের অধীনে কাজ করত কয়েক হাজার হতভাগ্য মুসলমান। কোম্পানীর চক্রান্তে চাকরি হারায়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের কবলে পড়ে ধুকে ধুকে মরতে লাগল তারা।

বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে কাযী, মুফ্তী, মীর, আদল প্রভৃতি পদে বহাল ছিল শত শত মুসলমান কর্মচারী। প্রতিটি শহর, চাকলা ও পরগণায় কাযীর অফিস ছিল। তাতে কর্মরত ছিল হাজার হাজার হতভাগ্য মুসলমান। প্রাথমিক অবস্থায় শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে কাজে বহাল রেখেছিল এসব কর্মচারীদের। স্বল্পকাল পরে এদেরও বরখাস্ত করা হল। বিচার বিভাগের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হল একজন ইংরেজ।

১৮৬৯ সালে আইন-আদালত বিভাগের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে হান্টার লিখেছেন, "মহামান্য রাণীর নিযুক্ত মোট ছয়জন আইন অফিসারের মধ্যে

---

১. হান্টারঃ দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, পৃঃ ১৪৮।

চারজন ইংরেজ ও দুইজন হিন্দু ছিল, মুসলমান একজনও ছিল না। হাইকোর্টের উচ্চতর গেজেটেড পদে মোট একুশজন অফিসারের মধ্যে সাতজন ছিল হিন্দু, কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। ব্যারিস্টারদের মধ্যে তিনজন ছিল হিন্দু, মুসলমান একজনও ছিল না। কিন্তু হাইকোর্টের উকিলের পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকাটা সর্বাধিক করুণ ইতিহাসের পরিচায়ক। বর্তমানে যারা জীবিত তাদের সকলেরই মনে আছে যে, আইনের এই পেশাটা সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদেরই ছিল করায়ত্ব। বর্তমান তালিকাটা ১৮৩৪ সালের অবস্থা অনুসারে তৈরী হয় এবং ঐ সময়কার উকিলদের মধ্যে যারা ১৮৬৯ সালে জীবিত ছিল তাদের মধ্যে ইংরেজ একজন, হিন্দু একজন এবং মুসলমান দু'জন ছিল। ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত আনুপাতিক হিসেবে ইংরেজ ও হিন্দুর সংখ্যা সাত আর মুসলমান ছয়জন। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে উকিল হিসেবে সনদপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা ১৮৬৯ সালে জীবিত ছিল তাদের সবাই মুসলমান। এমন কি ১৮৫১ সালেও যারা সনদ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত সংখ্যার সমান। এর পর থেকেই এ পেশায় নতুন ধরনের লোকদের সমাগম ঘটতে থাকে। ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে যোগ্যতার যাচাই শুরু হয়ে যায় এবং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত মোট সনদপ্রাপ্ত দু'শ চল্লিশ জন ভারতীয়দের মধ্যে দু'শ উনচল্লিশ জনই হিন্দু, আর মুসলমান মাত্র একজন। ১

হাইকোর্টের এটর্নী, প্রক্টর ও সলিসিটর পদে ১৮৬৯ সালে হিন্দুর সংখ্যা ছিল সাতাশ কিন্তু মুসলমান একজনও ছিল না। শিক্ষানবীশ কর্মরত উদীয়মান আইনজীবীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ কিন্তু মুসলমান শূন্যের কোঠায়। ২

ছোট বড় সব রকমের চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক আলোচনা হয়। কলকাতায়

---

১. হান্টারঃ দি ইন্ডিয়ান মুসলমান (অনুবাদঃ বাংলা একাডেমী) পৃঃ ১৪৯-৫০।
২. হান্টার ঃ পৃঃ ১৫০।

মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার হার তদন্তের জন্য বাংলা সরকার একটা কমিশন নিয়োগ করলেন। কিন্তু ফলাফলে দেখা গেল, সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা বরাবরের মত প্রতি বছর হ্রাস পাচ্ছে। ১৮৬৯ সাল ও তার পরবর্তী বছরগুলোর অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় চাকরির উচ্চতম স্তরে আনুপাতিক হার ছিল মুসলমান একজন আর হিন্দু দু'জন, ১৮৬৯ সালের পর মুসলমান একজন, হিন্দু তিনজন। দ্বিতীয় স্তরে পূর্বে ছিল মুসলমান দু'জন আর হিন্দু নয় জন, পরবর্তী সময়ে মুসলমান একজন, হিন্দু দশজন। তৃতীয় স্তরের চাকরিতে পূর্বে ছিল মুসলমান চারজন এবং হিন্দু ও ইংরেজ মিলে সাতাশজন। পরবর্তী সময়ে মুসলমান তিনজন এবং হিন্দু ও ইংরেজ মিলে চব্বিশজন। নিম্নস্তরে ১৮৬৯ সালে ছিল মুসলমান চারজন ও অন্যান্য সম্প্রদায় মিলে ত্রিশজন, পরবর্তী সময় মুসলমান চারজন ও অন্যান্য সম্প্রদায় মিলে ঊনচল্লিশজন। শিক্ষানবিশী পর্যায়ে ঐ সময় হার ছিল মোট আটাশটির মধ্যে মাত্র দু'জন মুসলমান। আর পরবর্তীকালে সেখানে মুসলমান একজনও নেই।[১]

চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হান্টার মন্তব্য করেছেন, "হিন্দুরা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী, কিন্তু সরকারী কর্মক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার জন্য যে রকমের সার্বজনীন ও অনন্য মেধা থাকার দরকার বর্তমানে তা তাদের নেই। এবং তাদের অতীত ইতিহাসও একথার পরিপন্থী। বাস্তব সত্য হলো এই যে, এদেশের শাসন কর্তৃত্ব যখন আমাদের হাতে আসে তখন মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি এবং শুধুমাত্র মনোবল ও বাহুবলের বেলাতেই উচ্চতর নয়, এমন কি রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনায় দক্ষতা এবং সরকার পরিচালনার বাস্তব জ্ঞানের দিক থেকেও তারা ছিল উন্নততর জাতি। এ সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য এখন সরকারী চাকরি এবং বেসরকারী কর্মক্ষেত্র এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"[২]

অর্থাৎ এ সত্য সুস্পষ্ট যে, ইংরেজ সরকারের প্রতারণা, বিভেদনীতি ও

---

১. হান্টারঃ পৃঃ ১৪৬।
২ হান্টারঃ পৃঃ ১৪৮।

মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসই মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে শোচনীয় অবস্থার অন্যতম কারণ। সব কিছু হারায়ে, নিঃস্ব নির্যাতিত হয়েও মুসলমানরা স্বস্তিতে থাকতে পারলো না। কোন ক্ষমতা নেই, তবুও তারা ইংরেজদের শত্রু। কোন অবস্থাতেই যেন আর তাদের বিশ্বাস করা যায় না। সমাজ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা পরিণত হল এক নির্মম পরিহাসে। আর ইংরেজদের অবস্থান হল আরও সুদৃঢ়, সুসংগত।

সত্য বটে, মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুদেরও ইংরেজ পদানত হতে হয়েছে। কিন্তু হিন্দুরা হৃষ্টমনে মেনে নিল এ অধীনতা। কারণ, তাদের কাছে এ পরিবর্তনে লাভ-লোকসানের প্রশ্ন ছিল না। শুধুমাত্র প্রভু পরিবর্তনের প্রশ্ন। প্রাক্-ইংরেজ আমলে তারা ছিল মুসলমান শাসিত। হঠাৎ ইংরেজ আসল সাহায্য-পুষ্ট প্রভু হয়ে। সাদরে আহ্বান জানাল তারা। মুসলমানদের হাত থেকে সর্ব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করল। মেতে উঠলো আনন্দ উৎসবে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাষায়—

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্তমুখে বল সবে বৃটিশের জয়।

যে হিন্দুদের সহযোগিতায় ইংরেজ এদেশের ক্ষমতা বিস্তারে গতিশীল হল, মুসলমানদের প্রতি বিনাশশীল ভূমিকা গ্রহণ করলেও হিন্দুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল না তারা। সম্ভবপর সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হিন্দুদের বশে রাখার চেষ্টা করল। তারা বিশ্বাস করত— যতক্ষণ এদেশের হিন্দু সমাজ সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত রাখবে, ততক্ষণ মুসলমানরা কিছুই করতে পারবে না। ১৮১৩ সালে স্যার জন ম্যালকম সিলেক্ট কমিটির সামনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "ভারতে হিন্দুদের সহযোগিতাই আমাদের নিরাপত্তার প্রধান সহায়।" আবার ১৮৪৩ সালে লর্ড এলিনবরো এক পত্রে ডিউক অব ওয়েলিংটনকে লিখেছিলেন, "মুসলমানরা বরাবরই আমাদের শত্রু। ভারতে আমাদের নীতি হবে হিন্দুদের প্রতি আমাদের সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত রাখা।" [১]

১. A. R. Mullick : British Policy and the Muslims, p. 64.

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এ সত্য অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল যে, মুসলমান কখনও রাজ্য হারাবার দুঃখ ভুলতে পারবে না। সুযোগ পেলেই ক্ষমতা অধিকারে সচেষ্ট হবে তারা।

ইংরেজ সরকারের এমনি বেপরোয়া মনোভাবের ফলে সমাজের প্রতি স্তরে, প্রতি ক্ষেত্রে দেখা দিল মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়। সরকারী চাকরির প্রতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের আধিপত্য। যোগ্যতম হলেও মুসলমান ছিল অপাঙক্তেয়। এই মনোভাব নিয়েই ওয়ারেন হেস্টিংস ফার্সীর সুপন্ডিত মুসলমান শিক্ষকের পরিবর্তে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণকে স্বীয় ফার্সী শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

কলকাতা হতে প্রকাশিত 'দূরবীন' নামক একটি ফার্সী পত্রিকা ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে লিখেছিল, "উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের সমস্ত চাকরি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার সকল শ্রেণীর প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য তথাপি এমন সময় এসেছে যখন মুসলমানদের নাম আর সরকারী চাকুরীয়াদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না ; কেবল তারাই চাকরির জায়গায় অপাঙক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনার অফিসে কতিপয় চাকরিতে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু অফিসারটি সরকারী গেজেটে কর্মখালীর যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় যে, এই শূন্য পদগুলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে। মোটকথা হলো, মুসলমানদের এতটা নীচে ঠেলে দেয়া হয়েছে যে, সরকারী চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও সরকারী বিজ্ঞপ্তি মারফত এটা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের জন্য কোন চাকরি খালি নাই। তাদের অসহায় অবস্থার প্রতি কারো দৃষ্টি নেই এবং এমনকি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতেও রাজী নয়।"[১]

কোম্পানী শাসনের প্রাথমিক পর্যায় অনেক বছর ধরে ফার্সী অফিস-আদালতের ভাষা থাকায় শাসন বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান কর্মরত ছিল।

---

১. হান্টার: পৃঃ ১৫২-৫৩।

মুসলমানরা ফার্সী ভাষায় সুদক্ষ বিধায় চাকরির প্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবী ছিল অগ্রগণ্য। ইংরেজী ও দেশীয় ভাষা প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত চাকরি ক্ষেত্রে হার ছিল ৬ জন মুসলমান ও ৭ জন হিন্দু। কিন্তু ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষিতদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দুরা নানাভাবে দাবী তুললো যে, ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী অফিস-আদালতের ভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৮২৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী কলকাতার একটি বাংলা পত্রিকা দাবী জানাল, "ফার্সী বর্তমানে অফিস-আদালতের ভাষা হলেও জজ, উকিল, বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীর ভাষা এখন আর ফার্সী নয়। আমাদের মনে হয়, যেহেতু ইংরেজী এখন শাসকদের ভাষা, সেহেতু ইংরেজীকে অফিস-আদালতের ভাষারূপে স্থান দেওয়া উচিত। বর্তমানে প্রায় চারশ' ছাত্র হিন্দু কলেজে অধ্যয়নরত। এ ছাড়া কলকাতার স্কুল-কলেজে প্রায় এক হাজার ছাত্র ইংরেজী পড়ছে। এমতাবস্থায় ইংরেজীকে ফার্সীর পরিবর্তে অফিস-আদালতের ভাষারূপে গণ্য করা হলে ইংরেজী শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।১

হিন্দুদের ক্রমাগত দাবী ও কোম্পানী সরকারের শোষণনীতির ফলে ১৮৩৭ সালে হঠাৎ এক আদেশ জারি হল যে, এখন থেকে ফার্সীর পরিবর্তে অফিস-আদালতের কাজ চলবে ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায়। রাতারাতি এমনি একটি পরিবর্তনে বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করলো। অনেক বছর সরকারী ভাষা ফার্সী থাকায় মুসলমানরা ইংরেজী বা দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি, অপর দিকে হিন্দুরা ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ থেকে ইংরেজী ও দেশীয় ভাষা সাদরে গ্রহণ করেছে।

ভাষার এ পরিবর্তনের ব্যাপার নিয়ে সৈয়দ আমীর আলী দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "সরকারী চাকরি পেতে হলে শাসকের ভাষা শিখতে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎপূর্বে ইংরেজী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে অবশ্যই সরকারী নির্দেশ থাকতে হবে। ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত সরকারী নির্দেশ ছিল ওকালতি অথবা মুনসেফগিরির জন্য ইংরেজী অথবা উর্দু ভাষাই যথেষ্ট।

১. M.A Rahim : Muslim Society and politics in Bengal. p. 123.

কিন্তু অতীব দুঃখজনক ব্যাপার যে, দু'এক বছর যেতে না যেতেই অকস্মাৎ সরকারী নির্দেশ জারি হল—উচ্চ পর্যায়ের ওকালতি এবং মুনসেফগিরি পরীক্ষার একমাত্র মাধ্যম হবে ইংরেজী।"

ইংরেজী জানতে হবে, এ সত্য উপলব্ধি করার আগেই এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হতে হল তাদের। সরকারী চাকরির প্রতিটি দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল তাদের জন্য। অপরদিকে হিন্দুরা পূর্ব হতেই ছিল বৃটিশ স্বার্থের পরিপোষক। হিন্দু যুবকরা মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজী শিখে সরকারী চাকরির প্রতিটি ক্ষেত্রে কায়েমী আসন দখল করে বসল। মুসলমানদের জন্য চাকরি এক মহাসংকট। সেই সংকট আরও প্রকট করে তুললো ইংরেজ শাসকদের ভেদ-নীতি।

অপেক্ষাকৃত মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলোতে মুসলমানদের অবস্থা এতই করুণ যে, এমন অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে মুসলমানদের স্থান শূন্যের কোঠায়। ১৮৭১ সালে হান্টার প্রদত্ত নিম্নরূপ তালিকা এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণঃ[১]

## গেজেটের পদসমূহের তালিকা

| | ইউরোপিয়ান | হিন্দু | মুসলমান | মোট |
|---|---|---|---|---|
| "চুক্তিবন্ধ সিভিল সার্ভিস | ২৬০ | - | - | ২৬০ |
| রেগুলেশন বহির্ভূত জেলাসমূহে | - | - | - | - |
| বিচার বিভাগীয় অফিসার | ৪৭ | - | - | ৪৭ |
| এক্সট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার | ২৬ | ৭ | - | ৩৩ |
| ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার | ৫৩ | ১১৩ | ৩০ | ১৯৬ |
| ইনকামট্যাক্স এসেসার | ১১ | ৪৩ | ৬ | ৬০ |

১। হান্টারঃ পৃঃ ১৪৭।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট | ৩৩ | ২৫ | ২ | ৬০ |
| স্মল কজ কোর্টের জজ এবং সাবডিনেট জজ | ১৪ | ২৫ | ৮ | ৪৭ |
| মুনসেফ | - | ১৭৮ | ৩৭ | ২১৬ |
| পুলিশ বিভাগ, সকল গ্রেডের গেজেটেড অফিসার | ১০৬ | ৩ | - | ১০৯ |
| গণপূর্ত বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং এস্টাবলিশমেন্ট | ১৫৪ | ১৯ | - | ১৭৩ |
| মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, মেডিকেল কলেজ, জেলখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগ প্রতিষেধক বিভাগ ও জেলা মেডিকেল অফিসার | ৮৯ | ৬৫ | ৪ | ১৫৮ |
| গণপূর্ত বিভাগ, একাউন্ট এস্টাব্লিশমেন্ট | ২২ | ৫৪ | - | ৭৬ |
| গণপূর্ত বিভাগ, সাবডিনেট এস্টাব্লিশমেন্ট | ৭২ | ১২৫ | ৪ | ২০১ |
| জনশিক্ষা বিভাগ | ৩৮ | ১৪ | ১ | ৫৩ |
| শুল্ক, নৌ-চলাচল, জরিপ, অফিস নিয়ন্ত্রণ ইত্যাকারের বিভিন্ন বিভাগ | ৪১২ | ১০ | - | ৪২২ |
| মোট | ১,৩৩৮ | ৬৮১ | ৯২ | ২,১১১ |

## মফস্বল জেলাসমূহের অবস্থা

| | হিন্দু | মুসলমান | মোট |
|---|---|---|---|
| ভাগলপুর | ১১৩ | ২২ | ১৩৫ |
| বগুড়া | ৯১ | ৩৩ | ১২৮ |
| বর্ধমান | ১১৭ | ১৪ | ১৩১ |
| ফরিদপুর | ৩৩৬ | ৩০ | ৩৬৬ |

১. Quoted from Muslim Society and Politics in Bengal : p-54.

| | | | |
|---|---|---|---|
| হাওড়া | ২০৬ | ৪ | ২১৪ |
| মুর্শিদাবাদ | ৩৪৩ | ৩৯ | ৩৮২ |
| ময়মনসিংহ | ৩২৪ | ২০ | ৩৪৪ |
| মেদিনীপুর | ৪৬০ | ৩৯ | ৪৯৯ |
| পাবনা | ১৭৯ | ২৬ | ২০৫ |
| পুর্ণিয়া | ১২৯ | ৫৯ | ১৮৮ |
| রাজশাহী | ২৮৭ | ৫৭ | ৩৩৮ |
| বরিশাল | ৩৮৯ | ৩৪ | ৪২৩ |

এছাড়া কলিকাতা শহরের হিসাবে দেখা যায়— বিভিন্ন সরকারী অফিস সমূহের মোট ৩,৭৫০ জন কর্মচারীর মধ্যে ৫৩৯ জন খৃস্টান, ৩,০৪৫ জন হিন্দু। মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ১৬৬ জন।

উপরোক্ত হিসাব পরিদর্শনে এ সত্য সহজে প্রতীয়মান হয় যে, কোম্পানী আমলে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা অতীব দুর্ভাগ্যজনক। এ শোচনীয় পরিণতির কারণ প্রথমত, ব্রিটিশ শাসকদের মুসলমানদের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা ও অবিশ্বাস, দ্বিতীয়ত, ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ও দেশীয় ভাষা প্রবর্তন, তৃতীয়ত, ইংরেজী ভাষা শেখার ব্যাপারে মুসলমানদের অনীহা ও শ্লথগতি। সবশেষে দেখা যায়, যে সব সরকারী অফিসে বিভিন্ন পদে হিন্দুরা পূর্ব হতে অধিষ্ঠিত ছিল, সে সব অফিসে মুসলমানদের নিয়োগের প্রশ্নে হিন্দুদের বিরোধিতা ও কারসাজি।

শেষের দিকে মুসলমান যুবকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল নিজেদের শিক্ষিত ও উপযুক্ত প্রমাণ করার জন্যে, কিন্তু বিশেষ কোন কারণে তাদের সামনে চাকরির সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যখনই কোন অফিস আদালতে মুসলমান প্রার্থী আবেদন পেশ করত, কোন এক ষড়যন্ত্র তাদের আবেদন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত পৌঁছতে দিত না।

## মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা

"উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রনৈতিক

বিচারে তাদের নাম ব্রিটিশের সহযোগী, সংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম বাবু সম্প্রদায় বা ভদ্র শ্রেণী, আবার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়।"১

ইংরেজ রাজত্বে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংকট ও বিপর্যয়ের কথা জানতে হলে সবার আগে পরিচিত হতে হবে হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে।

আগেই ব্যক্ত করা হয়েছে, কি করে হিন্দুরা মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। কি করে মুসলিম শাসকদের ছত্রছায়ায় থেকে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলো, আবার সেই মুসলমান প্রভুদের সর্বনাশ সাধন মানসে ষড়যন্ত্র জাল বিছিয়েছিল। পরিশেষে সেই ষড়যন্ত্র পুরোপুরিভাবে সাফল্যমন্ডিত হলো বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর সৌভাগ্যে। একথা সত্য যে, যতদিন এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি মাত্র পক্ষ ছিল ততদিন শত্রুতা থাকলেও, নিজেরাই তা মিটমাট করে নিয়েছে কিন্তু তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশ আসার পর থেকে নানা কারণে সেই সম্পর্ক দ্রুত বিরোধমূলক সমস্যায় ও সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়।

এদেশের নিম্ন বা কায়িক শ্রমজীবী হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের বরাবরই একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একদা এদেরই একাংশ বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাধ্য হয়েছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণে। হিন্দুদের যে শ্রেণী পুরুষানুক্রমে সমাজের উচ্চাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যারা শিক্ষা ও ব্যবসা সূত্রে সম্পদশালী, তারাই মূলত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বিস্তারে প্রধান হোতা। বাংলাদেশে বাণিজ্যের সূত্রে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশদের প্রথম প্রথম ও সহযোগী ছিল তারাই। এরা চিরকালই সুযোগ-সন্ধানী।

এ বিষয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্ত যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা বিশেষ লক্ষণীয়—"বৃটিশদের সৌভাগ্য গড়ে তোলার কাজে তিন প্রকারের দেশীয় মানুষ সামর্থ ও সাহায্য যুগিয়েছেঃ পাইক সম্প্রদায়—এরা ব্রিটিশদের বাহুবল যুগিয়েছে; করণ সম্প্রদায় ও তৃতীয় এক ধরণের বিত্তবান সম্প্রদায়—এরা ইস্ট ইন্ডিয়া

১. ভারবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৬৯।

কোম্পানীর এদেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে যোগসূত্র বা দালাল হিসাবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় যে ধর্মের বিচারে ব্রিটিশদের সামর্থ্য ও সাহায্য যোগানদার এই তিন সম্প্রদায়ই হিন্দু-ধর্মাবলম্বী।" ১

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম পর্যায়ে খাতাপত্র লেখালেখির কাজ করত এই করণ বা কেরানী সম্প্রদায়। এবং ধীরে ধীরে ইংরেজদের সাথে এদের একটা আলাদা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এদের থেকেই দেশীয় মুন্শী বেনিয়ান মুৎসুদ্দি ও দালালরূপী অবস্থাপন্ন গোষ্ঠীর জন্ম ও বৃদ্ধি। পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে এদেরই একাংশ নব্য জমিদাররূপে পরিচিত হয়। অন্য আরেক দল বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এদেশে বৃটিশের সর্বশ্রেষ্ঠ সহযোগীরূপে সুপরিচিত হয়।

পাইকদের একটা বিশেষ ক্ষমতা ও ভূমিকা ছিল তুর্কী আফগান আমল থেকে। এদেরই সহায়তায় ব্রিটিশরা বাংলাদেশের নানা স্থানে কুঠি পত্তন করে এবং এসব পাইকদের নিয়েই কুঠিয়াল বাহিনী গঠিত হয়। নীল কুঠির কুঠিয়াল বাহিনী এরাই। এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করল এই তিন শ্রেণীর দেশীয়রাই।

অপরদিকে মুসলমানরা চিহ্নিত হলো ইংরেজদের চিরশত্রুরূপে। তাছাড়া ইংরেজদের ভেদ-নীতির ফলে ধর্মীয় ব্যবধান গেল অনেক বেড়ে।

ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ও দেশীয় ভাষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল, শিক্ষিত হিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিরোধিতার ফলে তা আরও চরম আকার ধারণ করল।

খৃস্টান মিশনারী এবং অবস্থাপন্ন হিন্দুদের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থলে ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হল। সাথে সাথে স্থাপিত হল দেশীয় ভাষা শেখার বহু স্কুল। খৃস্টান মিশনারীদের সহযোগিতা ও সাহায্য ছিল এসব স্কুলের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ। অপরদিকে আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে মুসলমানদের অনেক স্কুলই বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বাংলা পাঠশালা বা স্কুলগুলোতে সংস্কৃত-প্রধান বাংলা শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠ্য পুস্তকের অধিকাংশ রচনা ছিল

---

১. ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৫৫।

হিন্দুদের দেব-দেবীদের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে। ক্লাসে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক-ভাবে স্বরস্বতী-বন্দনা শিখতে হত। কাজেই মুসলমানদের ইচ্ছা থাকলেও ধর্মীয় অনুশাসনের কঠোরতায় তাদের পক্ষে সম্ভব হত না বাংলা স্কুলে পড়া। এতসব বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি জেলায় বাংলা স্কুলে মুসলমান ছাত্র ভর্তি হয়েছিল। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদে হিন্দু ছাত্র ৯৯৮ ও মুসলমান ৬২, বর্ধমান জেলায় হিন্দু ১২,৪০৮, মুসলমান ৭৬৯, বীরভূম জেলায় হিন্দু ছাত্র ৬,১২৫, মুসলমান ২০২ জন।

উইলিয়াম কেরী, মে, পিয়ারসন ও হারলে প্রমুখ মিশনারীর প্রচেষ্টায় কলকাতা ও তার আশেপাশে বেশ কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এসব স্কুলের ছাত্রসংখ্যার অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ১৮১৭ সালে কলকাতায় বিখ্যাত হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। মুসলমান এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের জন্য এ কলেজের দ্বার ছিল রুদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এই কলেজে মুসলিম বিরোধী মনোভাব বজায় ছিল।[১] খৃস্টান মিশ-নারীদের ইংরেজী স্কুল ব্যাপক হারে প্রসারিত করার আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার একটা প্রধান কারণ ছিল খৃস্টধর্ম প্রচার। ১৮২২ সালের ১১ই মার্চ 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ লিখিত জনৈক মিশনারীর উক্তিঃ 'হিন্দুরা এখন থেকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে ঈশ্বর এবং তার প্রেরিত যীশুর শিক্ষা ও জ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।'[২] বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃস্টধর্ম গ্রহণের জোয়ার এসেছিল। পরবর্তীকালে দু'চার জন ইংরেজী শিক্ষায় আকৃষ্ট মুসলমানও আর্থিক সংকট উত্তরণ মানসে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। যশোহরের মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণায় সোচ্চার ছিলেন। এ সময় কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন খৃস্টান মিশনারীদের প্ররোচনায় খৃস্টানধর্মে দীক্ষা নেন এবং জন জমিরুদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। পরে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রচেষ্টায় জন জমিরুদ্দিন পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুন্শী মোহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ্ খৃস্টান মিশনারীদের ভন্ডামীর মুখোশ খুলে দিয়ে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

---

১. সুরজিৎ দাশগুপ্তঃ পৃঃ ২০৯।
২. Bengal in the Nineteenth Century, : R. C. Muzumder. p-32.

ইংরাজী শিক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও ফার্সী অফিস আদালতের ভাষা থাকায় সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। মুসলিম আইন, বিজ্ঞান ও ফার্সীভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস 'কলিকাতা মাদ্রাসা' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৭৮৫ সালে সরকারী বরাদ্দ ছিল বাৎসরিক ২৯,০০০ টাকা। দেশীয় শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বাজেটে লাখ টাকার সুপারিশ থাকলেও কলিকাতা মাদ্রাসার উন্নয়ন প্রকল্পে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। অথচ হিন্দুদের হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের জন্য আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ ছিল; কলিকাতা মাদ্রাসা নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হল শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে।

১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজে উচ্চ পর্যায়ের ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হল। অথচ কলিকাতা মাদ্রাসায় শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরের ইংরাজী চালু করা হল ১৮২৯ সালে। বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল মুসলমান ছেলেরা ইংরাজী শিক্ষায় আশাতীত পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম। কিন্তু কোম্পানী সরকারের অবহেলার দরুণ ক্যালকাটা মাদ্রাসার শিক্ষা সংকট আরও প্রকট হয়ে উঠলো। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৭ জন।

একদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, অর্থসংকট, বেঁচে থাকার অবলম্বন অন্বেষণে পর্যুদস্ত, তথাপি ইংরেজ জাতি ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মজ্জাগত ঘৃণা; অপরদিকে শাসক শ্রেণীর সর্বক্ষেত্রে অসহযোগিতা ও অবিশ্বাস। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমান পরিবার এক ভয়াবহ সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন বাংলার প্রতিটি মুসলিম পরিবারে এমন একটা পৃথক তহবিলের ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে ঐ পরিবারের ছেলেমেয়েরা ছাড়া আশেপাশের গরীব ঘরের ছেলেরাও বিনা খরচায় লেখাপড়া শিখতে পারত।[১] আর্থিক সচ্ছলতার সাথে সাথে শিক্ষারও সুব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি ঘরে দেখা যেত আরবী-ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত লোক।

---

১. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানসঃ হান্টার. পৃঃ ১৬০।

৬—

খৃস্টান মিশনারী ও বিত্তশালী হিন্দুদের প্রচেষ্টায় ইংরেজী ও বাংলা ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনবরত বাড়ছে এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, সেখানে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ নির্ণয়ে দেখা যায়, একঃ ১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন। মুসলমান আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় নির্বাহের জন্য নিষ্কর ভূমির ব্যবস্থা ছিল। সেই সব নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার চক্রান্তে এই আইনের সৃষ্টি। এই আইনের ফলে শত শত প্রাচীন পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। নিস্কর জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মরণ আঘাত প্রাপ্ত হল।[১] দুইঃ ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন। লর্ড টমাস ব্যারিন্টন মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী এই আইনের সৃষ্টি। এই আইনের বলে কেবলমাত্র ইংরেজী স্কুল ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য পাবে না। তিনঃ ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষা ঘোষণা। কোম্পানী শাসনে সুদীর্ঘকাল ফার্সী রাজভাষা থাকায় মুসলমানরা ফার্সী ও আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা শিখার চেষ্টা করেনি। হঠাৎ করে ইংরেজী সরকারী ভাষা ঘোষণার ফলে মুসলমানদের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড অচল হয়ে পড়ল। চারঃ ১৮৪৪ সালের চাকরি নিয়োগ পদ্ধতি আইন। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ হঠাৎ এক ঘোষণায় জানালেন যে যাদের ইংরাজীতে ডিগ্রী আছে কেবলমাত্র তারাই সরকারী চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবে। এই ঘোষণার ফলে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং মুসলমান শিক্ষক মুনশী মৌলভী চাকরি হারায়ে চরম দারিদ্রের কবলে পতিত হয়।[২]

ইংরেজ প্রশাসনিক আইন, বাণিজ্যনীতি ও শিক্ষানীতির ফলে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। সাধারণ কৃষক শ্রমিক ও বিত্তহীন মানুষের অবস্থা আরও ভয়াবহ। অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ-মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘূর্ণিপাকে পড়ে তারা দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হতে লাগল। যেখানে বেঁচে থাকার সামান্যতম সম্বলের অভাব, সেখানে উচ্চ বেতনে শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন অবান্তর।

---

১. দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানসঃ হান্টার, পৃঃ ১৬২।
২. উনিশ শতেকর বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারাঃ ডঃ ওয়াকিল আহামদ, পৃঃ ৪১।

তাই তো দেখা যায়, ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত এই পাঁচটি জেলায় ফার্সী ভাষায় হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ৭১৫ জন। কোম্পানীর নীতি পরিবর্তনের ফলে ১৮৭২-৭৩ সালে ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, কলিকাতা এই ৪টি জেলায় হিন্দু-মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬৯ ও ৮ জন।১

১৮৬৯ সালের আরেক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট উপাধিপ্রাপ্ত মোট চারজন ডাক্তারের মধ্যে তিনজন হিন্দু, একজন খৃস্টান। মুসলমান একজনও নেই। মেডিসিনে ব্যাচলার ডিগ্রিপ্রাপ্ত মোট ১১ জনের মধ্যে ১০ জন হিন্দু ও ১ জন ইংরেজ। এল. এম. এফ ডিগ্রীধারী মোট ১০৪ জনের মধ্যে ৫ জন ইংরেজ ; ৯৮ হিন্দু, মুসলমান মাত্র ১ জন।

অনুরূপভাবে আইনজীবী হিসাবে সনদপ্রাপ্তদের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়ঃ

১৮৩৮ সালে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত সংখ্যার সমান, সেখানে ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ সালের সনদপ্রাপ্ত ২৪০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ২৩৯ জনই হিন্দু। একজন মাত্র মুসলমান।২

ডালহৌসির আমলে কলিকাতা ও হুগলীতে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ভাষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। নর্মাল স্কুলে ভর্তির মাপকাঠি ছিল—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নীতিবোধ, শকুন্তলা ও বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি পুস্তক বিষয়ক জ্ঞান। বলা বাহুল্য. উপরোক্ত যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে কোন মুসলমান পারলো না নর্মাল স্কুলে ভর্তি হতে। ১৮৫৬-৫৭ সালে কলিকাতা ও হুগলীর নর্মাল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৭ ও ১৪৫ জন। এর মধ্যে একজনও মুসলমান ছিল না। সবাই ছিল হিন্দু।৩

১৮০৬ সালে হুগলীর বিখ্যাত দানবীর হাজী মহাম্মদ মহসীন মৃত্যুর

১. উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারাঃ ডঃ ওয়াকিল আহামদঃ পৃঃ ৪১।
২. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস (অনুবাদ, বাংলা একাডেমী)ঃ হান্টার। পৃঃ ১৪৯-১৫২।
৩. Muslim Society and politics in Bengal : M.A. Rahim P-130

পূর্বে তাঁর অগাধ সম্পত্তি দান করে গেলেন মুসলমানদের ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানের কল্যাণের জন্য। ওসীয়তনামার দুই মোতাওয়াল্লীর মধ্যকার মতবিরোধের সুযোগে একজন মোতাওয়াল্লীকে সরিয়ে দিয়ে কোম্পানী সরকার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করল। অপর মোতাওয়াল্লীর পরিবর্তে গ্রহণ করা হল সরকারের মনোনীত মোতাওয়াল্লী। মহসীনের সম্পত্তির আয় দিয়ে ১৮৩৬ সালে স্থাপিত হল হুগলী কলেজ। কলেজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখা হল সম্পত্তির বাৎসরিক আয়ের একটা অংশ ৫৪,০০০ টাকা। নিয়মিত বেতন দিয়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব জাতীয় ছাত্রের ভর্তির অধিকার রাখা হল। ইংরাজী ও দেশীয় ভাষার জন্য দুটো আলাদা আলাদা বিভাগ খোলা হল। পরে ১৮৩৮ সালে কলেজের পাশে একটা ইংরাজী স্কুল ও ১৮২৯ সালে একটা শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। কিন্তু সেখানে মুসলমান ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। অথচ একজন মুসলমানের দানকৃত সম্পত্তির আয় দিয়ে গঠিত কলেজে হিন্দুদেরও পড়ার অধিকার রাখা হল। মুসল-মানদের হেয় প্রতিপন্ন ও মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়েই কোম্পানী সরকার হিন্দুদের সাথে হাত মিলিয়ে এ ধরনের অন্যায় কাজ করতে সাহসী হয়েছিল।[১] কলেজ চালু হওয়ার পর দেখা গেল মুসলমান ছাত্রসংখ্যা শতকরা মাত্র ২ জন, বাকী সবই হিন্দু। গরীব মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ কোন বৃত্তি বা সুবিধা রাখা হল না সেখানে। এভাবে একটা মুসলিম প্রতিষ্ঠান চলে গেল বিধর্মীদের হাতে ; বিধর্মীদের সুবিধার্থে।

চট্টগ্রামে মীর ইয়াহিয়া মুসলমানদের শিক্ষার সুবিধার্থে যে বিপুল সম্পত্তি দান করে যান, ১৮৪০ সালে কোম্পানী সরকার সেই দানকৃত সম্পত্তির আয় দিয়ে গড়ে তোলে একটা ইংরাজী স্কুল। সেই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র প্রায় সবাই হিন্দু। মুসলমান ছাত্রদের জন্য সেখানেও ছিল না বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা।

সমাজের সর্বস্তরে মুসলমানদের অবস্থা এতই শোচনীয় আকার ধারণ করলো যে সাধারণ একটা মুসলমান পরিবারের পক্ষে দুবেলা দু'মুঠো খাওয়ার ব্যবস্থা

---

১. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস (অনুবাদ, বাংলা একাডেমী) : হান্টার, পৃঃ ১৬৩-৬৪।

করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। সরকার যে সমস্ত স্কুল-কলেজ স্থাপন করলো, তাতে বেতনের যে গুরুভার—সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে পড়ার খরচ চালানো শুধুমাত্র কষ্টসাধ্য নয়—অসম্ভব। কেবলমাত্র অভিজাত বা বিত্তশালীদের জন্য এ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা।

স্কুল-কলেজের জন্য সরকারের একটা সাধারণ সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। শর্ত ছিল—স্থানীয় লোকেরা নিজেদের চেষ্টায় স্কুল-কলেজ গড়ে তুলবে। পরে সরকার তাতে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করবে। মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, স্কুল-কলেজ গড়ে তোলার মত কোন সামর্থ্যই ছিল না তাদের। বস্তুত সরকারের এ ধরনের শিক্ষা-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাসহ যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত রাখা।

হিন্দু জমিদার বা বিত্তশালীরা স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায়। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক জমিদার স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছেন পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু প্রধান এলাকায়। নোয়াখালীর জমিদার প্রতাপচন্দ্র সিংহ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন বীরভূমে। নিজের এলাকা মুসলমান প্রধান, কাজেই সেখানে কিছুই করার থাকতে পারে না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারসহ অন্যান্য অনেক জমিদার যাদের জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, তাঁরা বাস করতেন কলকাতায়। স্কুল-কলেজ গড়ে তুলেছেন কলকাতা বা পশ্চিম বংগের কোন জেলায়।[১]

কোম্পানী সরকারের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষানীতি ও হিন্দুদের বৈরী ভাবাপন্ন মানসিকতার দরুন শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছিয়ে পড়ল। ১৮৪১ সালে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,০৩৪ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ৩,১৮৮ জন ও মুসলমান মাত্র ৭৫১ জন। আবার মুসলমান ছাত্রের অধিকাংশই ছিল কলিকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী মাদ্রাসার। সে সময় পূর্ব বঙ্গে কোন কলেজই ছিল না। ১৮৪৬ সালে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,৫৩৭ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ৩,৮৪৬ জন এবং মুসলমান ৬০৬ জন। মুসলমান ছাত্রদের ২২৪

১. Muslim Society and politics in Bengal : M.A. Rahim, P.137.

জন কলিকাতা মাদ্রাসার ও ২২২ জন হুগলী মাদ্রাসার। ঢাকার স্কুল-কলেজের ২৬৩ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ জন। ১৮৫০-৫১ সালে ৪,৬৭৪ জন ছাত্রের মধ্যে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩,৮১৪ জন ও মুসলমান মাত্র ৭১৬ জন। ৪৩৩ জন ছিল কলিকাতা মাদ্রাসার ও ১৪৫ জন ছিল হুগলী মাদ্রাসার। হুগলী কলেজে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৬ জন ও হিন্দু ৩৮৯ জন। ঢাকার স্কুল-কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যার ৩৮৩ জন হিন্দু আর মুসলমান ছিল মাত্র ২৯ জন। ১৮৫৫-৫৬ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়,—মোট ছাত্রসংখ্যার ৭,২১৬ জন ছিল হিন্দু ও ৭৩১ জন ছিল মুসলমান। ঢাকার স্কুল-কলেজের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ৪৫৫ জন ও মুসলমান মাত্র ২৪ জন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়-- ১৮৬৫ সালে ৯ জন হিন্দু এম. এ পাস করে, মুসলমান একজনও নয়। বি. এ পাস করে হিন্দু ৪১ জন আর মুসলমান মাত্র ১ জন। আইন পরীক্ষা পাস করে ১৭ জন হিন্দু, মুসলমান একজনও নয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে পাসকৃত ছাত্র সংখ্যার সবাই ছিল হিন্দু।[১]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল একান্তভাবে অবহেলিত। গুটি কয়েক স্কুল-কলেজ ছিল সারা পূর্ব বঙ্গ জুড়ে। সমস্ত স্কুল-কলেজ কেন্দ্রভূত ছিল কলকাতা ও তার আশেপাশে। ১৯০৫ সালে ঢাকা, আসাম ও পূর্ববঙ্গের রাজধানী পরিগণিত হওয়ার পর থেকে পূর্ববঙ্গে শিক্ষার প্রসার আরম্ভ হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলার বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনায় অন্তরায় দেখা দেয়। ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। ঢাকার স্থানীয় মুসলমানদের আবেদনক্রমে তিনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করেন। নেতৃস্থানীয় হিন্দু জনসাধারণ পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতায় আন্দোলন শুরু করেন । তাদের

---

১. Indian Muslims: Ramgopal, p-35 (Quoted from Muslim Society and Politics in (Bengal).

যুক্তি ছিল,—এতে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা সাহিত্য দ্বিধাবিভক্ত হবে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব কমে যাবে। শহর, গ্রাম, গঞ্জে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে হিন্দুরা জোর আন্দোলন গড়ে তুললো। প্রতিবাদলিপি পাঠান হল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কাছে। রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি বড়লাটের সাথে এক সাক্ষাতকারে জানাল যে, ঢাকায় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা অর্থহীন। প্রয়োজন শুধু মুসলমানদের মধ্যে কিভাবে শিক্ষাবিস্তার ঘটে তার ব্যবস্থা করা। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা হল মূলত কৃষিজীবী। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাদের বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত হবে না।[১] বড়লাট জানালেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে শুধুমাত্র শিক্ষা-কেন্দ্রিক ও আবাসিক। একমাত্র হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার ফলেই বড়লাট এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হলেন।

এরপরও হিন্দুদের আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলিকাতার এক বিরাট জনসভায় তারা দাবী জানালো যে, একান্তই যদি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হয়, তবে তা হতে হবে এফিলেশান বর্জিত। মুসল-মানরা পাল্টা আন্দোলন শুরু করল। নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও শামসুল ওলামা আবু নাসের মোহাম্মদ ওয়াহিদ প্রমুখ নেতা দাবী জানালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই এফিলেটেড হতে হবে।

যা হোক, অনেক বাধা বিপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা পাকাপাকি হয়। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ থাকে। ১৯২০ সালে রাজকীয় ব্যবস্থা পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়। মিঃ ফিলিপ জে. হারগট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হলেন।

১৯২৯ সালের ২২শে আগস্ট মুসলমান ছাত্রদের ছাত্রাবাস সলিমুল্লাহ মুস-লিম হলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়।

---

১. An article—Establishment of Dhaka University : M.S. Khan.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও পরিচালকমন্ডলীর অধিকাংশ ছিল হিন্দু। ছাত্রসংখ্যাও ছিল মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার আমলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তি ও সুবিধার ব্যবস্থা করার পর থেকে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে পূর্ববাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে উন্নত হতে থাকে।

বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলিত থাকলেও পরবর্তীকালে সৈয়দ আহমদ, আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক চিন্তাভাবনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কৌতূহল সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পায়। ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি। পরে এর নামকরণ হয় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মাহামেডান এসোসিয়েশান। উল্লেখ্য যে, হিন্দুরা এই সমিতির সদস্য হতে পারত। শুধুমাত্র ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না তাদের। আবদুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ প্রচার অভিযান চালাতে থাকেন। নানা কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশের মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে থাকে। ১৮৮১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশের উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,৮৩১ জন। অন্যপক্ষে মাদ্রাজে ১৭৭, বোম্বায়ে ১১৮, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোতে একত্রে ৬৯৭ এবং পাঞ্জাবে ৯১। এ ছাড়া ১৮৫৮-৯৩ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৯০ জন, বোম্বাই থেকে ৩০ জন, পাঞ্জাব থেকে ১০২ ও এলাহাবাদ থেকে ১০২ জন ছাত্র গ্রাজুয়েট হন। অর্থাৎ সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসল-মানরা ছিল পিছিয়ে। আবার বাংলাদেশের চাইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানরা ছিল অনেক বেশী পিছিয়ে।

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন প্রখর মেধাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। নিজের চেষ্টা ও গুণে তিনি হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। তিনি আবদুল লতিফের সাথে ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের মাধ্যমে শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দো-

লন শুরু করেন। তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের প্রতি। আমীর আলী ও আবদুল লতিফের আন্দোলন ছিল একটা সীমাবদ্ধ গন্ডীতে আবদ্ধ। তাঁরা অধঃপতিত মুসলমানদের মতিগতি ফিরাতে সক্ষম হয়েছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু সমাজচিত্তে আমূল পরিবর্তনের বৈপ্লবিক বীজ বপন করতে পারেননি।১

সৈয়দ আহমদ ভেবেছিলেন ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তার কথা, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তিনি মোটেই গুরুত্ব দেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রধানত দুটিঃ একদিকে বৃটিশ সরকার ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে মুসলিম মানসে ঔৎসুক্য ও পক্ষপাত জাগানো। তিনি ইংরেজদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, মুসলমানরা ইংরেজদের শত্রু নয়, বরং তারা ইংরেজদের সহায় হতে ইচ্ছুক। অপরদিকে মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা অর্জনের উপরই মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সৈয়দ আহমদ ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। ১৮৮৪ সালে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ

> Remember that worlds Hindu and Mahomedan are only meant for religious distinction— otherwise all persons, whether Hindu or Mahomedan, even the Christians who reside in the country, are all in this particular respect belonging to one and the same nation.

যেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের বাদ দিয়ে উন্নতির নবদিগন্তে যাত্রার আয়োজন করছে, হিন্দু নেতারা শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এক নতুন মহান জাতি গঠনের কল্পনায় উদ্দীপিত, সেখানে সৈয়দ আহমদের এ ধরনের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃতই অনন্য।

১৮৭৭ সালে তাঁর প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মনির্বিশেষে অনেকের কাছ থেকে

---

১. উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারাঃ ডঃ ওয়াকিল আহামদ, পৃঃ ৭৮-৭৯।

সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের দ্বার প্রথম থেকেই সকল জাতীয় ছাত্রের জন্য ছিল অবারিত। অথচ হিন্দু কলেজের দ্বার শুধু মুসলমান নয়, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের জন্যও রুদ্ধ ছিল! একথা সত্য যে, এক সময় তিনি নানা কারণে ইংরেজ সরকারের মন রক্ষা করে তোষণনীতি অনুসরণ করেছিলেন শুধুমাত্র অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিকল্পে আলীগড় কলেজ স্থাপন-কালে সৈয়দ আহমদের ইংরেজ-প্রীতি আরও প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিল।

যা হোক, আবদুল লতিফ, আমীর আলী, সৈয়দ আহমদ ও অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টায় মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহুলাংশে উন্নতি ঘটে। ধর্মীয় শিক্ষার মাদ্রাসাগুলোকে আধুনিকীকরণ করে তাতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মহসীন ফান্ডের টাকায় ১৮৭৪ সালে রাজশাহী ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা খোলা হয় এবং তাতে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হয়। সরকার পরি-কল্পিত জেলা স্কুলগুলোতে আরবী ও ফার্সী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং স্কুল-কলেজের মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ ঐ ফান্ডের টাকা থেকে দেওয়ারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তা'ছাড়া মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন হওয়ায় সরকার মুসলমানদের মধ্যে কিভাবে শিক্ষার হার বাড়ানো যায়— তারই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হন। ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় খোলা হল এফ. এ. ক্লাস এবং ১৮৮৮ সালে প্রেসি-ডেন্সী কলেজের সাথে উক্ত বিভাগ যুক্ত করা হয়, যার ফলে মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রেসিডেন্সীতে ক্লাস করার সুযোগ পায়।[১] হান্টার কমিশনের সামনে মুসলমান-দের দুরবস্থা, কুশিক্ষা ও কলিকাতা মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেন এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতার মাদ্রাসার প্রতি সরকারের ক্রমাগত উপেক্ষার ফলে মুসলমান

---

১. Report o fthe Indian Education Commmission-1883 : Hunter

ছাত্রদের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে হয়েছে। এদের প্রায় শতকরা ৮০ জনই ছিল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত।

মুসলমানদের মধ্যে যাতে করে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার সুপারিশে হান্টার বলেছেন— 'সরকারী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং অল্প বেতনে মুসলমান শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত পঞ্চাশটি সস্তা স্কুল এক পুরুষের মধ্যেই পূর্ব বাংলার জনমতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এ ব্যবস্থার ফলে শুধুমাত্র কৃষক সন্তানদের উপকার হবে না, মুসলমান শিক্ষকদেরও যথেষ্ট উপকার হবে। মুসলমান শিক্ষকদের জীবিকার ব্যবস্থা বর্তমানে খুবই শোচনীয়। কিন্তু সরকারী তহবিল থেকে অতিরিক্ত মাত্র পাঁচ শিলিং করে ফেলে, তা তাদের স্বাধীনভাবে ভাগ্যোন্নতির পথ খুলে দেবে। এর ফলে এমন একটা শ্রেণীকে আমরা আমাদের সাথে পেয়ে যাব, যারা বর্তমানে আমাদের ঘোর বিরোধিতা করে বেড়াচ্ছে।'১

এ ব্যাপারে সরকার এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, পাঁচ মাইলের মধ্যে দুটি স্কুল থাকলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে কমিশনের সামনে হান্টারের সুপারিশ, "সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন যে, পাঁচ মাইলের মধ্যে দুটি স্কুলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে না, কারণ তাহলে সরকারী অর্থের বিনিময়ে বেহুদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। অন্য সমস্ত ব্যাপারের মত এই ব্যাপারেও চতুর হিন্দুরা আগে মাঠে নেমেছে। তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাবার মত সারাদেশে স্কুল গড়ে তুলেছে। কিন্তু তাদের স্কুল মুসলমানদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

সুতরাং পাশে স্কুল থাকলেও মুসলমানরা যাতে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার অসুবিধার জন্য পাঁচ মাইলের নিয়ম শিথিল করতে হবে।২ স্যার আজিজুল হক হাণ্টারের ১৭ দফা সুপারিশমালাকে

১. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানসঃ হান্টার (অনুবাদ, বাংলা একাডেমী), পৃঃ ১৮২।
২. দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানসঃ হাণ্টার (অনুবাদ), পৃঃ ১৮১।

বাংলার মুসলমানের শিক্ষা অধিকারের সনদ বলে উল্লেখ করেন।১

মুসলমান নেতৃবৃন্দের আন্দোলন ও প্রচেষ্টা, সরকারের সহযোগিতা ও শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের মত পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের শিক্ষার অচল অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষার হার সন্তোষজনক না হলেও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। স্যার আজিজুল হক ১৮৮১-৮২ সালের শিক্ষা-বর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্রে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ও হারের নিম্নরূপ তালিকা প্রদান করেনঃ২

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | মোট ছাত্রসংখ্যা | মুসলমান ছাত্র | হার |
|---|---|---|---|
| ইংরাজী কলেজ— | ২,৭৩৮ | ১০৬ | ৩.৮ |
| প্রাচ্য কলেজ— | ১,০৮৯ | ১,০৮৮ | ৯৯.১ |
| উচ্চ বিদ্যালয়— | ৪৩,৭৪৭ | ৩,৮৩১ | ৮.৭ |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয়— | ৩৭,৯৫৯ | ৫,০৩২ | ১৩.২ |
| দেশীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়— | ৫৬,৪৪১ | ৭,৭৩৫ | ১৩.৭ |
| দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮,৮০,৯৩৭ | ২১,৭২১৬ | ২৪.৬ |
| উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়— | ১৮৪ | — | — |
| মাধ্যমিক ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়— | ৩৪০ | ৬ | ১.১ |
| দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়— | ৫২৭ | ৬ | ১.১ |
| দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়— | ১৭,৪৫২ | ১,৫৭০ | ৮.৯ |
| শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র (নর্মাল স্কুল)— | ১,০০৭ | ৫৫ | ৫.৫ |
| শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণ কেন্দ্র— | ৪১ | — | — |
| অপরিদর্শিত বেসরকারী বিদ্যালয়— | ৫৭,৩০৫ | ২৫,২৪৪ | ৪৪.৩ |

১৮৭১ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ২৮,১৪৮ (১৪.৪%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮২ সালে ২,৬১,১০৮ (২৩%) জনে দাঁড়ায়।৩

১. মুসলমান বাংলার শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যাঃ আজিজুল হক (অনুবাদ, বাংলা একাডেমী), পৃঃ ৪০।
২. ঐঃ পৃঃ ৩৭-৩৮।
৩. মুসলিম বাংলার শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, পৃঃ ৩৮।

১৮৯০-৯১ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩,৩৬,৮৮৬ জন। তন্মধ্যে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,২৮,৬৪৯ (২৪.৫%) জন।[১] ১৮৮৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের অবস্থা কিরূপ ছিল তা নীচের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে বোঝা যায়ঃ[২]

| বৎসর | এম.এ. | বি.এ. (অনার্স | বি.এ. (পাস) | বি.এল. | এফ.এ/ আইএ | এন্ট্রান্স |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৮৫ | ১ | ১ | ৯ | ৩ | ১২ | ৪৪ |
| ১৮৮৬ | ২ | ১৩ | ২৬ | ৯ | — | — |
| ১৮৮৭ | ৩ | ১১ | ২১ | ৪ | ৩১ | ৫১ |
| ১৮৮৮ | ২ | ৫ | ১৬ | ৬ | ১৯ | ১১৩ |
| ১৮৮৯ | ৩ | ৭ | ২৩ | ৩ | — | ৫৪ |
| ১৮৯০ | ২ | ৬ | ২২ | ৮ | ৫৭ | ১২৫ |
| ১৮৯১ | ২ | ৬ | ১২ | ১২ | ১৬ | ১১০ |
| ১৮৯২ | ৪ | ৭ | ১৫ | ৮ | ৪৭ | ৮৫ |
| ১৮৯৩ | — | ৬ | ২৪ | ৩ | ৩৫ | ১৭২ |
| ১৮৯৪ | ৪ | ৮ | ২৭ | ৩ | ৩১ | ১৩৪ |
| ১৮৯৫ | ৪ | ৫ | ২৩ | ২ | ৫৯ | ১৫৩ |
| ১৮৯৬ | ২ | ৫ | ২১ | ১৫ | ৫৩ | ১৪১ |
| ১৮৯৭ | ৩ | ৪ | ১২ | ১২ | ৫২ | ২৪১ |
| ১৮৯৮ | ৩ | ৮ | ২২ | ৬ | ৬৬ | ১৭৮ |
| ১৮৯৯ | ৩ | ৮ | ২৮ | ৭ | ৬৮ | ২০৩ |
| ১৯০০ | ৫ | ৯ | ৩১ | ৬ | ৫৯ | ২৫১ |

কোম্পানী সরকারের অসহযোগিতা, হিন্দুদের সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের ক্রমাগত উন্নতি তাদের মনোবল ও বলিষ্ঠ ঈমানের পরিচয় প্রদান করে।

বলা বাহুল্য, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস। কঠোর বঞ্চনার ইতিহাস।

---

১. Mohammedan Education in Bengal : A. Karim B. A. (Assistant School Inspector). Appendix.

২. উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারাঃ ডঃ ওয়াকিল আহামদ, পৃঃ ৬৫।

## হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

নির্দিষ্ট সন তারিখ দিতে না পারলেও ইতিহাস পাঠে অনুমান করা যায়, হিজরী প্রথম শতক থেকেই বণিকবেশী আরবী মুসলমানরা এই উপমহাদেশে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছিল। মুসলমানদের এই আবির্ভাব আকস্মিক বা নতুন কিছু নয়। মুসলমানদের আগে আর্য, সক, হুন, গ্রীক-কুষাণ প্রভৃতি বহু জাতি ভারতের সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। স্বল্পকাল অবস্থানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, হানাহানি কাটাকাটি বা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদেশের মাটিতে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি কেউ।

বহিরাগত মুসলমানরা এদেশে কেবল বাণিজ্য, লুণ্ঠন ও বিজয় অভিযানের অধিকার নিয়ে আসেনি। তারা এসেছিল উদার মানবিক ধর্মে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের তাগিদে। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোন প্রয়াস ছিল না সেখানে। ইসলাম উদার মানবতাবাদী সাম্যবাদের ধর্ম। "ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়। তা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হওয়ার স্পর্ধা রাখে।"[১] তাই তারা এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে এই দেশের মাটিকে নিজের বলে ভাবতে শিখেছিল। বৃটিশের মত এ দেশকে কলোনী করে এ দেশের শাসক সাজেনি। এ দেশকে নিজের দেশ মনে করেই এ দেশের বুকে শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, আর এটা সম্ভব করেছিল ইসলামের দেশ-কাল সীমানিরপেক্ষ বর্ণহীন শ্রেণীহীন উদার মানবতাবাদ। অপরদিকে হিন্দু ধর্মের মূলভিত্তি আচার-বিচার অনুশাসন আর জাতিভেদের নীতির উপর। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে গোপাল হালদার বলছেন "...পূর্বাপর হিন্দু সংস্কৃতির বুনিয়াদ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ......হিন্দুর সমস্ত দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এই বৈষম্যবাদের দ্বারা জর্জরিত। দেখতে পাই— এই হিন্দু সংস্কৃতির চোখে সমাজের উৎপাদক শ্রেণীর

---

১. সংস্কৃতির রূপান্তরঃ গোপাল হালদার, পৃঃ ১৯৫।

স্থান কত নীচে। তারা থাকল শূদ্র ও অন্ত্যজ হয়ে, মানুষের অধিকার হতে তারা সর্বতোভাবেই বঞ্চিত হয়ে থাকল, প্রায় তেমনি বঞ্চিত হয়ে থাকল স্ত্রীজাতি।"১

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্থানে বলেছেন, "মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানদের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আচারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুদের যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।"২

হিন্দু-মুসলমানের মূল দ্বন্দ্ব বোধ হয় এখানেই। একটা সাম্যবাদী ও উদার ধর্মের সাথে আরেকটা অনুদার এবং সীমাবদ্ধ গন্ডির আবর্তে নিমজ্জিত ধর্মের সর্বাঙ্গীন মিল ঘটতে পারে না। তাই "হিন্দু বৈশিষ্ট্য ও মুসলিম বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ সমন্বয় মধ্যযুগে পাঁচশ' বছরেও ঘটে ওঠেনি। তারপর আধুনিক যুগের দুশ' বছরে তৃতীয় পক্ষের চক্রান্তের জন্যে সেই সমম্বয়ের সম্ভাবনা নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, মুসলমান মধ্যপ্রাচ্যের কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিনিধি হয়ে এদেশে আসেনি। স্বদেশের সঙ্গে বিশেষ কোন যোগসূত্র রাখেনি, ভারতে ও বাংলার মাটিতে সে দেশীয় আবহাওয়ার মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে। বিবাহ বা ধর্মান্তর গ্রহণের সূত্রে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের রক্তের সম্পর্ক অক্ষুন্ন রয়েছে। পার্থক্য আছে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথায়। কিন্তু সারা মধ্যযুগে এসব ব্যাপারেও প্রচুর সমন্বয় ঘটেছিল। এছাড়া জল, মাটি, সাহচর্য, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, দেশজ (সাম্প্রদায়িক নয়) প্রথা ইত্যাদির ফলে মনে ও জীবনযাত্রায় পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশী।"৩

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এ সত্য স্পষ্ট যে, বহির্দেশ থেকে মুসলমানদের এদেশে আগমন ঘটলেও ক্রমান্বয়ে মুসলমানরা ঐ দেশকে নিজের দেশ বলে মনে

---

১. সংস্কৃতির রূপান্তর : গোপাল হালদার, পৃঃ ১৬১।
২. কালান্তর— হিন্দু-মুসলমান: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খন্ড, পৃঃ ৩৭৬।
৩. বাঙ্গালী : প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ২১।

করে। দেশ বিজয় করে তারা দূরে সরে থাকেনি, এদেশে বসতি স্থাপন করে এদেশের সন্তানে পরিণত হয়। অন্যদিকে ধর্মান্তরিত এ দেশীয় মুসলমান ও বহির্দেশীয় মুসলমানের মধ্যে একটা রক্ত-সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা এদেশের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে পরিণত হয়। অথচ গোপাল হালদার তাঁর সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে আক্ষেপ করে বলেছেন যে, মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা ভারতে থেকেও 'ইন্ডিয়ান ফার্স্ট' হতে পারেনি। মুসলমানরা এদেশে বাস করেও চেয়ে থাকে মক্কা মদীনার দিকে। তারা স্মরণ করে তাদের স্বপ্নের স্বদেশের কথা।১

ইসলামের মর্মাদর্শ ও মুসলিম শাসনের ইতিহাস জেনেও গোপাল হালদার এ ধরনের উক্তি কেন করলেন বোঝা কঠিন। মুসলমানরা সাত শতাব্দী ধরে যে মাটির অধিবাসী সে মাটিকে তারা আপন ভাবতে পারেনি এমন মনগড়া কথা বলার পূর্বে আরও গভীরভাবে বিষয়টি তাঁর বিবেচনা করা উচিত ছিল। মুসলমানদের কিবলা শরীফ কা'বা এবং তাদের ধর্মগুরু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ হেতু আরবের প্রতি মুসলমানদের একটা হৃদয়ের টান আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, উপমহাদেশের মাটিকে সে নিজের দেশ মনে করে না। নিম্নে গোপাল হালদারের উদ্ধৃত উক্তিই প্রমাণ করে যে, মুসলমান ঐ ধরনের সংকীর্ণ ভাবনার শিকার হতে পারে না।

"ইসলামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্য দৃষ্টির কাছে ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরাজয় ঘটলো। এ পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদার নীতি ও আত্মসচেতনতার কাছে। তাই যথেষ্ট ঘৃণা ও অবজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের প্রভাব ও সংমিশ্রণ এড়িয়ে যেতে পারলো না। হিন্দুদের প্রবল অসহযোগিতায় ইসলামের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো না। তারা ভারতীয় জনগণকে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করলো না বা বিজয়ী হয়ে দর্পভরে কারও প্রতি অত্যাচার করলো না। কারণ, ইসলাম কোন জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। ইহা অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টেনে নেয়।"২

---

১. সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ গোপল হালদার, পৃঃ ১৯৫।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৬।

যারা এতদিন হিন্দুধর্মের অনুদার নীতির চাপে পড়ে অনবরত অত্যাচার, অবিচার ও অবহেলা লক্ষ্য করে আসছিল, সমাজের বুকে নিকৃষ্ট অধঃপতিত শূদ্র বলে অবজ্ঞার পাত্র ছিল, তাদের কাছে ইসলাম ধর্ম পরম পরিত্রাণের পথ বলে পরিগণিত হল। তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তো হিন্দুদের উপর ক্রুদ্ধ মনোভাব নিয়েই ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। যারা ধর্মান্তরিত হলো না তাদের প্রতি ইসলামের ঘৃণা বা অত্যাচার ছিল না।

পাঠান-মোগল আমল থেকেই বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবের বিনিময় ছিল। অবস্থাপন্ন হিন্দুরা আদব-কায়দা ও পোশাক-পরিচ্ছদে মুসলমানদের অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। ধর্মমত আলাদা হলেও ব্যবহারে মিল ছিল, ভাবের বিনিময় ছিল, অনেক ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। "অত্যাচারী দুশ্চরিত্র, বিলাসী ও রূঢ় জমিদার বা নবাব তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বহু ছিলেন। এ সনাতন ব্যাপার, সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য নয়।"১

অবশ্য একথা সত্য যে, প্রভাবশালী হিন্দুদের মনে অসন্তোষ ছিল, হয়তবা প্রচন্ড ঘৃণাও ছিল মুসলমানদের প্রতি। তারা সহজে স্বীকার করে নিতে পারলো না ইসলামের বলিষ্ঠতা, গণতান্ত্রিক সাম্যবোধ এবং বিশ্বাসের অভিনবত্বকে। চিরকালের সংস্কার ও বিশ্বাস ছাড়িয়ে উন্নততর চিন্তার প্রয়াসী হতে পারেনি তারা। কিন্তু ইসলামের উদার নীতির সহযোগিতায় তাদের উগ্রতা ও বৈরীভাব প্রমাণিত হয়েছে। স্বধর্মী না হলেও সহকর্মী হয়েছে। উভয়ের কর্ম মিলনে একটা যৌথ লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠলো। ভারতীয় হিন্দু-জীবন ও শিল্পধারার সাথে মুসলমানী শিল্পকলা ও জীবন-যাত্রার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হল। যার ফলে "মুসলিম রাজ্যের উযীর, কাযী, মুন্শী প্রভৃতি নাম ও পদবী এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ফারসী ভাষাই ক্রমে দেশীয় শাসনের ধারা হয়ে ওঠে। হিন্দু রাজ্যেও তা গৃহীত হয়। ঠিক এভাবে রাজপুরুষ ও অভিজাতদের আদব-কায়দা

১. বাঙ্গালীঃ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ১৫।

খেতাব-খেলাৎ, উর্দী-কুর্তা প্রভৃতি মুসলমানদের নিকট হতে ভারতবাসী লাভ করলো। উহা আজও ভারতে হিন্দু-মুসলমান সবার দরবারী পোশাক ও কায়দা কানুন। এ দুদিক দিয়েই তারা ভারতীয় ঐক্যের রূপকে পুষ্ট করে তোসেন।"[১] বলা বাহুল্য, মুসলমানরা এদেশে আসাতে ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নতি ঘটে, জন-জীবনের রুচি পরিবর্তিত হয়। ভারতীয় সমাজ অগ্রসর হয় সংস্কারমুক্ত এক নতুন সভ্যতার দিকে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মুসলমান আমলেই দেশীয় ভাষাগুলো পুষ্টিলাভ করেছিল। এদেশের জন-জীবনের সাথে মিশে যাওয়ার প্রত্যাশায় মুসলমানরা দেশীয় কাহিনী ও কাব্য-গান শুনতো। এসব কাহিনী ও গানের মর্মার্থ উপলব্ধি করার ইচ্ছায় দেশীয় ভাষা শিখলো। উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হল। দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো। "বাংলায় এর প্রমাণ—লস্কর পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর বাংলা মহাভারত লেখানো। বস্তুত হুসেন শাহের সভাতেই বাংলা কাব্যের পুষ্টি। বাংলার আমলা মুনশী প্রভৃতি ফার্সী জানা কায়স্থ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের তাহা জন্মক্ষণ।"[২]

লোক-সংস্কৃতিতে মুসলমানদের দান যে অসামান্য গোপাল হালদার তা স্বীকার করেছেন, "লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান কতভাবে জমা হইতেছিল তাহার ঠিকানা নাই। যেমন, হিন্দুরাজ্য ও রাজ-কর্মচারীর শাসন বিচার সবই ধীরে ধীরে মুসলমানী রূপ গ্রহণ করিল। শহরে, বাজারে ও সওদাগরী দোকানপত্রে মুসলমানী দান বাড়িয়া উঠিল। কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর কেতাবের কদর বাড়িল। খানাপিনায় নূতন বিলাসিতা দেখা দিল। মুসলিম হেকিম ও মুসাফিরেরা সমাদৃত হইল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরের মুসলমান যুগে—মধ্যযুগের এই দ্বিতীয়ার্ধে এই সব লৌকিক পরিবর্তন ছাড়াও ভারতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় চেতনাও পরোক্ষভাবে জন্মাইতেছিল।"[৩]

---

১. সংস্কৃতির রূপান্তরঃ গোপাল হালদার, পৃঃ ২০০।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৮।
মধ্যযুগের পাক-ভারতীয় সংস্কৃতিঃ ডক্টর ইউসুফ হোসেন, পৃঃ ১০৫।
৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৯-২০০।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে মুসলমানদের দান নিয়ে আলোচনার অবতারণা করার উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই যে, যে দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব ছিল, ধর্মীয় মিল না থাকলেও ভাবের গরমিল ছিল না, ইংরেজ আমলে হঠাৎ সেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এতটা বৈরীভাব সৃষ্টির মূল কারণ কোথায়? মুসলমানেরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করলো, মিশে গেল এদেশের আবহাওয়া ও মাটির সাথে। সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নতি বিধান করলো। হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। আজ কয়েকশ' বছর পর যখন মুসলমানরাই এদেশের খাঁটি বাঙালী বলে প্রতিপন্ন তখন এ প্রশ্ন কি করে উঠতে পারে যে, মুসলমানরা এদেশে বাস করেও সুদূর আরবের দিকে চেয়ে থাকে। বরং উল্টোভাবে একথা বলা চলে যে, হিন্দুরা বহু বছর এদেশে মুসলমানদের সাথে একত্রে বাস করেও মুসলমানদের আপন ভাবতে পারেনি। বারবার খোঁচা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে— তোমরা তো বাঙালী নও, মুসলমান। তাই হয়ত এক সময় বাঙালী অর্থে 'হিন্দু' বোঝাতো। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একথা সত্য যে, ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের মূল কারণ—বহু বছর একত্রে পাশাপাশি বাস করেও হেয় থাকার ক্ষোভ, মার খাওয়ার লাঞ্ছনা। স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় পালিত হিন্দু জমিদার-মহাজন শ্রেণী দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানদের উপর ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎপীড়নের যে স্টীম রোলার চালিয়েছিল, তারই ভয়াবহ আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে মুসলমানরা আলাদা হয়ে যাওয়ার দাবী তুলেছিল।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ

"আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তার বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম 'এ কেন' তখন জবাব পেলেম, যে সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে,

জাজিম পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে।' তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নূতন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্তবড় ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোট নয়। ওখানে অকূল অতল কালা-পানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই ওটা পার হওয়া যায় না।"[১]

এভাবে হিন্দুরা চিরদিনই তাদের আচার-ব্যবহার ও ভেদ-বুদ্ধি দিয়ে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে 'আমরা পৃথক'। বলা বাহুল্য হিন্দুদের এ ভেদবুদ্ধি-গুণেই মুসলমানরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে পারেনি। পরবর্তীকালে তা পৃথক হওয়ার দাবী তুলতেও বাধ্য করেছিল।

বস্তুত বাংলাদেশ ও বিহারের জমিদার-মহাজন শ্রেণী ছিল প্রধানত হিন্দু এবং কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। তাই এদেশের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কৃষক-বিদ্রোহই হিন্দু জমিদার-মহাজনদের চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে আখ্যায়িত হয়েছে এবং এদেশের সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হয় মূলত তখন থেকেই।[২] হিন্দু-জমিদার-মহাজনদের দৃষ্টিতে মুসলমান রায়ত-প্রজা ছিল অস্পৃশ্য অমানুষ। ইংরেজ জমিদারতন্ত্রের আওতায় মুসলমান সম্ভ্রান্ত-দেরও স্থান ছিল না। শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিল পিছিয়ে, তাই রাষ্ট্রীয় জীবনেও ছিল আপাঙক্তেয়।

বাংলাদেশের কৃষকদের বিক্ষোভ ও দুর্দশার ইতিহাস, ফরাজী আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন, ফকীর বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের মহা-বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের মূল কথা জানতে হলে সবার আগে জানতে হবে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসল-মানদের পিছিয়ে পড়ার মধ্যে যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল, তার ইতিহাস।

পূর্বেই বলা হয়েছে—মোগল-পাঠান আমল থেকেই বাংলাদেশ তথা ভারতের

---

১. কালান্তর—স্বামী শ্রদ্ধানন্দঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫।

২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২২০।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবের বিনিময় ছিল। ধর্মীয় মিল না থাকলেও সামাজিক জীবনযাত্রায় গরমিল ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের এ সহজ জীবনযাত্রা জটিল হয়ে উঠলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে হাতে খড়ি পাওয়ার পর থেকে। পলাশী যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে তার আভাস সুস্পষ্ট। কোম্পানী শাসনের পর থেকে এ বিভেদ আরও প্রকট আকার ধারণ করলো, মুসলমান সামন্ত সম্প্রদায় তাদের বহু দিনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হারিয়ে ইংরেজদের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতে থাকল। সাধারণ কৃষক শ্রেণীভুক্ত যারা তাদেরও একটা প্রচন্ড ঘৃণা ছিল ইংরেজদের প্রতি। ইংরেজ রাজশক্তির সাথে কোন প্রকার আপোষমূলক ভাব বিনিময়ে রাযী হলো না তারা। তাই রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বড় দুঃখ করে বলেছিলেন, "মহা-রাণীর শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কি মুসলমান ধর্মের অনুশাসন?"১ অথচ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম থেকেই ইংরেজদের দালাল বেনিয়ন মুন্‌শী মুৎসুদ্দিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। অতি সহজে তারা ভূমি ব্যবস্থা, শাসনকার্য ও শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুবিধাজনক স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। নবাবী কায়দা-কানুন বর্জন করে ইংরেজ আধিপত্য মেনে নিল অতি সহজে, বিনা দ্বিধায়।

কিন্তু হিন্দু কৃষক বা শ্রমজীবী শ্রেণী সমীকৃত হলো মুসলমানদের সাথে। তুর্ক বিজয়ের পর হিন্দুদের একটা অংশ শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ ভাজন হওয়ার তাগিদে এবং স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে সহজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তেমনি আবার পলাশীর বিপর্যয়ের পর হিন্দুদের আরেকটা অংশ শাসক-সাহ-চর্যে এসে নিজেদের বৈষয়িক সৌভাগ্য গড়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদেরকে সে সৌভাগ্য গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করে দেয়।২

ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানীর শাসন, শোষণ আর উৎপীড়নে সাধারণ মুসল-মানদের মনে উদ্রেক হল প্রচণ্ড ঘৃণা। ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা কাজ করতে থাকল বিদ্রোহী মনে। "আমরা আর রাজার জাত নই—"

---

১. The Indian Musalmans : W. W. Hunter, preface.

২. ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৪৪।

এমনি একটা ভাবতেই তাদের মনে জেগে ওঠে হতাশার ভাব। তাই বাঙালী মুসলমানরা কেউ প্রকাশ্যে, কেউ-বা গোপনে, কেউ-বা সক্রিয়ভাবে, কেউ-বা গোপনে কোম্পানী শাসনের বিরোধী ছিল।[১] দালালী মোসাহেবীর জোরে এবং ইংরেজী শিক্ষার গুণে হিন্দুরা অতি সহজে হয়ে উঠলো ইংরেজ শাসকদের প্রিয়ভাজন। লুপ্ত গৌরব-গরিমা ফিরে পাওয়ার সুপ্ত আশা নিয়ে মুসলমানরা থাকল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে।

১৭৯৩ সালের জমিদার প্রথার আওতায় মধ্যস্বত্ব লাভেও মুসলমানরা পিছিয়ে থাকল। বাংলার মুসলমানদের অধিকৃত জমিদারী ইংরেজ পাদ্রীদের সুপারিশের ফলে বন্টন করে দেওয়া হলো হিন্দু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে। ফলে দেশের বুকে জমিদার মাত্রই হিন্দু। ১৮২৮ সালের লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত নীতির ফলে মুসলমানদের লাখেরাজ জায়েদাদ বলতে কিছুই থাকলো না।[২]

বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকার মূল কারণ, প্রথমত তারা ছিল শোষিত শ্রেণীর লোক। তাই বরাবরই তারা দরিদ্র। যে দু'চারজন অবস্থাশালী (নবাব, আমির-উমরা) ছিলেন, তাঁরা ছিলেন মূলত বিলাসপ্রিয় আধুনিক শিক্ষার প্রতি একান্তভাবে উদাসীন। দ্বিতীয়ত বাংলার মুসলমানরা ছিল মূলত গ্রামবাসী। স্কুল-কলেজ ছিল শহরে এবং সে শিক্ষা ছিল বিশেষভাবে ব্যয়বহুল। কাজেই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। তৃতীয়ত, ইংরেজ জাতির প্রতি প্রচন্ড ঘৃণাবোধ বিধর্মী ইংরেজদের প্রভু হিসাবে মেনে নিতে পারলো না তারা।

প্রাথমিক অবস্থায় ইংরেজ কোম্পানী সরকারী শাসনকার্যের সুবিধার্থে ইংলন্ড থেকে আমদানী করলো কিছু সংখ্যক কেরানী (writer). পরে অনেক হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেল ইংলন্ড থেকে কেরানী আমদানী বেশ ব্যয়বহুল। খরচ কমাবার উদ্দেশ্যেই এদেশে কেরানী তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। এ কেরানী সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই এদেশের বুকে ইংরেজী শিক্ষায় প্রচলন ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল-কলেজ। কিন্তু ইংরেজী শাসকরা চিরস্থায়ী প্রথা প্রচলনের উদ্দেশ্যের আলোকে ইংরেজী শিক্ষাকে বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ

---

১. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ঃ গোপাল হালদার।

২. শহীদ তিতুমীর ঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৫।

রাখার পক্ষপাতী। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হল। ফলে ইংরেজী শিক্ষার পরিপূর্ণ সুবিধা ভোগ করতে থাকলো জমিদার ও ধনী মধ্য শ্রেণীর ব্যক্তিরা। কৃষিজীবী মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, কুমোর, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি স্বভাবতই গরীব। তারা বঞ্চিত হল এ আধুনিক ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে। ইংরেজী শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার এটা অন্যতম কারণ।

মুসলমানদের এ পিছিয়ে পড়ার সুযোগে হিন্দু সমাজ এগিয়ে গেল অনেকখানি, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য প্রবল হয়ে উঠলো। দেশের প্রায় সব জমিদার মহাজন হিন্দু, শাসক ইংরেজ। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করলো হিন্দু বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত শ্রেণী। তাতে সহায়তা করলো স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসক। স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকে মুসলিম ভাবধারাবাহী রচনা বর্জন করে তাতে সমাবেশ ঘটানো হলো হিন্দু সংস্কৃতি ভাবাপন্ন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের।[১] হিন্দু ঐতিহাসিকরা মুসলিম চরিত্রগুলো হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের সুবিধামত ইতিহাস রচনার সুযোগ গ্রহণ করলেন। ফলে ইংরেজ শাসক ও হিন্দু জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার চরমে উঠলো। আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার জন্যে ইংরেজ-ভেদ-নীতি বহুলাংশে দায়ী।

মোটকথা হিন্দু জমিদার, মহাজন ও বুদ্ধিজীবী মধ্যশ্রেণী ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় সমাজের বিশেষ সুবিধাবাদী সম্প্রদায়রূপে চিহ্নিত হল। তাদের আধিপত্য ছড়িয়ে পড়লো সমাজের সর্বস্তরে। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, নায়েব, গোমস্তারূপে তারাই সামাজিক আধিপত্য হাতের মুঠোয় পুরে রাখল। গ্রাম্য মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা তখনও পড়ে থাকল মানসিক বিপর্যয়ের অস্থিরতায়। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জড়িয়ে তারা পরিণত হল সমাজের নিকৃষ্ট জীবরূপে।

এ সময় কৃষক বলতে বোঝাতো একমাত্র মুসলমানদের। অবশ্য ইতিমধ্যে এক

---

১. শহীদ তিতুমীরঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৮।

শ্রেণীর মুসলমান তাঁতীরূপে পরিগণিত হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা কৃষি ছাড়া আরও বহু পেশায় অভ্যস্ত ছিল— কাঠমিস্ত্রী, কুমোর, নাপিত, জেলে, গোয়ালা ও ধোপা বলতে কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বোঝাতো।

দেশীয় ব্যবসায়ী, জমিদার, মহাজন ও পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের নিয়ে গড়ে উঠলো হিন্দু বাবু সম্প্রদায়। এই বাবু সম্প্রদায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানানো তো দূরের কথা, সহ্যও করতে পারেনি।

তাই ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় বাবুদের মনোভাবকে কটাক্ষ করে রংপুরের রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত জাগের গানে বলা হয়েছে—

রাজবংশী মুসলমান গেলা ইংরেজ মারিবার
বাবুগণ আসিল তার মজা দেখিবার।

প্রকৃতপক্ষে ১৬৯০ সালে জব চার্নক যখন হুগলী নদীর উজান বেয়ে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধলেন, তখন থেকেই হিন্দু ব্যবসায়ীদের সাথে ইংরেজদের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে সেই সম্পর্ক আস্তে আস্তে আরও জোরদার হতে থাকে। তাই তো দেখা যায়, ১৭৩৬ সাল থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে কোম্পানী কলকাতায় যে ৫২ জন স্থানীয় ব্যবসায়ী নিযুক্ত করেছিল তারা সবাই ছিল হিন্দু। ১৭৩৯ সালে কাশিম বাজারে কোম্পানী ২৫ জন ব্যবসায়ী নিযুক্ত করে, তারাও সবাই ছিল হিন্দু। কেবলমাত্র ঢাকাতে কোম্পানীর নিয়োগকৃত ১২ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে ২ জন ছিল মুসলমান।[১]

কোম্পানীর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত থেকে আরও এক শ্রেণীর হিন্দু লাভবান হয়েছিল তারা হলো বাটাদার (মহাজন) এবং ব্যাঙ্কার। ১৭১২ সালের দিকে কলকাতা বা অন্যান্য স্থানে কোম্পানীর ব্যাঙ্কাররা সবাই ছিল হিন্দু।[২] কলকাতার বাইরে যে সব মহাজন পোদ্দার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে তারাও সবাই ছিল হিন্দু। ইংরেজদের ক্ষমতার বিকাশ ও ব্যাপকতায় হিন্দুরা লাভবান হয়, আর ক্ষতি হয় মুসলমানদের।

---

১. বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমানঃ ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক, পৃঃ ৭০।
২. G.C. Sinha : Economics Annals of Bengal. 1927. P. 148.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বর্ণ হিন্দুদের একটা বিশেষ অংশ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশের সহযোগীরূপে পরিচিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু নবাগত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশের স্বার্থে নিজেদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের প্রতিফলন দেখতে পেল। এই নব্য আধুনিক সমাজকে আশ্রয় করেই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাগরণ সূচিত হয়।

অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার গ্রাম কেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তর জনসাধারণ অতি নির্মমভাবে আধুনিকতার এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ইতিহাসের প্রবাহ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই জনসাধারণ যে মুসলিম প্রধান সে কথা সর্বদায় মনে রাখা বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ ধর্মীয় উপকরণের বিচারে হিন্দুদের চাইতে মুসলমানরাই রইল ব্রিটিশের পরম শত্রু হিসাবে।

ব্রিটিশের শিক্ষায় ও শক্তিতে অভিভূত, নিজেদের দুর্দশায় হীনমন্য ভারতীয়রা (হিন্দু অর্থে) সহসা আবিষ্কার করল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অতুলনীয় মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধি এবং দুর্বল ভারতীয়রা এক বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হলো। যদিও প্রাচীন ভারতীয়েরা হিন্দুদেরকে হিন্দু বলে ঘোষণা করেনি এবং প্রাচীনকালে হিন্দু কলেজ, হিন্দু-মেলা ইত্যাদির মতো হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শন, হিন্দু সমাজ বলে কোনও ধর্ম-দর্শন-সমাজের অস্তিত্ব ছিল না তবুও উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষের সমস্ত কিছুকেই হিন্দুত্বে চিহ্নিত করার রীতি প্রচলিত হয়।[১]

এরই পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী মহান ব্যক্তিরা হিন্দু জাতি প্রতিষ্ঠার সাধনায় আত্মনিয়োগ এবং পরজাতি-পীড়নকে বাস্তবসম্মত বলে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ কি ছিল দেখা যাক। ১৯০০ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেছেন, "আপনি যদি ভারতবর্ষে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলতে চান তাহলে আপনাকে ধর্মের ভাষায় কথা বলতে হবে।" অর্থাৎ ভারতে একমাত্র ধর্মের প্রচ্ছদেই রাজ-

১. ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

নীতি করা উচিত। ভারতীয় ধর্ম বলতে তিনি হিন্দু ধর্মকে বুঝাতে চেয়েছেন। অন্যত্র তিনি বাংলাদেশের যুবকদের আহবান জানিয়েছেন, "এস, আমাদের ধর্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য যাহা, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য, তাহারই ভিত্তিতে আমরা দন্ডায়মান হই।"— এখানে তিনি একান্তভাবে ভুলে গেছেন যে, অধিকাংশ বাঙ্গালীরই ধর্ম ইসলাম। ভারতের দ্বিতীয় সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতি মুসলমান।

আবার অন্যত্র বলেছেন, "হে বীর সাহস অবলম্বন কর। ...... সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারানসী ; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এই যে মন্ত্র এই স্বদেশ মন্ত্র, কোন অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভারতের অজস্র দেবদেবীকে কোন অহিন্দু বা মুসলমান ঈশ্বর বলে কল্পনা করতে পারে না। গৌরীনাথ কিংবা জগদম্বার কাছে কোন অহিন্দুর নিজেকে মানুষ করার জন্য প্রার্থনা করা সম্ভব নয়। এর অন্য কোন অর্থ বা তাৎপর্য আছে কিনা জানি না, তবে এই ধরনের স্বদেশমন্ত্র আক্ষরিক তাৎক্ষণিক অর্থে একান্তরূপে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দেরই স্বদেশমন্ত্র। এখানে অহিন্দুর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

"তিনি যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্র উপস্থাপন করেছেন, তখন তা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাদর্শে তথা হিন্দু ধর্মাদর্শে অলংকৃত হয়েই দেশবাসীর সকাশে উপস্থিত হয়েছে, যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভাষা, তাঁর বচনে ও রচনায় যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা বিশেষভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবন-যাত্রার অনুকূল পরিবেশ, তাঁর চিন্তার জগতে যেসব চিত্রকল্প ও প্রতীক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেসব হিন্দু ধর্মেরই চিত্রকল্প ও প্রতীক।"[১] তিনি দেশপ্রেমের কথাও

---

১. ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৮৬।

বলেছেন। মেথর, মুচি, চন্ডাল, সবাইকে তিনি স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার জন্যে আহবান জানিয়েছেন, কিন্তু মুসলমান বা খৃস্টধর্ম নিয়ে যারা ভারতে বাস করছেন, তাদের তিনি আহবান জানাননি। তাঁর তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলমান খৃস্টানের স্থান নেই। মোদ্দাকথা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মাঝখানে তিনি এক মহা প্রাচীর তুলে দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভের প্রয়াস পেয়েছেন। শুধুমাত্র বিবেকানন্দ নন, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাই হিন্দু সনাতন ধর্মের জাগরণ কামনা করেছেন, হিন্দু ধর্মের মহিমা কীর্তনে মগ্ন ছিলেন। হিন্দু কর্মবীর বা নেতাদের বক্তব্য বা ক্রিয়াকর্মে সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট না হলেও একই সামাজিক স্তরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব ও মূল্য সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। সত্য বটে, ইসলাম এসেছে ভারত-বর্ষের বাইরে থেকে। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মনে ইসলাম স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে, একটা নতুন যুগের সূচনা করেছে ইসলাম। সেই যুগটা কি এতই উপেক্ষণীয়, গুরুত্বহীন বা অলীক অবাস্তব যে, তার সম্বন্ধে কোন উল্লেখের প্রয়োজন নেই ?

"উগ্রপন্থীদের আরেক নেতা বালগঙ্গাধর তিলক, যিনি ধর্মভিত্তিক রাজ-নীতির অন্যতম প্রবক্তা। কি শিবাজী উৎসবের প্রসঙ্গে প্রদত্ত ভাষণে কি 'কেশরী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তিনি বারংবার ধর্মের দোহাই 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন এবং বহুবার ধর্ম বলতে স্পষ্ট করে 'হিন্দু' শব্দটাই ব্যবহার করেছেন। 'স্বরাজ' বলতেও তিনি কোথাও আধুনিক গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ বোঝাননি, বুঝিয়েছেন শিবাজী কর্তৃক পরিকল্পিত সপ্তদশ শতাব্দীর স্বরাজ আদর্শকে।"[১] অর্থাৎ তিলকের জাতীয়তাবাদ মানে হিন্দু ধর্মবাদ। স্বরাজ সাধনায় অহিন্দুদের স্থান নেই।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী বড় বড় নেতারাই মূলত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ ও বিরূপতার অস্তিত্বের আমদানী ঘটিয়েছেন।

---

১ ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাসগুপ্ত, পৃঃ ২৩১।

কংগ্রেসের উগ্রপন্থী তিন নেতার অন্যতম বিপিনচন্দ্র পাল স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, 'আনন্দ মঠ' থেকে যৌবনে তাঁরা মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাব লাভ করেছিলেন।[১] পরবর্তীকালের স্বদেশী আন্দোলনকারীরা বা সন্ত্রাসবাদীরাও আনন্দ মঠ এবং বড় বড় নেতাদের ছড়ানো বক্তৃতামালা থেকেই মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাব লাভ করেছিলেন। তাই তো দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে একমাত্র বরিশাল জেলাতেই বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিসপত্র কেনার অপরাধে স্বদেশী আন্দোলনকারীরা স্থানীয় মুসলমানদের উপর হামলা চালিয়েছিল। এ ধরনের ষাটটি ঘটনা ঘটে বরিশালে।[২] এ ধরনের আরো অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ আছে। এমনি লাঞ্ছনার হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্যই ১৯০৬ সালে ঢাকাতে মহামেডান ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশান গঠিত হয় এবং এর পরই সৃষ্টি হয় 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ'।

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লা শহরে ও জামালপুরে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়, তা নিয়ে ইংলণ্ডের 'হাউস অব কমন্সে'ও প্রশ্ন ওঠে। সেখানে বলা হয়েছিল যে, মুসলমানদের স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ে হিন্দুরা বাধ্য করেছিল এবং তার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেটাই আস্তে আস্তে দাঙ্গায় রূপ নেয়।

এ সম্পর্কে ১৫ জন নেতা প্রতিবাদ করে যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাতে বলা হয় যে, স্বদেশী আন্দোলনের সাথে এর কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। মুসলমানদের কে বা কারা এক লাল ইশ্‌তাহার বিলি করে। ইশ্‌তাহারে বলা হয় যে, হিন্দুদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। এ দেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। চাষীদের মধ্যেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। কৃষিই হলো সম্পদের উৎস। হিন্দুদের কোন সম্পদ নেই। মুসলমানদের পরিশ্রমেই তারা সম্পদশালী। মুসলমান যদি জাগ্রত হয় এবং আলোক প্রাপ্ত হয় তা হলে হিন্দুরা অনাহারে ধ্বংস হবে অথবা মুসলমান হবে।

---

১. ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাসগুপ্ত, পৃঃ ২৩০।

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩২।

এই লাল ইশ্‌তাহারকেই দাঙ্গার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলেছেন, মানতেই হবে যে, কৃষিই সম্পদের উৎস এবং কৃষকের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সম্পদের উৎপাদক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জমিদার মহাজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধীনেই তাদের শোচনীয় অস্তিত্ব। সুতরাং এটা বহুলাংশে ছিল ধর্মের প্রচ্ছদে আবৃত একটা অর্থনৈতিক সমস্যা।[১]

বলতে বাধা নেই, হিন্দুদের এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব জন্মগত। জন্ম হতেই তাদের শেখানো হয়—মুসলমানদের বাড়ীতে যাবে না। মুসলমানদের ছোঁয়া কোন কিছু খাবে না। মুসলমানরা কোন কিছু ছুঁলেই তা অপবিত্র হয়ে যায়। মোট কথা, মুসলমানদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা হিন্দুদের প্রাত্যহিক অত্যাবশ্যকীয় কর্মরূপে পরিগণিত ছিল। এরই ফলে দেখেছি শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন হিন্দুকেও মুসলমান বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতে। বিদ্যায় পান্ডিত্যে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদেরও এ ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করতে দেখেছি।

সর্বজনসমাদৃত অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও শ্রীকান্তের ১ম পর্বে শ্রীকান্তের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সেদিন বাঙ্গালী ও মুসলমান ছেলেদের ফুটবল খেলা কেন্দ্র করে একটা অশান্তি দেখা দিয়েছিল।" এখানে 'বাঙ্গালী' ও 'মুসলমান' শব্দ দুটি এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যেন মুসলমান হলেই সে আর বাঙ্গালী হতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে এ ধরনের ভাঙ্গনের প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন।

১৯৩৩ সালে শরৎচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "বস্তুত মুসলমান যদি বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চায়, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা

---

১. ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পৃঃ ২৩৩।

চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে। বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সংকোচ মানে নাই।" আবার বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমানে মিলন একটা গালভরা শব্দ। এ আকাশ কুসুমের লোভে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করি কিসের জন্য? এই মোহ আমাদের ত্যাগ করিতেই হইবে। হিন্দুস্তান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই।"[১]

এ হলো হিন্দু মহৎ ব্যক্তি, যাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, তাদেরই একজনের উক্তি। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুদের এ ধরনের মনোভাব ও আচরণ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াই পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পাকিস্তান সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ।

## প্রথম কৃষক বিদ্রোহ
## ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর হঠাৎ ইতিহাসের যে পটপরিবর্তন হল, তাতে মুসলমানরা আঘাত পেলেও সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েনি। প্রাথমিক অবস্থায় তারা চেষ্টা করলো অসহ-যোগিতার মাধ্যমে বেনিয়া কোম্পানী সরকারের সংস্পর্শ ত্যাগ করার। কিন্তু তাতে ফল ফললো বিপরীত। বেনিয়া কোম্পানীর অত্যাচার-উৎপীড়ন আরও বেড়ে চললো। ধীরে ধীরে ইংরেজ শক্তি একটার পর একটা ভারতের প্রদেশ ও রাজ্য গ্রাস করে চললো। ইংরেজ শক্তিকে এর জন্য যে প্রতারণা, ছলনা, উৎকোচ গ্রহণ ও ষড়যন্ত্রের খেলা খেলতে হয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

কালক্রমে ইংরেজ রাজশক্তি সমগ্র দেশব্যাপী যে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করেছিল তাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ রুদ্র আক্রোশে অধীর হয়ে উঠলো। ইংরেজ শাসক ও জমিদার-মহাজনদের শোষণ যন্ত্রণায় কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হল। এমতাবস্থায় তাদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকলো—শোষণ-

---

১. সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৫৫।

পীড়নের চাপে পড়ে অনিবার্য ধ্বংসে পরিণত হওয়া অথবা বিদ্রোহ, বিপ্লবের দ্বারা শোষণ যন্ত্রণার উচ্ছেদ সাধন করা। কৃষক সম্প্রদায় দ্বিতীয় পথকেই একমাত্র গ্রহণীয় পথ বলে মনে করলো। পরাধীন জাতির কালিমালিপ্ত ইতিহাস এবার পরিণত হল কৃষক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্তরঞ্জিত ইতিহাসে।[১]

ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ তথা ভারতের প্রথম বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৭৬৩ সালে। সমগ্র বাংলাদেশ ও বিহার জুড়ে এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এ বিদ্রোহের স্থায়িত্বকাল ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। এ বিদ্রোহ 'ফকীর-সন্যাসী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। বিদ্রোহ মূলত কৃষক বিদ্রোহ, তবুও এ বিদ্রোহ 'ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত হওয়ার কারণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এসব ফকীরের সম্পর্কে মরহুম নওয়াবজাদা আবদুল আলী কলকাতা থেকে প্রকাশিত এশিয়াটিক জার্নালে লিখেছেনঃ

"তারা মাথায় লম্বা চুল রাখে, রঙ্গীন কাপড় পরে এবং লোহার শিকল ও লম্বা চিমটা ব্যবহার করে। তাদের খাদ্য প্রধানত আতব চাল, ঘি ও নুন। তারা মাছ-মাংস খায় না এবং কিছু দিন আগ পর্যন্তও তারা কৌমার্যের জীবন-যাপন করতো। সফরের সময় তারা মৎস্য প্রতীক চিহ্ন অঙ্কিত পতাকা ব্যবহার করে এবং তারা বিরাট দলবল নিয়ে চলাফেরা করে। তাদের উপাধি 'বোরহানা'। এসব ফকীর 'বসরিয়া' তরিকার 'তৈফুরিয়া খান ওয়াড়ো' ও 'তারাগাতি' ঘরের অন্তর্ভুক্ত। অন্যভাবে আমার মনে হয় 'তৈফুরিয়া খান ওয়াড়ো' হচেছ 'বসরিয়া' ঘরেরই একটা শাখা। শাহা মাদার হচেছন এ তরিকার প্রবর্তক।"[২]

'দাবিস্তান' গ্রন্থ অনুযায়ী বিখ্যাত যোগী বা দরবেশ বদীউদ্দীন মাদার (Badiuddin Madar) ভারতের কানপুর জেলার মাকানপুরে বসতি স্থাপন করেন। হিন্দুরাও তাঁকে বিশেষ মানতো। অনেক শিষ্য ছিল তাঁর। বছরে একবার পৃথিবীর সব জায়গা হতে শিষ্যরা সেখানে আসত।

আবার অন্যমতে কিছুসংখ্যক মাদারী পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতো। আবার অনেকের লাখেরাজ জমি ছিল। তারা সেই জমি চাষ করতো। আরেক দল ছিল যারা দিনমজুরের কাজ করতো বা ভিক্ষাবৃত্তি ছিল

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৫-১৬।
২. নওয়াবজাদা আব্দুল ওয়ালী ছিলেন ইম্পেরিয়াল রেকর্ড কীপার।

তাদের পেশা। কিছুসংখ্যক ছিল, যাদের সাথে সত্যিকার মাদারীদের কোন মিল ছিল না। এরা ভালুক বা বানরের খেলা দেখাত, ভেলকিবাজি করত এবং আগুন খাওয়ার খেলা দেখাতো।১

'বোরহানা' ও 'মাদারী' জাতীয় ফকীর ছিল একই জাতীয়। ১৬৫৯ সালে বাংলার সুবেদার শাহ সুজা বোরহানা ফকীর জনাব শাহ সুলতান হাসান মুরিয়া বোরহানাকে এক সনদ প্রদান করেন। এই সনদ অনুযায়ী 'বোরহানা' সম্প্রদায়ের ফকীরগণ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যে কোন স্থানে যাতায়াত করতে পারে এবং তাদের পতাকা, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি জিনিসপত্র বহন করতে পারে এবং মালিকবিহীন সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারে। যেখানেই তারা যাবে, সেখানকার জমিদার বা প্রজা তাদের খাওয়া খরচ বহন করবে। তাদের কোন প্রকার কর দিতে হবে না।২

রায়বাহাদুর যামিনী মোহন ঘোষ মহাশয় তাঁর 'Sannyasi and Fakirs Raiders in Bengal' নামক গ্রন্থে ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে

---

১৯০৩ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে একটি প্রবন্ধ লেখেন। "They grow long hair on their head, put on coloured clothes and used iron shockles and long long. They subsist mainly on unboiled rice, clarified butter and salt. They do not eat fish or meat, and until recent years they live a lived of celibacy. In their tours they carry the fish standard and are accompanied by a huge retinue and their title is Burhana. The Fakirs are the member of the Basria group. Taifuria-khan-Wadu and Tabagatighar. In other Words, as I under- khan-Wandu and Tabagatighar. In other Words, as I understand from this, the Taifuria-Khan Wadu is a branch of Basriaghar and the Tabagatighar is again a branch of Taifuria-Khanwadu, an orther introduced by Shah Madar." চৌধুরী শামসুর রহমান কর্তৃক লিখিত 'বাংলার ফকীর বিদ্রোহ'ঃ Sannyasis & Fakir Raiderd in Bengal : Raibahadur Jamini Mahan Ray, P. 21.

১. Fakir and Sanysis Raiders in Bengal : Ray Bahadur Jamini Mohan Ray, P. 21.

২. Fakir of Balia Dighi in Dinajpur : Journal of Asiatic Society of Bengal, 1903.

অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন। মূলত তিনি ছিলেন ইংরেজ সরকারের খয়ের খাঁ, ইংরেজদের দালাল বা মুৎসুদ্দি শ্রেণীর লোক। তিনি প্রভু ইংরেজ সরকারের গুণগান করবেন বা তাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন, এ স্বাভাবিক। স্বৈরাচারী গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সাথে তিনি গলা মিলিয়েছেন। ওয়ারেন হেস্টিং-এর মতানুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হতে আগত কিছুসংখ্যক অসৎ সাধু-সন্ন্যাসী দল বেঁধে ঘোরাফেরা করতো। সুযোগ পেলেই তারা অধিবাসীদের উপর লুণ্ঠন কার্য চালাতো। আবার অনেকে কিছু জমি-জমা ক্রয় করতো বা দান হিসাবে জমি লাভ করতো। তারা চাষাবাদ করে জীবন-যাপন করতো। কৃষিকার্য করে জীবনধারণ করলেও এদেরে পোশাক ছিল ফকীর-সন্ন্যাসীদের মত। মুসলমান ফকীর বা হিন্দু সন্নাসীদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এরা একই রকম পোশাক পরতো। এদের সবাইকে হানাদার বা লুণ্ঠন-কারী বলে অভিহিত করলে অন্যায় হবে। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিল, যারা সত্যিকার যোগী বা তাপস। তাদের ধার্মিক বা বিদ্বানরূপে সম্মান করা চলতো।১

পূর্বোক্ত তথ্য অনুযায়ী এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এসব ফকীর-সন্ন্যাসীরা ছিল সাধারণত 'মাদারী' বা 'বোরহানা' সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা বাংলাদেশ তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে দল বেঁধে বাস করতো। দেশের নানা স্থানে পতিত বা খাস-জমি দখল করে কিংবা মোগল শাসকদের নিকট হতে 'দান' হিসাবে প্রাপ্ত জমিতে চাষাবাদ করে এরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। কালক্রমে এদেরই একাংশ কৃষকে পরিণত হয়। কিন্তু কৃষক হলেও এরা ফকীর-সন্নন্যাসীদের মতই পোশাক পরতো।২

১৬৫৯ সালে শাহজাদা সুজা বাংলাদেশের 'বোরহানা' সম্প্রদায়ের ফকীর-দের জন্যে যে 'সনদ' জারি করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছেঃ

ক. তারা (ফকীরগণ) নিজেদের খুশী অনুযায়ী যে কোন দেশ, বিভাগ বা শহরে গমনাগমন করতে পারবে এবং 'জলুস'-এর জন্য বিভিন্ন সামগ্রী যথা—প্রতীক চিহ্ন, পতাকা, খুঁটি, খাদ্যবস্তু, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বহন করতে পারবে।

খ. তারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পতিত জমি, মালিকবিহীন জমি বা করমুক্ত জমিজমা নিজেদের খুশীমত ভোগদখল করতে পারবে।

---

১. Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal : P. 11-12.

২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৮।

গ. তারা দেশের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করুক না কেন, দেশের জমিদার বা প্রজারা তাদের খাদ্যবস্তু বা রসদ সরবরাহ করবে।

ঘ. কোন প্রকার সেস্ বা খাজনা তাদের উপর ধার্য থাকবে না।১

ব্রিটিশ শাসননীতির মূল ভিত্তি অর্থ। এই অর্থের লোভে পড়ে বেনিয়া কোম্পানীর শাসকগোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ধ্বংস করে দেওয়ায় এবং তার পরিবর্তে কোন সুচিন্তনীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ দেশের জনজীবনে নেমে আসে ভয়াবহ অভাব, অনটন-অন্নাভাব। যে ফকীর-সন্নাসীগণ বিনা খাজনায় জমি ভোগ-দখল করে আসছিল এবং সর্বত্র যাদের অবাধ গতি ছিল, তাদের উপর যখন হঠাৎ কঠোর বিধি-নিষেধ এবং অতিরিক্ত কর প্রয়োগ করা হল তখন স্বভাবতই নিরীহ ফকীর-সন্ন্যাসিগণ বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠলো। এমনকি ইংরেজ শাসকগণ এদের তীর্থ ভ্রমণকেও শোষণের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পরিণত করে। এরা একদিকে কৃষক অপরদিকে ফকীর-সন্ন্যাসী আর এই উভয় দিক থেকেই তারা বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হয়েছিল বলেই নিজেদের জীবিকা ও ধর্ম রক্ষার জন্য তাদের বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।২ এক রকম বাধ্য হয়েই তারা দলবন্ধ হয়ে জমিদার-মহাজনদের গোলায় জমানো ধান-চাল এবং সম্পত্তি লুঠ করতে লাগলো।

এ ছাড়া ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলাদেশের কৃষক জনসাধারণের যে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তার তুলনা সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে অতি বিরল। দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বলেছেন, "এ দুর্ভিক্ষে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, পরবর্তী দুই পুরুষ কালেও তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। ... ১৭৭১ সাল শুরু হওয়ার আগেই এক পুরুষ কৃষকের এক-তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এককালে ধনবান পরি-বারের এক পুরুষ নিঃস্ব ভিখেরীতে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেকটি জেলাতে এই একই কাহিনী শুনতে পাওয়া যেতো।"

---

১. Sannysi & Fakir Raiders in Bengal : Raibahadur J. M. Gosh : p. 22.

২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৮।

দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে গিয়ে হাণ্টার সাহেব বলেছেন, "প্রদেশে তখনও কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ছিল এবং তা দিয়ে আরও ন'মাস চালানোর প্রয়োজন ছিল। ... কিন্তু ফসল কাটার সময় তা কিনে মজুদ করে রাখা হতো, পরে অনটনের সময় চড়াদামে বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করা হতো। ফলে দ্রুত দাম বেড়ে যেতো।[১]

এসব খাদ্য মজুদ করে রাখতো কারা? কোম্পানীর কর্মচারী এবং জমিদার-মহাজন শ্রেণীর লোকেরা। তাই ফকীর-সন্ন্যাসী এবং বিদ্রোহী কৃষকেরা এসব মজুতদার ব্যবসায়ী ও জমিদার-মহাজনদের শস্য ভাণ্ডারই লুঠ করেছিল সবার আগে।

এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরও কিন্তু কোম্পানীর শাসকদের টনক নড়েনি। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কোর্ট অব ডিরেক্টরকে লিখিত কাউন্সিলের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে হাণ্টার সাহেব বলেছেন, "অবস্থা শোচনীয় হলেও কাউন্সিল এখনও রাজস্ব বা নির্ধারিত পরিমাণ আদায় (খাজনা) কম হয়েছে বলে দেখতে পাননি।"[২] কাজেই একথা কাউকে ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, ইংরেজ বণিক সরকার বাংলাদেশের চাষীদের উপর কি অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল।

একটা দেশের কৃষক জনসাধারণকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার জন্যে এর চেয়ে বড় কারণ আর কি থাকতে পারে! হাণ্টার সাহেব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "দুর্ভিক্ষের পরবর্তী কয়েক বছরে বহু সহায়-সম্বলহীন নিরন্ন চাষী যোগ দেওয়ায় তাদের (ফকীর-সন্ন্যাসীদের) সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এসব কৃষকদের না ছিল বীজধান, না ছিল চাষাবাদের সাজ-সরঞ্জাম। ফলে এক রকম বাধ্য হয়েই তারা সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেয়।"[৩]

বস্তুত ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে অতিরিক্ত করের চাপে, জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারে এবং খাস-জমি দখল করে নেওয়ার ফলে ফকীর-সন্ন্যাসীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেটের দায়ে তারা জমিদার-মহাজনের ঘর-বাড়ী লুঠ করতে

---

১. পল্লী বাংলার ইতিহাস(Annals of Rural Bengal) হান্টার, পৃঃ ১৬, ১১।
২. Ibid. পৃঃ ৪৯।
৩. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal): হান্টার, পৃঃ ৬২।

থাকে। এসব গৃহত্যাগী (গৃহহারা) ও সর্বত্যাগী (সর্বহারা) ফকীর-সন্ন্যাসীদের সাথে যোগ দিল নিরন্ন চাষীকুল। এক সময় এরা সংখ্যায় পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল।১

এ ছাড়া এ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সম্রাটের বিশাল সৈন্যবাহিনীর চাকুরীচ্যুত বুভুক্ষু সৈন্যদল। হঠাৎ এরা এমন এক ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হলো যে, নিজ পরিবার-পরিজনের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ারও উপায় থাকলো না তাদের। বাধ্য হয়েই তারা বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিল।

এ ছাড়া ইংরেজ বণিকগণ যখন দেশীয় কারিগরদের তৈরী জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে অথবা কেড়ে নিয়ে চালান দিতে লাগল বিলেতে, তখন নিরুপায় কারিগরগণ ঘর-বাড়ি ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেল। ১৭৫৮ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত এ কয় বছরে কৃষকদের সাথে সাথে কারিগরদের একটা বিরাট অংশ বেকার হয়ে পড়ল। এক সময় ঢাকার মসলিন বস্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ কারিগর ইংরেজ বণিকদের শোষণ উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বনে-জঙ্গলে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। এরাও অংশগ্রহণ করলো ফকীর-সন্ন্যাসীদের দলে। সংঘবদ্ধ হয়ে এরা প্রথমে স্থানীয় অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করলো। কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝতে পারলো যে, এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। কারণ আশেপাশের প্রতিবেশীদের অবস্থাও প্রায় একই রূপ। ধন-সম্পদ জমা হয়ে রয়েছে জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ইংরেজ বণিকদের কুঠি-কাছারিতে। গুদামে জমানো শস্য ও ধন-সম্পদ কেড়ে না নিতে পারলে বেঁচে থাকা যাবে না।২

বিবিধ নথিপত্র ও গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী এ সত্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত যে, মোগল আমল থেকেই বাংলা ও বিহারের ফকীর-সন্ন্যাসীরা দল বেঁধে বসবাস করতো। স্থানীয় শাসনকর্তাদের অনুগ্রহ ছিল তাদের প্রতি। কালক্রমে এদের একটা অংশ কৃষকে পরিণত হয়। ইংরেজী শাসনের প্রারম্ভ থেকেই এরা কৃষক হিসাবে ইংরেজ শাসকদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়। পূর্বে এসব

---

১. Ibid, পৃঃ ৬২।
২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৯,২২।

ফকীর-সন্ন্যাসীর দলবদ্ধ তীর্থ ভ্রমণে কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু ইংরেজ শাসকগণ এদের তীর্থ ভ্রমণে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি করে এবং তীর্থযাত্রীদের মাথাপিছু কর ধার্য করে।

এ সময় ব্রিটিশ-ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই বলে কঠোর আদেশ জারি করেন যে, বাংলাদেশ ও বিহারের ফকীর-সন্ন্যাসী নামে পরিচিত যারা দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করে বা বসবাস করে, যারা সরকার ও স্থানীয় জমিদারদের নিকট হতে ভাতা পেয়ে আসছে, তাদের ধর্ম-কর্ম পালন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের সবাইকে দুই মাসের মধ্যে বাংলা ও বিহার ছেড়ে চলে যেতে হবে। ..এর পরও যাদের এদেশে দেখা যাবে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।১

কাজেই এসব ফকীর-সন্ন্যাসীরা উভয় দিক থেকেই ইংরেজ সরকারের উৎপীড়ন ও শোষণের শিকারে পরিণত হল এবং বাধ্য হয়েই তারা জীবিকা ও ধর্মরক্ষার সংকল্পে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে এদের সাথে যোগ দিয়েছিল সাধারণ গৃহহারা ও সর্বহারা কৃষক, বেকার সৈনিক ও বেকার কারিগর শ্রেণী।

বিদ্রোহীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে জমিদার-মহাজন ও ইংরেজ সরকারের কুঠি লুন্ঠন করতো। এরা কখনও স্থানীয় কৃষকদের উপর উৎপীড়ন বা তাদের সম্পত্তি লুঠ করেনি। বরং বিদ্রোহীদের প্রতি নেতাদের কঠোর নির্দেশ ছিল যাতে তারা সাধারণ মানুষের ঘর-বাড়ী বা ধন-সম্পদ লুঠ না করে।২

ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর কিছুসংখ্যক সমর্থক কর্তৃক লিখিত বিবরণে ফকীর-সন্ন্যাসীদের এই মহান বিদ্রোহকে 'বহিরাগত ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ও দস্যুদের বাংলাদেশ আক্রমণ' বলে অভিহিত করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও হেস্টিংস-এর এই উক্তি যে ভয়ানক মিথ্যা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এডওয়ার্ড টমসন ও

---

১. Secret Department Proceeding, dt. 21st Jan. 1773. Sannyasi & Fakir Raiders in Bengal. P. 65.

২. Letter from the Supervisor of Natore to the Council of Revenue, dt. 25th jan. 1772.

জে, টি, গ্যারাট স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, 'হেস্টিংস এসব ফকীর-সন্ন্যাসীদিগকে 'যাযাবর সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি যে কয়েকটি মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, এটি তাদের মধ্যে অন্যতম।১

এই বিদ্রোহীরা যদি বহিরাগত যাযাবর প্রকৃতির দস্যুই হবে, তা হলে তারা লুন্ঠন ও দস্যুতার জন্যে ভারতের অন্যান্য শাসকবিহীন অঞ্চলে না গিয়ে শক্তিশালী ইংরেজ শক্তি দ্বারা অধিকৃত ও শাসিত বাংলাদেশকে তাদের আক্রমণ ও দস্যুতার লক্ষ্যস্থল হিসাবে বেছে নিল কেন? ইংরেজ শাসন ও শোষণের ফলে এবং তাদের সৃষ্ট ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও তার পরিণতি-স্বরূপ ভয়ঙ্কর মহামারীর ফলে বাংলা ও বিহারের দেড় কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল, বাংলাদেশের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ আর মহামারী কবলিত বাংলা ও বিহারের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে বহিরাগত দস্যুরা কোন মহামূল্যবান ঐশ্বর্য লুন্ঠনের জন্য দীর্ঘ আটত্রিশ বছর (১৭৬৩-১৮০০) ধরে আক্রমণ চালিয়েছিল এবং ইংরেজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে হাজার হাজার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল? এ সত্য তারা কখনও উপলব্ধি করেননি।২

হান্টার সাহেব এ সত্য আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন,"............দরিদ্র কৃষকদের শীতকালীন সম্বল সমস্ত ধান-চাল লুন্ঠিত হওয়ার পর নিজেরাই ডাকাতে পরিণত হল। ১৭৭১ সালের গোড়ার দিকে স্থানীয় অফিসারগণ লিখেছেন, দুঃখ-দুর্দশায় হতাশ ও নিষ্ঠুর হয়ে কিছুসংখ্যক লোক প্রায়ই গ্রামে গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যে সকল রায়ত ইতিপূর্বে প্রতিবেশীদের মধ্যে সৎ ও সজ্জন বলে পরিচিত ছিলো, তাদের মধ্যে অনেকেই জীবন ধারণের রসদ সংগ্রহের শেষ উপায় হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করেছে। এই জাতীয় লোকেরা তথাকথিত গৃহহীন ধার্মিক (ফকীর-সন্নাসী) দলে দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতো এবং তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছিল।"৩

১. ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৯।
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০।
৩. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal) হান্টার, পৃঃ ৬২।

এবার প্রশ্ন জাগবে কারা দরিদ্র কৃষকদের শীতকালীন সম্বল সমস্ত ধান-চাল লুঠ করেছিল? এ কথার জবাব মিলবে সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়ঃ "এই নতুন বণিক শাসকগোষ্ঠী নিজেরাই সবচেয়ে বড় চোর, সবচেয়ে বড় ডাকাত, সবচেয়ে বড় লুন্ঠনকারী। তারা তাদের সর্বগ্রাসী শোষণ ও মুনাফার লোভ মিটাবার জন্যে তাদের শাসনাধীন প্রজাগণকেও প্রাণ বাঁচবার উপায় হিসাবে চুরি-ডাকাতির পথ দেখাল। নূতন বণিক শাসনে ইহা ব্যতীত বাঁচাবার অন্য উপায় বাংলা-বিহারের কৃষক ও কারিগরগণ খুঁজে পেলো না।"১

ফকীর-সন্ন্যাসীরা কেন লুঠ করত এবং কাদের লুঠ করত, উদ্ধৃত মন্তব্য-সমূহে তা ব্যক্ত হয়েছে। এটাই সত্য ইতিহাস, হেস্টিংস ও তার বংশবদদের লিখিত বিবরণী ইতিহাসগতভাবে সত্য নয়।

ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন মজনু শাহ বা মজনু ফকীর। মজনু শাহ গোয়ালিয়র রাজ্যে (বর্তমান ভারতে) মেওয়াট এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মাদারী বোরহানা তরিকার ফকীর বা দরবেশ। ভারতের কানপুর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত মাকানপুরে শাহ মাদারের দরগায় তিনি অধিকাংশ সময় বাস করতেন। এখান থেকেই তিনি তাঁর দলবলসহ প্রতি বছর বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করতেন। তাঁর অভি-যানের ক্ষেত্র ছিল ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা। এ অঞ্চলে তাঁর স্থায়ী আস্তানা ছিল বগুড়ার বিখ্যাত মস্তানগড়ে। ১৭৭৬ সালে তিনি মহাস্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এই দুর্গ থেকেই এ স্থানের নাম হয় "মস্তানগড়।"২ মস্তানগড়ের এই দুর্গই বহু বছর পর্যন্ত ফকীর বাহিনীর অভিযান পরিচালনার কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অপর একটি কেন্দ্র ছিল বগুড়া থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মাদারগঞ্জে।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত পরিবেশিত এক তথ্যে জানা যায়, 'মজনু' শব্দটির অর্থ

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২২।
২. Mr. Francis Glandwin's Letter to the provincial council of the Company.

পাগল আর 'শাহ' শব্দটির অর্থ রাজা। তাহলে 'মজনু' ও 'শাহ' শব্দ দুটির অর্থ একত্রে পাগল-রাজা। আসলে এটি একটি ছদ্মনাম। মজনু শাহ যে বহুকাল পর্যন্ত তাঁর প্রকৃত নাম ও পরিচয় গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন এটা তাঁর ব্যক্তিগত ও বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী গণশক্তির সাংগঠনিক সাফল্যের এবং ব্রিটিশ শাসকদের ও ব্রিটিশ শক্তির প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। তাই পরবর্তীকালে মজনু শাহের প্রকৃত নাম ও পরিচয় জানার পরও তা গোপন রেখে ইংরেজরা আসলে সেই প্রমাণকেই গোপন করেছে। খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহম্মদের 'কোচবিহারের ইতিহাস' এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষে' দেখা যায়, বাকের মুহম্মদ বা বাকের আলী নামে উল্লেখিত রংপুরের জনৈক ভূস্বামীই মজনু শাহ ছদ্মনামে ব্রিটিশ বিরোধী গণশক্তিকে চালনা করতেন অথচ প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেন ব্রিটিশদের চোখের সামনে। বাকের ছিলেন মুগল বংশোদ্ভূত এবং তাঁর এক কন্যার সঙ্গে দিল্লীর দ্বিতীয় আকবর বাদশাহের বিবাহ হয়। সেকালে মুগল পরিচয় ছিল উত্তর ভারতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং মজনুর মুগল পরিচয় প্রচারিত হলে বাংলার জনযুদ্ধ সমগ্র উত্তর ভারতেই বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে,— এই আশঙ্কার থেকেও ইংরেজরা মজনু শাহের প্রকৃত পরিচয় গোপনে যত্নপর হয়েছিল বলে মনে হয়।"[১]

মজনু শাহ ব্যতীত আর যারা বিদ্রোহের বিশিষ্ট নায়করূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুসা শাহ (মজনু শাহের ভাই) চেরাগ আলী, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী ও কৃপানাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ও বিহারের বেকার সৈন্যবাহিনী, কারিগর ও সর্বহারা কৃষকদের একত্রিত করে একটা বিরাট বিদ্রোহী বাহিনী গঠন করার কাজে মজনু শাহ যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একজন সুদক্ষ সেনাপতি-রূপে সৈন্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন বিশেষ কৌশলী সংগঠক। তিনি ছিলেন বিদ্রোহের প্রাণ, প্রধান নায়ক। বিহারের পশ্চিম প্রান্ত থেকে বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে তিনি বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ করার এবং একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে আনার চেষ্টা করেছিলেন বলে সমগ্র বাংলাদেশ

১. ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৪১।

ও বিহারের মানুষ এক ডাকে তাঁকে চিনেছিল বিদ্রোহের প্রধান নায়করূপে, মজনু ফকীর নামে।১

১৭৬৩ সালে বিদ্রোহীরা প্রথম আক্রমণ চালায় কোম্পানীর ঢাকার কুঠির উপর। মিঃ র‍্যালফ্ লিসেস্টার নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন ঢাকার কুঠির ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ফকীর বাহিনীর আক্রমণে লিসেস্টার এতই ভয় পেয়েছিলেন যে, কোন প্রকার প্রতিরোধের চেষ্টা না করেই তিনি কুঠির পেছন দিক থেকে পালিয়ে বুড়িগঙ্গার বুকে নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিনা বাধাতেই বিদ্রোহীরা কুঠি লুঠ করার সুযোগ পেল। এহেন অযোগ্যতার দরুন পরে লিসেস্টার ক্লাইভ কর্তৃক পদচ্যুত হন। অবশ্য কয়েক মাস পরে গ্রান্ট নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি ঢাকার কুঠি পুনরায় অধিকার করতে সমর্থ হন।২

এরপর থেকে বিভিন্ন কোণ থেকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ চলতে থাকল সমান গতিতে। পরিস্থিতির মুকাবিলায় সৈন্যবাহিনী এল। কিন্তু বিদ্রোহীদের দমন করতে পারলো না। সৈন্যবাহিনী নাজেহাল হয়ে ফিরে গেল। ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সরাসরি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, চার ব্যাটেলিয়ান ব্রিটিশ সৈন্য যুদ্ধরত ছিল। তাদের সাহায্য করেছিল স্থানীয় জমিদারদের সৈন্যবাহিনী। সমবেত প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। বিদ্রোহীদের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের সমর্থন ও সহানুভূতি থাকায় খাজনা আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অচল অবস্থার সৃষ্টি হল পল্লী অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায়।৩ বিদ্রোহীদের অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ও ইংরেজ শক্তির সর্বত্র পরাজয়ে শাসকগোষ্ঠী ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। গুপ্তচর নিযুক্ত করা হল বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা ও খবরাখবর সংগ্রহের কাজে। শুরু হল সর্বত্র অত্যাচার-উৎপীড়ন। জমিদারদের নির্দেশে এবং সহায়তায় সে অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকায় বিদ্রোহীরা হানা দিতে থাকল।

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ২৪।
২. Letter to Revenue Board. dt. 5th December 1763.
৩. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal) : হান্টার, পৃঃ ৬৩।

মজনু শাহের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল যাতে দেশের জমিদারসহ সকল শ্রেণীর মানুষ এ বিদ্রোহে অংশ নেয় অথবা সমর্থন যোগায়। ১৭৭১ সালের শরৎকালে বিদ্রোহীরা উত্তরবঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলো। এসময় মজনু শাহ নাটোরের জমিদার রাণী ভবানীর কাছে কৌশলী ভাষায় এক পত্র লিখলেনঃ

"আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সর্বত্র ভিক্ষা করে আসছি এবং বাংলাদেশের লোকেরাও আমাদের প্রতি সমর্থন ও সাহায্য যুগিয়েছে। ...... আমরা বিভিন্ন দরগাহ বা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেছি। আমরা কাউকে গালি দিইনি বা কারও গায়ে হাতও তুলিনি। তবুও আমাদের ১৫০ জনকে বিনাদোষে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষা করে তারা যা পেয়েছে, তা পরিধেয় বস্ত্র, এমনকি খাদ্যবস্তু পর্যন্ত তারা কেড়ে নিয়েছে। এসব গরীব ফকীরকে হত্যা করে তাদের কি লাভ হয়েছে বা কি খ্যাতি তারা অর্জন করেছে তাদের বলার প্রয়োজন নেই। আগে ফকীরগণ একাকী ভিক্ষা করে বেড়াতো, এখন তারা দলবদ্ধ হয়েছে। ইংরেজদের দৃষ্টিতে তাদের এ ঐক্যবোধ অপরাধ। তারা ফকীরদের উপাসনায় বাধা সৃষ্টি করে। এটা অন্যায়, আপনিই প্রকৃত শাসক। আমরা ফকীর মানুষ। আমরা আপনার মঙ্গল কামনা করি এবং আপনার সাহায্যপ্রার্থী।"[১]

মজনু শাহের চেষ্টায় ইংরেজ সরকারের বহু কর্মচারী যোগ দিত বিদ্রোহীদের দলে। নানাভাবে চেষ্টা করতো তাদের সাহায্য করার। কোথাও বিদ্রোহীদের সাথে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ বাধলে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে লাঠি, বল্লম হাতে নিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্যে এগিয়ে আসত।

ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। অপরদিকে ইংলন্ড থেকে নিত্য নূতন নূতন সৈন্যবাহিনী এসে জড় হতে থাকল। বসলো নূতন মন্ত্রীসভা, কি করে ফকীরদের দমন করা যায় তারই পরিকল্পনায়। কিছুতেই কিছু হলো না। ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল তাদের শক্তি এবং আক্রমণের প্রচন্ডতা। নিরুপায় জমিদারগণ টাকা-পয়সার বিনিময়ে ফকীরদের সাথে আপোস

১. Sannyasi & Fakir Raiders of Bengal : p. 47.

চেষ্টায় সক্রিয় হল। বহু ইংরেজ সেনাপতি এবং সৈন্য বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাল। সমস্ত দেশ জুড়ে চললো বিদ্রোহীদের প্রবল আধিপত্য। মজনু শাহ জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

এদিকে আবার রূপগিরি, ভূপৎগিরি ও অজিতগিরি নামক এক দল সন্ন্যাসী অর্ধ-উলঙ্গ 'রামায়েত' সন্ন্যাসীদের সাথে মিলিত হয়ে দেশের সর্বত্র ডাকাতি করে বেড়াত। ডাকাতিলব্ধ অর্থ তারা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সুদে কর্জ দিত। জনসাধারণ এসব সন্ন্যাসীদের ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মজনু শাহ এসব ভন্ড সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। এক সংঘর্ষে সুদখোর সন্ন্যাসীদের প্রায় ৩০/৪০ জন প্রাণ হারাল। এ অভিযানে মজনুর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। 'রামায়েত' নামক লুন্ঠনকারী ভন্ড সন্ন্যাসীদের কাজে বিদ্রোহী ফকীর সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল।[১] অবশ্য এসব ভন্ড সন্ন্যাসী ইংরেজ এবং তাদের দালাল জমিদারদের সৃষ্টি। ১৭৭৭ সালে বগুড়ায় অনুরূপ একদল সন্ন্যাসীর সাথে মজনুর পুনরায় সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষে মজনুর বহু অনুচর নিহত হয় এবং অনেক লোক ছত্রভংগ হয়ে এদিক-ওদিক পলায়ন করে।

রায় বাহাদুর যামিনী মোহন ঘোষ তাঁর 'Sannyasi & Fakir Raiders in Bengal' নামক গ্রন্থে এ সংঘর্ষকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বলে অভিহিত করেছেন।[২] অর্থাৎ এখানেও সেই পুরনো চালবাজী। একটা বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রামকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আখ্যা দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ইংরেজ সরকার এবং তাদের দালাল কিছুসংখ্যক হিন্দু জমিদারই এসব ভন্ড সন্ন্যাসীদের লেলিয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য, মজনুকে কিছুটা শায়েস্তা করা এবং মুসলমান ফকীরদের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্ন্যাসীদের উত্তেজিত করে তোলা।

১৭৮৩ সালে প্রায় এক হাজার অনুচরসহ মজনু শাহ হাযির হলেন ময়মন-

১. বাংলার ফকীর বিদ্রোহঃ চৌধুরী শামসুর রহমান।
Sannyasi & Fakir Raiders in Bengal : P. 84.
২. Sannyasi & Fakir Raiders in Bengal : P. 74.

সিংহ জেলায়। জেলার রেসিডেন্ট কোন প্রকার অত্যাচার বা লুঠতরাজ না করেই ময়মনসিংহ জেলা ত্যাগ করার অনুরোধ জানালো।১ কিন্তু মজনু শাহ ইংরেজ শক্তির বিপুল আয়োজন ও প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার বহু ইংরেজ কুঠি ও জমিদার কাছারী লুন্ঠন করেন এবং বহু অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন।

১৭৮৬ সালের মার্চ মাসে মজনু শাহ দলবল নিয়ে বগুড়া জেলায় উপনীত হন। মজনু শাহকে দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ইংরেজ বাহিনী। বহু ইংরেজ সৈন্য নিহত হল এ সংঘর্ষে। ডিসেম্বর মাসে পাঁচশ' সৈন্য নিয়ে মজনু পুনরায় বগুড়ার মুঞ্জরা নামক স্থানে সংঘবদ্ধ হলেন। খবর পেয়ে ইংরেজ সেনাপতি লেঃ ব্রেনাল বহু সৈন্য-সামন্তসহ মজনুকে আক্রমণ করলো। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী মজনুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেও কাবু করতে পারলো না। মজনু শাহ তরবারি হাতে অসীম সাহসে শত্রু-সৈন্যদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত পলায়ন করতে সমর্থ হন। মিঃ ব্রেনালের রিপোর্ট অনুযায়ী মজনু জল-কাদা মাখা দেহে রুগ্ন অবস্থায় যমুনা অতিক্রম করেন। পরে গঙ্গা পার হয়ে বিহারের উত্তর সীমান্তে গমন করেন। সেখানে অনেকদিন অসুস্থ অবস্থায় আত্মগোপন করে থাকেন। অবশেষে ১৭৮৬ সালে বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠতম নায়ক ফকীর মজনু শাহ মাকানপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুসা শাহ ও চেরাগ আলী বিদ্রোহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালের পর থেকে এ বিদ্রোহ পরিচালনার ক্ষেত্রে দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠকের ভূমিকা দেখা যায়। মজনু শাহের মৃত্যুর পর থেকে বিদ্রোহের আগুন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। ইতিমধ্যে মুসা শাহও তাঁর দলীয় লোকদের হাতে নিহত হলেন। মুসা শাহের মৃত্যুর পর যোগ্য নায়কের অভাবে এ বিদ্রোহ ক্রমশ প্রশমিত হতে থাকল।

বিদ্রোহের শেষ পর্বে (১৭৯৩-১৮০০) সোবহান আলী, রমজান শাহ, জহুর শাহ, মতিউল্যা প্রমুখ বিদ্রোহীর নেতৃত্বে এবং ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের

১. Ibid, P. 86.

শোষণ উৎপীড়নে জর্জরিত কৃষক জনসাধারণের সহায়তায় বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও স্থায়ী কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৯৩ সালে কুখ্যাত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু করেন। ফলে হতভাগ্য কৃষকদের উপর বর্বর জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার আরও বহুগুণ বেড়ে গেল।

শুধুমাত্র আদর্শ স্থির লক্ষ্য ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ তথা ভারতের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহ ও জন-জাগরণের ক্ষেত্রে এ বিদ্রোহ একটা নতুন পথের ইংগিত দিয়ে গেছে। সে রক্তাক্ত পথ ধরে পরবর্তীকালে এ দেশের বুকে আরও বহু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।

## ইংরেজ শাসন ও ফকীর-সন্নাসী বিদ্রোহের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভূস্বামী শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল এবং শতাব্দী শেষার্ধ পর্যন্ত তা এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছিল যে ভূস্বামী শ্রেণীর পক্ষে কোন প্রকার প্রগতিশীল ভাবধারা বা সংগ্রামী কৃষকদের প্রতি সমর্থন, এমনকি সাহিত্যে সেই সংগ্রামের প্রতিফলনও সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এহেন সময়ে সাহিত্য সম্রাট ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতার পথ পরিহার করে ভূস্বামী শ্রেণী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণে ব্রতী হন এবং সকল প্রকার প্রগতিশীল বাস্তবমুখী সাহিত্যের বিরোধিতা করতে থাকেন।[১]

সাহিত্যের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' জাতীয়তাবাদী সাহিত্য। কিন্তু

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১৬৩।

'আনন্দমঠ' সেই গৌরব ধারণে কতখানি সার্থক, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে তা বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে।

'আনন্দমঠের' মূল বক্তব্য বিচার-বিবেচনায় দেখা যায়— যে মহৎ পটভূমিকার উপর ভিত্তি করে 'আনন্দমঠ' রচিত হয়েছে, তা হলো ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, 'বেকার সৈন্য' বুভুক্ষ কৃষক আর সর্বহারা কারিগরদের সশস্ত্র শ্রেণী-সংগ্রাম, বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে 'দেশকে ইংরেজ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার শিক্ষা দেননি, পরামর্শ দিয়েছেন ইংরেজ প্রভুদের সাথে সহযোগিতা করার।' ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতার মন্ত্রে বলীয়ান হওয়ার শিক্ষা সেখানে সম্পূর্ণরূপে অবর্তমান। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে উড়ে আসা স্বৈরাচারী ইংরেজ কোম্পানী শাসক ছিল মহৎ উপকারী বন্ধু। শত্রু ছিল তৃতীয় কোন দল বা জাতি, যাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ প্রভুদের সহযোগিতা-প্রার্থী ছিলেন। ইংরেজ প্রভুদের সাহায্য করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভারতের সত্যিকার মুক্তির পথ। সুদীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের চাপে পড়ে যে মুক্তি প্রবাহের গতি রুদ্ধ ছিল এতদিন, তাকে আবার সোচ্চার করে তুলতে হলে চাই ইংরেজ প্রভুদের সহযোগিতা। বঙ্কিমবাবু বাঙালী জাতিকে সচেতন করে তোলার আগ্রহে অভয়বাণী শুনিয়েছেন:

"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা জানিতাম না, তাহা জানিতেছি ; যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে, ... যে সকল অমূল্য রত্ন ইংরেজের চিত্ত-ভান্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটি আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম— স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠা।"[১]

অদ্ভুত উক্তি! বঙ্কিমবাবুর এ যুক্তি যে-কোন জাতীয়তাবাদী মানব মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। যে ইংরেজ জাতির স্বৈরাচারী শাসনের নাগপাশ থেকে

১. ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড)।

মুক্তির ইচ্ছায় সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে নিরবচ্ছিন্ন গণ-সংগ্রাম চলছিল, সেই ইংরেজ জাতি করবে এদেশে জাতি প্রতিষ্ঠা! হাস্যকর প্রত্যাশা বটে।

একথা একান্তভাবে সত্য যে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ছিল ইংরেজ শাসনের মূল স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজ শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা চালিত হয়েই বঙ্কিম-চন্দ্র দেশবাসীকে এরূপ স্ববিরোধী শিক্ষাদানের প্রয়াস পেয়েছিলেন।১

ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল মূলত কৃষক সংগ্রাম, ইংরেজ শাসনের ভয়াবহ-তার হাত থেকে মুক্তির সংগ্রাম। এই বিদ্রোহের সমকালীন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার লিখেছেনঃ

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মারা গিয়াছে। জীবিত মানুষ মৃতদেহের কবর দিতে গিয়ে হয়রান হয়ে অবশেষে অসংখ্য লাশ নদীতে ফেলে দিয়েছে। ...১৭৭০ সালের স্বাভাবিক অনটন সরাসরি প্রকৃত চাপে রূপান্তরিত হয়েছিল। বছরের মাঝামাঝি সময়ের আগেই এক কোটি লোক মারা গিয়েছিল। জনৈক সরকারী কর্মচারীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় বছরের শেষে চুন-শ্রমিকের প্রতি দেড়শ' জনের মধ্যে মাত্র পাঁচজন বেঁচে ছিল। এবং দেশের তিন ভাগের এক ভাগ জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল।"২

ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভয়াবহতা ও কারণ সম্পর্কে হান্টার বলেছেন, "দুর্ভিক্ষের পরবর্তী কয়েক বছরে বহু সহায়-সম্বলহীন নিরন্ন চাষী যোগ দেওয়ায় তাদের (ফকীর-সন্ন্যাসীদের) সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এই সকল কৃষকের না ছিল বীজধান, না ছিল চাষাবাদের সাজ-সরঞ্জাম। ফলে এক রকম বাধ্য হয়েই তারা সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেয়। তারা পঞ্চাশ হাজার লোকের এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে লুঠতরাজ ও হত্যাকান্ড চালাতে থাকে।"৩

সমগ্র দেশের যখন এমনি ভয়াবহ অবস্থা-দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটনের জ্বালায় মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা, স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসন, শোষণ আর উৎপীড়নে সর্বত্র

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১৭৩।
২. পল্লী বাংলার ইতিহাস (Annals of Rural Bengal) হান্টার, পৃঃ ২৬, ৪৭।
৩. Ibid. পৃঃ ৬২।

জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের লেলিহান শিখা, তখন জাতীয়তাবাদের নায়ক (?) বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ ঝেড়েছেন শুধুমাত্র মুসলমান-দের বিরুদ্ধে। নির্যাতিত কৃষক-জনসাধারণের সংগ্রামকে এক রূপ দিয়েছেন, যেন তা মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সংগ্রাম এবং মুসলিম শাসনের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্রয়োজন ইংরেজ প্রভুত্বকে বরণ করা।[১] প্রচার করেছেন নিষ্ফল আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ত্ব। অর্থাৎ তার মূল বক্তব্য ইংরেজ না হলে মুসলমানের হাত থেকে হিন্দু সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নেই।

যে ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' রচিত সেই মহাবিদ্রোহের একমাত্র প্রধান নায়ক ছিলেন মজনু শাহ। সেই মহানায়ক মজনু শাহকে বঙ্কিম বাবু স্থান দেননি তাঁর 'আনন্দমঠে' শুধুমাত্র মজনু শাহ নয়, মূসা শাহ, চেরাগ আলী প্রমুখ আরও বহু মুসলমান চরিত্রকে বাদ দিয়েছেন একান্ত ইচ্ছাকৃতভাবেই। কারণ মুসলমান বিদ্রোহীকে তো মুসল-মানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতো না কিংবা মুসলমান বিদ্রোহীকে দিয়ে তো হিন্দু-সনাতন ধর্মের প্রচার করা চলতো না। মূলত বঙ্কিম বাবু বিদ্রোহের মুসলমান নায়কদের বাদ দিয়ে এমটা মহৎ শিল্পকর্মকে উদ্দেশ্যমূলক 'প্রচারপত্রে' পরিণত করেছেন, গলাটিপে হত্যা করেছেন একটা বিরাট সৃষ্টি সম্ভাবনাকে। বঙ্কিমবাবুর মত একজন শক্তিশালী সাহিত্যকর্মীর প্রচেষ্টায় 'আনন্দমঠ'-এর মত উপন্যাস অন্যরূপ ধারণ করতে পারতো। একটা কালজয়ী মহৎ শিল্পকর্মরূপে সর্বজন সমাদৃত হতে পারতো।

প্রকৃতপক্ষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরেজ পদলেহী এবং সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন একজন ইংরেজ দালাল মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শ্রেণী-সংঘাত অর্থাৎ ভূস্বামী শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে, ভূস্বামী শ্রেণীর পক্ষে কোনরূপ প্রগতিশীল ভাবধারা, সংগ্রামী কৃষকের প্রতি কোন সমর্থন, এমনকি সাহিত্যে সেই সংগ্রামের প্রতিফলন সহ্য করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভূস্বামী শ্রেণী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৭১।

মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যে বাস্তবতার পথ পরিহার করেই চলতে হয়েছিল এবং সকল প্রকার প্রগতিশীল বাস্তবমুখী সাহিত্যের বিরোধিতা করতে হয়েছিল। কারণ বাস্তবমুখী সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সামাজিক সম্পর্ক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এরই মাধ্যমে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর ভাবধারা এবং জীবন সংগ্রাম স্পষ্ট রূপ লাভ করে। সাহিত্য তখন হয়ে ওঠে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবন-সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই 'নীলদর্পণ' ও 'জমিদার দর্পণ' এর মধ্যে ফুটে উঠেছিল সমসাময়িককালের কৃষক জনসাধারণের অবস্থা। জমিদার ও নীলকর গোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের জ্বলন্ত উদাহরণ। তার সাথে সাথে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী কৃষক জনসাধারণের বলিষ্ঠ দৃঢ় পদক্ষেপ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাই হয়ত ভূস্বামী শ্রেণী ও ইংরেজ শাসনকে কায়েম করার মানসে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "সমাজ বিপ্লব সকল সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র. বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"[১] যে প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জোর গলায় চীৎকার ছেড়েছেন 'সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই আর্ট' (Art for art's sake) তিনি নিজেই তাঁর সেই মতবাদের অবমাননা করেছেন। তিনি 'আনন্দমঠ' সৃষ্টি করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক মতবাদের ভিত্তিতে। অবং তাঁর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য, ইংরেজ শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের জব্দ করা। বঙ্কিমচন্দ্র আন্তরিকভাবে ইংরেজ শাসন ও শোষণ আহবান করেছেন। তাঁর মতে, "যে মুসলমান শাসনকালে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হয়েছিল, ইংরেজ শক্তির সহায়তায় আবার তার পুনরুদ্ধার হবে।" বলা বাহুল্য, যে সময় মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে ব্যস্ত, সে সময় তিনি হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষে ইন্ধন যুগিয়ে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছেন।[২] হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলেছেন মুসলমানের বিরুদ্ধে। এবং তাতে বঙ্কিমবাবু সফল হয়েছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১৬৩—১৬৪।
২. আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (১৮৮২)।

পরবর্তী দু'শ বছরের ইতিহাস তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। হয়ত বা পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে ছিল এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুযায়ী অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের সাথে সহযোগিতাই ছিল দেশ ও জাতির মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই ঘৃণ্য অপমানকর পথ ধরেই একদিন মুক্তি আসবে। তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন, "ইংরেজ না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।"১

"ইংরেজ বাহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপন্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুস্পষ্ট। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।"২

এ কথা সুস্পষ্টভাবে সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ভূস্বামী শ্রেণী ও সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের মুখপাত্র। গোঁড়া পৃষ্ঠপোষক। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ থেকে ভূস্বামী শ্রেণীর অমানুষিক অত্যাচার ও ইংরেজ বণিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল, তাতে প্রতিক্রিয়াশীল ভূস্বামী সমাজ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিল। তাদের চিরকালের আধিপত্য আর শোষণ-পীড়ন কায়েম রাখার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম বাবু কলম ধরেছিলেন এবং গণমুখী সাহিত্যের বিরোধিতা করেছিলেন। স্বাধীনতা বিরোধী বঙ্কিমচন্দ্র জোর গলায় ঘোষণা করে-ছেন, "আমরা পরাধীন জাতি, অনেককাল পরাধীন থাকিব।"৩ পরাধীনতাই যদি বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য ছিল, তবে কিভাবে তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক এবং তথাকথিত রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান নায়করূপে অভিহিত হলেন? এর কারণও সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র মিলিত হিন্দু-মুসলমানের বাংলাদেশ তথা ভারতের মুক্তি বা সমৃদ্ধি কোনদিনই কামনা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় এবং সহায়তায় হিন্দু অভিজাত ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নবজাগরণ।৪ কিন্তু যে মুসলিম সম্প্রদায় এদেশে জন্মেছে এবং যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী

---

১. 'আনন্দমঠ,

২. 'আনন্দমঠ'

৩. ভারবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খন্ড) বঙ্কিমচন্দ্র

৪. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৬২।

এ দেশে বাস করে এ দেশের সুখ-দুঃখ উন্নতি-অবনতি ও উত্থান-পতনে শরীক হয়েছে, হিন্দুদের মতই যারা এদেশের সন্তান, তাদের সম্বন্ধে তিনি নির্বাক তো ছিলেনই, উপরন্তু ছিলেন তাদের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয়। ইংরেজ আগমনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন, 'ইংরেজ বাংলাদেশকে অরাজকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।'[১] অর্থাৎ সকল অরাজকতার মূল মুসলমান। সেই মুসলমান শাসন-দন্ড হারিয়েছে বলে তিনি উৎফুল্ল। মুসলমানদের শায়েস্তা করার জন্যে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলানো উচিত। স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মুসলমানদের দমিয়ে রাখাই বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং এই পথ ধরেই পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি কতখানি প্রবল হলে বঙ্কিম-চন্দ্রের মত একজন সাহিত্যসেবী এমন অভিমত প্রকাশ করতে পারেন!

রেনেসাঁসের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র নবজাগরণ কামনা করেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচারী ভূস্বামী ও ধনী, মধ্য শ্রেণীর। তিনি চেয়েছিলেন জমিদার মহাজনের ক্ষমতার দৃঢ়তা। তাদের নিজস্ব জাতীয়তাবাদ। তাই তিনি প্রকাশ্যভাবে কৃষক সংগ্রাম বা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক সমা-জের জরাজীর্ণ কাঠামো যাতে বজায় থাকে, তারই জন্যে উৎসর্গিত হয়েছিল তার সর্ব প্রচেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করতে পারেননি শোষণ-পীড়ন আর জরাজীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রগতিপন্থীদের সংগ্রাম। তাই দীনবন্ধু মিত্র ও মীর মোশাররফ হোসেন যখন 'নীল দর্পণ' ও 'জমিদার দর্পণে'র মাধ্যমে সর্বহারা কৃষক সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তুলে সংগ্রামমুখী করতে চাইলেন, বঙ্কিম বাবু তাদের উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠলেন। সাহিত্য নিরপেক্ষতার অভাব অজুহাতে তাদের বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক নাটককে 'সাহিত্যের অবমাননা' বলে গালি দিয়ে গাত্রদাহ মিটালেন, অথচ বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দমঠ' 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'রাজসিংহ' প্রভৃতি উপন্যাসে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিরপেক্ষতার অভাব। তার কোন উপন্যাসই নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসে রচিত ছিল না। বঙ্কিম-সাহিত্য অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের

১ 'আনন্দমঠ'।

ভাবাদর্শের প্রচার মাত্র।১ একটা বিশেষ শ্রেণীকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস দুঃখজনকভাবেই স্পষ্ট।

১৮৭২ সালের 'সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ'-এর পটভূমিকায় রচিত মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' গ্রন্থে জ্বলন্তভাবে ফুটে উঠেছে সর্বহারা কৃষক সমাজের উপর জমিদার শ্রেণীর অমানুষিক অত্যাচার-অবিচারের বাস্তব চিত্র। বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শনে' নাটকখানি ভাল হয়েছে বলে প্রশংসা করেও তার প্রচার বন্ধ করার দাবী জানালেনঃ

"বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এ পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিত কামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে এ সময় এ গ্রন্থের (জমিদার দর্পণ) বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক।"২

আবার নীলকরদের অসহনীয় অত্যাচারে যখন সমগ্র বাংলাদেশের কৃষককুল নিষ্পেষিত, সর্বহারা, দিশেহারা, সমগ্র দেশ জুড়ে চলছে তখন আন্দোলন, আলোড়ন আর বিদ্রোহ, ঠিক সেই মুহূর্তে বঙ্কিমবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র রচনা করলেন 'নীলদর্পণ' নাটক। চেষ্টা করলেন নীলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার আর শোষণের প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি তুলে ধরতে। বঙ্কিমবাবু 'নীলদর্পন'-এর জনপ্রিয়তার ভীত হয়ে উঠলেন। তিনি 'বঙ্গদর্শনে' লিখলেনঃ

"নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থে নাটক প্রণয়ন করেন আমাদের বিবেচনায় তাহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর। যে সকল নাটক এরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৃষ্টি সমাজ সংস্কার নহে, মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া সমাজ সংস্কারাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না।"৩

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১৬৩।
২. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০।
৩. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০।

যে নাটক নিয়ে সমগ্র দেশ জুড়ে তুলকালাম কান্ড, জনপ্রিয়তায় যা তুলনাহীন, সে মহৎ নাটক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এহেন অভিমত শুধুমাত্র দুঃখজনক নয়, কল্পনাতীত। "নীলদর্পণ' নিয়ে এহেন হীন মন্তব্য স্বার্থগতভাবে উদ্দেশ্যমূলক। তাই দুঃখজনকভাবে বলতে বাঁধা নেই, "বঙ্কিম সাহিত্য প্রগতি বিরোধী অভিজাত গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীর মুখপাত্র।"১ উদ্দেশ্যমূলক প্রচারপত্র।

কিন্তু কেন হল? ডঃ আহমদ শরীফের ভাষায়ঃ

"স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেমিক ও সেবক বঙ্কিম প্রতীচ্য আদলে জাতিগঠনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায়, সানন্দে ও সাগ্রহে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমের লেখনী তাই স্বজাতির চিত্তবোধন— হিতসাধন, লক্ষ্যচিন্তন ও গৌরবকথন কর্মে উৎসর্গিত হয়েছিল। কৈশোর-যৌবনে যিনি বিশ্বমানবের হিতবাদী ও মনুষ্যত্ব-পূজারী, সেই বঙ্কিম নিজের দেশকাল ও শাস্ত্র সমাজের বেষ্টনীর মধ্যে তার ভাব-চিন্তা-কর্ম সীমিত রাখলেন। যিনি সমুদ্র সাঁতারের সামর্থ্য রাখতেন, তিনি বদ্ধসরে তরঙ্গ সৃষ্টির সাধনায় হলেন নিরত ও তৃপ্ত।"২

প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় গোঁড়ামিই বঙ্কিমচন্দ্রকে উদার বিশ্বমানবিক কল্যাণ চেতনা-মূলক চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ভিন্নধর্মাবলম্বী যে কোন মানুষকে অশ্রদ্ধা ও অস্বীকৃতি তাঁর জীবনকে ভিন্ন খাতে চালিত করেছিল। যে মানুষ লেখনী ধরেছিলেন মানবকল্যাণে, যে মানুষ ছিলেন সংস্কারমুক্ত উদার, সে মানুষের সমাপ্তি ঘটলো একজন গোঁড়া হিন্দুরূপে। ডঃ আহমদ শরীফ যথার্থ বলেছেন, "সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসু মানুষ হিসাবে এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি হিন্দু হিসাবে। অতএব বঙ্কিম সাহিত্য হচ্ছে মানুষ বঙ্কিমের হিন্দু বঙ্কিমে ক্রমপরিণতির ইতিকথা ও আলেখ্য।"৩

## গণ-বিদ্রোহ

কোন দেশের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

বর্ষ, ১৩৮২), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা।

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৬১।
২. ঐ।
৩. বঙ্কিম বীক্ষাঃ অন্য নিরিখেঃ ডঃ আহমদ শরীফ (ভাষা-সাহিত্যপত্রঃ ৩য়

সুতরাং কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ও কৃষকই প্রাণ। কিন্তু বিদেশী শাসকদের শোষণ-মূলক নীতির প্রভাবে ক্রমান্বয়ে কৃষি ব্যবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে ; সৃষ্টি হয় সামন্তবাদী সমাজ ও জমিদার শ্রেণীর। রক্তাক্ত শোষণের দায়ে পড়ে কৃষক হারায় তার জমি। এভাবে ক্রমান্বয়ে এক বিরাট সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

কৃষকের আরেক শত্রু মহাজন। খাজনার টাকা সংগ্রহের তাগিদে কৃষক তার জমি ও বাড়ী বন্ধক রাখে মহাজনের কাছে। এই ঋণ সুদসহ বৃদ্ধি পেয়ে একদিন গ্রাস করে কৃষকের জমি-জমা ঘর-বাড়ী। কৃষক হয় জমিহারা আর মহাজন হয় জমিদার।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে এদেশের শিল্প ধ্বংস হল। যে 'মসলিন কাপড় সমস্ত পৃথিবীর কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু, ইংরেজ শাসকের চক্রান্তে সেই মসলিনের কারখানা বন্ধ হল। দৈহিক অত্যাচার ও অত্যধিক করের চাপে পড়ে তাঁতীরা পালিয়ে গেল বনে-জঙ্গলে। যে দেশের পণ্যসামগ্রী না হলে ইউরোপের বাজার জমতো না, ইংরেজ শাসন-শোষণের চক্রান্তে সেই দেশের বাজার পরিপূর্ণ হল ইংলন্ডে উৎপাদিত পণ্যে।

মোটকথা, বৃটিশ দুঃশাসনের কবলে পড়ে দেশের কৃষি ব্যাহত হল, শিল্প ধ্বংস হল। দেশ জুড়ে অভাব-অনটন আর হাহাকার। শোষণ-উৎপীড়নের চাপে আর অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো মানুষ। তারা বুঝলো, তাদের সামনে আসছে এক অনিবার্য ধ্বংস। এর হত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় অন্যায়-অবিচার আর রক্তাক্ত শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম।

১৮৫২ সালে স্যার জর্জ উইন্ গেট তাঁর রিপোর্টে কৃষক কর্তৃক দু'জন মহাজনকে হত্যার বিষয় উল্লেখ করে বলেছেনঃ আমার মনে হয় মহাজনের অত্যাচার কোন বিচিছন্ন ঘটনা নয়। বরং মহাজন ও সাধারণ কৃষকের মধ্যকার অধিকতর তিক্ত সম্পর্কের পরিণতির একটা উদাহরণ মাত্র।[১]

অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিশেহারা কৃষক সমাজ আত্ম-রক্ষার তাগিদে মারমুখো হয়ে রুখে দাঁড়াল। অবতীর্ণ হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামে।

---

১. India Today : R. P. Dutta. P. 275.

আজ এখানে কাল ওখানে এভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হল বেঁচে থাকার সংগ্রাম। সংঘবদ্ধ কোন দল নেই, নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলো না কেউ। তাই সংগ্রামী কৃষক শ্রেণী অসহায়ভাবে মার খেতে থাকলো। তবুও সংগ্রাম থামলো না ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত কৃষক সংগ্রামের ধারা পরিবর্তিত হল।

এ ধরনের একটা অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় কখনও বিপ্লবী বলে পরিগণিত হতে পারে না। শুধুমাত্র কোন বিপ্লবী শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত হয়ে বিপ্লবের হাতিয়াররূপে কাজ করতে পারে। তাই কৃষকদের স্বাধীন নেতৃত্বহীন আদর্শ ও লক্ষ্যহীন সংগ্রাম বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্তরে পৌঁছতে পারেনি। তবুও অসহনীয় শোষণের জ্বালায়, উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ সংগ্রাম কোনমতেই অর্থহীন নয়। অনবরত সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা তারা এক মহান সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছে। আজকের শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ ও গণসংগ্রামে জড়িত জনতা তাদেরই বংশধর। আজকের গণজাগরণের মূলে রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়ের আপোষহীন বিদ্রোহ।

১৭৬৩ সালের 'ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' থেকে শুরু করে ১৮৯৫-১৯০০ সালের 'মুণ্ডা-বিদ্রোহ' পর্যন্ত সকল বিদ্রোহই ছিল মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ১৭৬৩ সালে অত্যাচারী বেনিয়া কোম্পানীর অমানুষিক শোষণ-পীড়নে ক্ষিপ্ত হয়েই কৃষক, কারিগর, ফকীর-সন্ন্যাসীরা এক জোটে বিদ্রোহ করেছিল এবং পরবর্তীকালের সকল বিদ্রোহের মূল দাবী ও ধ্বনি ছিল একই। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি এবং জমিদার-মহাজনের হাত থেকে ভূমিস্বত্ব উদ্ধার— এই ছিল সকল বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। সময়ের ব্যবধান থাকলেও কোন বিদ্রোহই পরস্পর সম্পর্কহীন ছিল না। বরং পরবর্তীকালের বিদ্রোহগুলি পূর্বাপেক্ষা সংগঠিত ছিল। বোধ হয়, নীল বিদ্রোহকালেই কৃষক-সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা সংবদ্ধ ও সুগঠিত রূপ ধারণ করেছিল।

অথচ এসব আপোসহীন কৃষক-বিদ্রোহ বা সংগ্রামকে সহজ স্বীকৃতিদানে বুর্জোয়া-মানসিকতা-সম্পন্ন ইতিহাসবিদরা ছিলেন বিশেষভাবে বিমুখ। সংগ্রামী জনগণকে ডাকাত, উচ্ছৃঙ্খল জনতা বা দাঙ্গাকারী বলে আখ্যায়িত করতেও তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। জনসাধারণের সক্রিয় অস্তিত্ব ছিল আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

এদের সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে চাষী নাজেহাল হয়ে পড়ত। অনেক সময় নীলের চালান দিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হতো চাষীকে।১

নীলের চাষ বাংলাদেশের সর্বত্র বিস্তারিত ছিল। রাজশাহীতে একমাত্র আর. ওয়াটসন কোম্পানীরই অনেকগুলি নীলকুঠি ছিল। রাজশাহী জেলার নন্দকুঞ্জা, চন্দ্রপুর, গুরুদাসপুর, বীরাবাড়িয়া, সিধুলী, নাড়ীবাড়ী, লালপুর, বিলখারিয়া, কালিদাসখালী, চারঘাট, নন্দগাছি, রাজাপুর, আরাণী, সরদাহ, পানসাগর, দুর্গাপুর, দমদমা, বিড়ালদহ, নন্দনপুর, পাখাইল, ঝাড়া, কানষাট, রামচন্দ্রপুর হাট প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষ হত এবং নীলকুঠি ছিল।২

পাবনা জেলার অনেক জায়গায় নীলকুঠি ছিল। প্রধান নীলকুঠি ছিল দেওয়ানগঞ্জ, ধুলাউরি, ধোবরাখোল, কুমিদপুর, হিজলাবট প্রভৃতি স্থানে। হান্টার সাহেবের মতেঃ জেলার যে কোন দিকে ৪/৫ মাইল হাঁটলেই একটি নীলকুঠি পাওয়া যেত। সমগ্র জেলাতেই নীলকুঠি ছড়িয়ে ছিল।৩ ময়মনসিংহ জেলার পেয়ারপুর, নান্দিনা, ব্রাহ্মণপাড়া পক্ষীমারী, ইসলামপুর, দুরমুট, ইঞ্জিলপুর ও চন্দ্রা প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষ হত।৪

যশোহর, খুলনা ও নদীয়া জেলায় নীলের চাষ বিস্তার লাভ করেছিল সবচেয়ে বেশী। এসব এলাকায় বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর সবচেয়ে বৃহৎ কারবার ছিল। এর অধীনে মোল্লাহাটি, কাঠগড়া, খালবালিয়া ও রুদ্রপুরে ছিল প্রধান কনসার্ন। মোল্লাহাটি কনসার্নের অধীন ১৭টি কুঠি ছিল। মোট দুই লক্ষ চাষী ও কর্মচারী ছিল এসব কুঠিতে। কাঠগড়া কনসার্নে ৬টি কুঠি ছিল। এতে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৭৩,৮৩৯ জন। ১৮৬০ সালে এই কাঠগড়া কনসার্নেই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

---

১. যশোর-খুলনার ইতিহাসঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৭৬২-৬৩।
২. রাজশাহী জেলার ইতিহাস (২য়-খন্ড)।
৩. Statistical Accounts of Bengal : Hunter, vol. IX P. 330.
৪. জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্তঃ গোলাম মোবারক।

হাসিকদের বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণের স্পর্ধা রাখে। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় সুপ্রকাশ রায় বলেছেনঃ

"ইংরেজ শাসন ও জমিদার তালুকদার মহাজন গোষ্ঠীর শোষণ উৎপীড়ন হইতে মুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বঙ্গদেশ তথা ভারতের কৃষক বিদ্রোহগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার শমসের গাজীর বিদ্রোহ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাগলপন্থী গারো বিদ্রোহ, ওহাবী বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং উত্তর ভারতের মহাবিদ্রোহ এই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কৃষক সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল যে, শোষণ উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বৈদেশিক শাসক গোষ্ঠীর নিকট হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতষ্ঠা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। এই উপলব্ধি হইতেই বিভিন্ন বিদ্রোহে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা দিয়াছিল।.........১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কেবল দিল্লীতে একটা কেন্দ্রীয় সরকার নহে, উত্তর ভারতের চারটি প্রদেশের গ্রামাঞ্চল জুড়িয়া গণ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।.... তীতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' ভারতবর্ষের (তথা বঙ্গদেশের) জনসাধারণের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক হইয়া রহিয়াছে।"[১]

বলা বাহুল্য, প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু জমিদার ও মধ্যশ্রেণী যারা দালালী ও মোসাহেবীর জোরে রাতারাতি অর্থবান হয়েছিল এবং ইংরেজী শিক্ষার জোরে সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল, তারা যদি মুসলমানের প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন না করে ইংরেজ শাসকদের সাথে হাত না মিলাতো তাহলে হয়ত সর্বহারা কৃষকদের ক্রমাগত সংগ্রামের দাপটে বহু পূর্বেই ব্রিটিশ রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত হতে হতো, ইতিহাসের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। ভারতের মানচিত্র বদলে যেতো।

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, কৃষকদের এসব সংগ্রাম নেতৃত্বহীন হলেও আপোসমূলক ছিল না। সংগ্রামীরা কোন অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করেনি। সর্বাত্মক ধ্বংস ও পরাজয়ের মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয়েছিল প্রতিটি বিদ্রোহ।

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ ভূমিকা, পৃঃ ১৩।

'ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে' হাজার হাজার কৃষক ও কারিগর, 'সাঁওতাল বিদ্রোহে' পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল যুদ্ধক্ষেত্রে আপোসহীন সংগ্রামীরূপে মৃত্যু-বরণ করেছিল। ত্রিপুরার শমসের গাজীর বিদ্রোহী বাহিনী নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। ওহাবী বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ, তীতুমীরের সংগ্রাম, সর্বত্র একই পরিণতিঃ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও জমিদার মহাজন শ্রেণীর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রাম। স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সংগ্রামে পরিপূর্ণ জয় অথবা মৃত্যু।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনের একশত বৎসরের শোষণ-পীড়নেরই অনিবার্য পরিণতি। নানা কারণে এই বিদ্রোহ ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ রাজশক্তির ক্রমবর্ধমান শোষণযন্ত্রের চাপে পড়ে এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া জনসাধা-রণ তাদের আজীবনের ধর্মীয় ও শ্রেণীগত বিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করাই ছিল এই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য।

এই মহাবিদ্রোহে প্রথম অগ্নিস্ফুলিংগ জ্বলে উঠেছিল বাংলাদেশ হতেই। ব্যারাকপুরের সিপাহী মংগলপাণ্ডের ফাঁসির হুকুম হওয়ার সাথে সাথে এই বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র দেশে। অবশ্য এ বিদ্রোহের সূচনা বাংলাদেশে হলেও বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও তৎপরতা বাংলাদেশে ছিল না।

বাংলাদেশে এ বিদ্রোহের তৎপরতার অভাবজনিত কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রকাশ রায় বলেছেনঃ "দীর্ঘকাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করিয়া আসিলেও মহাবিদ্রোহের কালেও বাংলার কৃষক শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া নীরব দর্শকরূপে দণ্ডায়মান ছিল না। এই সময়েও তাহারা ছিল নীলকর দস্যুদল, জমিদার গোষ্ঠী ও ইংরেজ শাসনের সহিত জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে ব্যস্ত।"১

মহাবিদ্রোহের মাত্র তিন বছর পরই আরম্ভ হয়েছিল কৃষক জনসাধারণের সবচেয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম 'নীল-বিদ্রোহ'। তাই হয়ত মহাবিদ্রোহে বাংলার

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ৩০৪।

কৃষকসমাজ প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে নি। জমিদার ও শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রেখে-ছিল। লোক-লস্কর, যানবাহন ও খাদ্যবস্তু দিয়ে অনেকে ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করেছিল। অনেকে সিপাহীদের গতিবিধি ও তাদের গোলাবারুদের অভাবের সংবাদ পাঠিয়ে ইংরেজ শক্তিকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল।১

মহাবিদ্রোহে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে সুপ্রকাশ রায়ের বক্তব্যঃ

শহুরে মধ্যশ্রেণী আপন শ্রেণীর সমাজের সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে প্রগতি-শীলতার পরিচয় হইলেও ইহারা প্রথম হইতেই ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে আত্মহারা হইয়া ইংরেজদের ভারত জয়কে 'ভগবানের মঙ্গল বিধান বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং মহাবিদ্রোহে ইংরেজদের পরাজয় তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। সমসাময়িককালের শহুরে মধ্য শ্রেণী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সাহায্য না করিলেও অনেকেই মহাবিদ্রোহের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি স্বাধীনতার অগ্রদূত বলিয়া কথিত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যিনি 'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর পূজা করিব' বলিয়া আস্ফালন করিতেন, তিনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী ও অন্যান্যদের প্রতি কুৎসিৎ কটাক্ষ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।২

বলা বাহুল্য, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েই ইংরেজ শাসক-দল জমিদার ও মধ্যশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। তাই মহাবিদ্রোহকালে ইংরেজদের সাথে তাদেরই ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশী। এ দেশে যে এমনি একটি বিদ্রোহ ঘটতে পারে, সেদিন জমিদার মধ্যশ্রেণীভুক্ত স্বার্থবাদীরা তা কল্পনাও করতে পারেনি। "তীতুমীর প্রভৃতি কৃষক বীরগণ ১৮৩০ সালে বা তারও পূর্বে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়েছিল, কিন্তু ১৮৫৭ সালেও ইংরেজ কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ ছিল তথাকথিত প্রগতি-শীল বুদ্ধিজীবিগণের কল্পনারও অতীত।" তার কারণ মুসলমানরা চেয়েছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনের অবসান আর হিন্দু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা চেয়ে-

১. An Account of the Mutinies in Oudha : M.R. Gubbins. p. 58.
২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ৩০৩।

ছিলেন মুসলমানদের অগ্রগতি ও উন্নতির অবসান। এ কথা সম্ভবত অস্বীকার করা যায় না যে, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষ ও হিন্দুদের ইংরেজ প্রীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) সাংগঠনিক দিক থেকে সাফল্যজনক বিদ্রোহ। বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিদ্রোহের গুরুত্ব স্বীকার করে ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার-এ বলা হয়েছেঃ "পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ সালের কৃষক বিদ্রোহ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা। কারণ এই বিদ্রোহের পরিণতিস্বরূপ কৃষক ভূমির উপর প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনারই চূড়ান্ত ফলস্বরূপ বিধিবদ্ধ হয়েছিল 'প্রজাগণের সনদ' নামে কথিত ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।"[১] 'পাবনা জেলার ইতিহাসে' রাধারমণ সাহা বলেছেন, "১৮৭২-৭৩ সালের এ জেলার (পাবনা) খাজনা বিষয়ক গোলযোগই প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের মূল কারণ।"[২]

জমিদার গোষ্ঠীর সাথে প্রজার সম্পর্ক ছিল একমাত্র খাজনা বা নানাভাবে প্রজাদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের সম্পর্ক। খাজনা, টহুরী, পার্বণী, সেলামী, নজরানা ও আরও বহু প্রকার অজুহাতে কৃষকদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হত। অনাদায়ে করা হত অমানুষিক অত্যাচার। শেষ পর্যন্ত প্রজাদের বিরুদ্ধে আদালতে কয়েক দফা মামলা দায়ের হল। তাতে জয় হল প্রজাদের। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস এসে গেল এবং ভেতরে ভেতরে চললো বিদ্রোহের প্রস্তুতি।

বিদ্রোহের আয়োজন সম্পর্কে বার্কল্যান্ড সাহেবের মন্তব্যঃ

"১৮৭২ সালের মে মাসে কৃষকদের সমিতির অনেক লাভ ঘটতে থাকে এবং জুন মাসের মধ্যে সমগ্র পরগণায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। প্রজারা নিজেদের

---

১. Imperial Gazetteer : E. Bengal and Assam.

২. পাবনা জেলার ইতিহাসঃ রাধারমণ সাহা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯১।

বিদ্রোহী বলে পরিচয় দিতে সাহসী হল। 'বিদ্রোহী' শব্দের অর্থ সম্ভবত কৃষক সমিতির সভ্য। তাদের পরিচালক ছিলেন একজন চতুর ও ক্ষুদ্রজোত-দার। তারা বেশ শান্তভাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দিল যে তারা এখন বিদ্রোহী ও একতাবদ্ধ।১

এই একতাবদ্ধ কৃষকেরা প্রতিশোধ লালসায় শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। জমিদারদের সাথে স্থানীয় বিশেষ ধনী ব্যক্তিরাও যোগ দিয়েছিল। তাই বিদ্রোহীরা জমিদারদের সাথে সাথে ধনী ব্যক্তিদের উপরও হামলা চালাতে থাকল। বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হয়ে জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের বাড়ী লুণ্ঠন করতে লাগল। আকস্মিকভাবে এ বিদ্রোহের ব্যাপকতায় স্থানীয় কর্মকর্তাগণ দিশে-হারা হয়ে পড়েছিলেন। অনেক জমিদার ও ধনী ব্যক্তি ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে-গিয়েছিল শহরের দিকে। শেষ পর্যন্ত সরকার তাদের শোষণের অনুচর জমি-দার মহাজন গোষ্ঠীর রক্ষার জন্যে সামরিক ও পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দিল। পুলিশ বিদ্রোহের নায়কসহ প্রায় ৩০২ জনকে গ্রেপ্তার করলো। পরে বিচারে এদের অনেকেরই শাস্তি হয়েছিল।

অতঃপর সরকারের এক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহের অবসান ঘটলো: ঘোষণায় বলা হলঃ জমিদারদের তাদের ন্যায্য পাওনা অবশ্যই পাওয়া উচিত। কিন্তু অধিক আদায়ের জন্য প্রজারা অভিযোগ করতে পারে। এবং এ ব্যাপারে তাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগ অন্যায় নয়। অবশ্য প্রজাদের অভিযোগ ও শক্তি প্রয়োগ শান্তিপূর্ণভাবে হতে হবে।

এ দেশে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। তন্মধ্যে সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহের ফলেই সর্বপ্রথম কৃষকদের দাবী সমর্থিত হয় এবং কৃষক সমিতি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এ বিদ্রোহের মাধ্যমে কৃষক বিদ্রোহ আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। সিরাজ-গঞ্জের বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহকে একটা নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছিল।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সমগ্র উপমহাদেশে যে ধ্বংস বন্যা এনেছিল, সেই বিরাট ধ্বংসস্তূপের অনন্ত শূন্যতার মধ্যে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত কৃষক সমাজ

১. Bengal Under the Lt. Governors. Buckland, Vol, 1, P. 545.

অসহনীয় অন্যায়-অবিচার আর শোষণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসন ও শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করার মানসে কৃষক সমাজ অনবরত সংগ্রাম করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো। তাই তো এদেশের বুকের উপর অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হল। হয়ত সার্থকতার মাপকাঠির বিচারে এসব বিদ্রোহ ব্যর্থতারই নামান্তর, তবুও একথা জোর দিয়ে বলা যায় 'যে বিদেশী ইংরেজ শাসন-শোষণ ও জমিদার-মহাজনের অসহনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একমাত্র কৃষক জনসাধারণই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, অশিক্ষিত অপটু হাতে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল একমাত্র কৃষকরাই এবং ভারতের মুসলমান কৃষকই হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক বিদ্রোহ করেছিল, তারাই ভারতবর্ষের মাটি হতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য সব রকমের চেষ্টা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।[১] তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু ভদ্র সমাজ ইংরেজের অত্যাচার কর্মের যন্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। অত্যাচারের প্রকোপ যত বেড়েছে, তাদের ইংরেজ-প্রীতি তত গভীর হয়েছে।

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে একমাত্র 'নীল বিদ্রোহ'ই উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম সফল গণ-বিদ্রোহ। "নীল বিদ্রোহ' পূর্বগত স্বাধীনতাকামী সকল গণ-সংগ্রামেরই ঐতিহ্যবাহী।"

---

১. সুপ্রকাশ রায়ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৪৪।

# নীল বিদ্রোহ

# নীলের আদিকথা

নীলের আদি উৎপত্তি ও ব্যবহার বিষয়ে প্রকাশিত প্রামাণিক কোন দলিল নেই। প্রাচীন উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের মতে, নীল ছিল বন্য গাছ বিশেষ। এর সঠিক আবাস ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ, আফ্রিকা ও আরবের বিভিন্ন বনাঞ্চল। পরে চাষাবাদের মাধ্যমে নীল ব্যবহারিক পর্যায়ে আসে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রায় তিনশ' রকমের নীল ছিল। এই উপমহাদেশে নীল ছিল প্রায় ৪০ রকমের।

কারও কারও মতে, ভারত বা ইন্ডিয়াতে নীল প্রচুর পরিমাণে জন্মাত এবং বিভিন্ন দেশে তা রপ্তানি হত বলেই নীলকে গ্রীস , রোম, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে বলা হত 'ইন্ডিগো'। ফার্সী ভাষায় এর নাম 'তুখমে নীল', আরবী ভাষায় বলা হত 'নাভুন নীল' সংস্কৃত শাস্ত্রে এর নাম 'বিষশোধনী বাংলাদেশে এটা 'নীল' বলেই পরিচিত। কিন্তু মূল ও জাতিগতভাবে এর নাম 'ইন্ডিগো ফেরা'। সবচেয়ে ভাল জাতের যে নীল, ল্যাটিন ভাষায় তার নাম 'ইন্ডিগো টিনটোরিয়া' এবং এ জাতের নীল পাওয়া যেত ভারত ও বাংলাদেশে। আবার অন্য মতে এটা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলীয় দেশজ গাছ। এবং উক্ত অঞ্চলে চাষাবাদের মাধ্যমে তা ব্যবহারিক জীবনে স্থান পায়। কিন্তু চীন দেশের নীল গাছের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুর্বস্ (Forbes) ও হ্যামস্লে (Hemsley) মন্তব্য করেছেন যে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলোতে নীল বন্যাবস্থায় ছিল এবং পরে চাষাবাদের মাধ্যমে তা আয়ত্তে আসে। তবে কোথায় বা কোন্ দেশে তা বলা মুশকিল।

ভারতীয় লেখক Ramphins-এর মতে 'ইন্ডিগো ফেরা' গুজরাট অঞ্চলের দেশীয় সম্পদ। বোধ হয় দক্ষিণ ভারতেই সর্ব প্রথম নীলের চাষ শুরু হয়। সম্ভবত পশ্চিম ও মধ্যভারতেই সর্বপ্রথম নীলকে রঙের উৎসরূপে ব্যবহার

করার রীতি প্রচলিত হয়।[১] বন্যাবস্থায় নীল গাছের নাম ছিল ইন্ডিগো কো-ইরুলিয়া (Coerulea)।

আবার কুর্জ (Kurz)-এর মতে, ব্রহ্মদেশের ইরাবতীর পল্লী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ নীলের চাষ হত। তাঁর মতে নীলকে ভারতের দেশীয় গাছ হিসাবে গণ্য করার মধ্যে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।[২]

রং করার বস্তু হিসাবে নীলই সর্বাধিক প্রাচীন এবং প্রাথমিক যুগের মানব সমাজে নীলই ছিল রং করার কাজে একমাত্র ব্যবহার্য পদার্থ। সম্ভবত খৃস্টপূর্ব ষোল শতাব্দীতে মিসরের অষ্টাদশ বংশীয় রাজাদের মমি নীল রঙে রঞ্জিত কাপড়ে আবৃত ছিল।[৩] ভারতে নীলের ব্যবহার ছিল সর্বাধিকভাবে ব্যাপক এবং অদ্যাবধি এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগেও নীলের ব্যবহার চলে আসছে। নীলের গাঢ়ত্ব এবং রকম অনুযায়ী নীলের বিশেষ কতগুলো নাম এখনও প্রচলিত রয়েছে। যেমন 'নীলা' বলতে বোঝায় গাঢ় নীল। আবার সংস্কৃত লেখকগণ 'নীলা' শব্দ দিয়ে মাছি, পাখি, এবং গাভী প্রভৃতি বোঝাবারও চেষ্টা করেছেন। 'নীলপলা', 'নীলমণি', 'নীলরত্ন' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বোঝানো হত বিভিন্ন জাতের পাথরকে। আবার নীলাভা দিয়ে বুঝিয়েছেন নীল ফুল, নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও মেঘকে।

'নীলা'র একটা বিমূর্ত অর্থও রয়েছে— গাঢ়ত্ব। এক প্রকার গাছ যা থেকে নীল অথবা গাঢ় রং সৃষ্টি হয়। সম্ভবত কথিত 'ইন্ডিগো' 'ইন্ডিগো ফেরাই' এর একটা অন্তর্নিহিত অর্থ।

কানাড়ী ভাষায় নীলকে বলা হত 'ওলিনীল' (Ollenile) এবং 'হেনুনীল' (Hennunile)। তামিল ভাষায় বলা হত 'আভিরী' (Aviri) এবং 'কারুনদোষী' (karundoshi)। 'আভিরী' মানে স্নিগ্ধ। 'কারুনদোষী' ব্যবহৃত হত কালো নীল অর্থে।

---

১. Pamphlet on Indigo : G. Watt. P. 7.

২. Ibid, p. 8. 12345» 679ü8 1234 12 34

৩. The Columbia Encyclopaedia: Vol. 3. p. 1019.

ডায়োসকরিডেস (Dioscorides, 60 A. D.) নীলকে 'ইন্ডিকভ' (Indikov) নামে অভিহিত করেছেন। প্লিনি (Pliny) বলতো 'ইন্ডিকাম' (Indicum) এবং পেরিপ্লাস (Periplus)-এর নাম ছিল ইন্ডিয়ান ব্লাক (Indian black)। নীল রং আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এটা কালো রং হিসাবে ব্যবহৃত হত বলেই একে বলা হত 'ইন্ডিয়ান ব্লাক।'

নীলের বীজ থেকে এক প্রকার তেল বা আরক প্রস্তুত হত। চিকিৎসার জন্য তা বিশেষ কাজে লাগত। মৃগীরোগ এবং স্নায়ুবৈকল্যে এসব আরক বিশেষ ফলপ্রসূ ছিল। ব্রঙ্কাইটিস ও ক্ষত চিকিৎসায় এই আরক ছিল অত্যন্ত উপকারী।[১]

---

১. Pamphlet on Indigo : G. Watt. P. 7.

এ সম্পর্কে তৎকালীন বিভিন্ন চিকিৎসকের অভিমত বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ

1. "Used by Native Practitioners in Chronic Affictions of the Brain."
   (Civil Surgeon F. Anderson, N. B. Bijnor, N.W. porvince)
2. "A Chief Remedy of Mineral poison.' (V. Unmegudien Meltopollian, Madras)
3. "I have used it frequently for sores of horses : it is supposed to promote the growth of hair." (Surgeon, Major C. W. Calthrop, M. D. Morar)
4. "It is used as an external application in the form of paint over the abdomen in cases of tymlanites and retention of urine. In the form of paint or ointment it largely used in sores and diseases of cattle."
   (Civil Surgeon. F. H. Thornton. B. A. M. B. Monghyr)
5. "Indigo is used by natives as cooling application to burns and sores of horses."
   (Asstt. Surgeon, Bhagwan Dass, Civil Hospital. Rawalpindi, Punjab),
6. "It is given as an antidote in cases of poisoning by arsenic." (Surgeon, W. F. Thomas, Madras Army. 23rd. Regiment, M. N. I. Mangalore)
7. "Used as a Medicine as well as a dye." (Surgeon, Major F. E. T. Aitohison, CIE)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভেনিসিয়ান পরিব্রাজক মার্কোপোলো ত্রিবাঙ্কুরের কোলিয়াম বন্দরে প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুত হতে এবং বিদেশে রপ্তানী হতে দেখেছিলেন। ১৫৯৫ সালে জন্ হুইঘেন ভান লিন সোটেন তাঁর 'জার্নাল অব্ ইন্ডিয়ান ট্রাভেল' (Journal of Indian Travel) নামক গ্রন্থে বিশদভাবে নীল প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করে গেছেন। তাতে দেখা যায় তখন নীলকে বলা হত গ্যালি (Gali)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কান্তে (Cante) এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ট্রাভারনিয়ারও নীল প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে গেছেন। বায়না প্রভৃতি বন্দরে তখন ওলন্দাজ বণিকরা নীল সংগ্রহের কাজে বসবাস করতো।১ বস্তুত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারতে নীল উৎপন্ন ও প্রস্তুত হত। রোমান সাম্রাজ্য যুগে এবং মধ্যযুগে কিছুসংখ্যক ভারতীয় নীল ইউরোপে রপ্তানি হত।২

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতের সাথে ইউরোপের নতুন বাণিজ্য সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর মত নীলও পারস্য উপসাগর দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হয়ে ইউরোপে পোঁছতো। ১২২৮ সালে ফ্রান্সের মার্সাই (Merseille) বন্দরে যে নীল পোঁছেছিল তাকে 'বাগদাদে নীল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে তা ছিল ভারত হতে রপ্তানী করা নীল যা বাগদাদ হয়ে ইউরোপের বন্দরে পোঁছেছিল।

মধ্যযুগে জার্মানী, ফ্রান্স, প্রুশিয়া, ইটালী ও ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ভোড (Voad) নামক এক প্রকার নীল রং প্রস্তুত হত। তবে তা ভারতের নীলের মত সুন্দর এবং গাঢ় ছিল না। প্রথম দিকে ইউরোপের তাঁতীরা ভোডের সংগে নীল মিশিয়ে ব্যবহার করত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের তাঁতীরা উপলব্ধি করলো যে, নীলের ব্যবসা বেশ লাভজনক এবং নীল রঙের কাজে উৎকৃষ্ট। এরপর থেকে ইউরোপের বাজারে নীলের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চললো।

তৎকালে হল্যান্ড ছিল নীলের কাজের জন্য সমগ্র ইউরোপের মধ্যে বিখ্যাত স্থান। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা রং করার

১. Pamphlet on Indigo and Berneir's Travels.
২. Blair B. Kling : The Blue Mutiny, P. 16.

জন্যে কাপড় পাঠাত হল্যান্ডে। রঙের ব্যবসায় হল্যান্ডের বহু লোক বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল। তৎকালে ভারতের (অবিভক্ত) সাথে নীল ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায় পর্তুগীজদের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। প্রায় একশ' বছর কাল পর্তুগীজের রাজধানী লিসবন ছিল ইউরোপে এ দেশীয় পণ্যদ্রব্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু পর্তুগীজদের প্রধান দোষ ছিল যে, তারা শুধু প্রচুর মুনাফা অর্জন করেই সন্তুষ্ট থাকত, নিজেদের শিল্প প্রচার বা প্রসারের চেষ্টা তারা করতো না। তাই পর্তুগীজদের এই একচেটিয়া ব্যবসা বেশী দিন টিকলো না। ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও পর্তুগীজদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ১৬০০ সালে ইংরেজ ও ১৬৩১ সালে ওলন্দাজ বণিকেরা নিজ নিজ কোম্পানী গঠন করল এবং প্রচুর পরিমাণ নীল হল্যান্ডে পাঠাতে থাকল। হল্যান্ড থেকে সেই নীল সমগ্র ইউরোপে সরবরাহ করা হত।

এর ফলে সমগ্র ইউরোপের ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কারণ প্রচুর নীল আমদানী হওয়ার ফলে ভোডচাষী ও ভোডের ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল। ফ্রান্সের অনেক ধনী সন্তানদের ভাগ্য গড়ে উঠেছিল এই ভোডের উৎপাদনকে কেন্দ্র করে। তারা ভোড চাষের একটা অংশ ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসকে কর হিসাবে প্রদান করতো। ১৫৯৮ সালে ফরাসীদের মধ্যে নীলের ব্যবহার আইনত দন্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হল। ১৬০৯ সালে রাজা চতুর্থ হেনরী নীল ব্যবহারকারীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। জার্মানীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। জার্মানীতে ভোড প্রস্তুতকারীরা 'ডাইড হেরেন' (ভোডের জমিদার) উপাধিতে সম্মানিত হতেন। কাজেই নীলের আমদানীতে 'ডাইড হেরেনগণ' বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলেন। ১৬০৭ সালে জার্মান সম্রাট রুডলফ্ জার্মানীতে নীলের চাষ বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন।

ইংল্যান্ডেও অনেকদিন ধরে ভোড ও নীল ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংগ্রাম চলেছিল। ১৫৮১ সালে রাণী এলিজাবেথ ভোড ও নীল একই সঙ্গে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পশমে ঈষৎ কালো রং ব্যবহারে নীল ভাল কাজ করতো

কিন্তু ইংল্যান্ডের তাঁতীরা কাপড় রং করার কাজে শুধুমাত্র ভোড-এর ব্যবহারই জানত, নীলের ব্যবহার তারা জানত না। তাই তারা হল্যান্ড থেকে কাপড় রং করিয়ে আনত এবং এ সকল কাপড় ইংল্যান্ডের বাজারে বেশ চড়া দামে বিক্রি হত। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের একজন ব্যবসায়ী হল্যান্ড থেকে কাপড় রং করার কায়দা শিখে এল। ১৬০৮ সালে এই ব্যবসায়ী ইংল্যান্ডের রাজার নিকট হতে নীল দিয়ে কাপড় রং করার একচেটিয়া ব্যবসায়ী অধিকার আদায় করলো। এ সময় হল্যান্ড থেকে কাপড় রং করিয়ে আনা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হলো। এর ফলে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল। তারা প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত আদালতকে রায় দিতে হলো যে নীল বিষাক্ত। নীল আর ব্যবহার করা চলবে না। আইন করে নীলের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হল। এই আইন ১৬৬০ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

কিন্তু আইন যতই কঠোর হোক না কেন, নীলের ব্যবহারকে ঠেকিয়ে রাখা গেলো না। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে নীলের ব্যবহার চলতেই থাকলো। হল্যান্ড ও বেলজিয়াম একচেটিয়া ব্যবসায় মুনাফা লুঠতে লাগলো।

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস দেখলেন যে, নীলের ব্যবহার না করায় দেশের বস্ত্রশিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চার্লস বেল-জিয়াম থেকে কয়েকজন কারিগর আনিয়ে ইংরেজ তাঁতীদের নীল রং ব্যবহারের পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। আবার এই একই সময়ে ভারত থেকেও প্রচুর পরিমাণে নীল আমদানী হতে লাগলো। ১৬৬৪ সাল থেকে ১৬৯৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় নীলের আমদানীর পরিমাণ ছিল ১২,৪২,০০০ পাউন্ড।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নীলের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলো ইউরোপের প্রায় সব দেশ থেকেই। শুধুমাত্র জার্মানীর নুরেনবুর্গ শহরের তাঁতীরা উক্ত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নীল বর্জন করার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলো। এ সময় নীলের বিকল্প কিছু আবিষ্কারের জোর গবেষণা চলছিল। শেষ পর্যন্ত তাও ব্যর্থ হলো। মোট কথা এ সময় নীলের ব্যবহার ব্যাপক আকার ধারণ করলো। অবশ্য এ সময় আমেরিকাতে নীলের বিকল্প কিছু আবিষ্কারের প্রচেষ্টার সাথে

সাথে নীলে ভেজাল মিশিয়ে ভারতীয় নীলকে হেয় প্রতিপন্ন করারও জোর চেষ্টা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ফরাসী, স্পেনীজ, পর্তুগীজ ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা নীলের চাষ আরম্ভ করেছিল। ফলে ভারতীয় নীলের চাহিদা অনেকখানি কমে গেলো।

পশ্চিম ভারতীয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা দেখলো যে, কফি, চিনি ও অন্যান্য জিনিস রপ্তানীতে অনেক বেশী লাভ। তারা সাময়িকভাবে নীল ব্যবসায় ঢিলা দিল। ভারতীয় নীলের ব্যবসা এ সময় হঠাৎ মন্দাতাব ধারণ করলো।

এ সময় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছলো এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে আমেরিকা আলাদা হয়ে গেলো। ইংরেজ তাঁতীরা পড়লো বিপদে। আমেরিকার নীল আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা অন্যান্য দেশ থেকে নীল আমদানী শুরু করলো। এ সময় (অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি) ইংরেজ তাঁতী-দের বাধ্যগতভাবে উৎকৃষ্টমানের নীলের জন্যে নির্ভর করতে হতো স্পেনীয়, গুয়েতেমালা ও ফরাসী সান্ত-ডোমিংগো এবং মধ্যমানের নীলের জন্যে দক্ষিণ কেরোলিনার উপর।

এ সময় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীল প্রস্তুত হত প্রাচীন দেশীয় প্রথায়। এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ভারতীয় নীল বর্জন করার সংকল্পে এসব নিকৃষ্ট-মানের নীল আমদানী করতো। ১৭২৪ সালে দেখা গেল যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পশ্চিম ভারতীয় নীলকরদের সাথে আর পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে ইংরেজ তাঁতীদের এক প্রকার বাধ্য হয়ে উৎকৃষ্টমানের নীলের জন্যে স্পেনীয়, গুয়েতেমালা ও ফরাসী সান্ত-ডোমিংগো এবং মধ্যমানের নীলের জন্যে দক্ষিণ কেরোলিনার উপর নির্ভর করতে হত।[১]

১৮৩৫ সালে প্রকাশিত জন ফিলিপ্স-এর নীল চাষ বিষয়ে রচিত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মঁশিয়ে লুই বান্নো বা বোনার্দ নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক বাংলা-দেশে সর্বপ্রথম নীল চাষ আরম্ভ করেন। ১৭৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং হুগলী জেলার তালডাঙ্গায় ছোট্ট একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু

১. Oriental Commerce (London 1813)! W. Milburn. P. 213-14.

স্থানটি নীল চাষের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় পরে তিনি চন্দন নগরের কাছে গোন্দল পাড়ায় নীলকুঠি স্থানান্তর করেন।১

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেখলো যে, নীলের জন্যে ইংরেজদের ফরাসী ও স্পেনীয় কলোনীর উপর নির্ভর করতে হয়, তাই তারা বাংলাদেশে নীল চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। নীল চাষের ব্যবসায়িক লাভের প্রতি তাদের নজর পড়ল আরও বেশী। ইংরেজদের মধ্যে ক্যারেল ব্লুম্ ১৭৭৮ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নীলকুঠি স্থাপন করেন। ক্যারেল ব্লুম্ দাবী করেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এই লাভজনক ব্যবসার পত্তন করেন এবং নীল চাষের উন্নতি বিধানের প্রতি উৎসাহী হন।২

আঠারো শতকের শেষ পর্বে বাংলাদেশে নীলের চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হলো। ১৭৮৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে লর্ড কর্নওয়ালিসের এক মিনিটে (Minute) উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "বাংলাদেশ হালে আমদানীকৃত নীল সম্পদ আহরণের নতুন উৎস। ইউরোপের বিরাট একটা অংশের চাহিদা পূরণেও সমর্থ।"৩

১৭৭৯ সালে কোম্পানী সকল ইউরোপীয়কেই বাংলা ও বিহারে নীল চাষের সুযোগ ও অধিকার দিল। তারা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ থেকে নীলের বীজ এনে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় বপন করলো। এ সময় কোম্পানীর অফিসারগণও নীলের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়লো। নীল চাষে তাদের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হচ্ছে এমন কথা তারা ভাবলেও দেখা যায়, তারা প্রচুর টাকা নিয়মিতভাবে দেশে

---

১. A Dictionary of Economic products. Watt . P. 393 : History of Bihar : Minden Wilson, P. 69-72.

২. The Economic History of Bengal : N. K. Sinha, P. 207.

৩. The Directors of East India Co, Seeing the product of renewing their Indigo transactions and at the same time of saving the British manufacturers from dependence on French and Spanish Colonists, resolved to take active steps towards starting Indigo cultivation in Bengal," Pamphlet on Indigo : Watt. P. 11 ; Bengal Board of Trade (Indigo) Proceedings. Dec, 6, 1811.

পাঠাচ্ছে। প্রথম দিকে কোম্পানী ফ্যাক্টরীর মালিকানা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। অনেক ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় নীল চাষের দায়িত্ব নিতেও স্বীকার করেছিলেন। তারা লীজ হিসাবে জমি নিয়ে চাষ করতো এবং কোম্পানী তাদের কাছ থেকে Contract rate-এ নীল খরিদ করতো।

১৭৮০ সালে প্রিনসেপ্ নামক এক ভদ্রলোকের সাথে কোম্পানীর কন্ট্রাক্ট হয়েছিল। তিনি নীলের সাথে সাথে এ দেশ থেকে তুলা ও চিনি ইংল্যান্ডে চালান দিতেন। ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানী এ রীতিতে আরও অনেকের সাথে চুক্তিবন্ধ হয়েছিল। ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত নীল ব্যবসায় প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ ক্ষতি হত এবং পাঠাবার খরচ নিয়ে আরও অতিরিক্ত ১০ ভাগ এর সাথে যোগ হত। ১৭৮৮ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টররা জানালেন যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে নীল চাষে ক্ষতি হলেও এর একটা রাজনৈতিক দিক রয়েছে। বাংলাদেশের লোকদের পরিশ্রমে নীলের মত একটা মূল্যবান বস্তু যদি ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের জন্য পাওয়া যায়, তাই হবে কোম্পানীর রাজস্বের জন্য অনেক লাভজনক। এতো টাকা লাগাবার পর নীল চাষে অবহেলা করা উচিত হবে না। ...... কোম্পানীর কর্ম-চারীরা যদি বাংলাদেশ থেকে টাকার পরিবর্তে নীল পাঠাতে পারে তাই হবে কোম্পানীর জন্য অনেক লাভজনক।[১]

১৭৮৮ সালে কোম্পানী অধিকাংশ চুক্তি নাকচ করে দিলেন। মাত্র ৮/১০টা ইউরোপীয় কোম্পানী পশ্চিম ভারতীয় কৌশলে বাংলাদেশে নীল উৎপাদন অব্যা-হত রাখলো। এমনকি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকজন নীলকরকে এদেশে নীল ব্যবসায়ের সুযোগ দেওয়া হল। রবার্ট হেভেন্ নামক এক ভদ্রলোক, যিনি তের বছর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীল উৎপাদনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তাকে বাংলাদেশে পাঁচ বছরের জন্য বসবাস ও নীল তৈরী করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।[২]

জে. পি. স্কট নামক এক ভদ্রলোক নীলের ব্যবসায় বেশ কিছুটা লাভ দেখাতে সমর্থ হলেন। কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অংগীকারে নীলচাষে খুব উৎসাহ

---

১. Statistical Accounts of Bengal : Vol. 11, P. 229.
২. Blue Mutiny : Blair B. Kling, P. 18.

দিতে থাকল এবং সাথে সাথে নীলের মান উন্নত ও দামে সস্তা করার ব্যাপারেও চাপ দিল। ১৭৮৭ সালে ডাঃ হোড পশ্চিম ভারত পরিদর্শন করে মন্তব্য করলেন যে, ওদিকে নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কাজেই বাংলাদেশে নীলের চাষের প্রতি জোর দিতে হবে এবং বাংলাদেশের নীলকে আরও উন্নত পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে।

বাংলাদেশে ব্যাপক নীলচাষের পরিকল্পনা নিয়ে ১৭৯৫ সালে যশোহরে নীলচাষ শুরু করা হল এবং মিঃ বন্ড রূপদিয়ায় প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করলেন। ১৭৯৬ সালে মিঃ টাফ্‌ট নীলকুঠি বসালেন মাহামুদশাহীতে। ১৮০১ সালে সিভিল সার্জন মিঃ এন্ডারসন বারুন্দি ও নীলগঞ্জে নীলকুঠি বসালেন। ১৮০১ সাল পর্যন্ত ঢাকা ও যশোহর জেলায় অনেক নীলকুঠি স্থাপিত হল। যশোহর জেলার মোট আয়তনের ১০৩ বর্গমাইল ছিল নীলচাষের অধীন।

পাবনা জেলায় এত অধিক সংখ্যক নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল যে, জেলার যে কোন দিকে ৪/৫ মাইল হাঁটলেই একটা নীলকুঠি চোখে পড়ত। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত নিম্ন বাংলায় প্রায় পাঁচশ' নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৪-টি কনসার্ন বা কুঠি ছিল, যারা নীল বিদেশে রপ্তানি করত। যে সব কনসার্নগুলো নীল হাঙ্গামায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, উত্তম নীল উৎপাদনে বিশেষ খ্যাতি ছিল ওগুলোর।[১] নিম্ন বাংলায় উৎপাদিত নীলের অর্ধেক উৎপন্ন হত নদীয়া ও যশোহর জেলায়। একমাত্র জেমস্ হীলেরই ১১টি কুঠি ছিল নদীয়ায়। ১৮১৫ সালে জেমস্ হীল্ নদীয়ায় আসে এবং নিশ্চিন্তপুরে প্রথম কুটি স্থাপন করে। নীল উৎপাদন ও ব্যবসা ক্ষেত্রে Bengal Indigo Co. ছিল সবচেয়ে বড়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বারাসাতে ওদের অনেক কুঠি ছিল।[২] ঢাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে নীলের একচেটিয়া ব্যবসায়ী ছিল জে. পি. ওয়াইজ। Robert Watson Co. নদীয়ার আরেকটি নামকরা কোম্পানী। মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী ও পাবনায় এদের ৭টি কনসার্ন ছিল। চারটি নামকরা রপ্তানীযোগ্য কোম্পানী ও অনেক-

১. Blue Mutiny. P-20-26.
২. Indian and Home Memories (London, 1911) P. 80.

গুলো ছোট ছোট কনসার্নের মালিকানা ছিল বাঙালীদের হাতে।[১] মেসার্স আর, ওয়াটসন এন্ড কোম্পানী রাজশাহী জেলায় অনেক বড় বড় নীলকুঠি তৈরী করে জমজমাট ব্যবসা চালিয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চল জুড়েও অনেক বড় বড় নীলকুঠি তৈরী হয়েছিল। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে নীল চাষ দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।[২] ১৭৯০ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ইংল্যান্ডে নীল রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১,৮৪,০৮,১৫ পাউন্ড। মাত্র পাঁচ বছর পর ১৭৯৫ সালে শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে নীল রপ্তানী হয়েছিল মোট ২৯,৫৫,৮৬২ পাউন্ড। এর পরের বছর রপ্তানী হয়েছিল ৪৫,৪৮,৬৭০ পাউন্ড। আমদানীকৃত নীলের মধ্যে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় বাৎসরিক মাত্র ২০ লক্ষ পাউন্ড। বাকী নীল ইংরেজ ব্যবসায়ীরা রপ্তানী করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে।[৩]

গভর্নর জেনারেল জন শোর বাংলাদেশে নীলের চাষ ও কলকাতা হতে রপ্তানীকৃত নীলের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। আগ্রা ও অযোধ্যা এক সময় ইংল্যান্ডে রপ্তানী নীলের মোট পরিমাণের চার-পঞ্চমাংশ চাহিদা পূরণ করতো। জন শোর আগ্রা-অযোধ্যা হতে বাংলাদেশে আনীত নীলের উপর শতকরা ১৫ ভাগ ডিউটি বসিয়েছিলেন।[৪] পরবর্তী সালে শুধুমাত্র যশোহর জেলা থেকে বাৎসরিক হারে যে নীল রপ্তানী হত তার হিসাব দিতে গিয়ে কলকাতার নীল ব্যবসায়ী মেসার্স আর. টমাস এন্ড কোং উল্লেখ করে যে ১৮৪৯-৫০ সালে রপ্তানী হয় মোট ১৬,৮১৮ মণ, ১৮৫৫-৫৬ সালে রপ্তানী হয় মোট ৬,৮৮৫ মণ।[৫] এভাবে বাংলাদেশ ও অযোধ্যার নীলই ইউরোপের বাজারে ক্রমশ চাহিদা বাড়িয়ে তুললো। নীল ব্যবসাকে একচেটিয়া করার উদ্দেশ্যে এক সরকারী আদেশ জারি হল যে-কোন দেশীয় লোক নীল চাষের

---

১. New Calcutta Directory (Cal. 1857).
২. Statistical Accounts of Bengal: Hunter. Vol. V111. P. 87. Vol. IX, P. 148-149. 330.
৩. নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ : প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৬-৭।
৪. Blue Mutiny : P. 18.
৫. Statistical Accounts of Bengal : Vol. 11, P. 300.

ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বাংলাদেশের উৎপাদিত নীলের লাভ-জনক অর্থ দিয়েই অযোধ্যায় নীলচাষের ব্যাপকতা বাড়ান হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংল্যান্ডে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের বিশেষ গুরুত্বলাভের এবং নীলচাষের দ্রুত অগ্রগতির কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব। সেকালে ইংল্যান্ডে কোন কার্পাস শিল্প ছিল না ; ছিল পশম শিল্প। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে কলকারখানা দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। এসব কলকারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহ হত এদেশ থেকে। কাঁচা চামড়া, তেল, নীল, পাট, কার্পাস প্রভৃতি ছিল কলকারখানার জন্য অত্যা-বশ্যকীয় কাঁচামাল। বাংলাদেশ থেকে এসব কাঁচামাল রপ্তানী হত প্রচুর পরি-মাণ। ফলে বিদেশের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব বেড়ে চলে এবং নীলচাষ বাংলাদেশে দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

বাংলাদেশ ইংরেজদের অধিকারে আসার পূর্ব পর্যন্ত অযোধ্যা, আগ্রা, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান থেকে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য স্থানে নীল রপ্তানী হত। অযোধ্যায় নীলের ব্যবসার টাকা দিয়ে ইংরেজ এক দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিল। পাঞ্জাব বিজয়ের সময় এই সৈন্যবাহিনী বিশেষ সহায়তা করেছিল। এদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় কাজে নীল ব্যব-সার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[১] এভাবে বাংলাদেশ ও বিহারে নীল চাষ ব্যাপক হারে বেড়ে চললো এবং নিত্য নতুন নীলকুঠি স্থাপিত হতে থাকলো। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নীল-করদের অল্প সুদে প্রয়োজনীয় অর্থ আগাম দিত এবং উৎপাদিত নীল ক্রয় করে

---

১. "...... The Govt. of Bengal acquires an additional right of interference in this trade (Indigo). If these observations are just with respect to Oude, they will apply with still greater force to countries beyond it, not at all connected with us ; whence, however, we are told, not only that much of the indigo exported by Oude comes, but that the profits an indigo in those countries have furnished the funds for paying formidable military levies made in thems" (Letter wrote to the Governor General by the Court of Directors, dt, 28th August, 1800).

ইংল্যাণ্ডে চালান দিত। ১৭৮৬ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত নীলকরদের কোম্পানী প্রায় ১০ লক্ষ পাউন্ড ধার দিয়েছিল। এ সময় নীলের ব্যবসা এত বেশী লাভজনক হয়ে উঠল যে, ১৮০২ সালে কোম্পানী ডিরেক্টররা ঠিক করলো যে নীলকরদের আর অর্থ আগাম দেওয়া হবে না। এর পর থেকে নগদ মূল্যে নীল ক্রয় করা হত এবং ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হত। নগদ মূল্যে কেনা নীল গুদামজাত করার জন্যে ১৮০৬ সালে কোম্পানী কলিকাতায় কয়েকটি বড়-বড় নীল-গুদাম স্থাপন করলো।

নীলের ব্যবসায় কোম্পানী যতই মুনাফা অর্জন করতে থাকলো, নীল-করদের আধিপত্য ও দৌরাত্ম্য ততই বেড়ে চললো। নীলের ব্যবসা কি পরিমাণ লাভজনক ছিল, নিম্নবর্ণিত তালিকায় তার একটা চিত্র তুলে ধরা হলো।

কলকাতা হতে রপ্তানীকৃত নীলের হিসাব।[১]

১৮০৫—৬

| | বাক্স সংখ্যা | মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|
| লণ্ডনে | ১৩,৪৮৮ | ৪৫,২৩,১২৪ |
| ইউরোপে | ৪৩৭ | ১,৫২,২২৭ |
| আমেরিকায় | ৪৭৭ | ২,১৩,৪৯০ |
| এশিয়া ও আফ্রিকায় | ৯৮৫ | ৩,০৩,৫৩৩ |
| মোট : | ১৫,৩৮৫ | ৫১,৯২,৭৭৪ |

১৮০৬—৭

| | বাক্স সংখ্যা | মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|
| লণ্ডনে | ১৭,৫৪২ | ৫৭,৩১,৩৯০ |
| ইউরোপে | ৫৮৭ | ২,১০,৭০২ |
| আমেরিকায় | ১,৫৪৮ | ৪,৯৭,৪৫৮ |
| এশিয়া ও আফ্রিকায় | ২,০৭২ | ৬,০৭,৭৪০ |
| মোট : | ২১,৭৪৯ | ৭২,৩৮,২৮৮ |

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ : প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৮।

১৮০৭—৮

| | বাক্স সংখ্যা | মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|
| লণ্ডনে | ২১,০২৭ | ৮১,৮৯,৬৪৮ |
| ইউরোপে | ১,২৪৯ | ৪,৮৩,২৪০ |
| আমেরিকায় | ৩,২৫৭ | ১১,১৫,০৬৪ |
| এশিয়া ও আফ্রিকায় | ১,৭৩১ | ৫,৯০,২১২ |
| | মোট : ২৭,৩০৯ | ১,০৩,৭৮,১৬৮ |

অন্যমতে : নীল বিক্রয়ের খতিয়ান (১৮০৭—১৮০৯)।১

১৮০৭-এর মার্চ—২০,২২,১১৩ পাউণ্ড।
সেপ্টেম্বর—২৬,৫২,৪২৮ „
১৮০৮-এর মার্চ—২৬,৫২,৪২৮ „
সেপ্টেম্বর— —
১৮০৯-এর মার্চ—৩৯,৯৫,১৯১ „
সেপ্টেম্বর—৩,৭১,৩৭০ „

বাক্সের হিসাবে প্রতি বাক্সে সাড়ে ৩ মণ করে (সাড়ে ২৬২ পাউণ্ড এবং ১ মণ=৭৫ পাউণ্ড) নীল থাকতো। অথচ যারা হাড়ভাঙা খাটুনি খেঠে নীল উৎপাদন করতো, সে সব হতভাগ্য চাষীদের ভাগ্যে জুটতো অতি সামান্যই। কোম্পানী নীলকরদের কাছ থেকে কিন্ত প্রতি পাউণ্ড এক টাকা চার আনারও কম দরে। অথচ তখন লণ্ডনের বাজারে নীলের দাম ছিল:২

| নীলের রকম | Per Pound | Price s. | Price d. |
|---|---|---|---|
| Blue | .. .. .. .. | 10 | — |
| Purple | .. .. .. .. | 9 | — |
| Violet | .. .. .... | 7 — | 6 |
| Copper | .. .. .. .. | 6 — | 6 |

অর্থাৎ তখনকার টাকার মূল্যে প্রতি পাউণ্ড নীলের দাম ছিল ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা। কিন্তু এক সের নীল তার গুণাগুণের তুলনায় যথাযোগ্য

১. Pamphlet on Indigo: Watt. P. 14.
২. Pamphlet on Indigo : Watt. P. 14.

দাম পেতো না। কোন নীল হয়ত খুবই নিকৃষ্ট মানের, কিন্তু দাম পেতো বেশী। আবার কোন নীল হয়ত উৎকৃষ্ট মানের অথচ দাম পেতো তাও কম। এর একমাত্র কারণ নীলে ভেজাল মেশাবার প্রবণতা।১

অন্যত্র সেকালের সংবাদপত্রে বর্ণিত এক হিসাবে দেখা যায় ১৭৯২ সালে নীল রপ্তানী হয়েছিল ৭,২৬৬ মণ এবং ১৮২৭ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল এক লক্ষ মণ। এর থেকে নীল উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সহজে অনুমান করা চলে। বাংলাদেশে উৎপাদিত নীল ব্যবহার করে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্প যতই উন্নত হতে লাগলো, এদেশের বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ততই পাকাপাকি হতে থাকলো। হিসাবে দেখা যায় ১৭৯২ সালে কাপড় রপ্তানী হয়েছিল ১২ লক্ষ ২০ হাজার থান এবং ১৮২২ সালে রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াল মাত্র ১ লক্ষ থানে। উপরন্তু ১৮২২ সালেই ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার কাপড় আমদানী করা হলো। এদেশের শিল্পকে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী বাড়িয়ে তোলা বা ধ্বংস করার একচেটিয়া অধিকার অর্জন করলো কোম্পানী সরকার।২

এদিকে কোম্পানীর কাছ থেকে আগাম অর্থ-পথ বন্ধ হওয়ায় নীলকরেরা মূলধন সংগ্রহ করতে থাকলো বিদেশী এজেন্সী হাউজ ও নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক থেকে। ১৮২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩৪টি এজেন্সী হাউজ স্থাপিত হয়েছিল। এদেশে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এ সব এজেন্সীই ব্যাংকের কাজ করতো। বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য সাধারণত এসব এজেন্সীগুলোর দ্বারাই পরিচালিত হত। গৃহ নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ ও অন্যান্য কাজে বা ব্যবসায় এদের মোটা মূলধন খাটতো। কিন্তু এজেন্সী হাউজগুলির সবচেয়ে অধিক মূলধন নিয়োজিত ছিল বাংলাদেশের নীলচাষে। ১৮২৬—৩০ সালে যখন ব্যাপক বাণিজ্য সংকটে এজেন্সী হাউজসমূহের পতন ঘটতে থাকে তখন দেখা গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের নীলচাষে খাটানো বাৎসরিক প্রায় দুই কোটি টাকা মূলধনের মধ্যে এক কোটি ষাট লক্ষ (১৬০০০০০০) টাকাই এ সমস্ত হাউজগুলির। ১৮২৬-২৭ সালের মধ্যে ডেভিডসন, মার্শাল,

১. Pamphlet on Indigo : Watt. P. 65
২. সংবাদপত্রে সেকালের কথা ঃ ৩য় খন্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পৃঃ ৬০।

বার্নেট, সেন্ডটা, ব্যারেটা প্রভৃতি বিদেশী এবং আনন্দমোহন ও সুবলচন্দ্র পাল, রাধামোহন ও কিষণমোহন পাল, গঙ্গাগোবিন্দ ও হরগোবিন্দশীল, বিশ্বম্বর ও চন্দ্রকুমার পাইন, রাম নারায়ণ ও মাধব চরণ দে, মথুরামোহন দে ও সুবল চন্দ্র নন্দী প্রভৃতি দেশীয় এজেন্সীসমূহের পতন ঘটে। ১৮৩০-৩৩ সালের মধ্যে পামার কোং, আলেকজান্ডার কোং, স্কট কোং প্রভৃতি বড় বড় হাউজগুলিরও পতন ঘটে। এসব এজেন্সী হাউজের পতনের ফলে তৎকালীন বাংলাদেশের ধনী শ্রেণীর একটা বিরাট অংকের ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা দিল ব্যবসা-ভীতি। ফলে বাঙ্গালীর আর্থিক জীবনে হঠাৎ নেমে এলো একটা ভয়ানক বিপত্তি। নীলকরদের প্রচুর ঋণদানের ফলে তৎকালীন ইউনিয়ান ব্যাংকেরও পতন ঘটে।[১]

এ সময় Anglo-Indian Indigo Industry নামে সরকারীভাবে একটি কোম্পানী স্থাপন করা হলো। নীলের চাষ এতই লাভজনক হয়ে উঠলো যে কোম্পানীর এজেন্ট যারা রেশম ও আফিম ইত্যাদির ব্যবসা পর্যবেক্ষণ করার কাজে মফস্বলে থাকতো তারা কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে নীল ব্যবসায় জড়িয়ে পড়লো। কয়েক বছরের মধ্যে কুঠিয়ালরা বিরাট ধনী হয়ে উঠলো। অন্যান্য সব ব্যবসাতেই কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। তবে নীল ব্যবসা ছিল সর্বাধিক লাভজনক।

ইউরোপে নীলের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চললো। মিলবার্নের ১৮১৩ সালের বিবৃতি অনুযায়ী ইউরোপে বাৎসরিক প্রায় ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড নীলের প্রয়োজন হত। কেবলমাত্র বাংলাদেশ থেকে এর পাঁচগুণ পরিমাণ আহরিত হত।

দলিলপত্রে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী তিন বছরে (১৮১০-১৮১৩) সর্বতোভাবে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল গড়ে ৯৮,৫৭,৭৪৫ পাউন্ড এবং রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৯৪,৬০,৮৭৮ পাউন্ড। অর্থাৎ ৩,৯৬,৯৫৭ পাউন্ড থাকতো স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্যে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত নীলের পরিমাণ ছিল গড়ে ২,৫০,০০০ পাউন্ড থেকে ৪,০০০,০০ পাউন্ড।[২]

---

১. Trade and Finance in the Bengal Proceeding : 1793-1833. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭, ৪৯১—৪৯২।

২. Pamphlet on Indigo : Watt. P. 81.

১৮১১ সালের এক বিবৃতিতে কোম্পানী জানালো যে, দেশীয় লোকদের মধ্যে কেউ যদি নীলের ব্যবসা করতে চায় তবে তাদের অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হবে। বাংলাদেশের নীল ততদিন পর্যন্ত ইউরোপীয় বাজারে তার ন্যায্য অধিকার পাবে না, যতদিন দেশীয় লোকেরা সস্তায় ভাল নীল উৎপাদন না করে।

এ সময় নীল চাষে বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। যেখানে সেখানে নীলকুঠি স্থাপিত হতে থাকলো। এ ব্যাপারে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ আদেশ জারি করলেন যে, প্রতিটি নীলকুঠি স্থাপিত হবে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে। কে কোথায় বা কতদূরে কুঠি স্থাপন করবে এ ব্যাপারে যেন তারা (নীলকরেরা) নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেয়। এ ছাড়া আরও জানালো যে, কোম্পানী তাদের বাৎসরিক হারে যে অগ্রিম অর্থ দিয়ে থাকে, ভবিষ্যতে তা নির্ভর করবে রায়ত ও চাষীদের সাথে তাদের ব্যবহারের তারতম্যের উপর।

কিন্তু নীলকরদের নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়া-বিবাদ থাকুক না কেন, দেশীয় লোকদের হাতে দেয়ার ব্যাপারে তারা সবাই ছিল একমত, অর্থাৎ দেশীয় লোকদের হাতে ব্যবসা ছেড়ে দিতে তারা কোন মতেই রাজী ছিল না। দেশীয় কিছু জমিদার মহাজন কুঠি স্থাপন করে নীলের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল কিন্তু তারা কেউ কোম্পানী সরকারের তরফ থেকে কোন প্রকার সাহায্য পেল না, ফলে তাদের ব্যবসা প্রসার লাভ করলো না।

বাংলাদেশের নীল তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দিয়ে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত বিশ্বের বাজারে তার শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছিল। নিম্নে বর্ণিত খতিয়ানই তার প্রমাণঃ[১]

| | ১৮১১—১২ থেকে ১৮২০—২১ | ১৮২১—২২ থেকে ১৮৩০—৩১ |
|---|---|---|
| মণ (৮০, পাঃ হিসাবে) | ৮,৪৬,৮০০ | ১০,৯২,৪০০ |

১. Calcutta Review, March 1860, P. 123.
নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ ঃ পৃঃ ১০।

| | | |
|---|---|---|
| (বাক্স) | ২,২২,৫০০ | ৩,০১,১০০ |
| ইংল্যান্ডে রপ্তানী (বাক্স) | ১,৭১,২০০ | ২,০৮,০৭০ |
| | ১৮৩১-৩২ থেকে ১৮৪০—৪১ | ১৮৪১-৪২ থেকে ১৮৫০—৫১ |
| মণ (৮০ পাঃ হিসাবে) | ১১,০০,০০০ | ১২,৫১,০০০ |
| (বাক্স) | ৩,১১,২০০ | ৩,৪৫,১.,০ |
| ইংল্যান্ডে রপ্তানী (বাক্স) | ২,৫৪,৫০০ | ৩,০০,১২০ |

প্রতি পাউন্ডের গড়পড়তা মূল্যঃ (শিলিং পেন্স হিসাবে)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| উৎকৃষ্ট : | ৮ থেকে ১০.৮ | ৯.৩ থেকে ১০.৯ | ৭.৫ থেকে ৮.১ | ৫.৪ থেকে ৬.৪ |
| সাধারণ : | ৫.৪ থেকে ৭ | ৫.৯ থেকে ৭.১০ | ৪.১০ থেকে ৫.১১ | ৫ থেকে ৬.৩ |

আবার ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত ১০ বৎসরে বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে রপ্তানীকৃত নীলের খতিয়ান।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ : | গড়ে | ৯৭,৪২,৫২১ | পাউণ্ড |
| মাদ্রাজ : | গড়ে | ৪৪,৮৬,১১৫ | ,, |
| বোম্বাই : | গড়ে | ৫,৪৫,৮৩২ | ,, |
| সিন্ধু : | গড়ে | ৩,২৩,১৫৪ | ,, |

অথচ বাংলাদেশের এতো বড় সম্পদ নীল বিদেশী ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হয়েই থাকলো শুধু। দেশীয় বণিকরা এর থেকে কোন মুনাফা বা লাভজনক কিছুই পেলো না। অন্যের ইচ্ছায় সবচেয়ে ভাল জমিতে নীল চাষ করে তারা পুরস্কার পেলো—অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশা, জোর-জুলুম আর অত্যাচার-অবিচার।

১. Pamphlet on Indigo ; Watt, P. 85.

## নীল প্রস্তুত প্রণালী

১৭৭৮ সালে ক্যারল ব্লুম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে এক রিপোর্টে জানালেন যে, বাংলাদেশে নীলের চাষ প্রচুর মুনাফা লাভের নতুন উৎস এবং অবি-অবিলম্বে এদেশে ব্যাপক হারে নীলের চাষ আরম্ভ করা উচিত।[১] মুনাফা লাভের এই উৎসকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে নীলের চাষ আরম্ভ হয়েছিল।

বাংলা-বিহারকে নীল-চাষ হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করা চলেঃ
১. নিম্ন বাংলা ; ২. উত্তর বিহার ; ৩. দক্ষিণ বিহার।

নিম্ন বাংলায় নীল চাষের জন্যে কোথাও পানির প্রয়োজন হতো ন এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক স্থলে নীল ডুবে যেতো। যেমন তেমন করে নীল গাছ লাগিয়ে রাখলেই চলত। তেমন কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হতো না। শরতের প্রারম্ভকালে সাধারণত নীল চাষ করা হতো। নীলের জমিতে আগাছা জন্মাতো অনেক। তাই বিশেষ যন্ত্র সহকারে নিড়ানি দিতে হতো। সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হলে খাল বা কূপ খনন করে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হতো। একটা বাঁশের এক মাথায় একটা বালতি এবং অপর মাথায় ভারী কোন বস্তু বেঁধে পানি উঠিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা হতো। আবার কখনো কখনো চামড়ার থলিতে পানি ভরে ষাঁড়ের পিঠে করে নালায় ঢালা হতো। চৈত্র মাসে যদি বৃষ্টি একেবারেই না হতো তবে জমি ফেটে যেতো এবং গাছগুলো নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তো, তবে একেবারে নষ্ট হতো না। একটুখানি বৃষ্টি পড়লেই আবার জেগে উঠতো।

এক রকমের নীল ছিল, যা আষাঢ়-শ্রাবণ বা সময় সময় ভাদ্র মাসেও কাটা হতো। এ প্রকারের নীল সাধারণত ৮ মাস জমিতে থাকতো। ঋাসানেক নীল নিয়ে কৃষকেরা একটু মুশকিলে পড়তো। ধান রোপণ কাজে যখন কৃষক ব্যস্ত থাকতো, তখনই কাটা হতো এ জাতীয় নীল। একদিকে জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ধান, অপরদিকে নগদ টাকা আমদানীর পথ—নীল। কৃষকেরা পড়ে যেতো উভয় সংকটে। যদি বা নীলের প্রলোভন দমন করে ধান চাষে

---

১. Economic History of Bengal, N. K. Sinha, P: 195,

মন দিত তখন জোর করে তাদের দিয়ে নীল চাষ করিয়ে নেওয়া হতো। ফলে, নীলকর ও কৃষকের মধ্যে বাধত বিবাদ।

নীল কাটার সময়ে প্রথমে নীচু জমির নীল কাটতে হতো। কারণ বৃষ্টির পানিতে নীচু জমির নীল নষ্ট হওয়ার ভয় ছিল। নীল কাটার পর আঁটি বেঁধে কুঠিতে পৌঁছিয়ে দিতে হতো কৃষকদেরই। সেখানে ভেজাবার পাত্রে রাখার পরই কৃষক দায়িত্বমুক্ত হতো।

বাংলাদেশে প্রতি বিঘায় চার-পাঁচ সের নীল বীজ বপন করতে হতো। প্রতি একর জমিতে নীল জন্মাতো দশ থেকে বার পাউন্ড (৫ তাড়া)। ২৫০ তাড়ায় কমপক্ষে এক মণ নীল হতো। কলিন সাহেবের মতে বাংলাদেশে প্রতি বিঘায় ১৫ টাকার নীল জন্মাতো।

বিশেষ কতগুলো কারণে নীল নষ্ট হওয়ার ভয় থাকতো। (১) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টির ফলে পাতা মরে যেতো। (২) গাছ বড় হওয়ার পর সময় সময় গাছে এক হাত লম্বা এক প্রকার পোকা জন্মাতো। এই পোকার নাম মালপোকা। এই পোকা জন্মালে বুঝতে হতো যে নীল কাটার সময় হয়েছে· কিন্তু ২/৪ দিন বিলম্ব হলেই পোকা গাছের পাতা খেয়ে ফেলতো। (৩) ১ হতে দেড় ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার পোকাই ছিল নীলের প্রধান শত্রু। এমন কি সন্ধ্যার সময় যদি এ ধরনের পোকা গাছে বসতো, সকাল বেলাতেই দেখা যেতো পুরো ক্ষেতই বৃক্ষহীন। (৪) ঝড়, শিলাবৃষ্টি, গাছ উঠানো-নামানোর সময় ও পানিতে ভিজানোর সময় পাতা নষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। (৫) অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দুই-ই বিশেষ ক্ষতিকর ছিল। (৬) নীলের গাছ যথেষ্ট সতেজ থাকলেও দীর্ঘদিন ক্ষেতে ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যেতো।

নীল কুঠিতেই নীল প্রস্তুত হতো। এসব কুঠিকে সাধারণভাবে বলা হতো 'কনসার্ন' (Concern)। প্রত্যেক কুঠিতে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাকতো। এছাড়া থাকতো কুলি, মজুরদার, কেরানী ও গোমস্তা। সবার উপরে থাকতো অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষকে অবশ্যই দক্ষ ও কৌশলী হতে হতো।

পরিষ্কার পানি ও নীল— এই দুই বস্তু ছিল প্রতিটি নীলকুঠির প্রাণ। পরিষ্কার পানি নীলের জন্য ছিল অপরিহার্য। তাই দেখা যায় সব নীলকুঠিই স্থাপিত হয়েছে নদী বা জলাশয়ের ধারে। নদী বা জলাশয় থেকে পাম্প দ্বারা

পানি উঠানো হতো উপরে রাখা পাত্রে। দশ হাজার ঘনফুট পানি ধরে সেই আন্দাজ চৌবাচ্চায় পানি উঠিয়ে রাখা হতো। চৌবাচ্চার পানি থিতিয়ে পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা হতো। এছাড়া ছোট ছোট আরও অনেকগুলো চৌবাচ্চা থাকতো। ওগুলোর নাম ছিল ভেট (Vates)। ছোট ছোট চৌবাচ্চাগুলো পরস্পর সংযুক্ত করা হতো নলের সাহায্যে। ভেট দু প্রকার ছিল। স্টিপিং (Steeping) ভেট ও বিটিং (Weating) ভেট। এসব ভেট বা চৌবাচ্চা তৈরী হতো ইট ও সিমেন্টের গাঁথুনিতে। এগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো থাকতো। এসব ভেট বা চৌবাচ্চার সামনে মাটির নীচে ছিল আরও কতগুলো প্রশস্ত ও গভীর চৌবাচ্চা। বিটিং ভেট ও স্টিপিং ভেট-এর নীচের দিকে এসব চৌবাচ্চার ছিদ্র ছিল। বাহির দিক থেকে কাঠের ছিপি দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে রাখা হতো। এই ছিদ্রপথে নল লাগিয়ে উভয় চৌবাচ্চা সংযুক্ত করা থাকতো। পরে ছিপি খুলে দিলেই স্টিপিং ভেট-এর রস বিটিং ভেট-এ চলে যেতো। আবার বিটিং ভেট-এর উপর দিকে আরেকটা করে ছিদ্র থাকতো। ঐ ছিদ্র ছিল নলের সাথে সংযুক্ত।

নীলের আঁটি কুঠিতে আনার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐগুলো স্টিপিং ভেট-এ সাজিয়ে রাখা হতো। পাতার দিকটা থাকতো সাধারণত ভেটের মাঝখানে। এর উপর বড় বড় কাঠের টুকরো চাপিয়ে দেওয়া হতো। তারপর নীলের গাছগুলো ডুবিয়ে পানি ছাড়া হতো। এভাবে ৮/৯ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর পচন ক্রিয়া সম্পন্ন হতো।

পচন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হওয়ার পর স্টিপিং ভেট-এ ছিপি খুলে দিয়ে ভেতরকার তরল পদার্থ বিটিং ভেট-এ আনা হয়। তখন ঐ তরল পদার্থের রং দেখে বলা যেতো যে কি রকমের রং হবে। যদি সবুজের আভাযুক্ত অল্প পীত বর্ণের হতো তা হলে উৎকৃষ্ট নীল হবে বলে ধারণা করা যেতো। যদি মদিরা (Madira) শরাবের মত রং হতো, তবে সুন্দর নীল হয়েছে বলে বুঝতে হতো। ঈষৎ পিঙ্গল বা সবুজ বর্ণের মিশ্রণ থাকলে এবং অল্প লাল মিশ্রিত গাঢ় নীল বর্ণের হলে বুঝতে হতো নীল মধ্যম শ্রেণীর। ময়লাযুক্ত লাল বর্ণের হলে বলা হতো তাম্রযুক্ত নীল অর্থাৎ নীল খারাপ হয়েছে। তরল পদার্থ বিটিং ভেট-এ আনার পর যা পড়ে থাকত তা হলো গাছগুলো। ওগুলো

ফেলে দেওয়া হতো। একে বলা হতো ছিট্। এ ছিট্ দিয়ে জমিতে সার দেওয়া চলতো কিংবা জ্বালানিরূপেও ব্যবহার করা চলতো।

বিটিং ভেটের তরল পদার্থ এবার নানাভাবে নাড়তে হতো। ১০/১২ জন লোককে নামিয়ে নেওয়া হতো বিটিং ভেটের মধ্যে। এদের কোমর পর্যন্ত ডুবে থাকতো। দুই সারিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত কিংবা দাঁড়ের মত বাট দিয়ে ঐ তরল পদার্থ নাড়তে থাকতো। প্রথমে আস্তে আস্তে নাড়া শুরু করতো। পরে এত দ্রুত ও জোরে নাড়ত যে চৌবাচ্চায় দস্তুরমত ঢেউ উঠতো। এভাবে প্রায় ২ ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা নাড়তে হতো। নাড়বার পর প্রথমে গাঢ় সবুজ বর্ণ, তারপর বেগুনী, সর্বশেষে ঘোর নীল বর্ণের আকার ধারণ করতো। নাড়বার পূর্বে নীলকে বলা হতো White Indigo.

বাতাসের মিশ্রিত অম্লজান (অক্সিজেন) বায়ুর সংস্পর্শে এসে নীল বর্ণ পায়। সাদা নীল (White indigo) পানিতে দ্রবণীয়। কিন্তু অম্লজান বায়ুর সঙ্গে মিশে যখন উহা নীল বর্ণ পায় তখন আর পানিতে দ্রব হয় না, চৌবাচ্চার তলায় পড়ে থাকে এবং উপরে সাদা পানি টল্‌টল করতে থাকে। এর পর চৌবাচার গায়ের ছিদ্র খুলে দিয়ে পানি বের করে দেওয়া হতো। অতঃপর নীচে জমানো কাদার মত নীল বালতি পুরে ছাকনির উপর রাখা হতো। তাতে খড়কুটা বা পাতা ইত্যাদি থাকলেও আপত্তি হতো না।

এরপর নলের মধ্য দিয়ে আরেকটা পাত্রে আনা হতো। এর নাম Pulp vat। সাধারণত এর সাইজ ছিল ১৫X১০X৩ ফুটের। নলের মধ্য দিয়ে বের হওয়ার সময় নীল ছাঁকা হয়ে যেতো। কারণ নলের মাথায় জাল দেওয়া থাকতো। এরপর নীলকে নেওয়া হতো বয়লারের মধ্যে। বয়লারগুলো ছিল সাধারণত তামার বা লোহার তৈরী। আকৃতি ছিল ২৫ ফুট দৈর্ঘ্য, ১২ ফুট বিস্তৃত ও ৪ ফুট উচ্চ। বয়লারের মধ্যে নীলের উপর অল্প অল্প পানি দেওয়া হতো এবং অতি অল্প তাপে গরম করা হতো। যতক্ষণ না বাষ্প উঠতে থাকতো, ততক্ষণ জ্বাল দিতে হতো এবং আস্তে আস্তে নাড়তে হতো। এভাবে ৩ ঘন্টা জ্বাল দেওয়ার পর বুদবুদ উঠতে থাকতো, তখন জ্বাল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হতো।

এরপর বয়লার থেকে নীলকে আনা হতো ড্রিপিং ভেট (Dripping vat)-এ। এটা ছিল একটা প্রশস্ত টেবিলের মতো। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ ফুট। প্রথমে ভিজা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে তার উপর নীল রাখা হতো। কাপড় চুইয়ে যে পানি বের হতো, তা আবার নীলের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হতো। এভাবে যতক্ষণ না কাল রং মিশ্রিত লাল পানি বের হতো ততক্ষণ ঐ প্রক্রিয়া চলতে থাকত। (৫/৬ ঘন্টা পর্যন্ত এ প্রতিক্রিয়া চলত। এরপর কাপড়ের এক-পাশ উল্টিয়ে নীলের উপর দেওয়া হতো এবং ভারী কোন জিনিস চাপা দেওয়ার ফলে নীলের মধ্যকার বাকি পানিও বের হয়ে যেতো।

এবার নীল রাখা হতো 'প্রেস' নামক এক প্রকার বাক্সে। চার কোণ বিশিষ্ট এ বাক্সের দৈর্ঘ্য ৪২" ইঞ্চি প্রস্থ ২৪১" ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১২" ইঞ্চি হল। বাক্সের চারপাশে অনেক ছিদ্র থাকতো। ডালা থাকতো আলগা। বাক্সে নীল রেখে কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে আলগাভাবে ডালা লাগিয়ে রাখা হতো। এভাবে ৫/৬ ঘন্টার পর দেখ যেতো যে, পানি আর বের হচ্ছে না, উচ্চতা কমে গিয়েছে।

এরপর ধীরে ধীরে বাক্সের ফ্রেম সরিয়ে ৪২" লম্বা একখানা নীল বড়ি (Indigo Cake) বের করে আনা হতো। এতে কুঠির মার্কা ও তারিখ খোদাই করা থাকতো। তারপর প্রয়োজন মত খন্ড করে কেটে আলাদা ঘরে শুকাবার জন্য রাখা হতো। মাঝে মাঝে আবার উল্টিয়ে দেওয়া হতো।

তরপর আনা হতো সোয়েটিং রুম-এ। এখানে নীল বড়ি ঘর্মাক্ত করে উজ্জ্বল করে তোলা হতো। তারপর কম্বল বা ভুষি দিয়ে ঢেকে রাখতে হতো। কারণ বেশী বাতাস লাগলে নীল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এভাবে ১৫ দিন রাখার পর নীল বড়ি সত্যিকারভাবে উজ্জ্বল হতো।

নীল বড়ি ভালভাবে শুকাতে প্রায় তিন মাস সময় লাগতো।[১]

নীলচাষ ও নীল তৈরী ক্ষেত্রে যারা নীলকুঠিতে কাজ করতো তাদের অধি-কাংশই ছিল দেশীয় কর্মচারী। দেশীয় কর্মচারীদের মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রধান ছিল দেওয়ান। নীল চাষের জমি সংক্রান্ত আইনগত কাজ ও হিসাব তদারক করা ছিল দেওয়ানের প্রধান কাজ। একজন দেওয়ানের সর্বোচ্চ বেতন

---

১. বিশ্বকোষে (কলকাতা) প্রদত্ত 'নীল প্রস্তুত প্রণালী' ও স্যার জন ওয়াটের পাম্পলেট অন 'ইনডিগো' পুস্তক হতে গৃহীত।

ছিল ২৫ হতে ৩০ টাকা। এছাড়া রায়তদের প্রাপ্ত টাকা হতে টাকা প্রতি আধা বা ১ আনা কমিশন পেত। কেরানী বা রাইটার ছিল তার অধীনস্থ কর্মচারী। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এই পদে অধিষ্ঠিত হত। এদের বেতন ছিল মাসিক ৫ থেকে ৯ টাকা।

উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রধান কর্মচারী ছিল গোমস্তা। নীল চাষ তদারক করা ছিল গোমস্তার প্রধান কাজ। বেতন ছিল মাসিক ১২ টাকা থেকে ২০ টাকা। ওভারশিয়ার হলো গোমস্তার প্রধান সহকারী। বেতন ছিল মাসিক ৩ থেকে ৪ টাকা। কিন্তু তার মুখ্য আয় ছিল চাষীদের নিকট হতে অবৈধভাবে আদায়ী কমিশন। প্রয়োজন মত দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা রায়তদের উপর জোর-জুলুম করার জন্যে নিযুক্ত ছিল লাঠিয়াল। সাধারণত ফরিদপুর ও পাবনা জেলার একশ্রেণীর লোক লাঠিয়ালের কাজে নিযুক্ত হত।[১] এছাড়া ছিল কুঠিয়ালদের ব্যক্তিগত সহকারী, সাধারণ ওভারসিয়ার, কাঠমিস্ত্রী, মালি, সংবাদবাহক প্রভৃতি।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা প্রয়োজনমত মানভূম, সিংভূম, ও মেদিনীপুর হতে জংলী-জাতীয় কুলি (Bunna Cooly) আমদানী করতো। এদের কেউ কেউ পরিবারের সবাইকে নিয়েই আসত এবং কুঠি-এলাকায় স্থায়ীভাবে বাস করতো। বড় বড় কুঠিতে উৎপাদন মৌসুমে শতাধিক কুলি কাজ করতো। এদের বেতন ছিল মাসিক ৩ থেকে ৪ টাকা।[২]

উৎপাদন মৌসুমে পাম্প, বয়লার, কাটার যন্ত্র এবং অন্যান্য মেশিনপত্র চালাবার জন্যে কিছুসংখ্যক দেশীয় মজুর কাজ করতো। নীল গাছ কুঠিতে পৌঁছাবার কাজে নিযুক্ত থাকতো নৌকার মাঝি ও গাড়ীর গাড়োয়ান।

---

১. Bengal Peasant life : Lal Behari Dey, P. 327.
২. Indigo Com. Report. Appendix 1940.

## নীল চাষ ও বাংলার কৃষক

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে 'শিল্প বিপ্লব' শুরু হওয়ার পর থেকে কল-কারখানা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। নিত্য নতুন শিল্প উৎপাদনের অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু এর ফলে ইংল্যান্ডে দুটো সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়াল। প্রথমত শিল্পোৎপাদনের জন্যে কাঁচামালের প্রচুর সরবরাহ। দ্বিতীয়ত উৎপাদিত পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের জন্যে বিস্তৃত বাজার। এ দুটো সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রস্বরূপ বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষই একমাত্র উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচিত হলো। এর একমাত্র কারণ—এ দেশে কাঁচা চামড়া, পাট, কার্পাস ও নীল প্রভৃতি কাঁচামাল প্রচুর এবং ইংল্যান্ডে প্রস্তুত লৌহজাত ও কার্পাসজাত দ্রব্যের বাজাররূপে এদেশকে ব্যবহার করাও সহজ ছিল। তখনও শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি এদেশে। দু'একটা যা ছিল তাও কোম্পানী সরকারের চক্রান্তে লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

শিল্প-বিপ্লবের সাথে সাথে ইংল্যান্ডে বস্ত্র-শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে এবং বস্ত্র রঞ্জনের জন্যে বাংলাদেশের নীলের চাহিদাও বাড়তে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ হতে নীল সরবরাহ করার দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ ও বিহারে ব্যাপক নীলের চাষ শুরু করেছিল। কিন্তু প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে বাংলাদেশের চাষীরা নীল চাষ করতে অস্বীকার করলো। নীলকরেরা জোর-জুলুম ও আইনের আশ্রয় নিয়ে নীল চাষ করতে বাধ্য করলো চাষীদের। দাদন ও আইনের মারপ্যাঁচে পড়ে ভূমিদাসে পরিণত হল বাংলার নিরীহ চাষীরা। নীলকরদের অত্যাচার দিনের পর দিন আরও বেড়ে চললো।

ভূমিদাসদের সঠিকভাবে পরিচালনা ও তাদের শাসনে রাখার জন্যে প্রয়োজন অভিজ্ঞ কর্মচারীর। এ সময় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসপ্রথার অবসান ঘটলো। ওখানকার বাগিচা শিল্প যারা পরিচালনা করতো তাদের আনা হলো বাংলাদেশের বাগিচা শিল্প পরিচালনা করার জন্যে।[১] পশ্চিম

১. কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৯৫-১৯৬।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষ পরিচালকদের হাতে পড়ে বাংলার চাষীকুল ভূমি-দাসে পরিণত হল। ১৮৩৩ সালে ইংরেজদের এদেশে জমি ক্রয়ের অনুমতি দান ও তাদের এদেশে বাগিচা-শিল্পের মালিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে যে হীন ষড়যন্ত্র ছিল, তা এবার পুরোপুরিভাবে সফল হলো। দেশ জুড়ে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম হলো। ১৮৬০ সালের নীল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী তখনও দশ লক্ষাধিক শ্রমিক চা, রবার ও কফি প্রভৃতি বাগিচা-শিল্পে আবদ্ধ ছিল।[১] ইংরেজ কোম্পানী শাসকগণ বাংলা ও বিহারের চাষীদের বর্বর দাস-পরিচালকদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত হলেন।

ইংরেজ নীলকরগণ যখন সর্বপ্রথম এদেশে নীল চাষ করার জন্যে আসে, তখন জমি ক্রয় করার অধিকার তাদের ছিল না। এদেশে সরাসরি আসার ব্যাপারেও অনেক বাধা-বিপত্তি ছিল। এদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে হলে তাদের কোম্পানী সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে আসতে হতো। এদের অনেকেই কলকাতার ব্যাংক অথবা বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে নীলের কারবার চালাতো।

নীল চাষের দু'রকমের ব্যবস্থা ছিল। প্রথমত 'নিজ আবাদী' জমি। স্বনামে বা বে-নামীতে কিছু জমি সংগ্রহ করে তারা সেই জমির মালিকরূপে পরিচিত ছিল। এসব জমিতে দিনমজুর খাটিয়ে নিজেরাই নীল চাষ করতো। দ্বিতীয়ত রায়তী আবাদী বা দাদনি জমি। রায়তদের দাদন (অগ্রিম টাকা) দিয়ে নিজেদের পছন্দমত জমিতে নীল চাষ করানো হতো। 'নিজ আবাদী' জমিতে নীল চাষের জন্যে নীলকরদের অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকে বেশী অর্থ দিয়ে দিন মজুর সংগ্রহ করতে হতো। সাধারণত বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সাঁওতাল মজুর নিয়ে আসা হতো। পুরুষ শ্রমিকের মজুরী ছিল তিন টাকা এবং স্ত্রী ও বালক শ্রমিকদের মজুরী ছিল দৈনিক দু' টাকা। নিজ আবাদের যাবতীয় খরচপত্র বহন করতো নীলকররাই। এতে খরচ পড়তো বেশী এবং মোটা মূলধনের প্রয়োজন হতো তাতে। এ ব্যবস্থা নীলকরদের মনঃপূত ছিল না।

---

১. India Today: R. P. Dutta, P. 118.

অপরপক্ষে রায়তী বা দাদন আবাদীতে রায়তকে মাত্র দু'টাকা দাদন (অগ্রিম) দিয়ে নীল চাষের সমস্ত কাজ করিয়ে নেওয়া হতো। চাষের যাবতীয় খরচ.; যথা লাঙ্গল, হালচাষ, সার, বীজ, নিড়ানো, গাছকাটা প্রভৃতি এ দু'টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । এমনকি নীল কুঠিতে পেঁৗছানোর খরচও এ দু'টাকার মধ্যে ছিল। এরপর যা কিছু পেতো, তাতে চিরকালই চাষীদের লোকসান সহ্য করতে হতো। নীলকরদের লাভ ছিল ষোল আনা। ১৮৬০ সালে নীল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী নিজ আবাদী ব্যবস্থায় দশ হাজার বিঘা জমি চাষের জন্যে ব্যয় হতো আড়াই লাখ টাকা। অপরদিকে রায়তী বা দাদনী ব্যবস্থায় বিঘা প্রতি দু'টাকা দাদন দিয়ে দশ হাজার বিঘা জমিতে নীলের চাষ বাড়ানো যেতো। কমিশন রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, ১৮৫৮-৫৯ সালে ২৩,২০০ জন নীলচাষীর মধ্যে মাত্র ২,৪৪৮ জন নীলচাষের দরুন কিছুমাত্র অর্থ পেয়েছিল, বাকী যারা ছিল তাদের কেবলমাত্র দাদন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।১

১৮৩৭ সালের নীলকর ও জমিদারদের সাথে চাষীদের গন্ডগোল নিয়ে Lord Macaulay মন্তব্য করেছেন, "রায়তদের অভিযোগ নীলকরদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। নীলকরগণ চাষীদের যে দাদন দেয় আমার মতে তা নীতি-বিরুদ্ধ কাজ।"২

এ দেশের নিরীহ জনসাধারণ কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ আর বিদ্রোহকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র মাধ্যমে একদল জমিদার সৃষ্টি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, অসময়ে এরাই তাদের শোষণ আর অত্যাচারের সমর্থক ও সহায়ক হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়ের মত দু'চারজন ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আশানুরূপ সমর্থন মিলছে না। তাই কোম্পানী শাসকগণ কৌশলে ইংরেজদের এদেশে জমিদাররূপে দাঁড় করাবার পরিকল্পনা করলো। নীলকর সেই পরিকল্পনারই বাস্তব ফল। দ্বারকানাথ ও রামমোহন রায় নীলকরদের সমর্থনে অনেক ওকালতি করেছেন।

১৮৪৮ সালে একজন ইংরেজ লেখক তারই স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন:

---

১. Indigo Commission Report, P. 10.
২. Pamphlet on Indigo, P. 14.

"নীলকরগণ ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী দুর্বৃত্ত মাত্র। তারা প্রথমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মত একটা স্থান খুঁজে বের করে। এর জন্যে প্রয়োজন ৫০ হতে ১০০ বিঘা কিংবা তার চেয়েও বড় আকারের এক খণ্ড জমি। জমি ক্রয়ের পর চাই কিছু যন্ত্রপাতি, গামলা ইত্যাদি নিয়ে একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করা।... কোম্পানীর পূর্ব ঘোষণা বা সনদ অনুযায়ী নীলকরগণ এদেশের ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে ফ্যাক্টরীর জমি এবং এমনকি ফ্যাক্টরীও থাকত বেনামীতে।"১

সমসাময়িক সংবাদপত্রে নীলকরদের অত্যাচারের অনেক জ্বলন্ত ছবি তুলে ধরা হয়েছিল। ১৮২২ সালের ১০ই মে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার রিপোর্ট ঃ

"মফস্বলে কোন কোন নীলকর প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ কারণ এই, যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। তারাহা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমির নিকট থাকে, কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনই সে গরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে। সে গরু এমত করেদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়। প্রথম তাহাদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না, পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয়। ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুষ দিয়া ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস নাই, যেহেতু হিসাব রক্ষা হয় না। প্রতি সনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কয়েদ রাখে। তাহাতে ভীত হইয়া হাল বকেয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবত গোবংসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে, তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে, যেহেতু দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্বাহ করিতে পারে না।"২ এদেশে নীলকর

---

১. Calcutta Review. 1848.

২. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়), পৃঃ ১০৮-১০৯।

ও তৎকালীন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বর্বরতার যে নিদর্শন রেখে গেছে তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। নীলকরদের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে চাষীদের প্রতিবাদী কণ্ঠ সদা সোচ্চার ছিল। চাষীদের নালিশ ছিল শাসক গোষ্ঠীরই আদালতে। কিন্তু বিচার ছিল না। আক্রোশ ছিল উল্টো চাষীদের উপর। কোন সভ্য জাতির ইতিহাসে এমনটি আছে কিনা সন্দেহ।

১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের তৎকালীন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যঃ

"গ্রামে গ্রামে নীলকরদের অত্যাচার বাড়িয়া চলিতেছে। দারোগা তা দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকে। প্রথমত প্রজারা ভয়ে কোন নালিশ করিতে সাহসী হয় না। সাহেবদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া খুবই কঠিন। দ্বিতীয়ত ম্যাজি-স্ট্রেট সাহেবদের সঙ্গে নীলকরদের বন্ধুত্ব খুব গভীর। তাই প্রজাদের কোন অভিযোগ হয়ত আরও অত্যাচার ডাকিয়া আনিবে।"১

"শাসনের নামে সারাদেশে স্বৈরাচার চলিতেছে। শুধুমাত্র চোর-ডাকাত দু'চারটা ধরাকে শাসন বলে না। কোন কুঠিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের শালা, কেহ ভাই, কেহ ভগ্নিপতি, কেহ পিসে, কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ গ্রামস্থ, কেহ সম-ধ্যায়ী—এইভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক ও সংযোগ আছে। এবং তাহা না হইলেও সকলে 'এক সার্নাকর ইয়ার'। কোন মতে ছাড়াছাড়ি হইবার জো নাই। অপিচ হইতে এমত কহেন, শ্বেতকায় নীল-সাহেবদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিয়াছেন তাহারা কস্মিনকালেই কোন মোকদ্দমায় পরাস্ত হয়েন না। সর্বত্রই তাহাদের জয়-জয়কার।...দারোগা প্রত্যক্ষ ঘটনা দৃষ্টি করিয়াও রিপোর্ট দিতে সাহসী হয় না। তাহা হইলেও শেষ রক্ষা হয় না। বিচারপতির কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া অবশেষে কর্ম রাখা দায় হয়।...লোকে কথায় বলে—যার সর্বাঙ্গে ব্যথা, তার ঔষধ দেবো কোথা?"২

বাংলাদেশের কয়েকজন বুনিয়াদী জমিদার নীলকরদের অন্যায় অবিচার ও নীলচাষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা নীলকরদের উচ্ছেদ কামনা

১. সংবাদপত্রে সেকালের কথাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৫৮।
২. সংবাদপত্রে সেকালের কথাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

করে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে একটি আবেদন পত্র পেশ করেন। এতে তাঁরা নীলচাষের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেনঃ

"নীলকরগণ যে সব স্থানে নীলের চাষ আরম্ভ করেছে, সে সব স্থানের চাষীরা অন্যান্য চাষীদের তুলনায় অনেক বেশী দুর্দশাগ্রস্ত। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ নীলকর সাহেবদের দ্বারা বলপূর্বক জমি দখল এবং ধান গাছ নষ্ট করে নীলের চাষ করানো। এর ফলে ধানের চাষ হ্রাস পেয়েছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অনেকগুণ বেড়েছে)। নীলকর সাহেব-গণ রায়তদের গরু-মহিষ নিয়ে আটক রাখে এবং বলপূর্বক প্রজাদের টাকা-পয়সা প্রভৃতি কেড়ে নেয়। এ সব প্রজাদের ক্রমাগত অভিযোগের ফলেই সর-কার ১৮২০ সালের 'রেগুলেশন' পাস করেছিলেন। নীলকর সাহেবদের যদি এদেশে জমিদার ও রায়তদের ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এদেশের জমিদার ও রায়তদের ধ্বংস অনিবার্য।"[১]

চাষীরে দাদনের প্রলোভন দেখিয়ে বা জোর-জুলুম করে ভাল জমিতে নীলের চাষ করানো হতো। আবাদী জমি নষ্ট হয়ে যায় বলে জমিদারগণ চাষীদের নীল চাষ করতে নিষেধ করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি বাধাও দিতেন। তার ফলে নীলকরদের সাথে স্থানীয় জমিদারদের বিরোধ দেখা দিত। সময় সময় লাঠালাঠি মারামারি পর্যন্ত হয়ে যেতো। এরপর ক্রমে ক্রমে জমিদারদের কাছ থেকে জমি লীজ নিয়ে নীলকরগণ নীলচাষ করতে আরম্ভ করে। এর ফলে প্রজাদের সাথে মূল জমিদারের আর কোন সম্পর্ক থাকলো না। এতে জমিদারদের সুবিধাই হল। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের দায় আর তাদের থাকলো না। জমিদারেরা লোভে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জমি ইজারা বা পত্তনি দিত। নীলকরগণ চাষীদের উপর জোর-জুলুম করে অনেক গুণ মুনাফা আদায় করতো। অধিক মুনাফার লোভে অনেক স্থানীয় জমি-দারও নীলচাষের দিকে ঝুঁকে পড়েন। একথা সত্য যে, জমিদাররা নীলকরদের

১. Memorandum submitted to the British Parliament by the Zaminders of Bengal, Quoted from. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১৯৯।

তুলনায় অত্যাচারী কম ছিল না।[১] এদেশের নিরীহ চাষীরা বরাবরই জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। নীলকরদের আগমনে সে অত্যাচার আরও বহুগুণে বেড়ে গেল।

১৮৬০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর স্যার জন পিটার গ্রান্ট কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেনঃ নীলকরদের অত্যাচার বহুদিন থেকেই চলে আসছে এবং বহু পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলছিল।

১৮১০ সালের দেশীয় প্রজাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে যে ৪ জন নীলকরের অনুমতিপত্র বাতিল করা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল (ক) আঘাত, সরাসরি খুন না হলেও এসব আঘাতে দেশীয়দের প্রাণনাশ হয়েছে, (খ) কয়েদ, (গ) অন্য কুঠির সহিত দাঙ্গা, (ঘ) দেশীয়গণকে প্রহার।

সে সময় গভর্নর জেনারেল সার্কুলার দিয়েছিলেন যে, সামান্য প্রহারের মোকদ্দমা, যা সুপ্রীম কোর্টের উপযুক্ত নয় তাও গভর্নরকে জানাতে হবে। ইউরোপীগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এদেশে থাকতে হলে চাষীদের উপর অত্যাচার করা চলবে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর এ নির্দেশ জারী করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ নির্দেশ মোটেই পালিত হয়নি।

১৮১১ সালে যশোহরের কালেক্টর প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন কুঠির মধ্যে ৩/৪ ক্রোশ ব্যবধান রাখা হোক। গভর্নর তাতে এই বলে আপত্তি জানালেন যে, এতে প্রজাদেরই ক্ষতি হবে। বহু জমির উপর একজন নীলকরের আধিপত্য স্থাপিত হলে নীলকরদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যাবে। এ ছাড়া নীলকরদের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা থাকবে না। কিন্তু ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত প্রজাদের জমি নীলকরেরা ভাগ করে নিল। এতে প্রজাদের ক্ষতি হলো। তারা প্রতিবাদ করলো, নালিশ জানালো। কিন্তু কোন ফল হলো না তাতে। এ সময় আবার নীলকরদের সমিতি স্থাপিত হলো। প্রতিযোগিতা

১. Bengal Board of Trade (Indigo) proceeding, 1793-1833. P. 489-490.
সাহিত্য পত্রিকা, ১৩০৮ বাং, ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

বলতে এবার আর কিছুই থাকলো না। নীলকরগণ ইচ্ছামত প্রজাদের ভাল ভাল জমিতে নীল বুনতে থাকলো এবং ইচ্ছামতই নীল ক্রয় করতে লাগলো।

যে উদ্দেশ্যে গভর্নর যশোহরের কালেক্টরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো। ১৮১০ সালে যে উদ্দেশ্যে ৪ জন নীল-করের অনুমতিপত্র বাতিল করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্যও সফল হলো না।[১]

ছোটলাট তাঁর রিপোর্টে নীলকরদের বিরুদ্ধে ৪ প্রকার অভিযোগের দৃষ্টান্ত পেশ করেন। রিপোর্টে গত ৫ বছরে একমাত্র নদীয়া জেলাতেই ৫৪টি নীল ঘটিত মামলার উল্লেখ ছিল। ১৮১১ সালের সার্কুলারে প্রজাদের প্রহার করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল—প্রহারের বিরুদ্ধে প্রজারা অভি-যোগ এনেছিল, তাতে মাত্র একজন নীলকরের ১ মাসের জেল হয়। যেখানে নীলকর জমিদার ছিল না, সেখানে প্রজাদের সুবিধা ছিল। কিন্তু নীলকরগণ জমিদার হওয়ার ফলে অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে থাকে।

এ বিষয়ে গ্রান্ট তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন—গত দুই পুরুষ ধরে প্রজারা অত্যাচারে জর্জরিত। তারই প্রতিকার আশায় এ বিদ্রোহ।

১৮১০ সাল থেকেই নীলকরগণ নিজেদের সুবিধার্থে আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করে আসছিল। ১৮১১ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর বিরো-ধিতায় তা সম্ভবপর হয়নি। ১৮২৩ সালের ৬ষ্ঠ আইনের (Regulation VI of 1823) বলে নীলকরগণ যেসব চাষীদের টাকা বা নীলবীজ দাদন দিয়েছে, সেসব চাষীদের জমির উপর একটা বিশেষ স্বত্ব ও অধিকার লাভ করলো। পূর্ব হতেই নীলকরদের অত্যাচারে চাষীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, এই আইনের বলে সরকারী আদালতেও নীলকররা বিশেষ সুবিধা লাভ করলো। কিন্তু এত ক্ষমতা পেয়েও তাদের আশা মিটলো না। আরও ব্যাপক ক্ষমতা লাভের জন্য তারা আন্দোলন চালাতে থাকলো। তাদের দাবীঃ তারা নিজেদের দেশ বাড়ী ঘর ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে অশিক্ষিত চাষীদের মধ্যে বসবাস করছে। হাজারো রকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে ব্যবসা করছে। তাদের জন্যই ইংল্যান্ডে ব্যবসা বাড়ছে এবং শিল্পের উন্নতি হচ্ছে। মূলত তারা তো স্বদেশের উন্নতির চেষ্টাই করছে। এমতাবস্থায় তাদের নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য সরকারকে অবশ্যই আইন পাস করতে হবে।

---

১. সাহিত্য পত্রিকা, ১৩০৮, ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

অবশেষে ১৮৩০ সালে বিশেষ আইন পাস করা হলো। এরই নাম কুখ্যাত পঞ্চম আইন (Regulation V of 1830)। এই আইনে ঘোষণা করা হলো যে, দাদন গ্রহণকারী কৃষকদের পক্ষে নীল চাষ না করা আইন-বিরুদ্ধ। নীলকরগণ ইচ্ছা করলে এই অপরাধের জন্য ফৌজদারীতে নালিশ করতে পারবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে চাষীদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

লেফ্‌টেনেন্ট গভর্নর স্বীকার করেছেন যে, যে সব কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করে এই আইন প্রণয়ন করেছিল, সে সব কাগজপত্রে এমন কিছুই ছিল না, যার উপর ভিত্তি করে এমন একটা কালা আইন প্রণয়ন করা চলে।১

এই আইন পাস করার পর নীলকরদের অত্যাচার পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেড়ে গেলো। তাদের ক্ষমতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, নতুন কোন মহকুমা স্থাপনেও নীলকরগণ তাদের সুবিধার জন্যে আপত্তি তুলতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—যশোহরের একজন নীলকর তার কুঠির কাছে মহকুমা স্থাপনে আপত্তি করার ফলে মহকুমা স্থাপন স্থগিত থাকে। এর স্বপক্ষে কারণ দেখানো হলো যে দেশীয় লোকেরা মামলাবাজ। মহকুমা কাছে থাকলে তারা শুধু মামলাই করবে। এতে তাদের কুঠির কাজের অসুবিধা হবে।

ঘটনাক্রমে একদিন যশোহরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত কুঠিতে বেড়াতে গেলেন। পথে জানতে পারলেন যে, কুঠির কয়েদখানায় কয়েকজন চাষীকে অনেকদিন যাবৎ আটক রাখা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান চালানো হলো। দেখা গেল, কুঠির গুদামে কয়েকজন লোককে দুই মাস যাবৎ আটক করে রাখা হয়েছে।

মহকুমা স্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণটা সহজেই বুঝতে পারলেন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এই অপরাধে কুঠিয়ালের জরিমানা ও একজন আমলার জেল এবং জরিমানা হয়েছিল।২

নীলকরদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের বিষয় বর্ণনা করে একজন মফস্বলবাসী তৎকালীন 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় একখানা চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল যে নীলকরদের নানা রকম অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ : প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৬।
২. সাহিত্য পত্রিকাঃ ১৩০৮, ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

ক্ষমতা কৃষকদের নেই। প্রতিবাদ করতে গেলেও বিপদ ; জীবননাশের আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া প্রতিবাদ বা নালিশ করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তা দরিদ্র কৃষকদের নেই।

পত্রলেখক আরও বলেছেন, নীলকরদের ক্ষমতা লাভের ও শিকড় গেড়ে বসার মূল কারণ আমাদের দেশের জমিদাররা তাদের সহায়ক। নীলকরদের জন্যে তারা লাভবান. স্বার্থের খাতিরে তারা নীলকরদের অধীনে কাজ করে।[১]

নীলকরদের অত্যাচারে বিলাতের ডিরেক্টরগণও তটস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ নিয়ে ডিরেক্টর ও কোম্পানী সরকারের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। এমনকি এক পত্রে ডিরেক্টরের মতামতে বলা হয়েছে—"রায়ত প্রজাদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চলছে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। হয়ত এসব অত্যাচার বা দুষ্কর্ম সরাসরি নীলকরেরা করছে না। কিন্তু তাদের কর্মচারীদের কৃত-কর্মের দায় তাদের ঘাড়ে পড়ছে এবং তাদের স্বার্থের খাতিরে কর্মচারীরা তা করছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে লোকেরা আহত তো হচ্ছেই, নিহতও হচ্ছে। দেশের আইন-কানুন উপেক্ষা করে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে ভাড়াটিয়া সশস্ত্র লোক নিয়োগ করছে। তারাই এসব কুকর্ম করছে। এ সব দেশীয় গোমস্তা বা অন্যান্য কর্মচারীরা যে শুধু রায়তদের উপর অত্যাচার করে তা নয়, তারা নীলকরদেরও ঠকায়। তাদের রক্ত চুষে খায়।"

রায়তদের অভিযোগ সম্বন্ধে ডিরেক্টরগণ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন: "রায়তরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক দাদন নেয়। কিন্তু সারাজীবন ধরে নীলচাষ করেও তার সেই দাদন থেকে মুক্তি পায় না। যদি কোন রায়ত দেনা পরিশোধ করতে চায় বা নীলচাষ থেকে মুক্তি পেতে চায়, তারও কোন আইন-সঙ্গত উপায় নেই। নীলকরেরা এমনিভাবে কোন টাকা গ্রহণ করে না। ফলে রায়তদের সারাজীবন নীলচাষ করতে হয় এবং দাদনের নাগপাশে আবদ্ধ থাকতে হয়।[২]

নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে নদীয়া জেলার তৎকালীন জজ স্কোন্‌স (Mr. A. Sconce) গভর্নমেন্টের সেক্রেটারীর কাছে এক অভিজ্ঞতা-

---

১. নীল বিদ্রোহ: প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৬।.
২. নীল বিদ্রোহ: প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৭।.

পূর্ণ রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। তাতে স্কোন্‌স বলেছেনঃ "কোন্‌ জমিতে নীলচাষ হবে সে বিষয়ে রায়তদের কোন প্রকার স্বাধীনতা নেই, নীলকরেরা যে জমি ঠিক করে দেবে তাতেই নীল বুনতে হবে। এবং সেই জমিটা হলো রায়তের সবচেয়ে ভাল জমি।"

"নীল বোনার আগে অন্য কিছু বোনার ক্ষমতা রায়তদের ছিল না।"

"নীলকরদের মাপের এক বিঘা মানে সাধারণ মাপের আড়াই বিঘা।"

"নীলের মূল্য হিসাবে যে দু টাকা রায়ত পায় তার একটা পয়সাও তাদের হাতে থাকে না, সে' দু'টাকা তাদের দিতে হয় ফ্যাক্টরীর আমলাদের।"

"এক বাণ্ডেল নীল ডেলিভারী দিতে হয় দুই বা ততোধিক বাণ্ডেল একত্রিত করে। এর নাম ফ্যাক্টরী বাণ্ডেল। দুই বাণ্ডেল নীল দিয়ে রায়ত দাম পায় এক বাণ্ডেলের।"

"রায়তেরা গরু-ছাগলের মতই কাজ করে। কাজের বিনিময়ে কিছুই তারা পায় না।"

"রায়তদের গরু ছাগল চরতে পারে না। গরু-ছাগল পেলেই নীলকর-দের লোকেরা ধরে নিয়ে যায়। হয়ত মেরেও ফেলে। পানিতে ডুবিয়ে দেয়। রায়তদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয়। অভি-যোগ করার মত ক্ষমতা রায়তদের নেই। কতবার অভিযোগ করবে? কার কাছেই বা করবে? তার চেয়ে মুখ বুজে সহ্য করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"১

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী মিঃ গ্রে (Mr. Grey) উপরোক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে কোন প্রকার তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

যশোহরে কালারোহার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফের কোর্টে কয়েকজন রায়ত ঝিকরগাছা ফ্যাক্টরীর (Prihabara) হেনরী ম্যাকেঞ্জির বিরুদ্ধে রায়তদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করে। জনাব আবদুল লতিফ উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হেনরী ম্যাকেঞ্জির নিক নিম্নলিখিত পরোয়ানা প্রেরণ করেনঃ

"ফুলে গ্রামের আসাদউল্লাহ মণ্ডল, গোলাপ মণ্ডল, জাকের মণ্ডল, তোতা গাজী এবং আকবর দফাদার অত্র কোর্টে অভিযোগ পেশ করেছে যে,

১. Papers Relating to Indigo Cultivation in Bengal. P. 4-5.

তোমার ফ্যাক্টরীর আমীন, খালাসী এবং দেওয়ান লাঠিয়াল নিয়ে রায়তদের জোর করে নীল বুনতে এবং দাদন নিতে বাধ্য করেছে। যারা দাদন নিতে রাজী নয় তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের প্রতি মার-পিট করেছে, এমন কি তাদের কাউকে হত্যা করেছে। কাজেই অত্র পরোয়ানা মারফত তোমাকে নির্দেশ দেওয়া যাচেছ যে ভবিষ্যতে তোমার লোকেরা যেন রায়তদের প্রতি আর অত্যাচার না করে। তাদের স্বাধীন চাষাবাদে যেন কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। রায়তদের বিরুদ্ধে যদি তোমার কোন অভিযোগ থাকে আদালতে তা পেশ করতে পার। যদি এই নির্দেশ তুমি অমান্য কর বা রায়তদের প্রতি অত্যা-চার কর তবে তোমাকে গুরুতর জবাবদিহি করতে হবে।"

হেনরী ম্যাকেঞ্জি এই পরোয়ানা পেয়ে সেক্রেটারী গ্রের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ জানাল যে, ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ নীলকরদের বিরুদ্ধে তার লোকজন পাঠিয়েছে এবং রায়তদের উস্কানি দিচ্ছে যাতে করে তারা চুক্তিনামা লঙ্ঘন করে। নীল বুনতে অস্বীকার করে। ঝিকরগাছা কুঠির অনেক জিনিসপত্র ধ্বংস করে দিয়েছে তারা। ...তদন্ত করলে দেখা যাবে যে আবদুল লতিফ ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত।"১ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মিঃ গ্রে কোন প্রকার তদন্ত না করেই আবদুল লতিফ সাহেবকে কর্তব্য অবহেলার জন্য দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহানাবাদে বদলীর আদেশ দিয়েছেন।

পাবনা জেলার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মিঃ এফ. বিউফোর্ট (F. Beaufort) রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের কাছে ১৮৩০ সালের পঞ্চম আইন সংশোধন করার সুপারিশ করে ১৮৫৪ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে এক পত্র লেখেন। তাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলার চেষ্টা করেছেন যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটা লোকের স্বার্থরক্ষার খাতিরে সমগ্র জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ, যারা বরাবরই গরীব এবং দুর্বল তাদের আরও গরীব এবং দুর্বল করা হচ্ছে।"

মিঃ বিউফোর্টকে সমর্থন করে বর্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার ডব্লিউ. এইচ. ইলিয়ট (W. H. Elliott) মন্তব্য করেছেন, "যে যুগে রায়ত-

---

১. Papers Relating to Indigo Cultivation in Bengal. P. 10, 11, 12, 19, 24.

দের স্বাধীন সত্তাকে মর্যাদা দেওয়া হয়, সেই যুগে দুষ্কৃতকারীদের প্রাধান্য হচ্ছে। যা (নীল) করে রায়তদের কোন লাভই হয় না, তা চাষ করার জন্য রায়তদের কোন মতেই জোর জবরদস্তি করা উচিৎ নয়।"

বর্ধমানের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. বি. লফোর্ড (H. B. Luwford) বলেছেন, "রায়তরা নীল বুনছে নীলকরদের খুশী করার জন্যে, নিজেদের লাভ বা খুশীর জন্যে নয়। কাজেই নীলকরগণ যদি দাদন দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হোক। সে ক্ষতি তারা নিজেরাই বহন করুক।"১ রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এফ. গোউল্ডসবেরী (F. Gouldsbury) সেক্রেটারীকে এক পত্রে জানিয়েছে, "নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গোপাল লাল মিত্র এলাকা সফর করে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনায় বলেছেন যে রায়তদের সাথে নীলকর জমিদারদের বিবাদ অনবরতই লেগে আছে। ...একজন রায়ত মাত্র দুই টাকা দাদন পায়। এই দুই টাকা তাকে দিতে হয় কুঠির গোমস্তা, আমীন ও তাগাদাদারকে। তার হাতে আর কিছুই থাকে না। গোমস্তা এক বিঘা জমি মাপতে গিয়ে রায়তদের দেড় বিঘা জমি অধিকার করে নেয়। এই দেড় বিঘা মানে এক বিঘা।...২ বান্ডেল নীলগাছের জন্য রায়ত পায় এক টাকা। কিন্তু ২ বাণ্ডেলের পরিবর্তে তাকে দিতে হয় ৬ বাণ্ডেল। এমতাবস্থায় একজন রায়ত কোন ক্রমেই লাভবান হতে পারে না।...যে রায়ত একবার দাদন গ্রহণ করে, তার আর কোনদিন শোধ হয় না।"২

নিরীহ চাষীদের উপর নীলকর জমিদারদের অত্যাচারের আরও অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান এবং তৎকালীন ইংরেজ অফিসারগণ সরেজমিনে তদন্ত করেই এসব অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে রায়তেরা যে ৮৯টি অভিযোগ পেশ করেছে তার প্রকৃতি পর্যালোচনায় দেখা যায়ঃ৩

১. জোর করে নীল বপন ও অন্যান্য ফসল নষ্ট করার—৪০

---

১. Papers Relating to Indigo Cultivation In Bengal, p. 80-93.

২. Letter of 15th Sept. 1856, to the Sec. of the Governor from Mr. F. Gouldsburey, Commissioner, Rajshahi Div.

৩. Papers Relating to Indigo Cultivation in Bengal; P. 93.

২. রায়তের বোনা ধান নষ্ট করে নীল বপন করার—১৯
৩. ঘর জ্বালানো হয় এবং সেই ঘরের ভিটিতে নীল বপন করার—১
৪. জোর করে রায়তের হালের বলদ ধরে নিয়ে যাওয়া এবং দাদনের চুক্তি পূরণে বাধ্য করার—৯
৫. জোরপূর্বক দাদন নিতে বাধ্য করার—৪
৬. নীল বোনার জন্যে জমি দেওয়ার জন্যে মারধর এবং অত্যাচার করার—৫
৭. নীলচাষ নিয়ে কলহ দাঙ্গা করার—২
৮. অনধিকার জোর-দখল করার—৫ ...
৯. জমিতে খাল কেটে নীলের জমি ভরাট করার—২
১০. সাদা কাগজে দস্তখত করতে চাষীকে বাধ্য করার—২ ...

ঢাকা জেলার কমিশনার মিঃ সি. টি. ডেভিডসন্ ১৮৫৬ সালের ১৭ই জুলাই গভর্নরের সেক্রেটারীকে লিখিত এক পত্রে নীলচাষ সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রকাশ করেন যে, ঢাকা জেলায় নীলকরদের বিরুদ্ধে ১৭টি অভিযোগ আদালতে পেশ করা হয়। রায়তদের ধানের জমি নষ্ট করে জোরপূর্বক নীল বপনই হল প্রত্যেকটি অভিযোগের মূল প্রকৃতি।[১]

নদীয়া জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট টামবুলের তাঁর নীল কমিশনের রিপোর্টে বলেছেন, "নীলচাষীদের দুরবস্থা ও নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার মত সুযোগ ঘটেছিল। নীলকরগণ ছলে বলে বা কৌশলে অশিক্ষিত চাষীদের চুক্তিবন্ধ করে। সেই চুক্তি কোনমতেই চাষীদের পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না, বরং সে চুক্তির ফলে চাষীরা চিরদিনের জন্যে নীলকরদের দাসরূপে পরিগণিত হয়। ......জমি চাষ, বপন ও ফসল কাটার সময় সমস্ত-জেলাকে মনে হতো একটা গোলযোগের স্থান। এ সমস্ত ভয়ানক রকমের শান্তিভঙ্গের কারণগুলো ঘটতো শান্তিরক্ষক পুলিশ অফিসারদের, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটের নাকের উপর। আইনকে কলা দেখিয়ে সশস্ত্র লোকেরা দল বেধে চাষীদের জমি অধিকার করে নিত, কিংবা শস্য কেটে নিত। এ সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা রক্তারক্তি এমনকি খুন খারাবিও হতো। দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ দারোগাদের নীলকরগণ ঘুষ দিয়ে বাধ্য করে রাখতো।...পুলিশেরা নীলকার-

১. Papers Relating to Indigo Cultivation.

থানায় প্রবেশ করতেও সাহস পেতো না। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত নীলকরদের বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহসী হতো না।"১

১৮৩৫ সালের জুলাই মাসে ২০০ জন নীলকর গভর্নর জেনারেলের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করে। এদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্মারকলিপিতে তারা দাবী জানালো যে নীলচাষীরা ঠগ, শঠ, প্রতারক, মিথ্যাবাদী এবং অকর্মণ্য। এমনকি আদালত ও পুলিশ তাদের কর্তব্য কাজে বিমুখ। এমতাবস্থায় যেখানে তারা কোটি কোটি টাকা ব্যবসায় খাটাচ্ছে সেখানে ব্যবসায়ে নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা হোক। ২ নীলকরদের এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালের ১৭ই অক্টোবর যে মন্তব্য পেশ করেন তাতে তিনি বলেছিলেন যে দাদন দিয়ে রায়তদের সাথে যে চুক্তি করা হয়ে থাকে নীতিগতভাবে তা বিশেষভাবে আপত্তিকর। কারণ এসব চুক্তি হয়ে থাকে জোরপূর্বক এবং ছল-চাতুরীর মাধ্যমে। ভয় ও ছল-চাতুরীর ফলে কৃষক এমন একটি চুক্তিপত্রে সই করতে বাধ্য হয়, যার বিন্দু বিসর্গও সে বুঝতে পারে না। এসব অন্যায় আইন ও চুক্তিপত্র বাতিল করে দেওয়া উচিত। অসৎ ও অত্যাচারী নীলকরদের শাস্তি দেওয়া কর্তব্য।৩

আশ্চর্যের বিষয় যে, চাষীদের প্রতি নীলকরদের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে নীলকরদের কুঠি ও গুদামগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশও ম্যাজিস্ট্রেটদের দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া নীলচাষীদের অযথা নির্যাতন ও বলপূর্বক নীল চাষ করার জন্যে বাধ্য না করার ব্যাপারেও বিধিনিষেধ অরোপ করা হয়েছিল। কয়েকজন নীলকরের লাইসেন্সও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসবই ছিল বাংলার নীল চাষীদের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ ও বিদ্রোহ প্রশমিত করার কৌশল মাত্র। ফলে নীলকরদের অত্যাচার তো থামলোই না, বরং আরও বহুগুণে বেড়ে গেল।৪

বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইডেন ছিলেন একজন আদর্শ ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক। আইন ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে রায়তদের দুঃখ-দুর্দশা কিছুটা লাঘব

১. Indigo Commission Report, Appendix 16.
২. Indigo Commission Report, Appendix 13.
৩. Abid : Appendix 14.
৪. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ৭৪-৭৫।

করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ফলে বারাসাতের হাব্‌রা কুঠির মালিক মিঃ প্রেস্ট উইচ (Prest Wich) তৎকালীন গভর্নরের কাছে এক অভিযোগ দাখিল করেন যে মিঃ ইডেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও রায়তদের সহায়তা করছেন এবং নীল বপন না করার ও নীলকরদের সাথে হিসাবপত্র মীমাংসা করার জন্যে তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন।

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর সাহেব মিঃ ইডেনের কৈফিয়ত তলব করেন। কৈফিয়ত দিতে গিয়ে মিঃ ইডেন যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, যদি নীলকরদের জোর-জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা এই হারে চলতে থাকে তা হলে সমগ্র বাংলাদেশে এমন ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবে—যা আর কোন দিন হয়নি। হাজার হাজার মুসলমান প্রজারা একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হয়েছিল যে কোন প্রকার অন্যায় হস্ত-ক্ষেপের মোকাবেলা করার জন্যে। আমি যদি তখন দেরী করতাম তা হলে সমগ্র জেলা জুড়ে গোলমাল সৃষ্টি হতো।[১]

নীলকরদের অত্যাচারের ফিরিস্তি পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে নিম্নলিখিত অপরাধ সংগঠনে তারা ছিল বিশেষ অভ্যস্তঃ

১। হিংসাত্মক আক্রমণ ও নরহত্যা।
২। অন্যায় অজুহাতে দেশীয় লোকদের গুদামে আটক রাখা, তাদের গরু-বাছুর আটক রাখা এবং জোরপূর্বক পাওনা আদায় করা।
৩। ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে চাষীদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে নীল বুনতে বাধ্য করা।
৪। ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে অযথা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা এবং অন্য নীলকরদের সাথে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানো।
৫। চামড়া মোড়া বেত (শ্যামচাঁদ) দ্বারা প্রজাদের প্রহার করা এবং আরও অনেক জঘন্য পন্থায় শাস্তিদান করা।[২]

ইডেন ও মেকলে প্রমুখ উদারনৈতিক ইংরেজ শাসনকর্তারা নীলকরদের অত্যাচারের অনেক নিন্দা করেছেন, কৃষকদের দুর্দশার প্রতি দরদ দেখিয়েছেন,

১. Papers Relating to Indigo Cultivation : P. 171.
২. Buckland II. P.238-239.

অনেক ভাল ভাল কথা তারা বলেছেন। অথচ কোন ফল ফলেনি তাতে, চাষী-দের অবস্থা যা ছিল তা-ই রয়ে গেল। অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার নিরীহ চাষীদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার সমান গতিতে চলতে থাকল। নীল চাষীরা ছিল ক্রীতদাস এবং ১৮৬০ সাল পর্যন্ত তারা ক্রীতদাসই থাকল। তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তনই ঘটলো না।

১৮২৩ সালের ষষ্ঠ আইন ও ১৮৩০ সালের পঞ্চম আইনের বদৌলতে নীলকরদের ক্ষমতা এতই বেড়ে গেল যে, তারা আইনের অনুশাসন সম্পূর্ণ-রূপে অবজ্ঞা করতে থাকল এবং তাদের অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেল। ফলে নীল-জেলাগুলিতে কোম্পানীর শাসনকার্য অচল হয়ে পড়লো। ১৮৩৩ সালে নতুন সনদ প্রণয়নের সময় নীল প্রশ্নের উপর অনেক তর্কবিতর্ক হলো। একটা কমিশন বসিয়ে এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা ও এর প্রতিকারের ব্যবস্থার জন্য দাবী উঠলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ইন্ডিয়ান ল' কমিশনের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো।১

কোন প্রতিকার হলো না, তাই বাংলার নিরীহ চাষীকুল শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে রুখে দাঁড়ালো। শুরু হল ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নীল চাষীদের আপোসহীন সংগ্রাম। জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। বিভিন্ন জেলার স্থানে স্থানে খন্ডযুদ্ধ চলতে থাকলো। নীলকররা তাদের ভাড়াটে গুন্ডাদল লেলিয়ে দিত। কৃষকরা তাদের লাঠি, তীর, ধনুক আর বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো গুন্ডাদের মুকাবিলায়। ১৮৪৮ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে একজন ইংরেজ লেখক নীলকর ও কৃষকদের সংঘর্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন।

"অসংখ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আমরা দিতে পারি। একটা দুটা নয়, শত শত মুখোমুখি সংঘর্ষের খবর আমরা জানি। সে সব সংগ্রামে দু'তিনজন নয়, ছয়জনও নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে নীলকর সাহেবরা কৃষক লাঠিয়ালদের আক্রমণে টিকতে না পেরে তেজস্বী ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছেন। বহুক্ষেত্রে কৃষকদের আক্রমণে নীল-

---

১. নীল বিদ্রোহ : প্রমোদ সেনগুপ্ত পৃঃ ১৮-১৯।

কুঠি ধূলিসাৎ হয়েছে। অনেক স্থানে একপক্ষ বাজার লুট করেছে, পরক্ষণে অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।"১

কৃষকেরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য অনবরত সংগ্রাম করেছে। বিদ্রোহের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দিয়েছে দেশের প্রতি কোণায় কোণায় নীল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এদেশের মানুষ সাহস ও আত্মপ্রত্যয় সঞ্চয় করেছে। তাই নীল বিদ্রোহ এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার দাবীদার।

## নীল চাষের স্বরূপ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নীল চাষ দু'রকমের ছিল, ১। নিজ আবাদী অর্থাৎ নীলকরদের নিজের জমিতে দিন মজুর খাটিয়ে। ২। রায়তী আবাদী, অর্থাৎ রায়তদের দাদন (অগ্রিম টাকা) দিয়ে তাদের জমিতে তাদেরই খরচে নীলের চাষ করানো। নিজ আবাদী জমির জন্যে দূর দূর থেকে বেশী অর্থ দিয়ে মজুর আমদানী করা হতো। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি স্থান থেকে বেশী পয়সায় সাঁওতাল শ্রমিক আনা হতো। সাঁওতালরা সপরিবারে কাজ করতো। কুঠির কাছেই তারা কুঁড়ে ঘর তৈরী করে বাস করতো।

পুরুষ শ্রমিকের মজুরী ছিল মাসে তিন টাকা আর স্ত্রী ও বালক শ্রমিকরা পেতো দু'টাকা। নিজ আবাদী জমির যাবতীয় খরচ বহন করতে হতো নীলকরদের। এ ছাড়া লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব ছিল। প্রশ্ন ছিল বিরাট অংকের মূলধনের। এ সব কারণে 'নিজ আবাদী' প্রথা তারা এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করতো। নিজ আবাদী প্রতি ১০,০০০ বিঘা জমি চাষের খরচ ছিল ২,৫০,০০০ টাকা। অথচ রায়তী আবাদী জমির জন্যে বিঘা প্রতি দু'টাকা হারে

১. Calcutta Review (1848) Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)।

চাষীদের দাদন দিলে উক্ত ১০,০০০ বিঘার খরচ পড়তো মাত্র ২০,০০০ টাকা। দাদনের এ টাকা দিয়ে রায়তকে লাঙ্গল, সার, বীজ, নিড়ানি, গাছ কাটা এবং নীলগাছ কুঠিতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার খরচ বহন করতে হতো। ফলে রায়ত যে টাকা পেতো, খরচ হতো তার তিন-চার গুণ। অর্থাৎ এ তিন-চার গুণই ছিল লোকসান। অপর পক্ষে নীলকরদের লাভ হতো শতকরা একশত টাকারও বেশী। খরচ কম, অথচ লাভ বেশী। কাজেই অধিক লাভের এই রায়তী আবাদী প্রথায় যত বেশী জমিতে নীল চাষ করা যায় ততই লাভ এবং তারই চেষ্টায় নীলকর দস্যুরা উন্মাদ হয়ে উঠলো। নীল চাষী ও নীলকরদের মধ্যকার সংঘর্ষের মূল কারণ— এই অধিক মুনাফা।১ লেঃ গভর্নরের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, রায়তী আবাদী চাষের চেয়ে নিজ আবাদী চাষ অনেক লোকসানজনক। তাই নিজ আবাদী চাষ অনেক কমে গিয়েছে। বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর একমাত্র লক্ষ্য হলো নিজ আবাদী চাষ কমিয়ে রায়তী আবাদী চাষ বাড়িয়ে দেওয়া।২

প্রতি বিঘায় দশ থেকে বার বান্ডেল নীল হতো। এরূপ এক হাজার বান্ডেলে নীল প্রস্তুত হতো পাঁচ মণ।৩ দশ বান্ডেলে নীল প্রস্তুত হতো দু'সের। আবার দু'সের নীলের দাম ছিল দশ টাকা। প্রতিমণ দু'শ টাকা। রায়তী আবাদী চাষে এই দশ বান্ডেল নীল গাছের জন্য টাকায় চার বান্ডেল হিসাবে চাষী পেতো মাত্র দু'টাকা আট আনা।৪ অথচ খরচ বিঘা প্রতি বীজের মূল্য চার আনা থেকে আট আনা, কুঠিতে নীল পেঁৗছানোর খরচ বিঘা প্রতি চার আনা থেকে দশ আনা, স্ট্যাম্পের খরচ দু'আনা থেকে আট আনা। এ ছাড়া রয়েছে খাজনা, শ্রমজীবীর পারিশ্রমিক। সুতরাং খরচ বাদ দিয়ে চাষীদের হাতে কিছুই থাকতো না বললেই চলে।

মিঃ লারমুরের সাক্ষ্যে জানা যায়—বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর ভিন্ন ভিন্ন কুঠিতে ১৮৫৮-৫৯ সালে ৩৩,২০০ জন প্রজা নীলচাষ করেছিল। এর মধ্যে-

---

১. নীল বিদ্রোহ ঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪৫।
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ২০৪।
২. Buckland : Bengal under the Lt. Governors Vol. P. 246.
৩. Indigo Commission Report : P. 10.
৪. Indigo Commission Report : P. 15.

মাত্র ২,৪৪৮ জন প্রজা নীলের মূল্য বাবদ দাদনের অতিরিক্ত সামান্য কিছু পেয়েছিল। রানাঘাটের জমিদার জয়চাঁদ পাল চৌধুরীর অনেকগুলি নীলকুঠি ছিল। কমিশনে তিনি যে সাক্ষ্য দেন তাতে অনেক সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। গত বিশ বছর ধরে এত অত্যাচার সয়েও কেন প্রজারা নীলচাষ করল, এ প্রশ্নের জবাবে জয়পাল চৌধুরী বলেছিলেনঃ "প্রহার, কয়েদ, ঘর জ্বালান প্রভৃতি অত্যাচারের ফলে ও তার ভয়ে।"

কমিশন একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ছোট লাট গ্রান্ট সাহেব মন্তব্য করেছিলেনঃ

"This diluted into becoming official language, I find to be the conclusion of the Commission and it is certainly the inevitable deduction from the whole body of evidence". ১

অথচ এই দশ বাণ্ডেল নীল গাছ থেকে রং প্রস্তুত করতে নীলকরদের খরচ পড়তো এক টাকারও কম। দু'সের নীলে খরচ পড়তো মাত্র তিন টাকা আট আনা। দু'সের নীলের জন্য তারা দাম পেতো দশ টাকা। সুতরাং মাত্র দু'সের নীলে নীলকরদের লাভ হতো ছ'টাকা আট আনা। এভাবে এক মণ নীলের দাম পড়তো ২০০ টাকা এবং তাতে নীলকর লাভ করতো ১৩০ টাকা। ২

ওয়াটস সাহেব তার Dictonary of Economy Products of India গ্রন্থে নীল ব্যবসায় মুনাফা দেখিছেন এক শ' টাকায় এক শ' টাকা। প্রকৃতপক্ষে নীল ব্যবসায় লাভ হতো এর চেয়েও বেশী। তিনি নীলের বাজারদর ধরেছেন প্রতি মণ ২০০ টাকা। কিন্তু বাংলাদেশের নীলের মত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নীলের দাম ছিল প্রতি মণ ২৩০ টাকা। সমসাময়িক ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় হিসাব দেখান হয়েছিল যে নীলকররা যে পরিমাণ নীল গাছের জন্যে চাষীদের ২০০্ টাকা দিত, সে পরিমাণ নীলগাছ থেকে তারা পেতো ১৯৫০ টাকার নীল। নীল উৎপাদনে আরও ২০০্ টাকা খরচ ধরলেও তাদের লাভ হতো ১৭৫০ টাকা। এমন আশ্চর্যজনক লাভ হতো বলেই বাংলাদেশের নীলের উপর নীলকরদের লোভ যেমন বেড়েছিল, অত্যাচারও তেমনি চরম সীমায় উঠেছিল। ৩

১. Indigo Commission Report.
২. নীল বিদ্রোহ ঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪৬।
৩. ঐ পৃঃ ৪৬-৪৭।

১৮১১ সালে Anglo Indian Indigo Industry কোম্পানী সরাসরি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দিয়েছিল, "বাংলাদেশের নীল ততক্ষণ পর্যন্ত ইউ-রোপীয় বাজারে তার ন্যায্য কদর পাবে না, যতক্ষণ না দেশীয় লোকেরা সস্তায় ভাল নীল উৎপাদন করে। ১

বাংলার চাষীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার একটা হীন ষড়যন্ত্র প্রথম থেকেই চলে আসছিল। আমেরিকায় প্ল্যানটেশনের জন্যে আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ক্রীত-দাস কিনে এনে চাষের কাজে লাগানো হতো। ইংরেজ প্রভুরা এদেশে এসে মাত্র দু'টাকা দাদন দিয়ে এ-দেশীয় চাষীদের আজীবনের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করার এমন জঘন্যতম উদাহরণ পৃথি-বীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।

১৮৩৭ সালের নীলকর ও চাষীদের মধ্যকার গন্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে দাদন প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিলঃ

"The regulation which gave to the indigo planters, who had made advances to the ryots a lien on the indigo corp seems to me highly objectionable in principle." ২

বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট লেস্‌লী ইডেন দাদন প্রসঙ্গে নীল-কমিশনকে বলেছিলেন, (ক) সাংঘাতিক রকম লোকসান জেনেও চাষীরা নিজের ইচ্ছায় নীলচাষ করতে সমস্ত হতে পারে না। (খ) নীলচাষে নীলকরদের যে নিয়ম-রীতি তাতে কোন স্বাধীন ব্যক্তি নীলচাষে রাষী হতে পারে না। (গ) অসংখ্য মামলার নথিপত্র দেখলেই বোঝা যায় যে চাষীদের বলপূর্বক নীলচাষ করতে বাধ্য করা হতো। (ঘ) নীলকরগণ নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, রায়তদের স্বাধীনতা থাকলে তারা নীলচাষ করতো না। (ঙ) তারা আরও স্বীকার করেছে যে, চাষীদের আয়ত্তে আনার জন্যই তারা জমিদারী কিনেছে এবং জমিদারী না থাকলে চাষীদের হাত করা যায় না। (চ) যে মুহূর্তে চাষীরা বুঝলো যে আইনত তারা স্বাধীন, সেই মুহূর্তে তারা নীলচাষ বন্ধ করেছিল।৩

এ ব্যাপারে রেভারেন্ড ডাফ বলেছেন, "কে কোথায় কবে শুনেছে

---

১. Pamhlet on Indigo : Watt, P. 14.
২. Indigo Commission's Report, Appendix No. 14.
৩. Indigo Commission Report : Evidence, P. 2.

যে নিজের গুরুতর লোকসান জেনেও বছরের পর বছর ধরে কেউ চুক্তিপত্রে সই করে দেয়, তাও আবার কতকগুলো ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্মীয় লোকদের ধনী করার জন্যে? ব্যাপারটা একেবারেই আজগুবি।১

১৮৩০ সালে যে আইন পাস হলো (১৮৩৫-এ তা কার্যকরী হয়) তাতে বলা হয়েছিল যে, যারা চুক্তিভঙ্গ করবে তারা আইনত শাস্তি পাবে। অথচ আইনে দুর্বল নিরীহ রায়তদের স্বার্থরক্ষার প্রতি কোন আশ্বাস বা বিধান থাকলো না। নীলকরগণ ভয় দেখিয়ে জোর-জবরদস্তি চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নেয়, অন্যায়-ভাবে জুলুম করে। আইনে শোষিত চাষীদের জন্যে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থায়ই থাকলো না।২

বাংলাদেশের নীলচাষীদের শোষণ করার ষড়যন্ত্র যে প্রথম থেকেই চলে আসছিল, তা নীলকররা স্বীকার করেছে এবং কমিশনও তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এদেশের নীল ব্যবসা যে অতি লাভজনক তাও তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কি পরিমাণ নীল বিদেশে রপ্তানী হত এবং বিদেশে তা কি দামে বিক্রি হত। বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট লেস্‌লী ইডেন দুই বিঘা জমিতে চাষীদের নীল উৎপাদনে লাভলোকসানের হিসাব দিয়েছেন। তা থেকে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যাবে।৩

তামাকের জমিতে নীল চাষে খরচ

| | | | |
|---|---|---|---|
| খাজনা | ৩ | ০ | ০ |
| ৮ মাসের লাঙ্গলের খরচ | ৮ | ০ | ০ |
| সার খরচ | ১ | ০ | ০ |

১. নীল বিদ্রোহঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৬৭।

২. The effect of that enactment was to give the stronger contracting Party—the protection of law, while no consideration was shown to the weaker, who might have been forced into contracts the full meanings of which he did not comprehend."

—The Pamphlet on Indigo, P. 15.

৩. নীল বিদ্রোহঃ পৃঃ ৪৮-৪৯।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বীজ খরচ | ০ | ১০ | ০ |
| নিড়ানি | ০ | ৪ | ০ |
| গাছ কাটা | ০ | ৮ | ০ |
| মোটঃ | ১৩ | ৬ | ০ |

একই জমিতে তামাকের চাষে খরচ

| | | | |
|---|---|---|---|
| খাজনা | ৩ | ০ | ০ |
| লাঙ্গলের খরচ | ৮ | ০ | ০ |
| সার | ১ | ০ | ০ |
| নিড়ানি | ৬ | ০ | ০ |
| অন্যান্য খরচ | ৫ | ০ | ০ |
| সেচ | ১ | ০ | ০ |
| মোটঃ | ২৪ | ০ | ০ |

| নীল | দাম | | |
|---|---|---|---|
| ২০ বান্ডেল, টাকায় ৫ বান্ডেল দরে | ৪ | ০ | ০ |
| লোকসানঃ | ৯ | ৬ | ০ |
| তামাক | | | |
| ৫ টাকা মণ দরে ৭ মণ | ৩৫ | ০ | ০ |
| লাভ | ১১ | ০ | ০ |

উপরোক্ত তথ্যের উপর ইডেন সাহেব মন্তব্য করেছেনঃ

"রায়ত নিজের জমিতে স্বাধীনভাবে তামাকের চাষ করতে পারলে যে লাভ করতে পারতো, তার সাথে নীলচাষে যে ক্ষতি হয়েছে তা যোগ করলে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ টাকা ৬ আনা। উল্লেখযোগ্য যে এখানে তামাকের যে দর ধরা হয়েছে তা অনেক পুরানো দর। ১৮৫৮ সালে তামাকের দর ছিল ১৮ টাকা মণ। তার মানে তামাকের চাষে রায়তের লাভ হতো মোট ১০১ টাকা ১৪ আনা।[১]

১. Indigo Commission Report, P. II.

এরপর ইডেন এক বিঘা ধানের জমিতে নীলচাষের তুলনামূলক তথ্য তুলে ধরেছেনঃ

| নীল | | | | ধান | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খাজনা | ১ | ০ | ০ | খাজনা | ১ | ০ | ০ |
| বীজ | ০ | ১০ | ০ | বীজ | ০ | ১২ | ০ |
| লাঙগল | ১ | ০ | ০ | লাঙগল | ১ | ০ | ০ |
| স্ট্যাম্প | ০ | ৬ | ০ | নিড়ানি | ০ | ৯ | ০ |
| মই | ০ | ২ | ০ | কাটা | ০ | ৮ | ০ |
| নিড়ানি | ০ | ৮ | ০ | মই | ০ | ৪ | ০ |
| দস্তুরী | ০ | ৪ | ০ | | | | |
| মোটঃ | ৩ | ১৪ | ০ | মোট : | ৪ | ১ | ০ |

মূল্য

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টাকায় ৫ বাণ্ডেল করে | | | | ১০ মণ ধান | | | |
| ১০ বাণ্ডেলের মূল্যঃ | ২ | ০ | ০ | ১ টাকা মণ দরে | ১০ | ০ | ০ |
| রায়তের ক্ষতি— | ১ | ১৪ | ০ | রায়তের লাভ— | ৫ | ১৫ | ০ |

মিঃ ইডেনের তথ্যানুযায়ী একটা সত্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে নীল-চাষের চাষীরা ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে শুধু, কোনদিক থেকে লাভবান হয়নি। স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও নয়, অর্থের দিক দিয়েও নয়, নিজেদের সুখ-সুবিধার দিক দিয়েও নয়।

রানাঘাটের জমিদার জয়চাঁদ পাল চৌধুরী নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নীলকরদের শোষণের একটা পরিস্কার চিত্র তুলে ধরেছেনঃ

"যেখানে ৮ খানা লাঙগলের বাজার দর (মজুরীসহ) ছিল এক টাকা, সেখানে নীলকরদের দেওয়া দাম ছিল তার অর্ধেক, অর্থাৎ টাকায় ১৬ খানা।..., নীলচাষে রায়তদের কোন লাভই থাকে না।......নীলচাষের জন্য নীলকরদের খুব কমই খরচ করতে হতো। একজন সাধারণ চাষীর এক বিঘা জমিতে নীল-চাষ করতে খরচ হয়েছে দশ টাকা তের আনা। এ ছাড়া চাষীকে জরিমানা ইত্যাদি বাবদ খরচ করতে হয়েছে। যেমন গরুর অনধিকার প্রবেশের জন্য মাথা পিছু প্রতিদিন ছ' আনা। এসব খরচ হিসাবের খাতায় উঠতো না। তাহলে

ফসলের জন্যে চাষী কি পেতো? তার ফসল হলো বত্রিশ বান্ডেল। টাকায় ৮ বান্ডেল করে তার দাম হলো চার টাকা। তা হলে তার লোকসান দাঁড়াল ছ' টাকা তের আনা। পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে নীলচাষ করে সে কিছুই পাচ্ছে না। সারা বছর ধরে সে বেগারই খাটছে। এত লোকসানের পরও চাষীকে কুঠিতে কড়াগন্ডায় দস্তুরী বুঝিয়ে দিতে হতো। যার পরিমাণ ছিল আট আনা থেকে দশ আনা। এ ভাবে যে চাষী একবার নীলকরদের কাছ থেকে দাদন নিত, সে দাদন আর ইহজীবনে শোধ হতো না।১

মাত্র দুটি টাকা দাদন নিয়ে চাষীকে চিরদিনের জন্য ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হতো। নিজের জমিতে নিজের খুশীমত ফসল ফলাবার অধিকারও তার ছিল না। এমনকি নীলের জমি ছাড়া অন্য জমিতে কাজ করার ক্ষমতা তার থাকতো না। নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে পাদরী ফেডারিক সুড় পরিষ্কার ভাষায় অভিমত প্রকাশ করেছেনঃ

রায়তেরা যখন মাঠে তাদের কাজ করতে থাকে, তখন তাদের নীলকরদের জমিতে কাজ করার জন্য ডেকে আনা হয়। তৎক্ষণাৎ কুঠিতে হাযির না হতে পারলে তাদের প্রহার করা হয়। এর ফলে চাষী তার জমিতে ধান, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি কিছুই চাষ করতে পারে না।২

মোটকথা নীলের চাষ করে একমাত্র প্রহার, কয়েদ আর অত্যাচার-অবিচার ছাড়া আর কিছুই পেতো না হতভাগ্য চাষীরা। নিম্নে কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মোল্লাহাটি কনসার্নের ৩ জন চাষীর ১৮৫৯ সালের দেনা-পাওনার হিসেব তুলে ধরা হলো।৩

১। তাজু মণ্ডল, আলমপুর (৩।। বিঘা)

| জমা | | | | খরচ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নীলগাছ বাবদ (টাকায় | | | | ১৮৫৮ এর বাকী | ৩৬ | ৬ | ১ |
| ৬ বান্ডেল করে) | ১১ | ৪ | ০ | ১৮৫৯ এর দাদন | ৩ | ০ | ০ |

১. Indigo Commission Report, Evidence, P. 10.
২. Indigo Commission Report, P. 63-64.
৩. Indigo Commission Report, Appendix, 8.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বীজ | ০ | ৪ | ০ | স্ট্যাম্প | ০ | ৫ | ০ |
| | | | | চাষের খরচ | ০ | ১০ | ০ |
| | | | | গাছ কাটার খরচ | ০ | ৮ | ০ |
| মোট | ১১ | ৮ | ০ | বীজ | ১ | ১২ | ০ |
| | | | | গাড়ী | ০ | ১৩ | ০ |
| | | | | মোট | ৪৩ | ৬ | ১ |
| | | | | জমা | ১১ | ৮ | ০ |
| | | | | রায়তের বাকী | ৩১ | ১৪ | ১ |

২। হানিফ মুন্সী মণ্ডল, গাজীপুর (৩ বিঘা)

| জমা | | | | খরচ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নীলগাছ (টাকায় ৬ বান্ডেল করে) | ৩ | ৬ | ৮ | ১৮৫৮ এর বাকী | ৬৭ | ৩ | ০ |
| | | | | দাদন | ২ | ৮ | ০ |
| বীজ | ০ | ৪ | ০ | স্ট্যাম্প | ০ | ৮ | ০ |
| | | | | নিড়ানি | ০ | ১ | ৩ |
| মোট | ৩ | ১০ | ৮ | গাছ কাটা | ০ | ৮ | ০ |
| | | | | বীজ | ১ | ৪ | ০ |
| | | | | গাড়ী | ০ | ৪ | ৩ |
| | | | | মোট | ৭২ | ৪ | ৬ |
| | | | | জমা | ৩ | ১০ | ৮ |
| | | | | রায়তের বাকী | ৬৮ | ৯ | ১০ |

৩। হরচাঁদ মন্ডল, কানাসাল (৪ বিঘা)

| জমা | | | | খরচ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নীলগাছ (টাকায় ৬ বান্ডেল করে) | ৬ | ৪ | ৩ | ১৮৫৮-এর বাকী | ৫৯ | ০ | ০ |
| | | | | দাদন | ২ | ৮ | ০ |
| | | | | স্ট্যাম্প | ০ | ৮ | ০ |
| | | | | কাটা | ০ | ৮ | ০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বীজ | ২ | ২ | ০ |
| | | | গাড়ী | ০ | ৭ | ৬ |
| মোট | ৬ | ৪ ৩ | মোটঃ | ৬৫ | ৪ | ৬ |
| | | | জমা | ৬ | ৪ | ৩ |
| | | | রায়তের বাকী | ৫৯ | ০ | ৩ |

উপরের তথ্যাবলী হতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, নীলচাষের পথ ধরেই চাষীর সর্বনাশ নেমে এসেছিল। মান-সম্মান, অর্থ, স্বাস্থ্য, সর্বস্ব খুইয়ে চাষী লাভবান তো হতে পারেইনি, নীলকর প্রভুদের সন্তুষ্টও করতে পারেনি। ১৮৪৮ সালে দেলাতুর সাহেব ছিলেন ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। নীল কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ

"এমন এক বাক্স নীলও ইংল্যান্ডে যায় না, যা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়। একথা বলার জন্যে মিশনারীদের অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আমিও সেই একই কথা বলতে চাই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার ফলে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। আমি এমন কয়েকজন রায়তকে দেখেছিলাম যাদের দেহ বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল। কয়েকজন চাষীকে আমার সামনে আনা হয়েছিল, যাদের নীলকর ফোর্ড গুলী করে হত্যা করেছিল। এমন কয়েকজনকে জানি যাদের বল্লম দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এবং পরে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল।"১

১৭৮৮ সালে কোম্পানীর বিলেতের ডিরেক্টরগণ বাংলাদেশের নীলকে সবচেয়ে লাভজনক দ্রব্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তখনই তাঁরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যে, দেশীয় লোকদের পরিশ্রম ও রক্তের বিনিময়ে যে নীল বিলেতে আমদানী হবে, তা দিয়ে বিলেতের শিল্প কর্মের উন্নতি হবে এবং তাতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে।২ তাই হয়ত পরবর্তীকালে যখন সমস্ত দেশ জুড়ে নীলকরদের অত্যাচারের তান্ডবলীলা চলতে থাকে, তার প্রতিকারের জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু অত্যাচার আরও সুদূরপ্রসারী করার জন্যে অনেক প্রকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, অথচ একথা

১. Indigo Commisssion Report, Evidence No. 1918.
২. Economic History of Eengal : P. 29.

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারা যদি অতিলাভের লোভে রায়তদের প্রতি অমন অমানুষিক অত্যাচার অবিচার বা জোর-জবরদস্তি না করে শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে নীলচাষ করতো অনায়াসে তারা শতকরা ২৫ টাকা লাভ করতে পারতো।

১৮৫০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় চাষীদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ

"...... প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সারা বৎসর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল-যাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে তাহার লাভ দূরে থাকুক, তাহাদিগের দুশ্ছেদ্য ঋণজালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষিকার্যই তাহাদের উপজীব্য, ভূমিই তাহাদের এক-মাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহাদের সমুদয় আশা-ভরসা নির্ভর করে। কোন্ ব্যক্তি এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? কিন্তু তাহাদের কি উপায়ান্তর আছে? প্রবল প্রভাবান্বিত মহাবল পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবদের অনিবার্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীনদরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য? ...তাহাদিগের স্বীয় ভূমিতেই অবশ্য নীল বপন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়াও স্বহস্তে গরল পান করিতে হয়। এই ভূমির নামই 'খাতাই জমি'। 'খাতাই জমির' প্রসঙ্গ মাত্রই প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছসিত হইয়া ওঠে।"[১]

বলা বাহুল্য, 'খাতাই জমি' মানেই ভূমিদাসত্ব। ভূমি দাস হয়েই বাংলার চাষীকুল প্রায় ৪০ বছর যাবত নীলকরদের অত্যাচার সহ্য করেছে। বছরের পর বছর সহ্য করেছে স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে অনশন আর ধানের জমিতে নীল বপন করে সীমাহীন লোকসান।

নীলচাষীর লোকসান সম্পর্কে হারাণ চন্দ্র চাকলাদার মন্তব্য করেছেন, "নীল-চাষ ছিল চাষীদের জন্য সম্পূর্ণ লোকসানের ব্যাপার এবং চাষীর পরিবারের পক্ষে নীলচাষের অর্থ ছিল অনশন। নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই পরিষ্কার, অতি অল্প ব্যয়ে বা কোন প্রকার ব্যয় না করেই সবচেয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করা। নীলকর চাষীদের নামমাত্র মূল্যে দিয়ে নীলগাছ হস্তগত করতো। যদি বা

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ২১০-২১১।

ঐ নামমাত্র মূল্যটা চাষীদের দেওয়া হতো তা হলেও নীলচাষ চাষীদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। এরপর ঐ নামমাত্র মূল্য হতেও কিছুটা অংশ কাটা যেতো, কারণ কুঠির কর্মচারীরা এতবেশী ভাগ বসাতো এবং নীলগাছ ওজন করার সময় অসৎ উপায় অবলম্বন করতো যে নামমাত্র মূল্যটাও শেষ পর্যন্ত শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াত। চাষীরা যদি নীলের জমি থেকে অন্ততঃ খাজনার টাকাটাও তুলতে পারত তবে সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতো।১

নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের অনেক তথ্যই নীল কমিশনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একবার যে চাষী দাদন নিত সারাজীবনেও সে দাদন তার শোধ হতো না। এমনকি তার মৃত্যুর পর স্ত্রী পুত্রকে সেই দাদনের বোঝা বহন করতে হতো।

নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নদীয়ার কৃষক সবির বিশ্বাস বলেছিল, "আমি ১১ বিঘা জমিতে নীলের চাষ করি। কিন্তু নীলকরদের মাপে তা হয় মাত্র ৭ বিঘা। দাদন কোন কোন বছর দু'এক টাকা পাই, তাও কুঠির আমলারাই নিয়ে যায়। নীলচাষ করে আমি কোন দিন একটি পয়সা পাইনি। গত বছর ২৫ নৌকা ভর্তি করে নীলগাছ কুঠিতে পেঁৗছিয়েছিলাম। আমার এক নৌকায় নীল গাছ ধরে ১২/১৬ বান্ডিল, কিন্তু তারা বলে এক নৌকায় ধরে মাত্র ৩/৪ বান্ডিল।'

আরেক চাষী মীরজান মন্ডল বলেছিল, "অন্য মহাজন থেকে ধার আনলে পাই টাকায় ১৪ থেকে ১৬ কাঠা ধান। কিন্তু নীলকর জমিদার দেয় মাত্র টাকায় ৮ কাঠা। আমরা নীলকর ছাড়া অন্য মহাজন থেকে ধার করতে পারি না। আমার আরেকটা অভিযোগ হচ্ছে যে কার্তিক মাসে নীলকর ৭০০ বাঁশ কেটে নিয়েছে এখনও দাম দেয়নি। যদিও বা দাম দেয় ১০০টা বাঁশের জন্য মাত্র ৪ আনা।"২

একে তো নীলের চাষ করেই চাষীরা সর্বশান্ত, তার উপর আবার জিনিস-পত্রের মূল্যবৃদ্ধি। সে সময় দু'টি প্রধান কারণে হঠাৎ জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকে। বিশেষ করে কৃষিজাত দ্রব্যগুলির। প্রথমত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জিনিসপত্রের চাহিদাও বাড়তে থাকে। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেশের

১. Fifty Years Ago : an article published in the Dawn Magazine by H. C. Chaklader.

২. Indigo Commission Report, Evidence, P. 232-233.

সার্বিক উন্নয়ন কাজের জন্য টাকার চাহিদাও বাড়তে থাকে। লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে উন্নয়নমূলক কাজের পরিমাণও বাড়তে থাকল। মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধির সাথে তাল রেখে জিনিসপত্রের দামও বেড়ে গেল।১ সেই অনুপাতে ধান, তামাক ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও বাড়লো। বিশেষ করে ধানের মূল্য বাড়ল দ্বিগুণ। কৃষিকাজের মজুরী বেড়েছিল, কিন্তু নীলের চাষ যদিও আগের মতই সমান হারে চলছিল, নীলের দাম মোটেই বাড়েনি। এর ফলে ১৮৫০ সালের হিসাবে চাষীরা নীলচাষে সাধারণভাবে ৫ থেকে ৭ গুণ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।২

১৮৬৩ সালের ২৩শে নভেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয় শীর্ষের খবর, "দ্রব্যগুণ বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজাদের কষ্ট বাড়িয়াছে, কিন্তু নীল-করেরা বর্ধিত হারে মূল্য দেয় না। ইহার উপর যেই সব প্রজারা দাদন লইয়াছে, তাহাদের অবস্থা আরও করুণ। প্রতিকারের কোন উপায় না থাকায় কোথাও কোথাও প্রজা-ধর্মঘট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।"৩

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের অনেক স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিয়েছিল। চাষীদের মনে অসন্তোষের বিষবাষ্প অনেক দিন থেকে জমা হয়েছিল, এখন তা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেলো। মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ছোটলাট যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ

"নীল সংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছার সবচেয়ে বড় কারণ হল সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এটা সবারই জানা কথা যে গত তিন বছরে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ বা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। দিন মজুর ও হালের গরু বলদ পোষার খরচও বেড়েছে।...... যেহেতু এই একটি মাত্র দ্রব্যের (নীলের) মূল্য কোন প্রকারেই বৃদ্ধি পায়নি। একটি হচ্ছে সব থেকে বড় কারণ যা চাষীদের কাছে নীলচাষের অপকারিতাগুলিকে দ্বিগুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। চাষীর টাকার

১ Fifty Years Ago : an article published in the Dawn Magazine by H. C. Chaklader.

২. Bengal District Gazetteer, Faridpur, Jessore & Nadia, P. CVIII.

৩. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পৃঃ ৬০।

ক্ষতিটা দ্বিগুণ হল এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণও বেড়ে গেল,.........চাষীরা একেবারে খোলাখুলি বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত নীলকরেরা নীল গাছের দাম বাড়াবার কথা মোটেই চিন্তা করেনি।[১]

নীলচাষের ফলে চাষীদের যে সর্বনাশ সাধিত হয় তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা সর্বনাশা নীলচাষ সমগ্র বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দেয়। নীলচাষের ফলে নীলকুঠির সামান্য কিছু কর্মচারী আমলা, কেরানী বা গোমস্তা ইত্যাদির অবস্থা বেশ ভাল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ চাষীদের উপর জুলুম করেই এরা সঙ্গতিসম্পন্ন হয়। এ ছাড়া জমিদার মহাজন তালুকদার বা শহরের মধ্যশ্রেণীর সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ছিল অত্যাচারী। চাষীদের প্রতি জুলুম করাটা ছিল স্বভাবগঠিত অভ্যাস। বলা বাহুল্য, এদের সবাই ছিল শিক্ষিত হিন্দু সমাজভুক্ত।

পূর্বেই বলা হয়েছে—ইংরেজদের অনুগ্রহে পালিত হিন্দু সমাজ প্রথম থেকেই ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে ইংরেজী শিখে দেশের শিল্প-কারখানা ও আইন-আদালতে বিশেষ আসন অধিকার করে নেয়। এবং ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানীর চাটুকার দালাল মুৎসুদ্দিরা রাতারাতি জমিদাররূপে পরিগণিত হয়। কাজেই এসব শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর জুলুম-অত্যাচার বরাবরই সইতে হয়েছে এদেশের অশিক্ষিত সরল চাষীদের। নীলকরদের সাথে এরাও হাত মিলিয়েছিল। যার ফলে এরু অত্যাচারের পরও কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি। বা ইচ্ছা করেই প্রতি-বাদ করেনি। বরং দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায়ের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নীলকরদের সাথে হাত মিলিয়ে চাষীদের ভাগ্যে সর্বনাশ ঘটাবার পথ সুগম করে তুলেছিলেন। অন্যায় নীরবে সহ্য করে যাওয়ার দরুনই হয়ত সমগ্র দেশকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। ১৮৬১ ও ১৮৬৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের একটা বিশেষ কারণ এই নীলচাষ। একজন ইংরেজ লেখক বাংলাদেশের ধ্বংসের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায়—বাংলাদেশের ২০ লাখ ৪০ হাজার বিঘা উৎকৃষ্ট জমিতে প্রতি বছর নীলের চাষ করা হয়। এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "এর অর্থ হচ্ছে অর্ধ মিলিয়নের

১. Bengal under the Lt. Govt. Vol. I Buckland, P. 245.

অনেক বেশী জমি খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং তা হয়েছে এমন একটা দেশে যেখানে দুর্ভিক্ষ কায়েমী আসন পেতে বসেছে।"১

অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, এই ভয়াবহ সংকট মুহূর্তে রামমোহন রায়, দ্বারাকানাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-সেবক 'রেনেসাঁস আন্দোলন চালিয়েছিল। এই রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য কি ছিল? তথাকথিত এই রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে জমিদার মহাজন ও শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ষোলআনা আদায় করে নিয়েছিলেন এবং কৃষক শ্রেণীর উপর শোষণের যন্ত্রটা আরও জোরালো হাতে চেপে ধরেছিলেন।

রেনেসাঁসের প্রকৃত ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের পাশাপাশি রেনেসাঁস নামে ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত জমিদার শ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী যে আন্দোলনটি চালিয়েছিল তাহা কৃষক বিদ্রোহের মতই তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর দেওয়া ভূমিস্বত্বের অধি-কার বলে জমিদার শ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী একদিকে কৃষক শোষণের ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্য এবং অপরদিকে ইংরেজ সৃষ্ট নতুন সমাজের নেতৃত্ব লাভের জন্য তাহাদের তথাকথিত 'রেনেসাঁস' আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল।"২

হিন্দু জমিদার-মহাজন ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী যদি স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সাথে হাত না মিলাতেন, নীলকদের নানাভাবে সহায়তা না করতেন, তবে হয়ত বাংলার অশিক্ষিত চাষীকুলের ভাগ্যে অমন দুর্বিষহ লাঞ্ছনা আর অত্যাচার আসতো না। বিফল হতো না হয়তো ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। বাকল্যান্ড সাহেব পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "দেশীয় জমিদারগণ শ্রেণীগতভাবে নীল-করদের বিরোধী ছিল না।"৩

---

১. নীল বিদ্রোহ ঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৫৪।

২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ (১ম সংস্করণের ভূমিকা) পৃঃ ১৫।

৩. Bengal under the Lt. Governors, Buckland : Vol. I, P. 248.

ছোটখাট জমিদারগণ হয়ত নীল বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু বড় বড় জমিদারগণ প্রকাশ্যভাবে নীলকরদের সাথে হাত মিলিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে কৃষকদের দমন করার চেষ্টা করেছেন। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেব নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, "জমিদারগণ ইচ্ছা করলে যতখানি সাহায্য করতে পারতেন, তার তুলনায় কিছুই করেন নি। নদীয়ার দু'জন প্রধান জমিদার শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিবউল্লা হোসেন কৃষকদের দমন করার ব্যাপারে নীলকর লামুরকে সাহায্য করেছিলেন।"[১]

নীলকরদের অত্যাচারের কবলে পড়ে যে সব জেলায় বেশী নীল উৎপাদিত হতো সে সব জেলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ১৮৬১ ও ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর বহু জমি অনেকদিন পর্যন্ত অনাবাদী অবস্থায় পড়েছিল। ১৭৮৮ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস আনন্দের আতিশয্যে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের নীল বিদেশ থেকে রফতানী করা বাণিজ্যিক সামগ্রীর মধ্যে নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ এবং ইহা অর্থকরী সম্পদের উৎস।"[২]

কর্নওয়ালিসের সেই সম্পদের উৎসের প্রলোভনে নীলকরগণ সমগ্র বাংলাদেশের উপর যে ঔপনিবেশিক শোষণ আর অত্যাচারের তান্ডবলীলা চালিয়েছিল, সুসভ্য ইংরেজ জাতির ইতিহাসেও তার তুলনা নেই। শিল্প-সাহিত্য কৃষি আর সভ্যতার উপর বিরাট বিরাট কিতাব লিখে আর প্রচারপত্র ছাপিয়ে ইংরেজের সে কলঙ্কের ইতিহাস নাশ করা যাবে না। কালের ঘূর্ণায়মান চাকার আবর্তন থেকে শোষণ পীড়নের সেই মর্মন্তুদ আর্তনাদ চিরকাল শোনা যাবে।

## নীলকরের অত্যাচার

১৮১০ সালে বাংলাদেশের নিরীহ চাষীদের উপর অত্যাচার করার অভিযোগে ৪ জন নীলকরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অথচ ১৮৩৩ সালে

১. Indigo Commission Report—Evidence : P. 6.
২. Bengal Board of Trade (Indigo) Proceedings. Dec. 6, 1811.

সেই অত্যাচারী নীলকরদেরই বাংলাদেশে জমি কিনে জমিদার হওয়ার অধিকার দেওয়া হল। তখন থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নীলকরদের ব্যবসায়ের অজস্র শাখা-প্রশাখা গজিয়ে উঠতে শুরু করে। একমাত্র কলকাতার বুকেই তাদের অজস্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। ১৮৩৫ সালে ভারত সরকারের প্রথম আইন প্রণেতা লর্ড মেকলে ভারত সরকারের কাছে এক মন্তব্য-লিপি পেশ করেন। তাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেনঃ "নীলচুক্তিগুলি নীতিগতভাবে অতিশয় আপত্তিকর।......এসব নীলচুক্তি ও নীলকরদের বে-আইনী এবং অত্যাচারজনিত কার্যকলাপের ফলে দেশের কৃষক প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হয়েছে।"[১]

অথচ ১৮৩৭ সালেই গঠিত হল 'নীলকর সমিতি'। অর্থাৎ চাষীদের উপর অবলীলাক্রমে অত্যাচার চালাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা। এরই কয়েকদিন পর আবার জন্ম হল 'দি ল্যান্ড হোল্ডারস এন্ড কমার্শিয়াল এসোসিয়েশন অব বৃটিশ ইন্ডিয়া' নামক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের। এই প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট এবং প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হল নীলকর সমিতি। আগে নীলকরেরা নিজেদের মধ্যে জমির অধিকার নিয়ে মারামারি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা করতো। তার ফলে কৃষকেরা কিছুটা স্বস্তি পেতো। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে তাদের মধ্যকার আত্মকলহ প্রশমিত হলো। তার সাথে সাথে মিলিত শক্তির অত্যাচারে চাষীদের অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। নীলকরদের এ অত্যাচারের সবেচেয়ে আদি-কথাঃ দাদন। মাত্র দুটি টাকা দাদন দিয়ে চাষীকে সারা-জীবনের মত দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা হ'তো।

বাংলাদেশে নীলচাষ করতে গিয়ে ইংরেজ প্রভুদের কোন টাকাই খরচ করতে হতো না। চাষীকে যে দু'টাকা দাদন দেওয়া হতো তারই বদৌলতে বছরের পর বছর চাষী চোখ-কান বুজে ইংরেজ প্রভুর সেবা করে যেতো। তার পরনে থাকতো না কাপড়, পেটে থাকতো না ভাত। তবুও তাকে নীলচাষ করতে হতো। নীলকরদের হুকুম অনুযায়ী তাদের নির্ধারিত জমিতে নীলচাষ না করলে বা কোন প্রকার ওজরআপত্তি তুললে চাষীর কপালে জুটতো—কয়েদ, বেত্রাঘাত,

১. Minute by Lord Macauley, 17th Oct. 1835.

জরিমানা, ফসল নষ্ট, ঘর-বাড়ী জ্বালানো। মোটকথা, "কৃষকের নিকট নীলচাষ ছিল যতবেশী ক্ষতিজনক নীলকরদের পক্ষে তা ছিল ততবেশী লাভজনক।"[১]

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় নীলকদের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেনঃ "নীলকরদের কার্যের বিবরণী করিতে হইলে প্রজাপীড়নেরই বিবরণ লিখতে হয়। তাহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহাদের নীল ক্রয় করেন এবং আপনার ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন।...এই উভয় প্রজানাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে। নীলকর তাহাদিগকে বল দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন এবং নীল বীজ বপনার্থে তাহাদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাহার নীতি নহে। অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প মূল্য ধার্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ। তিনি মনে করলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন। তবে অনুগ্রহ করিয়া দাদন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবাদি উপলক্ষে তাহারও কোন-না-কোন অর্ধাংশ কর্তন যায়।"[২] এসব ইংরেজ নীলকর ছিল হতভাগ্য বঙ্গীয় চাষীদের দন্ডমুন্ডের কর্তা—ভাগ্যবিধাতা। ইচ্ছামত চাষীদের জমিতে চাষ, প্রয়োজনে চাষীদের কয়েদ, খুন, রক্তপাত প্রভৃতি কাজে তাদের ছিল আইন সম্মত অধিকার। ইংরেজ আইনে তাদের কোন অন্যায় অপরাধকে অপরাধ বলে গণ্য করা হতো না। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর মফস্বল অঞ্চলে নীলকরগণ অনেক জায়গায় সরকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করে। ফলে চাষীদের দুরবস্থা আরও বেড়ে যায়।

ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে নীলকর সাহেবদের বন্ধুত্ব কিংবা আত্মীয়তা থাকতোই। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা যখন শিকারে যেতেন অবসর যাপন করতেন নীলকুঠিতেই। ফিরে আসতেন হাতী, কুকুর, হরিণ প্রভৃতি উপঢৌকন নিয়ে। তৎ-

১. নীল বিদ্রোহ ঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪৭।
২. জতি বৈরঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৯৫-৯৬ (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)।

কালীন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার খবরে প্রকাশঃ 'নদীয়া জেলার নীলকরদের অত্যাচারের ফলে প্রজাদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যভাবে নীলকরদের পক্ষভুক্ত হইয়া এই অত্যাচারে সাহায্য করিতেছেন।'[১]

১৮১১ সালে যশোহরের কালেক্টর সাহেব এক প্রস্তাবে বলেছিলেন যে, বিভিন্ন কুঠির মধ্যে ৩/৪ ক্রোশ ব্যবধান রাখা হোক। গভর্নমেন্ট তাতে আপত্তি জানালেন যে, তাতে প্রজাদের ক্ষতি হবে। অনেকখানি জমির উপর একজন নীলকরের আধিপত্য বিস্তারিত হবে। কোন প্রতিযোগিতা থাকবে না। ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত নীলকরগণ নিজেরাই প্রজাদের জমি আপোসে ভাগ করে নিত। প্রজাদের কোন অভিযোগই তারা গ্রাহ্য করতো না। চোখ-কান বুজে দুর্দশার শিকার হয়েই তাদের থাকতে হতো। এদিকে আবার নীলকর সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর প্রতিযোগিতা আর থাকলো না। তখন তারা ইচ্ছামত নিজেদের পছন্দ করা জমিতে অল্পমূল্যে নীল বুনতো এবং নীল খরিদ করতো।

নীলকরেরা নিজ জমিতে নীল বুনতে গিয়ে দেখলো যে, তাতে প্রতি বিঘায় খরচ পড়ে ৬ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই। অথচ রায়তী আবাদীতে খরচ পড়ে মাত্র ২ টাকা তিন আনা। কাজেই তারা দাদনী জমির উপরই জোর দিল বেশী। এতে আরও সুবিধা ছিল। সরকারীভাবে এদেশের এক বিঘা জমির মাপ ছিল তখন ১৪০০০ বর্গফুট। কিন্তু নীলকরগণ সেই মাপ অগ্রাহ্য করে নিজেদের হিসাব মত মাপ দিত প্রতি বিঘা ২১,৫১১ বর্গফুট।[২]

এত অত্যাচার সহ্য করেও ধান-তামাকের ভাল জমিতে নীলচাষ করে কি পেত চাষীরা? এর উত্তর পাওয়া যায় নীল কমিশন রিপোর্টে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, "টাকায় ৮ বান্ডিল করে ৩২ বান্ডিল নীলের দাম হয় চার টাকা। অথচ ঐ বত্রিশ বান্ডিল নীলগাছ উৎপাদন খরচ পড়ে মোট দশ টাকা তের আনা। সেখানে চাষী পাচ্ছে মাত্র চার টাকা। তাহলে তার লোকসান হচ্ছে ছয় টাকা তের আনা।

---

১. সংবাদপত্রে সেকালের কথা ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ৬০।
২. Indigo Commission Report, Evidence, P. 202.

অর্থাৎ মজুরী বাবদ সে কিছুই পাচ্ছে না। সারা বৎসর পরিশ্রম করে তাকে শুধু লোকসানই দিতে হচ্ছে। এরপর তাকে কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দিতে হয় আমলাদের দস্তুরি। তার পরিমাণ দাঁড়ায় আট থেকে দশ আনা। এ অবস্থায় যে চাষী একবার দাদন নিত সে দাদন আর কোনকালেই শোধ হত না।"১

এত করেও কিন্তু নীলকরদের মন পাওয়া যেতো না। সারাদিন শুধু লোকসানই দিয়ে যেতো। উপরি হিসাবে পেতো কয়েদ, বেত্রাঘাত আর ধান-তামাকের ফসলের ক্ষতি। কাজেই চাষীদের সহ্যের সীমা যখন অতিক্রম করে যেতো তখনই শুরু হত গন্ডগোল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর মামলা-মোকদ্দমা।

'সংবাদ প্রভাকরে'র খবরঃ 'নদীয়ায় নীলকরদের সাথে চাষীদের বিবাদ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আগে দু'আনা পয়সা ও কিঞ্চিত তন্ডুল দিলে একটা চাষীকে সারাদিন খাটানো যেতো। এখন আহার্য বস্তু ও ব্যবহারীয় পশুর দর বৃদ্ধি পাওয়ায় কেহই আর চার আনার কমে কাজ করতে রাজী হয় না। নীলকরেরা এক পয়সাও বেশী দিতে নারাজ। ফলে বাঁধলো বিবাদ। চললো অত্যাচার। নীলকরেরা জোর করে চাষীদের ধরে নিয়ে যায়, খাটতে বাধ্য করে। নানা প্রকার দৈহিক অত্যাচারও করতে থাকে।"২

নীলকররা কিভাবে জোর করে চাষীদের দাদন দিত সে বিষয়ে ১৮৬০ সালের জুন মাসের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় একটা বিবরণী বেরিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, 'একজন নীলকর কোন একটি গ্রামের ইজারা পাওয়া মাত্রই তার প্রধান কাজ হল গ্রামে কয়টি লাঙ্গল আছে তা খুঁজে বের করা। এবং তার পরের কাজ হল লাঙ্গল প্রতি দু'বিঘা জমি চাষ করার জন্যে রায়তকে বাধ্য করা। এইভাবে সমস্ত খবর নেওয়ার পর রায়তদের কুঠিতে ডেকে আনা হত। তারপর এক-একজন করে প্রত্যেককে দু'টাকা করে দাদন দিত এবং প্রত্যেককে লাঙ্গল প্রতি দুই থেকে ছয় বিঘা জমি চাষ করতে বাধ্য করত। তখন সাদা স্ট্যাম্প কাগজে তাদের সই অথবা বুড়ো আঙ্গুলের টিপ নেওয়া হত। এরপর কুঠির লোক মাঠে গিয়ে ভাল ভাল জমিগুলিকে বেছে চিহ্ন বসিয়ে দিত। চাষীরা সেইসব জমিগুলি হয়ত মূল্যবান কোন ফসল করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল।"

১. Indigo Commission Report, Evidence, P. 10.
২. সংবাদ প্রভাকরঃ ১২,৩, ১৮৬০ ইং।

১৮৬০ সালের ১লা জানুয়ারীর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকর ও তাদের গোমস্তা আমলাদের অমানুষিক অত্যাচারের এক কাহিনী পাওয়া যায়ঃ "জেলা নদীয়ার অন্তপাতি খাল বুলিয়ার বিখ্যাত নীলকুঠির অধীন ভাজনঘাট কুঠির অন্তর্গত বগুলা নামে অপর এক কুঠি আছে। একদিন গোমস্তা এসে অনুমতি করল যে, তিন গ্রামের প্রজারা নীল ক্ষেতে উপস্থিত থেকে ক্ষেত উত্তম-রূপে নিড়ান দিবে, যেন ক্ষেতের মধ্যে কোন প্রকার আগাছা প্রভৃতি না থাকে। গোয়াপোতা, শ্যামনগর, বড়চুলুরি—এই তিন গ্রামের প্রজারা যতদিন ঐ কাজ শেষ না করবে নিজের ক্ষেতে তারা অন্য কাজ করতে পারবে না। প্রজারা বিপাকে পড়ে গেল। তারা গোমস্তাকে জানাল যে, আমরা বরাবর যেমন করতাম তেমনই করব। এতে আপনার পূজা সমাধার জন্য তিন গ্রাম থেকে ৩০০ টাকা যোগাড় করে দেব আপনাকে। গোমস্তা তাতে রাজী হল। এবং জানালো যে, যতদিন না টাকা দিতে পার ততদিন কাজ করে যেতে হবে। প্রজারা টাকা সংগ্রহের কাজে লেগে গেল। শ্যামনগরের প্রধান লোক কাল্লু মন্ডল ও আমীর মন্ডল। কাল্লু ঐ সময় বাড়ী ছিল না। আমীর মন্ডল চাঁদা আদায়ে নিযুক্ত হল। কাল্লু এসে জানাল যে, আমাদের নামে যে টাকা ধার্য করা হয়েছে আমরা তাহাই দিব। আদায়ে থাকতে পারবো না। আমাদের অত সময় নেই। গোমস্তা এ কথা জানতে পেরে কাল্লুকে ডেকে পাঠাল। এবং জানাল যে তোমাদের যদি এতই কাজ থেকে থাকে সমস্ত টাকা তোমরা দিয়ে দাও। পরে অবসর মত প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে নিও। কাল্লু বাড়ী এসে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলো। কিছুই করলো না। গোমস্তা রাগ হয়ে দুইজন তাগিদার ও সড়কিওয়ালাকে পাঠাল তখনই কাল্লুকে ধরে আনতে এবং মারধর করার জন্যে। ওরা কাল্লুকে ধরে বেঁধে ফেলল। নীলকরদের এতে কেউ বাধা দিতে সাহসী হল না। ওদের বেঁধে নিয়ে যাবার সময় দেখা গেল মজুদ্দিন নামক এক বৃদ্ধ দরজার নিকট বসে কাঠ কাটছে। সড়কিওয়ালা তাকে গিয়ে বলল যে, এখনই ক্ষেতে কাজ করতে যাও। এখানে বসে আছ কেন? বৃদ্ধ জবাব দিল, আমার যে টাকা ধার্য করা হয়েছিল তা আমি দিয়ে দিয়েছি। সড়কিওয়ালা তখনই বৃদ্ধকে প্রহার করতে লাগল। বৃদ্ধ যতই পালাতে চায় ততই তাকে প্রহার করে। বৃদ্ধের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তখনই গ্রামে গিয়ে সবাইকে খবর দিল। প্রজারা তখন একত্রে বসে কাল্লুকে উদ্ধার

করার উপায় খুঁজছিল। তারা আবার দ্বিতীয় অত্যাচারের কথা শুনে দৌড়ে আসল। তাগিদার ও সড়কিওয়ালাকে বেঁধে কাল্লু ও বুধকে মুক্ত করে নিল। কিছুক্ষণ পর যখন তাদের রাগ পড়ে গেল, তখন তাগিদার ও সড়কিওয়ালাকে মুক্ত করে দিল এবং ৫ টাকা করে ওদের হাতে দিয়ে বলল, এসব কথা যেন কুঠির অধ্যক্ষ জানতে না পারে।

কিন্তু সড়কিওয়ালা ও তাগিদার তখনই তা জানিয়ে দিল কুঠিয়াল সাহেবকে। বরং নিজেদের দোষের কথা গোপন করল। কুঠিয়াল মিঃ টুইড তখনই ১২ জন লাঠিয়াল নিয়ে গ্রামে হাযির হলেন। প্রজারা সাহেবকে সব কথা জানাল। সাহেব শুনলেন না কিছুই। প্রধান মন্ডল কাল্লু ও আমীরকে তখনই বগুলার কুঠিতে যাবার জন্য আদেশ করল। কুঠিতে গেলে যে কি অবস্থা দাঁড়াবে তা তারা জানত। তাই গেল না। সাহেবরা অপমান বোধ করল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে চুরি, হামলা ও লুঠতরাজের মামলা দায়ের করল। যশোহর থেকে ৫০ জন সুশিক্ষিত সড়কিওয়ালা এসে গ্রামের বুকে লুকিয়ে লুকিয়ে অত্যাচার আরম্ভ করল। প্রজারা দেখল নীলকরদের সাথে বিবাদ করা মানে মহাবিপদ। তারা ধনীলোক জমিদার বৃন্দাবন সরকারের কাছে ধর্ণা দিল এবং সাহায্য প্রার্থনা করল। জমিদার জানাল যে, পূর্ব হতেই আমার নামে মামলা চলছে, জেলার বিচারপতি সাহেবদের পক্ষে। এমতাবস্থায় আর কোন সাহায্য আমার দ্বারা হবে না। প্রজারা এক দরখাস্ত দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটকে সব জানাল। তাতেও কোন ফল হলো না। অপরপক্ষে নীলকদের অনুরোধে শহর থেকে ২৪ জন অস্ত্রধারী গেল গ্রামে এবং গোমস্তাদের সাথে একত্রিত হয়ে অত্যাচার আরম্ভ করল।

প্রজারা নিরুপায় হয়ে সাহেবের পায়ে পড়ল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল। সাহেব জানাল যে, এখন ১০০ টাকা দিতে হবে। প্রজারা সেই টাকা দিল এবং পরে সংগ্রহ করে আরও ৩০০ টাকা দিল। গোমস্তাদের যে ৩০০ টাকা দেওয়ার কথা ছিল তাও দিল। তারপর থেকে প্রজারা হল সাহেবের কেনা গোলাম। যা আদেশ করে তাই করে।"[১]

---

১. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্রঃ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১১১-১১২।

সরকারী নথিপত্রে দেখা যায়, রাজশাহী জেলার জজ মিঃ জ্যাকসন এমনি এক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে চিঠি লিখেছিলেন নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রারের কাছে। বর্ণিত কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ

"মিঃ কক্‌বার্ন ছিলেন সিরাজগঞ্জের চুন্দা কুঠির মালিক। ভয়ঙ্কর অত্যাচারী এবং জেদী মানুষ। রায়তেরা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, কুঠিয়ালদের সাথে তারা কোনমতেই কোন প্রকার সহযোগিতা করবে না।

১৮৫৯ সালের ২৩শে মার্চ, বুধবার।

নীলের জমি চাষ করার জন্য হালের অভাব হয়ে পড়ল। লাঙল বা গরু দিতে আজ আর কেউ রাজী নয়। পাশেই সুবাগাছি গ্রাম। চাষীরা সেখানে ধানের জমিতে কাজ করছিল। এমন সময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রায় একশ' লোক সুবাগাছির চাষীদের ঘিরে ফেলল। তারা চাষীদের কাছে জানতে চাইল কুঠির কাজের জন্যে তারা লাঙল দেবে কিনা। চাষীরা একবাক্যে অস্বীকৃতি জানাল—না, তারা লাঙ্গল দেবে না। আগে যেসব লাঙ্গল দেওয়া হয়েছে, এখনও তার দাম তারা পায়নি। কুঠির পাইক-বরকন্দাজ জবাবে জানাল, 'তোমাদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমাদের আমাদের সাথে যেতে হবে এবং চাষ করতে হবে।' কক্‌বার্ন তখন আড়াইশ গজ দূরে ঘোড়ার পিঠে বসে সবই দেখছিলেন। লাঙ্গল দিতে অস্বীকার করায় কক্‌বার্ন অকথ্য ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করলেন এবং লাঠিয়ালদের আদেশ দিলেন চাষীদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে।

বলা বাহুল্য এই কুঠির পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। সাহেবের আদেশ পাওয়ামাত্র 'কালি' 'কালি' রব তুলে তারা চাষীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চাষীরা প্রাণের দায়ে মাঠ ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিল। সেখানেও কুঠির লোকজন হামলা চালাল। অনেকে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাল। মুনিম, কুতুবুদ্দী ও সাদুল্লাহ্‌ টুকী এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হল না তাতে। কুতুবুদ্দী ও সাদুল্লাহ্‌ আহত হল। মুনিম পেটে আঘাত পেয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। এক সঙ্গে কয়েকটা লাঠি পড়ল মুনিমের মাথায়। চীৎকার করে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

লাঠিয়ালরা চলে যাওয়ার পর গ্রামের লোকজন মুনিমকে বাঁচাবার অনেক

চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অল্পক্ষণ পরই মুনিম মারা গেল। বলা বাহুল্য, বিদেশী নীলকররা এসব পাইক-পেয়াদা বিদেশ থেকে আমদানী করেনি। আমাদের এ দেশীয় লোক দিয়েই আমাদের জব্দ করছে তারা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ফন্দী ভালভাবেই জানা সে সব ইংরেজ কুঠিয়ালদের।

অথচ দেশে আইন-আদালত ছিল, পুলিশ-দারোগা ছিল। পুলিশের দারোগা আর জমিদারের নায়েব-গোমস্তারা ছিল চোর-ডাকাতের অর্থে পুষ্ট। বিচারক ছিল আমলাদের হাতের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। তাই বিচার ছিল না, ছিল বিচারের প্রহসন।১

জমিদার শ্রেণী সাধারণত নীলকরদের সহায়তা করত। মাঝে মাঝে দু'একজন জমিদার দেখা যায়—যাদের সাথে নীলকরদের বনিবনা ছিল না। এসব জমিদাররা নীলকরদের সমর্থন করতেন না। শুধুমাত্র চাষীদের উপর জুলুম করেই নীলকররা ক্ষান্ত হতো না, সুযোগমত জমিদারদের উপরও জুলুম চালাতো। নদীয়া-যশোরের জমিদার লতাফত হোসেন নীলকরদের এক হতভাগ্য শিকার। কাঁচিকাটা ও সিন্দুরিয়া কুঠির নীলকররা অনেকদিন থেকে লতাফত হোসেনের বড় ভাইদের কাছ থেকে জমি ইজারা নেবার চেষ্টা করে আসছিল। তাঁর বড় ভাইরা যখন মারা যান তখন লতাফত হোসেন ছিলেন নাবালক। এই সুযোগে নীলকররা তাঁর বড় ভাইদের জমি ইজারা দিয়েছে— এই দাবীতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নালিশ করল। আদালতে নীলকরদের পাট্টাদলীল জাল বলে প্রমাণিত হল। আদালতে হেরে গিয়ে নীলকররা ৩০০ লাঠিয়াল নিয়ে লতাফত হোসেনের কাছারি আক্রমণ করল ও জ্বালিয়ে দিল। নালিশ করায় ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন নীলকরের সামান্য শাস্তি হল। কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জোর-জুলুম চলতেই থাকল। ১৮৪৪ সালে নীলকরদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল লতাফতকে আক্রমণ

১. পাবনা জেলার ইতিহাসঃ রাধারমণ সাহা, পৃঃ ১১০-১১১।
"It cannot be denied that. In point of fact there is no protection for person and property and the present wretched. mechanical, inefficient system of police is a mere mockery." (Letter From Mr. Staychy, 3rd Judge, Pubna to Mr. W. B. Bayley Register, Nijamat Adalat, Murshidabad-Rajshahi Division)

১৪—

করল। এবং তিনজন লোককে খুন করল এবং অনেককে জখম করল। আবার আদালতে নীলকরদের কয়েক জনের শাস্তি হল। এবং কিছুদিন পর ৭২৫ বিঘা, ৫৫০ বিঘা ও ৩৫০ বিঘা জমির দাবীতে আবার আদালতে নালিশ করল। তাতেও কিছু হল না। ৩ হাজার ৯শ' টাকার ক্ষতিপূরণ দাবীতে আবার লতাফতের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করল।১

নীলকরদের প্রজাপীড়নের এমনি অসংখ্য উদাহরণ আছে। নীলকররা অত্যাচার করেছে একথা যেমন সত্য, চাষীরা যে স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের আদালতে গিয়ে তার বিচার পায়নি, একথাও তেমনি সত্য। ১৮৬০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় শান্তিপুরের জার্মান পাদ্রী মিঃ রসভাইটিস-এর যে চিঠিখানা ছাপা হয়, তাতেও নীলকরদের অত্যাচারের নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায়ঃ

"আট বছর আগে যখন আমি আমার আগের কর্মস্থল সোলেতে বাস করছিলাম, সে সময় আর্চিবল্ড হিল্‌স আশেপাশের তালুকগুলি কিনে নেবার চেষ্টা করছিল। এ সময় ১০ জন, ২০ জন, এমনকি ৫০ জন করে ঐ গ্রামের মন্ডলরা আমার কাছে এসে অনুরোধ জানিয়েছিল তাদের তালুকগুলি কিনে নেওয়ার জন্যে। তারা এও বলেছিল, আমি যদি তালুকগুলি কিনে নেই, তাহলে তারা আমার খরচের অর্ধেক টাকা তুলে আমাকে উপহার দেবে। এমনকি তালুকদারেরা এসেছিল তাদের তালুক কিনে নেবার জন্যে অনুরোধ জানাবার জন্যে। তাদের মধ্যে এমন একজনও এসেছিলেন যিনি নীলকরদের লাঠিয়াল দ্বারা নিজের বাড়ীতেই ঘেরাও হয়েছিলেন। গভীর রাত্রে তিনি সকল বিপদ অগ্রাহ্য করে ২৫ জন রায়ত নিয়ে আমার কাছে এসে অনুরোধ করেছিলেন যেন তার অভিযোগটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেঁৗছে দেই। তার অভিযোগ, তালুক বিক্রি করে দিচ্ছ বলে নীলকররা জোর করে তার কাছ থেকে সই নিতে চায়। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয়নি। ...এর কিছুদিন আগে নীলকরদের লাঠিয়ালরা চাষীদের ৫০টা গরু দুপুর বেলায় জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এই গরুচুরির মোকদ্দমা

১. Indigo Commission Report. Evidence P. 171.

যখন কৃষ্ণনগরের আদালতে চলছিল—তখনই চাষীদের জমিতে জোর করে নীলচাষ করিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। কিছুদিন পরই তালুকগুলি নিশ্চিন্দপুর কুঠির অধীনে চলে যায়। এতে চাষীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। মেলিয়াপোতা, পাথরঘাটা ও গোবিন্দপুরের চাষীরা, যারা এর আগে কখনও নীলচাষ করেনি তারাও আমাকে নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে অনুরোধ জানাল। ............ চাষীরা আমার বাড়ী এসেছিল— একথা শুনে এই অপরাধে নীলকররা তাদের ২৫ টাকা জরিমানা করলো। এরপর তারা দাদন নিয়েছিল প্রথমবার ও শেষবারের মত। (শেষবারের মত মানে প্রথমবার নেওয়ার পর আর তারা কখনও দাদন পায়নি)। আমার কাছেও আর তারা আসেনি। এভাবে অত্যধিক খরচ করে প্রতি বছর তারা নীলচাষ করে দন্ড দিতে থাকল। শুরু হল তাদের লোকসান ও সর্ব-নাশের। .........একদিন দূরে আমার এক মিশনারী বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে নীলকর মিঃ স্মিথ্ চাষীদের এসে জানাল যে, যদি তারা নীলচাষ করতে রাযী না হয়, তাহলে এই মুহূর্তে তাদের ঘরবাড়ী সব জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। (মালিয়াপোতা গ্রামের চাষীরা ছিল সবাই খৃস্টান, তারা নীল বুনতে অস্বীকার করেছিল এই ভরসায় যে, পাদ্রী রস্ ভাইটিস তাদের রক্ষা করবেন)। চাষীরা ভয়ে নীলচাষ করতে রাযী হল। সেই মতে তাদের দাদনও দেওয়া হল। এবং চুক্তির খাতায় তাদের নাম উঠানো হল। ছোট্ট এ অনুষ্ঠান শেষ করার পর তারা (নীলকরেরা) দাবী করলো যে, চাষীরা চুক্তিবন্ধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কোন দাদন না পেলেও তারা নীলচাষ করতে বাধ্য থাকবে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, নীলকর ও রায়ত উভয়ের মৃত্যুর পরও এ চুক্তিনামা বাতিল হয় না। নতুন নীলকর স্বতঃসিদ্ধভাবেই ধরে নেয় যে, মৃত চাষীর সন্তানও কোন প্রকার চুক্তি ছাড়াই সারাজীবন নীলচাষ করতে বাধ্য। এমনি উদাহরণ অনেক আছে। এমন উদাহরণও আমি জানি, যেখানে নাতীরা পিতামহের চুক্তিপত্রের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

.........চুক্তিপত্রে সই করার সময় যারা ছিল না, দাদনের টাকা তাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কোন প্রকার আড়ম্বর ছাড়াই চুক্তির খাতায় তাদের

নাম উঠানো হয়েছিল। ঋণি একজন লোক হচ্ছেন গরীব অথচ সম্ভ্রান্ত খৃস্টান। দেড় বিঘা জমি চাষের জন্যে তাকে ৩ টাকা দাদন দেওয়া হয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে সেই দেড় বিঘা জমি তিন বিঘায় পরিণত হয়েছিল কিন্তু দাদন বাড়েনি। এই দেড় বিঘা আবার কুঠির মাপের দেড় বিঘা। জমিদারী বিঘায় ৫ বিঘার সমান। গত বছর এই লোক ১৬ গাড়ী নীলগাছ কুঠিতে পৌছে দিয়েছিল। কুঠির ওজন অনুসারে তা ছিল ১২ বান্ডিল। অথচ এর জন্যে চাষীকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৩ টাকা। কুঠির আমলারা শেষ পর্যন্ত কত টাকা নিয়ে তাকে যেতে দিয়েছিল তা আজ আর আমার মনে নেই। তবে তার খরচের হিসাবটা আমার কাছে আছে। তার খরচ হয়েছে ১৭ টাকা ৫ আনা। তবে একথা ঠিক জানবেন, সে খুব ভালয় ভালয় ছাড়া পেয়েছিল। এমনি আরও ৪০০০ হিসাব আছে আমার কাছে। যে কোন মানুষ তাতে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। এখনও বহু লোক কয়েদ আছে নিশ্চিন্দপুরের নিকট দামুরহুদার কুঠির গুদামঘরে। তাদের উপর চলছে নানারকম পাশবিক অত্যাচার। অত্যাচারের ফলে যাতে তারা স্বীকার করে যে, তারা দাদন নিয়েছে এবং তারা নীলচাষ করবে।"১

কাপাস ডাঙ্গার পাদ্রী ফ্রেডারিক সুড় নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, "১৮৫৬ সালে একদিন বিকেল ৪টার সময় বসে লিখছিলাম, খবর পেলাম যে, লাঠিয়ালরা খৃস্টানদের গরু-বাছুর নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে তখনই কুঠির দিকে ছুটলাম। বাজারের কাছে এসে দেখলাম ৩৫টা গরু নিয়ে যাচ্ছে। লাঠিয়ালরা আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। যে সব খৃস্টান আমার পেছনে আসছিল তারা গরুগুলি নিয়ে গেল। তখন আমাকে একজন বলল, নদীর ধার দিয়ে লাঠিয়ালরা আরও একপাল গরু নিয়ে যাচ্ছে। সে দিকে গিয়ে দেখলাম, ১ জন আমিন ও ৮ জন লাঠিয়াল আরও গোটা চল্লিশেক গরু নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখেই আমিন লাঠিয়ালদের হুকুম করলো, সাহেব কো মারো। আমি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম।"

১. নীল বিদ্রোহঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৫৯—৬১।

মিঃ সুড় বাড়ী পৌঁছেই নীলকরদের চিঠি লিখে সব জানালেন। তারা চিঠির কড়া জবাব দিল এবং জানাল যে, তিনি যেন এতে নাক না গলান। তারপর সুড় ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলেন। তিনদিন পর পুলিশ এলো। অনেক মাইল দূরে দামুর-হুদা থানা এলাকায় গরুগুলো পাওয়া গেল। সুড় আরও বলেছেন, "রায়তেরা যখন মাঠে নিজের জমিতে কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন তাদের নীলকরদের জমিতে কাজ করার জন্যে ডাকে। না গেলে মারপিট করা হয়। এই জন্যে রায়তেরা তাদের আখ, তামাক, ধান ইত্যাদি চাষ করতে পারে না।"[১]

নীলকররা দেশের আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে থানা অফিসার, পুলিশ কনস্টেবল বা জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের চোখের সামনে বসে খুন-জখম, লুটতরাজ, জোর-জুলুম প্রভৃতি সব অপরাধই করে যাচেছ, আইন তাদের আটকাতে পারছে না। নীলকররা সরকারের চেয়েও বেশী শক্তিশালী। তাই প্রজারা সহজে আইনের আশ্রয় নেয় না। কেউ আশ্বাস দিলেও তারা ভরসা পায় না।

বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট এসলী ইডেন নীলকরদের অনেক জঘন্য অত্যাচারের প্রমাণ কমিশনের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে তিনি ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত ৪৯টি খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা, লুট, আগুন লাগান ও লোক অপহরণের ঘটনার তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি সেই তালিকা নীলকমিশনের সামনে পেশ করেছিলেন। ইডেনের তালিকায় বর্ণিত একটি ঘটনা এমনিঃ

"রাজশাহী জেলার বাঁশবেড়িয়ার শ্যামপুর কুঠির গুদামে একটা লোককে আটক করে রাখা হয়েছিল, সেই লোকটি সেখানেই মারা যায়। কুঠির লোকেরা লাশের গলায় ইট বেঁধে ঝিলে ডুবিয়ে দেয়। এই ঘটনা পরে যখন কোর্টে উঠলো, কুঠির চাকরগুলো শাস্তি পেলো। কিন্তু উচ্চ আদালতে তারা খালাস পেয়ে যায়। কারণ, যদিও কুঠির গুদামে আটক থাকাকালীনই লোকটির মৃত্যু ঘটেছিল একথা ঠিক, তবুও একথা সঠিকভাবে বলা যায় না যে, কিভাবে তার মৃত্যু ঘটেছিল।

১. Indigo Commission Report, Evidence, p. 63-64.

কাজেই যারা তার লাশ লুকাবার চেষ্টা করেছিল তাদের শাস্তি দিয়ে লাভ নেই।"১

বিচারের নামে চমৎকার প্রহসন। এমনি বিচারই ছিল ইংরেজ আদালতে। এমনি বিচার যেখানে, সেখানে রায়তেরা ভরসা পাবে কি করে? কি আশায় তারা নালিশ করবে? কার কাছেই বা নালিশ করবে? কাজেই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেও অনেক সময় হতভাগ্য রায়তদের চুপ করে থাকতে হতো। আদালতে বা অন্য কারো কাছে নালিশ দেওয়ার ইচ্ছা হতো না। সাহস পেতো না।" মিঃ ইডেন অন্য আরেক জায়গায় বলেছেনঃ

"আমি যখন আওরঙ্গবাদ মহকুমায় বদলী হলাম, দেখলাম যে, সব চাষী নীল বুনতে রাযী হয় না। নীলকররা তাদের গরু-বাছুর ধরে নিয়ে আটকে রাখে। এ বিষয়ে আমি তদন্ত করে অনেক খবর সংগ্রহ করলাম। পুলিশ পাঠিয়ে ৩০০ গরুও উদ্ধার করলাম। তা আমার নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসলাম। কিন্তু নীল-করদের ভয়ে অনেকদিন পর্যন্ত চাষীরা সে সব গরু নিতে আসেনি।"২

রায়তদের প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়ে ইডেনকে অনেক কৈফিয়তের সম্মু-খীন হতে হয়েছিল। রায়তেরা একথা ভালভাবেই জানতো যে, আইন তাদের রক্ষা করতে পারবে না। নীলকর আইন মানে না। সরকার মানে না। সত্যিকারভাবে নীলকরই তখন দেশের সরকার। দন্ডমুন্ডের কর্তা।

নদীয়া জেলার জজ মিঃ স্কোন্‌স রায়তদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে গভর্নরের সেক্রেটারী মিঃ গ্রে-র কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, "রায়তদের গরু মাঠে চরতে দেওয়া হয় না। যদি চরে তবে তা ধরে নিয়ে যাওয়া হয় নতুবা পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। রায়তের ফসল ধ্বংস করে দেওয়া হয়, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এ'সব দুর্বল দরিদ্র রায়তেরা কার কাছে অভিযোগ করবে? কে শুনবে তাদের অভিযোগ? তার চেয়ে ভাল মুখ বুজে চুপ করে থাকা।"

মিঃ স্কোন্‌স অনুরোধ জানিয়েছিলেন, "একটা কমিশন বসিয়ে চাষীদের এসব অভিযোগ তদন্ত করা হোক। যদি চাষীরা স্বেচ্ছায় নীলচাষ করে, তবে বুঝতে

১. Ibid, P. 3-4.
২. Ibid, P. 3-4.

হবে তারা এতে সন্তুষ্ট। তাদের অভিযোগও মিথ্যা। আর যদি অনিচ্ছায় নীলচাষ করে থাকে, তবে বুঝতে হবে এর পেছনে রয়েছে প্রতিকারহীন অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী।[১]

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, স্কোনস-এর আবেদন বা অনুরোধের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করলো না। উপরন্তু স্কোন্‌স তিরস্কৃত হলেন। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, আপনি কেবলমাত্র এক পক্ষের কথা শুনেছেন। নীলকরদের কথা শুনলে আপনার এ অভিমত পালটে যাবে। শুধু কি নীলকরই অত্যাচারী? জমিদার-মহাজনরা অত্যাচার করে না?

দুঃখের বিষয় যে সেক্রেটারী মিঃ গ্রে এসব অভিযোগের কোন প্রকার তদন্ত বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বোধ করেননি। অত্যাচার শুধুমাত্র নীলকররা করেনি, নিরীহ চাষীদের প্রতি অত্যাচার করেছে স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকার। সরকারের সমস্ত আমলা অফিসার। অত্যাচার করেছে জমিদার-মহাজন। তাদের নায়েব গোমস্তা।

কলারোয়ার[২] ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবদুল লতিফ সরকারী ক্ষমতা অনুযায়ী পুলিশ পাঠিয়ে অত্যাচারী নীলকরের হাত থেকে রায়তদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি পুলিশ ফোর্স পাঠাবার পূর্বে জনাব আবদুল লতিফ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মন্‌ট্রিসোর-এর অনুমতি নিতেও কসুর করেননি। মন্‌ট্রিসোর পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছিলেনঃ

> By all means send two Burkandazes to prevent Mr. Mackenzie's people bullying the ryots.

আবদুল লতিফ নীলকর ম্যাকেন্‌জিকে যে পরোয়ানা পাঠিয়েছিলেন, তাতে তিনি ম্যাকেন্‌জিকে জোর করে নীল বপন, লাঠিয়াল পাঠিয়ে জমি দখল, কয়েদ, বাড়ী-ঘর ধ্বংস, আঘাত ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং অবিলম্বে জোর-জুলুম বন্ধ করে আইনের আশ্রয় নিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত কোন প্রতিকার তো হলোই না, উল্টো আবদুল লতিফের বিরুদ্ধে অন্যায়-

১. Selections from the Record of the Govt. of Bengal, P. 4-5.

২. কলারোয়া বর্তমান সাতক্ষীরা।

ভাবে নীলকরদের উপর জুলুম ও আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হল। কৈফিয়ত তলব করা হলো। নীলকর ম্যাকেন্‌জিকে খুশী রাখার জন্যে আবদুল লতিফকে অন্যত্র বদলী করা হল।১ নীলকর শুধুমাত্র রায়তদের উপর অমানুষিক জোর-জুলুম ও অত্যাচার করেনি, যারা রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল তাদের উপরও খড়্গ-হস্ত ছিল তারা।

পাবনার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর. আলেকজান্ডার তাঁর এক রিপোর্টে বলেছেন, "রাণী সুমোময়ী মুর্শিদাবাদ জেলার একজন নিরীহ বাসিন্দা। তিনি সিভিল কোর্টের ডিক্রী অনুযায়ী কিছু জমির মালিক হন। বেলনাবাড়ী কুঠির নীলকর মিঃ স্টীভেনসন্ সেই জমি জোর করে দখল ও তাতে নীল বপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু সুমোময়ীর লাঠিয়ালগণ শেষ পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়।"২

ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার অবিচারের বিষয় নিয়ে জোর আলোচনা হয়েছিল। লেয়ার্ড বলেছিলেন, "নীলকররা অন্যায়ভাবে রায়তদের জমি দখল করেছে। সশস্ত্র হয়ে কৃষকদের উপর হামলা চালিয়েছে। তাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করেছে, গাছ কেটে নিয়েছে, বাগানের গাছ উপড়ে ফেলেছে। যারা বাধা দিতে এসেছে তাদের কাউকে খুন করেছে অথবা হরণ করে নিয়ে নিজেদের গুদামে বন্ধ করে রেখেছে। দেশের মধ্যে একটা উদ্দাম অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। কোন সভ্য দেশে এসব অত্যাচারের তুলনা মিলে না।"৩

অবাধে অবলীলাক্রমে নীলকররা যে এসব অন্যায় অবিচার ও বে-আইনী কাজ করে বেড়াতো তার কারণ ফৌজদারী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ছিল প্রায় সবই ইংরেজ। মফস্বল আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার ছিল না। কেবলকমাত্র কলকাতা হাইকোর্টে তাদের বিচার করা চলতো। এর ফলে নীলকরদের সাহস ও অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারী

১. Selection from the Record of Govt. of Bengal, P. 11-12, 1924.
২. Selection from the Record of the Govt. of Bengal. P.112.
৩. নীল বিদ্রোহঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৬৫।

মাসের 'সমাচার দর্পণে'র 'নীলকরদের দৌরাত্ম্যে রায়ত লোকেদের সর্বনাশ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে প্রজাদের অসহায় অবস্থার পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়ঃ

"গ্রামে গ্রামে নীলকরদের অত্যাচার বাড়িয়া চলিতেছে। দারোগা তাহা দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ প্রজারা কোন নালিশ করিতে সাহসী হয় না। সাহেব-দের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া খুব কঠিন। দ্বিতীয়তঃ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের সঙ্গে নীলকরদের বন্ধুত্ব খুব গভীর। তাই হয়ত প্রজাদের কোন অভিযোগ আরও অত্যাচার ডাকিয়া আনিবে।"

১৮৫০ সালের ১৮ই জানুয়ারীর 'সমাচার দর্পণে'র খবরে প্রকাশঃ "নদীয়া জেলায় নীলকরদের অকথ্য অত্যাচারের ফলে প্রজাদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যভাবে নীলকরদের পক্ষভুক্ত হইয়া এই অত্যাচারে সাহায্য করিতেছেন।"১ অর্থাৎ নীলকররা ছিল দেশের সর্বেসর্বা, একচ্ছত্র সম্রাট। রাজাধিরাজ! আইনের রশি ছিল তাদের হাতে। বিচারক ছিল তাদের খেলার পুতুল।

১৮৫৯ সালের 'সমাচার দর্পণে'র আরেক রিপোর্টে আইন ও আদালতের এক চমৎকার রূপ ফুটে উঠেছেঃ "শাসনের নামে সারাদেশে স্বৈরাচার চলিতেছে। শুধুমাত্র চোর ডাকাত দু'চারটা ধরাকে শাসন বলে না। কোন কুঠিয়াল ম্যাজিস্ট্রে-টের শালা, কেহ ভাই, কেহ ভগ্নিপতি, কেহ সমধ্যায়ী, কেহ পিসে, কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ গ্রামস্থ, এইভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক ও সংযোগ আছে। এবং তা না হইলেও সকলে এক সানকির ইয়ার। কোন মতেই ছাড়াছাড়ি হইবার জো নাই। অপিচ হইতে এমত কহেন শ্বেতকায় নীল সাহেবদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিয়াছেন তাহারা কস্মিনকালেও কোন মোকদ্দমায় পরাস্ত হন না। সর্বত্র তাহাদের জয়জয়কার। .........দারোগারা প্রত্যক্ষ ঘটনা দৃষ্টি করিয়াও রিপোর্ট দিতে সাহসী হয় না। কারণ সাক্ষীর যোগাড় হয় না। তাহা হইলেও শেষ রক্ষা হয় না। বিচারপতির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া অবশেষে কর্ম রাখা দায় হয়। ...... লোকে কথায় বলে—"যার সর্বাঙ্গে বাথা, তার ঔষধ দিবে কোথা?"২

১. সংবাদপত্রে সেকালের কথাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৮-৬০।
২. সংবাদপত্রে সেকালের কথাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রায়তদের সর্বদিকেই বিপদ। কোন মতেই নীলকর অক্টোপাসের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। দু'টাকা দাদন নিয়ে আজীবন বিনালাভে নীলচাষ করতে হবে। স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে উপোস থাকতে হবে; আর সইতে হবে নির্বিবাদে অসহনীয় অত্যাচার। এর কোন প্রতিকার নেই! রক্ষক যেখানে ভক্ষক সেখানে বাঁচার উপায় কোথায়?

নীলকরদের আধিপত্য এত প্রবল ছিল যে, নিজেদের সুবিধার জন্যে সরকারী কার্যকলাপেও তারা হস্তক্ষেপ করার সাহস রাখতো। সরকার বিচার কার্যের সুবিধার জন্যে আদালতের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নীলকরদের প্রভাব হেতু সর্বক্ষেত্রে তা করতে পারেনি। যশোহর লোহাগড়ায় মহকুমা স্থাপন করার প্রস্তাব করা হলে নীলকর ম্যাক আর্থার আপত্তি জানাল যে, নীলকুঠির পাশেই মহকুমা থাকতে পারে না। দেশীয় লোকেরা মামলাবাজ। মহকুমা কাছে থাকলে তারা শুধু শুধু মামলা দায়ের করবে। এতে নীলকুঠির কাজের অসুবিধা হবে। এর কিছু দিন পর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সে অঞ্চলে বেড়াতে গেলেন। পথে লোকমুখে জানতে পারলেন যে, কুঠিতে কয়েকজন রায়তকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান চালালেন। দেখা গেল কুঠির গুদামে অনেক লোক। ভিন্ন ভিন্ন কুঠিতে প্রায় দু'মাস যাবৎ তাদের আটক রাখা হয়েছে। মহকুমা স্থাপনের আপত্তির কারণ কোথায়— সহজেই বুঝতে পারলেন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট।[১] এ ব্যাপারে কুঠির কয়েকজনের শাস্তিও হয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে। এমনি দু'একজন সদাশয় কর্মঠ ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের অত্যাচারের ব্যাপার নিয়ে গভর্নমেন্টকে অনেকভাবে জানাবার চেষ্টা করেছিলেন। কোন ফল হয়নি তাতে। গোটা দেশ জুড়ে চলছে অরাজকতা। শাসন বিভাগ অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক। স্বৈরাচারী কার্যকলাপের পোস্ত। সে ক্ষেত্রে দু'একজনের তদন্ত বা রিপোর্টে কোন সুফল ফলার সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও বিচার বৈষম্য দূর করার মানসে ১৮৪৯ সালে ভারত সরকারের আইন সচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন সাহেব) আইনের

---

১. সাহিত্য পত্রিকা, ১৩০৮ বাংলা ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

কিছুটা সংশোধন করার ইচ্ছায় একটা খসড়া প্রস্তুত করেন। তাতে বলা হয় যে, প্রস্তাবিত আইন অনুসারে মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে বিচার হতে পারবে এবং জুরী দ্বারাই সে বিচার হবে। তবে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের থাকবে না। এ ছিল আইনের একটা খসড়া মাত্র। এবং এতটুকু সংশোধন প্রক্রিয়া দ্বারায় বিচার বৈষম্য দূর হতে পারে না। এবং এর ফলে নীলকরদের বিশেষ সুবিধাসমূহ লুপ্ত হয়ে যাবে না। অথচ এই সামান্য খসড়ার খবর পেয়েই এদেশের ইউরোপীয় সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। একত্রিতভাবে তারা জোর প্রতিবাদ জানাল যে, এমন একটা কালাকানুন (Black Act) বাতিল করতে হবে। 'নীলকর সমিতি' 'জমিদার ও বণিক সংঘ' এবং 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স' এবং তাদের পরিচিত সংবাদপত্রগুলো একজোটে আন্দোলন গড়ে তুললো। পরিশেষে সরকার বাধ্য হলেন এই আইনের খসড়া প্রত্যাহার করতে।

রায়তদের তরফ থেকে বিখ্যাত বক্তা ও রাজনৈতিক নেতা রাম গোপাল ঘোষ এই আইনকে সমর্থন করে অনেক বক্তৃতা দিলেন এবং পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। রাম গোপাল বাবু ছিলেন 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল এন্ড হরটিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতি। এছাড়া তিনি সাংস্কৃতিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এই আইনের সমর্থনে পুস্তিকা প্রকাশের অপরাধে তাঁকে উক্ত সোসাইটির সহ-সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

রাম গোপালবাবু তাঁর পুস্তিকায় লিখেছিলেনঃ "বলপূর্বক ফসল দখল করার কথা, বে-আইনীভাবে লাঠিয়াল লাগিয়ে চাষীদের জমিতে নীল বোনার কথা সবই জেনেছি। নিরপরাধ চাষীদের কিভাবে সপরিবারে কুঠিতে নিয়ে কয়েদ রাখা হয় এবং অত্যাচার করা হয়, সে সংবাদও আমি পেয়েছি। রায়তদের প্রহার করা ও হত্যা করার খবরও আমি জানি। চাষীদের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করা হয়, ঠান্ডা মাথায় বন্দুক চালিয়ে নরহত্যা করা হয়। নীলের চাষ করার চেয়ে অন্য ফসল করা চাষীদের জন্যে অনেক লাভজনক ; কিন্তু তাদের হাত-পা বাঁধা। নীলচাষ করার জন্যে তাদের জোর করে দাদন দেওয়া হয়েছে।......এতসব অপরাধের জন্যে দেশের আইনে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

কিন্তু তারা রেহাই পেয়ে যায়। মফস্বলের আদালত তাদের নাগাল পায় না।"১

আইন তৈরী হয়নি, খসড়া হয়েছিল মাত্র, শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয়ে গেল। রাম গোপাল ঘোষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। সরকার বাধ্য হলেন নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করতে। কাজেই এবার নীলকরদের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। দেশী-বিদেশী অনেক ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের অত্যাচার বর্ণনা করে বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারীকে প্রতিকারের জন্যে অনেক অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি তাতে। অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে শুধু।

নদীয়া জেলার অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ. জে হার্সেল নীল-কমিশনের সামনে নীলকরদের অত্যাচারের একটা লম্বা ফিরিস্তি পেশ করেছিলেন। তার থেকে দু'একটা উদাহরণ এখানে তুলে দেওয়া হলোঃ

১. ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে নীলকর ব্রোড্রিকের লাঠিয়ালদের সাথে রায়তদের এক লড়াই হয়। সে লড়াইয়ে বিষ্ণু ঘোষ খুন হয়। তার লাশ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এটাকে সাজানো মামলা বলে ডিসমিস্ করে দেন। সেশন জজ-এর কোর্টে এর বিরুদ্ধে যে আপীল করা হয় তাও নাকচ হয়ে যায়।

২. ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসে ইস্কান্দারপুর গ্রামে রায়তরা নীল বপণ করেনি বলে নীলকর ডম্বাল ১৫০ জন লাঠিয়াল নিয়ে রায়তদের আক্রমণ করে এবং গ্রাম লুট করে। অসংখ্য কৃষক এই দাঙ্গায় আহত হয়। মামলায় ডম্বাল নির্দোষী বলে প্রমাণিত হল। কিন্তু তার অনুচর ৫ জনের ১ বছর করে কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে জরিমানা হল। ডম্বালের পুত্র আক্রমণ পরিচালনা করেছিল বলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে আদালতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেন। সে আদালতে হাযির হল না, তবুও তাকে জামিন দেওয়া হল। সেশন কোর্টে সব আসামীই খালাস পেয়ে গেল।২

১. Selections from the Records of the Govt. of Bengal ; Papers Relating to Indigo Cultivations in Bengal. P. 2-3.
২. Indigo Commission Report. Appendix 11.

নীলকরদের পৈশাচিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সময় কৃষকেরা মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। সবক্ষেত্রে কৃষকরা মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেনি। রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ময়মনসিংহের জামালপুর মহকুমার পক্ষীমারির কালু চুনিয়া নীলচাষ করতে ও দাদন নিতে অস্বীকার করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নান্দিনা কুঠির ম্যানেজার আর্থার ব্রুস্ কয়েকজন কর্মচারীসহ ঘোড়ায় চড়ে কালুর বাড়ীতে হাযির হলেন। কালুকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেত্রাঘাত করতে থাকেন। কালু বেপরোয়া হয়ে বাঁশের একটা খুঁটি নিয়ে সাহেবদের পিঠে দমাদম আঘাত করতে লাগলো। সাহেব ভয়ে লোকজন নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। এরপর থেকে ঐ অঞ্চলের চাষীদের মন থেকে সাহেব ভীতি কমে গেল।১

বেতাই গ্রামের ইউসুফ বিশ্বাস ও বৃন্দাবন দত্ত ৮০ জন রায়তকে নিয়ে নীলকর আর্চিবল্ড হিল্‌সের নীলকুঠি আক্রমণ করে কুঠি ধ্বংস করে দেয়।২

কিছু কিছু জমিদারও নীলকরদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ফলে জমিদারদের সাথেও নীলকরদের সংঘর্ষ বাধে। ১৮৫৭ সালে জমিদার ব্রজপাল চৌধুরীর সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে ডম্বালের সাথে বেলুপুকুরিয়ার জমিদার কালাচাদ ভট্টাচার্যের এবং ১৮৫৫ সালে কাঠুরিয়ার নীলকরদের সঙ্গে জয়রামপুরের তালুকদার রামচন্দ্র রায়ের সংঘর্ষ বেধেছিল।৩

ভাওয়ালের জমিদার কালীকিশোর রায় চৌধুরী ঋণগ্রস্ত হয়ে সম্পত্তির কিয়দংশ প্রসিদ্ধ নীলকর জে. পি. ওয়াইজ সাহেবের নিকট বিক্রয় করেন। ওয়াইজ সাহেব পার্শ্ববর্তী জমিদারদের কাছ থেকে আরও কিছু সম্পত্তি ক্রয় করে এবং মুদাফা ও ভারারিয়ায় কুঠি স্থাপন করে। ওয়াইজ সাহেব জমিদারদের প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করে। জমি শস্যাদি বলপূর্বক লুঠ, অন্যায়ভাবে কয়েদ এবং মারপিট প্রভৃতি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক জমিদার তাদের সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে নীলকর ওয়াইজ সাহেবের সাথে আপোস করতে বাধ্য হয়।

---

১. জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্তঃ গোলাম মোহাম্মদ।
২. Indigo Commission Report. Appendix 11.
৩. Indigo Commission Report, Appendix. II.

ভাওয়ালের অন্য হিস্যার জমিদার বিধবা সিদ্ধেশ্বরী দেবী কিন্তু এসব অত্যাচার নীরবে সহ্য করলেন না। তিনি অত্যাচারী ওয়াইজকে উচিত শাস্তি দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি ভগীরথ পাঠক নামক এক লাঠিয়ালকে বহু লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র ও ১২টি হাতীসহ ওয়াইজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়েছিল। শান্তিরক্ষার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রান্ট সাহেব একদল পুলিশ মোতায়েন করেছিলেন। সংঘর্ষের ভয়া-বহতা দেখে তারা ভয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। জমিদারের লোকজন ওয়াইজ সাহেবের কাছারি লুঠ করে। ওয়াইজ ও তাঁর ম্যানেজার ক্যামারন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।১

১৮৩০ সালে একটা বে-আইনী আইন করা হয়েছিল যে, নীল-চুক্তির জন্যে নীল-চাষীকে ফৌজদারী মামলার সাহায্যে জেলে আটক রাখতে পারত। পরে অবশ্য এই বর্বর আইন বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। নীলচাষে অবিশ্বাস্য রকম লাভ ও বিপুল ক্ষমতা হাতে পেয়ে নীলকরদের লোভ ক্রমশ বাড়তে থাকল। তারা ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিতে থাকল যে, ১৮৩০ সালের 'বর্বর আইন' আবার প্রয়োগ করা হোক। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৫ সালে সেই আইন আবার প্রয়োগ করার বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা শুরু করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় আলোচনা স্থগিত রাখতে হল।২ ইতিমধ্যে তারা আরেকটি ক্ষমতার অধিকারী হল। সিপাহী বিদ্রোহের পর অত্যাচারী নীলকরদের অনেকেই অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হল। অর্থাৎ অপরাধী এবার বিচারকের আসনে বসল। কোন সভ্য জাতির ইতিহাসে এমন নিদর্শন আছে কিনা সন্দেহ।

ফলে নীলকরদের অত্যাচার আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। অপরদিকে চাষী-দের সহ্যের বাঁধ ভাঙলো। আর তারা মুখ বুঁজে সইতে রাজী নয় বর্বর নীলকরদের অন্যায় অত্যাচার। দিকে দিকে শুরু হল সংঘর্ষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা। স্থানে স্থানে জ্বলতে লাগল বিদ্রোহের আগুন। ১৮৬০ সালে যে ব্যাপক নীল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার বীজ রোপিত হয়েছিল ১৭৬০ সালে ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনায়।

---

১. বাংলার পারিবারিক ইতিহাস, ৬ষ্ঠ খন্ড। পৃঃ ১৬২-১৬৩ঃ পন্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৭২।

## কৃষক জমিদার ও নীলকর

আদিতে রাজা বা রাষ্ট্রই ছিল প্রধানত ভূস্বামী। প্রজার অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল জমি দখল ও ভোগ করার মধ্যে। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট খাজনা অনাদায়ের অপরাধ ছাড়া প্রজার সেই অধিকার বিলুপ্ত করার ক্ষমতা রাজারও ছিল না। প্রজা-পরিবারের কেহ ইচ্ছা করলে ভোগ দখলের অধিকার হস্তান্তর করতে পারত। অবশ্য তার জন্যে প্রয়োজন হত পল্লী বা গ্রাম প্রধানদের লিখিত অনুমোদন। মোটকথা প্রজার অধিকারের রূপ : দখলীস্বত্ব। রাজস্ব আদায় করতে না পারলে উচ্ছেদে বাধ্য। হস্তান্তর করার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ।

যেহেতু কৃষিই ছিল প্রধান উৎপাদন পন্থা, সেইহেতু সমাজের মূল নিহিত ছিল ভূমি ব্যবস্থার মধ্যে। জমির মালিক রাজা ও দখলীস্বত্ববান কৃষক ছাড়াও জমির ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিল বর্গাদার, নানা রকম দাস ও ক্ষেতমজুর।

পর্যাপ্ত মুদ্রার প্রচলন না থাকায় উৎপন্ন শস্যের একাংশ দিয়েই রাজার দেয় বা খাজনা পরিশোধ করতে হত। দাস ও ক্ষেতমজুরদের বেতনও পরিশোধ করতে হত শস্য বা উৎপন্ন বস্তু দ্বারা। মোগল আমলে রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। আঞ্চলিক মুদ্রা মাধ্যমেও তা গ্রহণযোগ্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ল তখন অবশ্য চাষীরা ফসলের অর্ধাংশ দিয়েও নিষ্কৃতি পেত না। কারণ, চতুর্দিকে বিশৃঙ্খল ও গোলযোগের সুযোগে জমিদার, গোমস্তা, জায়গীরদার ও সামন্তরাজগণ নিজেদের ইচ্ছামত হুকুমজারী করত, সুযোগমত যা পেত আদায় বা লুট করে নিত। শাসনদণ্ড গ্রহণ করার প্রারম্ভেই ইংরেজ বাংলা ও বিহারকে লুঠ করার এক মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করল। রাজস্ব আদায়ের নামে অর্থলোভী ক্লাইভ নির্বিবাদে এই লুণ্ঠন কার্যে সহায়তার জন্যে গোমস্তা, বেনিয়ান, জমিদার প্রভৃতি একদল কর্মচারী সংগ্রহ করল। এদেরই সহায়তায় ইংরেজ কোম্পানী অবাধ লুঠতরাজ কায়েম করল এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ভেঙে চুরমার করে দিল। শহর-নগর গ্রাম সর্বত্র তাদের পণ্য-ব্যবসা প্রসারিত

হল। ইংল্যাণ্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের উন্নতির জন্যে কাঁচামাল সংগ্রহের প্রয়োজনে নিরীহ গ্রাম্য চাষী-মজুর পরিণত হল একচেটিয়া শোষণের শিকাররূপে। লোপ পেলো পূর্বের প্রচলিত প্রথা। কৃষকদের নিকট হতে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের কানুন জারী হল। এবং মুদ্রাই হল রাজস্ব আদায়ের একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা। এভাবে ইংরেজ বেনিয়া সরকার বাংলা বিহারের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে ভূমি-ব্যবস্থার কাঠামো নতুনভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করল। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ করল প্রশস্ত।

এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী কোম্পানী সরকার রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তা বা কর্মচারীদের জমির মালিক বলে ঘোষণা করল। এই সুযোগে গ্রামের কিছু সংখ্যক মহাজন বা প্রধান ব্যক্তিও জমির মালিক হয়ে বসলো। এসব নতুন জমির মালিকদেরই নাম হল 'জমিদার'। তারা জমিদার হল এই শর্তে যে, কৃষকদের নিকট হতে খাজনা বা কর আদায় হোক বা না হোক নির্দিষ্ট দেয় রাজস্ব ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দিবে। অপরিমিত ক্ষমতা ও অবাধ অধিকার প্রাপ্তির ফলে এসব নব্য জমিদার শ্রেণী কৃষকদের নিকট হতে যত খুশী কর বা খাজনা আদায় করতে লাগল। ইচ্ছামত জমি বিলি-ব্যবস্থার অধিকার লাভ করার ফলে গাঁতিদার, তালুকদার, পত্তনিদার ও দরপত্তনিদার নামে কিছুসংখ্যক উপস্বত্বভোগী শোষণকারীরও জন্ম দিল তারা। এদের মিলিত শোষণ-যন্ত্রের চাপে পড়ে বাংলা-বিহারের চাষী ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যেতে লাগল।

এতেও কোম্পানীর শাসকগণ সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা জমিদারদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। তাই কোম্পানী জমিদারদের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করার জন্যে তাদের উপর তদারককারী (সুপারভাইজার) নিযুক্ত করল। হিসাবপত্র তদারক ছাড়াও এদের বেসরকারী কাজ ছিল জমিদারদের নিকট হতে প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ। এ ব্যবস্থাতেও কোম্পানী সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সুপারভাইজারী পদ লোপ করে তার পরিবর্তে প্রত্যেক জেলায় একজন করে কালেক্টর নিযুক্ত করা হল। কালেক্টরদের উপর জমিদারদের কার্য প্রক্রিয়া তদারকের ভার অর্পণ করা হল এবং একটা কমিশন গঠন করা হল নতুন কর ধার্য করার বিষয় পরিকল্পনার জন্যে।

১৭৭২ সালে এই কমিশন নতুন কর ধার্য করার পরিকল্পনায় জমিদারদের সাথে 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' করলো। অবশ্য ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাতিল হল এই পরিকল্পনা।

এরপর গঠিত হল রেভিনিউ বোর্ড। এই রেভিনিউ বোর্ড ভূমিকরের নামে চাষীদের উপর স্টীমরোলার চালাবার ব্যবস্থা করলো। ভূমিকরের পরিমাণ বেড়ে চলল দিনের পর দিন। শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করা হলো যে, ভূমিকর দিতে না পারলে চাষীদের জমি বিক্রি করে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত ভূমিকরের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, তা আদায় করা কৃষকদের পক্ষে সম্ভবপর হলো না। এমনকি হেস্টিংস, রেজা খাঁ, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ ও দেবী প্রসাদ প্রভৃতি কুখ্যাত অত্যাচারীর পক্ষেও তা সম্ভবপর হলো না। অমানুষিক উৎপীড়ন আর শোষণের ফলে দেশ জুড়ে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। নড়ে উঠলো ব্রিটিশ শাসনের শক্ত ভিত। এই সংকটের সময়ে গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। দেশের এ দুরবস্থার প্রতিকার হিসাবে ভূমিরাজস্ব নতুনভাবে নির্ধারণের ব্যবস্থা হল। কোন প্রকার জরীপ বা চাষীদের দেয় ক্ষমতা বিবেচনা না করেই সমগ্র বাংলাদেশের ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হল দু'কোটি আটষট্টি টাকা। ১৭৯৩ সালে কোম্পানী জমির সম্পূর্ণ অধিকার ন্যস্ত করলো জমিদারদের উপর। বৎসরের একটা নির্দিষ্ট দিনে জমিদারগণ বৈধ বা অবৈধ উপায়ে যেমন করে হোক কোম্পানীর নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করল। এরই নাম কুখ্যাত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।'[১] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক যে উদ্দেশ্য ছিল তা হল, দেশবাসীর মধ্য হতে এমন একটা নতুন শ্রেণী তৈরী করা, যারা সংকট মুহূর্তে ইংরেজ শাসকদের সহায়তা করবে এবং কৃষকদের ক্রমবর্ধমান ক্রোধানল থেকে ইংরেজ শাসকদের রক্ষা করবে।

লর্ড কর্নওয়ালিশ তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ "আমাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এদেশের জমিদারগণকে আমাদের সহযোগীরূপে

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১০৯-১১০।

গ্রহণ করতে হবে। যে জমিদারগণ একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্ত মনে ও সুখ-শান্তিতে ভোগ করবে তাদের মনে কোন প্রকার পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগতেই পারে না।"১ পরবর্তীকালে 'দরদী সমাজ সংস্কারক' নামে পরিচিত জনপ্রিয় গভর্নর জেনারেল লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিকও দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, "আমি একথা বলতে বাধ্য হলাম যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা গণবিপ্লব রোধ করার ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে।"২ জমিদাররাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুন্ঠাবোধ করেননি। ১৮৫৭ সালের মহা-বিদ্রোহের সংকট মুহূর্তে জমিদাররা ইংরেজ প্রভুদের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিতে এতটুকু কুন্ঠাবোধ করেননি। ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় জমিদারদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার প্রশ্নে জমিদার সংঘের সভাপতি ময়মনসিংহের মহারাজ বলেছিলেন, "শ্রেণী হিসাবে আমাদের (ভূ-স্বামীগণের) অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে ইংরেজ শাসনকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করে তোলা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।"৩

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষীদের সর্বনাশ ও জমিদারদের অবস্থা বর্ণনায় তৎকালীন সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' তার সম্পাদকীয়তে যে চিত্র তুলে ধরেছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়ঃ "যে সময়ে প্রজারা অনায়াসে খাজনার টাকা প্রদান করিতে পারে সেই সময় কালেক্টর সাহেবরা জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্বের টাকা গ্রহণ করিলেই উত্তম হয়, বাকি আদায় নিমিত্ত কোন জমি-দারী নিলাম হয় না। কিন্তু যে সময়ে প্রজার ঘরে টাকা থাকে না, তাহারা ক্ষেত্রের কার্যে পরিশ্রম করে এবং কিরূপে ফসল উত্তম হইবে সেই চিন্তায় অহরহ চিন্তিত থাকে, সে সময় কালেক্টারী খাজনা দিতে হইলে জমিদাররা সর্বনাশ বোধ করেন, তাহারা টাকার নিমিত্ত মস্তকে হস্ত দিয়া বসেন, কোথায় টাকা পাইবেন তাহার চিন্তায় স্বচ্ছন্দ্যপূর্বক তাহাদিগের আহার নিদ্রা হয় না।

---

১. Land problem in India : R. K. Mukherjee, P. 35.

২. Lord William Bantinck's Speech on November 8,1829, Quoted from India Today, by R. P. Dutta, P. 233.

৩. Presidential Address in the first All-India Land holder's Conference 1938, Quoted from 'India Today' P. 233.

জমিদারগণের এই মহাচিন্তা উপস্থিত হইলে ধনাঢ্য লোকেরা কর্জ্জ দিয়া ১২ পারসেন্টের হিসাবে সুদ ও ৫ পারসেন্টের হিসাবে কমিশন লইয়া আপনা-পন দীর্ঘোদর পরিপূর্ণ করেন, তাহাতে জমিদারগণের একে রাজস্ব প্রদানের চিন্তা তাহার উপর সুদ কমিশনের চিন্তা উপস্থিত হয়, সুতরাং অনেক জমি-দার . জমিদারী রক্ষা করিতে পারেন না।......ভূম্যাধিকারিদের মধ্যে যাহারা দুর্দান্ত হয়েন তাহারা প্রজার বক্ষের উপর বাঁশ দিয়া টাকা সংগ্রহ করেন। সপ্তম পঞ্চমের অনেক মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়, কোন প্রজা দুষ্ট হইলে নায়েবেরা তাহার দমনার্থে কালেক্টর সাহেবের সমীপে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করেন। কালেক্টর সাহেব তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন না। জমিদাররা প্রজার প্রতি এই প্রকার যত অভিযোগ বা অত্যাচার করিয়াছে গভর্নমেন্টকেই তাহার মূল কারণ বলিতে হইবেক, গভর্নমেন্ট জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহকরণের কঠিন নিয়ম না করিলে ঐ সকল অত্যাচার কোনরূপেই হইতে পারে না।"১

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালে খাজনার দায়ে প্রজারা যখন ঘরবাড়ী ক্ষেত-খামার ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল এবং জমিদাররা যখন গভর্নমেন্টের কাছে অভিযোগ পেশ করতে লাগল যে তারা সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাজনা দিতে পারবে না তখন গভর্নমেন্টে এক নতুন আইন প্রণয়ন করে জমিদারদের জোর-জুলুম করে চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধি-কার দিল। এই আইনের নাম কুখ্যাত সপ্তম আইন (Regulation VII of 1799)। পরে এই আইন অত্যধিক কঠোর হয়েছে বিবেচনা করে আরেকটা সংশোধিত আইন জারী করা হল। এরই নাম পঞ্চম আইন (Regulation V of 1812)। অথচ এর নেপথ্যে নিহিত সত্যিকার কারণ বা অবস্থা খুঁজে দেখার প্রয়োজন বোধ করলো না কেউ।২

গভর্নমেন্টকে রীতিমত রাজস্ব প্রদান করে কেবলমাত্র জমিদাররাই যে লাভ-বান হয়েছে তা নয় জমিদারদের অধীনে যে সমস্ত তালুকদার, পত্তনিদার, দর-

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র। বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১৪-১৫
২. Report of Land Revenue Commission, Bengal. Vol. 1, P. 21-22.

পত্তনিদার ও ইজারাদার প্রভৃতি ছিল তারাও কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির দ্বারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখেছে ও আরাম-আয়েসে সংসার নির্বাহ করেছে। নিজেদের পুষ্টিসাধন করেছে। এ বিষয়ে তৎকালীন সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত বিবরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

"গভর্নরের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমিদারগণই ভূমির উৎপন্নের লভ্যাংশ ভোগ করিয়া থাকেন এমন নহে, জমিদারদিগের অধীনে যে সমস্ত তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার ইজারাদার প্রভৃতি আছেন তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি আপনাপর সুখসেবা ও সংসার যাত্রা নির্বাহকরণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষকদিগকে আপনাপন শ্রমার্জিত ধন দিয়া এই সকল লোকেরও পুষ্টি সাধন করিতে হয়।

তালুকদার প্রভৃতি ব্যতীত তাহাদিগকে অধীনস্থ কর্মচারীরাও বিবিধ উপায় ও কলাকৌশল এবং ভয় প্রদর্শন দ্বারা কৃষকের উপার্জনের অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তাহাদিগের লম্বোদর পরিপূর্ণ করিতে না পারিলে কৃষকের নিস্তার থাকে না। তাহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণাজালে জড়িত হইতে হয়। তাহারা সময়ে সময়ে নূতন জরীপ ও নূতন জমাবন্দীর ফন্দি তুলিয়া কৃষকের সর্বনাশ করেন, অপিচ গ্রামে গ্রামে আবার অনেক ধান্যের মহাজন আছেন, তাহারা ও মহাপাত্র। তাহাদিগের শরীরে দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই। ঐ মহাজনেরা অসময়ে অর্থাৎ ভূমিতে বীজ বপনকালে কৃষকদিগকে বীজ ধান দেয় এবং আহারের অভাব সময়ে ধান্যাদি কর্জ দিয়া থাকে। কিন্তু কৃষক আপনার ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন করিলে বৃদ্ধির সহিত তারা গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ঐ বৃদ্ধি গ্রহণের নিয়ম অতি ভয়ানক। তাহারা একগুণ দিয়া তাহার চতুর্গুণ এবং কোন কোন স্থলে পঞ্চগুণ ও ষড়গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ ভয়ানক ধান্যের মহাজনেরা ২/৪টা শরের গোলা বান্ধিয়া জমিদার অপেক্ষাও অধিক পরাক্রম ধারণ করিয়াছে। দুঃখী কৃষকগণ অসময়ে অভাব মোচন নিমিত্ত অনেকেই তাহাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই মহাজনেরাও বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়া আপনাপন পাওনা সকল সংগ্রহ করিতেছে।[১]

---

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড): বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১৩৫-৩৬।

এমন করে স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসকদের চক্রান্তে এবং তাদের সৃষ্ট ভূমি বিপ্লবের ফলে ভূমির মূল স্বত্ব লাভ করলো জমিদারগণ, আর উপস্বত্ব বণ্টিত হল বিভিন্ন ধরনের জোতদার তালুকদারগণের মধ্যে। কৃষক হারাল তার সমস্ত স্বত্ব। মিঃ জে. ফিল্ড যথার্থই মন্তব্য করেছেনঃ

"ভূমির উপর হতে কৃষকের সর্বস্বত্ব এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হল যে উহার সামান্যতম নিদর্শন আজ আর খুঁজে বের করা যাবে না। এমনকি সে বিষয়ে কোন ধারণা করাও বর্তমানে অসম্ভব।"১

যে জমির উপর যাদের কখনও কোন অধিকার ছিল না, সেই জমির উপর সর্বপ্রকার স্বত্ব ও অধিকার লাভ করার ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় স্থায়ী একটি শোষক শ্রেণীর জন্ম হল। জমিদার গোষ্ঠী ইংরেজ সরকারের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে পারলেই হল। এরপর ইচ্ছামত শোষণ করে যা কিছু আদায় করতে পারত, তার একমাত্র অধিকার ছিল জমিদারের। যে জমিদার প্রজাদের উপর ইচ্ছানুরূপ যত বেশী আবগা কর চাপিয়ে দিতে পারত, সে-ই ছিল ততবেশী নামকরা প্রতাপশালী জমিদার। এ ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অদৃশ্য ইংগিত।২ এমন ইংগিতের একটা কারণও ছিল, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই মুসলমানগণ ইংরেজদের বিরোধিতা করে আসছিল। এমনকি ইংরেজী ভাষা বর্জন করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতেও পিছপা হয়নি তারা। তারা সুযোগ পেলেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। কোন অবস্থাতেই ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতায় প্রস্তুত ছিল না তারা। দীর্ঘ একশত বছর কাল ধরে মুসলমানগণ বিদেশী ইংরেজ শাসকদের আপোসহীন শত্রু বলে গণ্য করে আসছিল। তাই লর্ড ক্যানিং দুঃখ করে বলেছিলেন, "মহারাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন?"৩ বিদ্রোহী মুসল-

১. Land Holding : J. Field, P. 23 (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।
২. Commercial System of East India Company. P. 175.
৩. The Indian Musalmans ; W. W. Hunter, Preface.

মানদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ছাড়াও তাদের শায়েস্তা করার জন্যে ইংরেজ সরকার অনেক পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। সমাজ ও শাসন বিভাগের সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের আধিপত্য বাড়িয়ে মুসলমানদের হেয়ভাবে দাবিয়ে রাখার একটা হীন পরিকল্পনা প্রথম থেকেই কাজ করে আসছিল। ইংরেজ শাসনের চক্রান্তে রাতারাতি যারা জমিদাররূপে আখ্যায়িত হল, তারা সবাই ছিল হিন্দু। ইংরেজ কোম্পানীর দালাল এবং মুৎসুদ্দি শ্রেণীর স্বার্থপর কুচক্রী। অপরদিকে বাংলার শতকরা ৯০ ভাগ কৃষিজীবীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তারা ছিল চিরকালের গরীব। তখনকার দিনে স্কুল-কলেজের সংখ্যা ছিল অতিশয় নগণ্য এবং তা ছিল শহরে। পল্লীবাসী গরীব মুসলমানদের পক্ষে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। তার উপর ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ইংরেজ-বিদ্বেষ। এমতাবস্থায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের দিয়ে দরিদ্র নিরীহ মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার চক্রান্তে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সহজেই সফল হলো। হিন্দুরাও এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করলো না। হিন্দু জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারে পল্লীর মুসলিম সমাজের বুকে এক ভয়াবহ ত্রাসের সঞ্চার হলো। অত্যাচার এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যে, মুসলমান প্রজাদের দাড়ির উপর কর বসাতেও দ্বিধাবোধ করেনি অত্যাচারী হিন্দু জমিদার। মহাজনের ঋণের চক্রান্তে পড়ে বহু নিরীহ চাষী পরিবারকে ঘটি-বাটি জমি-জমা খুইয়ে পথে বসতে হয়েছে। পরবর্তীকালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে পল্লীর মুসলিম সমাজকে মহাজনরূপী যমের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী আজও পল্লীর মানুষের হৃদয়ে ত্রাসের কম্পন সৃষ্টি করে। দেশীয় জমিদারদের অত্যাচার এমন এক পর্যায়ে গিয়েছিল যে, নিগৃহীত দরিদ্র মানুষেরা ইংরেজদের চেয়ে দেশীয় জমিদারদের বড় শত্রু মনে করত।

১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতালগণ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিল, "আমাদের এ যুদ্ধ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বাঙালীদের বিরুদ্ধে।"[১] বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে বাঙালী মানে হিন্দু সুদখোর মহাজন।

১. Bengal, Bihar, Orissa, Shikim : L. S. S. O. Malley, P. 156.

বাংলার গ্রামে গ্রামে নীলকরদের সর্বতোভাবে যারা সহায়তা করেছিল তারাও ছিল হিন্দু জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী। কুঠির কেরানী, গোমস্তা সবাই ছিল শিক্ষিত বলে চিহ্নিত হিন্দু মধ্যশ্রেণীভুক্ত। এমনকি নীলকরদের সশস্ত্র ফৌজ লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা সবাই ছিল হিন্দু। আর অত্যাচারিত শ্রেণী নিরীহ অশিক্ষিত কৃষকদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান।

শুধুমাত্র ইংরেজ সরকারের নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান ছাড়া ভূমি হতে প্রাপ্ত আয়ের অর্থাৎ অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে প্রজাদের নিকট হতে আদায়ী অর্থের বাকী সবটাই ভোগ করত জমিদার। আর্থিক এ ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। লোভী স্বৈরাচারী কোম্পানী সরকারের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব ছিল। এ ক্ষতি-পূরণের একটা উপায় হিসাবে সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে সব জমি পতিত ছিল বা যা কেউ দাবী করে নাই, রাজস্ব অনাদায়ের দরুণ যে সব জমি নিলাম হয়েছিল, গুরুতর অপরাধের ফলে জমিদারদের যে সব জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, যুদ্ধ করে কেড়ে নেওয়া জমি এবং গ্রামে শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য জমিদারদের যে সব জমি অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত জমি কোম্পানী সরকার খাস দখলে নিয়ে এল। এ সব জমি নিয়ে গঠিত হল সরকারী জমিদারী। এ সব অঞ্চলের ভূমিকর সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করলো। সময় সময় শুধুমাত্র খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হত এজেন্টদের উপর। এজেন্টগণ ভূমিকরের একাংশ নিজেদের পারিশ্রমিক হিসাবে রাখত।

আবার, জলপাইগুড়ি ও সুন্দরবন এলাকার কিছু জমি বিশ ত্রিশ বছরের জন্য সাময়িক বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। এ সব জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব ধার্য ছিল। ইজারাদারগণ তা শোধ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা ভোগ-দখল করতে পারত। মেয়াদ শেষ হলে সে সব জমি আবার সরকারের হস্তে ফিরে আসত। সরকার নতুন করে আবার তা ইজারা দিত।

এই 'সরকারী জমিদারী'র সাহায্যে সরকার বিপুল ক্ষতির কিয়দংশ পূরণ করার চেষ্টা করলো।[১]

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১১৪।

যদিও ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করাই ছিল জমিদার সৃষ্টি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য, তবুও পরবর্তীকালে নানা কারণে সরকার জমিদারদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারলো না। অবশ্য রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত যারা দালালী ও মুৎসুদ্দীগিরি করে জমিদার হয়েছিলেন তাঁরা বরাবরই ইংরেজ সরকারের খয়ের খাঁ ছিলেন। আপদে-বিপদে সরকারকে তাঁরা সাহায্যও করেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকের কিছু জমিদার বিপুল আয় থেকে সরকারকে বঞ্চিত করে এবং অনেকক্ষেত্রে সরকারের বিরোধিতা করায় সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ফলে সরকার তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলো না। অমঙ্গল চিন্তায় শঙ্কিত হল। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংরেজ সরকার চিন্তা করতে লাগল যে, কি করে ইংরেজদের এদেশে জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এ সময় ১৮২৯ সালে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এদেশে ইংরেজদের জমিদারী ক্রয়ের সুযোগদানের স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুললেন। এতে ইংরেজ সরকার সুযোগ ও সাহস পেলেন। ঐ বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে গভর্নর জেনারেল চার্লস মেটকাফ ইংল্যান্ডে লিখে পাঠালেন:

"এবার আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে এই ভেবে যে, যদি আমাদের একান্ত অনুগত প্রভাবশালী একটা শ্রেণী এদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিকড় বিস্তার করে বসতে না পারে, তবে আমাদের ভারত সাম্রাজ্য সর্ব সময় বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে থাকবে। তাই আমি মনে করি আমাদের দেশবাসীদের ভারতে বসবাস করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আমাদের সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ দৃঢ় করবে।"১

১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কও ইংল্যান্ডে বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর নিকট লিখেছিলেন:

"ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যারা বিপদের দিনে আমাদের সাহায্য করতে পারে। ভারতের প্রভাবশালী সাহসী ব্যক্তিদের অধিকাংশই আমাদের

১. Minutes of Sir Charles Thomas Metcalfe dt. 19th Feb. 1929.

অপছন্দ করে। ... বিনা বাধায় যদি বহু সংখ্যক ইউরোপীয়গণকে এদেশে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া যায়, তবে আমরা এ বাধা কাটিয়ে উঠতে পারব।"১

কাজেই এদেশে ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় করার জন্যে ইংরেজদের এদেশে জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল। এ সময় ব্যাপক শিল্প-আন্দোলনের ফলে ইংল্যান্ডে প্রচুর বস্ত্র-শিল্প গড়ে উঠলো। এই বস্ত্র-শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ল রঞ্জকদ্রব্য নীলের সরবরাহ। ১৮৩৩ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এক সনদে ইংরেজদের, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিষ্ঠুর দাস পরিচালকগণকে এদেশে জমিদারী ক্রয় করে বসবাস করার অধিকার প্রদান করলো। ছোট ছোট জমিদারগণ সাময়িক লাভের আশায় নীলকরদের সাহায্য করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো। টাকার লোভে অনেকেই চড়া দাম পেয়ে জমিদারী বিক্রি করে দিল। অনেক নিরীহ ব্যক্তি নীলকরদের অত্যাচার ও তাদের বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেটের হুমকির ভয়ে নিজের জমি-জমা বিক্রি করে সরে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। অনেক জমিদার স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পার্শ্ববর্তী জমিদারকে জব্দ করার মানসে নিজের জমিদারী নীলকরদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

নদীয়া যশোহর জেলার 'বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানী' ৫৯৪টি গ্রামের জমিদারী অধিকার করে বসেছিল। এই বিশাল জমিদারীর জন্যে নীলকর সরকারকে রাজস্ব দিত মাত্র তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। একমাত্র নদীয়া জেলাতেই কোম্পানীর মূলধনে খাটত আঠারো লক্ষ টাকা।২

অনেক জমিদার আবার জমি বিক্রি না করে উচ্চহারে নীলকরদের নিকট জমি পত্তনি দিত। এ প্রসঙ্গে যশোহর খুলনা জেলার ইতিহাস প্রণেতা সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেছেনঃ

"১৮১৯ সালের অষ্টম আইনের বলে জমিদাররা পত্তনি তালুক বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকার লাভ করে। ফলে এক একটি পরগণায় অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হয়। সেইভাবে জমিদারগণ নীলকরদিগকেও বড় বড় পত্তনি দিতে লাগল।

---

১. Report of Lord Bantick, 30th May, 1829.
২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ২০১।

এদেশীয় কিছু জমিদারও নিজের জমিদারী অথবা পরের জমিদারীর মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে পত্তনি নিয়ে নীলের ব্যবসা আরম্ভ করে। এদের মধ্যে নড়াইলের জমিদার ছিলেন অগ্রণী। অনেক জমিদার নীলকুঠিও স্থাপন করেছিলেন।

এ বিষয়ে বিখ্যাত মুৎসুদ্দী-জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, "আলস্য, অনভিজ্ঞতা ও ঋণের দায়ে পড়ে দেশীয় জমিদারগণ জমি পত্তনি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কারণ এতে তাঁরা জমিদারী চালনার দায় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতেন এবং জমিদারী পত্তনিদারের ন্যায় একটি নিশ্চিত আয়ের সাহায্যে তাঁরা রাজধানীতে কিংবা বড় শহরে আরামে বাস করতে পারতেন।"[১]

নীলকরদের জমি পত্তনি দিলে উচ্চ হারে সেলামী ও খাজনা পাওয়া যায়। এ মারাত্মক লোভে পড়ে ছোট ছোট জমিদারগণ জমি পত্তনি দিতে বেশী মাত্রায় আগ্রহী ছিল। জমি পত্তনি দেওয়া হত প্রথমবারের মত ৫ বছরের জন্যে। পাঁচ বছর পর পুনরায় নতুন করে পত্তনি নিতে হত। নীলকরগণ কিন্তু রায়তীস্বত্ব-সহ জমি ক্রয় করতো না। রায়তীস্বত্ব থাকতো প্রজাদের। কারণ নিজেদের স্বত্ব থাকলে নিজ খরচেই নীলের চাষ করতে হতো। তাতে লাভ হত কম। রায়তী স্বত্ব বলবৎ রেখে চাষীদের দাদন দিয়ে নীলচাষ করাতে পারলে লাভের পরিমাণ হত তাতে অনেক বেশী।

বাংলার চাষীরা বহুপূর্ব হতেই এদেশের জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে ছিল জর্জরিত। নীলকর জমিদারদের ক্ষমতা দেশীয় জমিদারদের চাইতে ছিল অনেক বেশী। কারণ তারা সরাসরি সরকারী সমর্থন লাভে সমর্থ। কাজেই দেশীয় জমিদারদের চাইতে নীলকর জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রাও বেশী। নীলকরগণ একাধারে জমিদার ও মহাজন হওয়ায় তাদের শোষণের সুবিধা অনেক বেশী। তারা দেশীয় জমিদারদের চেয়ে অনেক বেশী খাজনা আদায় করতো। এ ছাড়া ছিল অনেক প্রকার করের বোঝা।

নীলকরগণ বোঝাপড়া করে জমিদারদের সাথে, রায়তদের সাথে নয়। তারা জমিদারদের নিকট সরাসরি প্রস্তাব পেশ করে—তোমার জমিদারী এক হাজার

১. Indigo Commission Report : P. 12-13.

রায়তদের জন্য যদি জমিদারীর পত্তনি আমাকে দাও, তবে তোমাকে ৫,০০০ টাকা দেব। তাছাড়া খাজনা যা দেবার তাও দেব। এমন লোভনীয় প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিল না জমিদারদের। জমিদার ও নীলকরদের স্বার্থের সংঘাতে পড়ে মারা যায় নিরীহ প্রজারা।

লারমুর সাহেব নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ১৮৫০ সালের পূর্বে সহজে জমিদারী কেনা যেত। কিন্তু এরপর থেকে জমিদারগণ পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ হারে সেলামী দাবী করতে লাগলেন। জমির খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হল। নীলকদরদের মতে এই অত্যধিক সেলামীই যত নষ্টের কারণ। জমিদার জমির দর চাড়িয়ে নীলকরদের কাছ থেকে তা আদায় করার চেষ্টা করতেন। তা না পারলে রায়তদের উস্কিয়ে দিতেন। লাগতো গন্ডগোল। নীলকরগণ তখন জোরজবরদস্তি করে জমি দখল করার চেষ্টা করতো।[১]

জমিদারীর এলাকা ছিল ব্যাপক। নীল চাষের জন্য যৌথভাবে কোম্পানী স্থাপন করা হত। এই যৌথ কারবারকে বলা হত কনসার্ন। প্রতিটি কনসার্নের অধীনে অনেকগুলি করে নীলকুঠি (Factory) থাকত। কনসার্নের প্রধান কুঠিকে বলা হত সদর কুঠি। কুঠির ম্যানেজারের অধীনে একজন দেশীয় প্রধান কর্মচারী থাকত। তাকে বলা হত নায়েব বা দেওয়ান। এই দেওয়ানের বেতন ছিল মাসিক ৫০ টাকা। দেওয়ানের অধীনে ছিল গোমস্তা। গোমস্তার সাথে রায়তদের সম্পর্ক ছিল হিসাবপত্রের। কাজেই দর-দস্তুরীর সময় গোমস্তাকে কিছু উৎকোচ বা নজরানা দিতেই হত। গোমস্তাকে অনেক সময় সাহেবদের গালাগালি এমন কি বুটের লাথিও খেতে হত। এরা সর্বপ্রকার কাজে পারদর্শী ছিল। মিথ্যা, জাল-জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা, কোন কিছুতেই এরা পিছপা হত না। কাজেই দেশীয় প্রজারা সবচেয়ে বেশী অত্যাচার সহ্য করতো গোমস্তার কাছ থেকে। এ ছাড়া জমি মাপের জন্য আমীন, নীল মাপের জন্য ওজনদার, কুলি খাটাবার কাজে জমাদার বা সর্দার, খবর পাঠাবার জন্যে বা রায়তগণকে কাজে তাগাদা দেওয়ার জন্যে ছিল তাগিদদার।

---

১. Indigo Commission Report : Evidence, P. 191.

এদের সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে চাষী নাজেহাল হয়ে পড়ত। অনেক সময় নীলের চালান দিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হতো চাষীকে।[১]

নীলের চাষ বাংলাদেশের সর্বত্র বিস্তারিত ছিল। রাজশাহীতে একমাত্র আর. ওয়াটসন কোম্পানীরই অনেকগুলি নীলকুঠি ছিল। রাজশাহী জেলার নন্দকুজা, চন্দ্রপুর, গুরুদাসপুর, বীরাবাড়িয়া, সিধুলী, নাড়ীবাড়ী, লালপুর, বিলখারিয়া, কালিদাসখালী, চারঘাট, নন্দগাছি, রাজাপুর, আরাণী, সরদাহ, পানসাগর, দুর্গাপুর, দমদমা, বিড়ালদহ, নন্দনপুর, পাখাইল, ঝাড়া, কানষাট, রামচন্দ্রপুর হাট প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষ হত এবং নীলকুঠি ছিল।[২]

পাবনা জেলার অনেক জায়গায় নীলকুঠি ছিল। প্রধান নীলকুঠি ছিল দেওয়ানগঞ্জ, ধুলাউরি, ধোবরাখোল, কুমিদপুর, হিজলাবট প্রভৃতি স্থানে। হান্টার সাহেবের মতেঃ জেলার যে কোন দিকে ৪/৫ মাইল হাঁটলেই একটি নীলকুঠি পাওয়া যেত। সমগ্র জেলাতেই নীলকুঠি ছড়িয়ে ছিল।[৩] ময়মনসিংহ জেলার পেয়ারপুর, নান্দিনা, ব্রাহ্মণপাড়া পক্ষীমারী, ইসলামপুর, দুরমুট, ইঞ্জিলপুর ও চন্দ্রা প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষ হত।[৪]

যশোহর, খুলনা ও নদীয়া জেলায় নীলের চাষ বিস্তার লাভ করেছিল সবচেয়ে বেশী। এসব এলাকায় বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর সবচেয়ে বৃহৎ কারবার ছিল। এর অধীনে মোল্লাহাটি, কাঠগড়া, খালবালিয়া ও রুদ্রপুরে ছিল প্রধান কনসার্ন। মোল্লাহাটি কনসার্নের অধীন ১৭টি কুঠি ছিল। মোট দুই লক্ষ চাষী ও কর্মচারী ছিল এসব কুঠিতে। কাঠগড়া কনসার্নে ৬টি কুঠি ছিল। এতে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৭৩,৮৩৯ জন। ১৮৬০ সালে এই কাঠগড়া কনসার্নেই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

---

১. যশোর-খুলনার ইতিহাসঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৭৬২-৬৩।
২. রাজশাহী জেলার ইতিহাস (২য়-খণ্ড)।
৩. Statistical Accounts of Bengal : Hunter, vol. IX-P. 330.
৪. জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্তঃ গোলাম মোবারক।

হাজরাপুর বা পোড়াহাট কনসার্নের অধীনে ১৫টি কুঠি ছিল। এই কনসার্নে প্রতি বছর এক হাজার মণ নীল উৎপন্ন হত।

যশোহর সিন্দুরিয়া কনসার্নে ১৫টি কুঠি ছিল। নীল আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৬ শত বিঘা। নীল উৎপন্ন হত বাৎসরিক ৭ শত মণ। বিজলিয়া কুঠির অধীনস্থ ৪৮টি গ্রামের চাষীরা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল।

খড়গড়া কনসার্নে ছিল মোট ৬টি নীলকুঠি। জমির পরিমাণ ছিল চার হাজার বিঘা। নীল উৎপন্ন হত বছরে ১৬৭ মণ।

পোড়াদাহ কনসার্নে ছিল মোট ৮টি কুঠি। ৯,৪৫৮ বিঘা জমিতে নীলের চাষ হত। বছরে নীল উৎপন্ন হত ৬ শত মণ। জেম্‌স রবার্ট শরীফ নামক নীলকর সাহেব সর্বপ্রথম পোড়াদাহ কুঠি স্থাপন করে। ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত পোড়াদাহ কুঠিতে নীলের চাষ হয়েছিল।

এ ছাড়া ছিল মহিষাকুন্ড, ন'হাটা, বাবুখালি, শ্রীকোল ন'হাটা, রামনগর ও মদনধারী প্রভৃতি কনসার্ন। এসব প্রতিটি কনসার্নের অধীনে ৬/৭টি করে কুঠি ছিল। শ্রীখন্ডিত, হরিপুর, নিশ্চিন্তপুরে, নড়াইল জমিদারের নীলকুঠি ছিল। এ দেশীয় জমিদার তালুকদারদেরও অনেক কুঠি ছিল। অনেক দেশীয় লোক সাহেবদের কুঠির প্রধান কর্মকর্তারূপে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন।[১]

সমগ্র যশোহর জেলার ১০৩ বর্গমাইল জুড়ে নীলচাষের দৌরাত্ম্য বর্তমান ছিল। যশোহর জেলায় উৎপন্ন নীলের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় ১৮৪৯-৫০ সাল থেকে ১৮৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে গড়ে নীল উৎপন্ন হত ১০,৭৯১ মণ। শুধুমাত্র ১৮৪৯-৫০ সালেই নীল উৎপন্ন হয়েছিল ১৬,৮১৮ মণ। এই বছরই সবচেয়ে বেশী নীল উৎপন্ন হয়েছিল। ১৮৫৫-৫৬ সালে মাত্র ৬,৮৮৫ মণ।

যশোহর জেলায় নীলচাষ আরম্ভ হয়েছিল ১৭৯৫ সাল থেকে। মিঃ বন্ড নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম রূপদিয়ায় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৯৬ সালে মিঃ

১. যশোর-খুলনার ইতিহাসঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৭৬৬।

টাপ্ট নীলকুঠি বসালেন মাহমুদ শাহীতে। ১৮০০ সালে মিঃ টেইলার ও ১৮০১ সালে মিঃ এন্ডারসন রারান্দি ও নীলগঞ্জে কুঠি স্থাপন করেন। ১৮১১ সাল পর্যন্ত যশোহর জেলা নীলকুঠিতে ভরা ছিল। কুঠিয়ালদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা হর-হামেশা চলতে থাকত। এমতাবস্থায় যশোহরের কালেক্টার সুপারিশ করলেন যে পূর্বে স্থাপিত কুঠির দশ মাইলের মধ্যে নতুন কোন কুঠি যেন স্থাপিত না হয়।১

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই এদেশে জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার চলে আসছে। নিরীহ চাষীদের সামনে এসব অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিকারের কোন পথ ছিল না। যে রাজার দরবারে বিচার প্রার্থনা করবে সে রাজাই ছিল অত্যাচারের মূল হেতু। এরপর প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের যে বিরাট অংশ ইংরেজ নীলকর দস্যুদের দ্বারা পিষ্ট ও সর্বস্বান্ত হয়েছিল তার মূলে ভিত্তি ছিল এই জমিদারী প্রথা। এই জমিদারী প্রথার জোরেই নীলকরদের শোষণ আরও জোরদার ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

স্বার্থের বশবর্তী হয়ে দেশীয় জমিদারগণ নীলকরদের অনেকভাবে সাহায্য করেছিলেন, আবার অনেক জমিদার নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়িয়েছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের পক্ষে অত্যাচারী নীলকরদের মুকাবিলা করা সম্ভবপর হতো না। জমিদারদের সাথে নীলকরদের সংঘর্ষের মামলা আদালত পর্যন্তও গড়িয়েছিল। কিন্তু আদালতে সুবিচার পওয়া সম্ভবপর হতো না। কারণ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলা উঠলেই দেখা যেত হাকিমের পাশে চেয়ারে বসে রয়েছে নীলকর সাহেব, আর দেশীয় জমিদার হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে কাঠগড়ায়। এমতাবস্থায় বিচারে সুফল পাওয়া অসম্ভব ছিল।

জমিদার মুনশী লতাফত হোসেনের সাথে জমি নিয়ে নীলকরদের বিবাদ অনেকদিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। অবশেষে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে এক হুকুমনামার মাধ্যমে তাকে জানানো হল যেমন করে হোক নীলকরদের সাথে আপোস করার জন্যে।...মোদ্দাকথা এই যে, জমিদারের সাথে নীলকরদের বিবাদ দীর্ঘ-

১. Statistical Accounts of Bengal : Hunter, Vol. II, P. 297-300 and Vol. IX, P. 149.

স্থায়ী হতো না। জমিদার কোন-না কোন কারণে শেষ পর্যন্ত আপোস করতে বাধ্য হত।[১]

মোটকথা কোন মতেই সুবিচার পাওয়ার আশা ছিল না। অধিকন্তু বিচার প্রহসন শেষ হলে দেখা যেতো নীলকরদের সাহস ও অত্যাচার দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে অধিকাংশ জমিদারই নীতিগতভাবে নীলকরদের সমর্থন করতেন।

বাকল্যান্ড সাহেবের ভাষায়—"দেশীয় জমিদারগণ সাধারণত শ্রেণীগতভাবে নীলকরদের বিরোধী ছিল না।"[২]

নীল বিদ্রোহ চলাকালীন কিছু জমিদার নীলকরদের বিপক্ষে ছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ জমিদারই বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে নীলকরদের সাহায্য করেছিলেন। এ বিষয়ে নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেবের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ

"জমিদারগণ ইচ্ছা করলে কৃষকদের যতখানি সাহায্য করতে পারতেন, কার্যত তাঁরা কিছুই করেন নাই। এমন কি নদীয়ার জমিদার শামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিবুল হোসেন কৃষকদের দমন করার ব্যাপারে নীলকর সাহেবদেরকে সাহায্য করেছিলেন।"[৩]

নীলকর জমিদারদের অত্যাচার ছিল ব্যাপক এবং অমানুষিক এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশীয় জমিদারদের মধ্যে যাদের নীলকুঠি ছিল, তারাও ঠিক একইভাবে অত্যাচার করেছেন চাষীদের উপর। ১৮৫৯ সালের ৪ঠা জুন তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত এক পত্রে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়ঃ

"......নীলকরদের অত্যাচারের বিষয় যদিও অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম আছে, তথাচ কিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, কারণ দুষ্টের দমন বিষয়ে সকলেরই ইচ্ছা। আমাদের পূর্ব সংস্কার এইরূপ ছিল যে আমাদিগের কোন

---

১. Indigo Commission Report, P. 12-13.
২. Buckland : Bengal Under the Lt. Governors, Vol. I P. 5248.
৩. Indigo Commission Report : Evidence, P. 6.

বাংগালী নীলকর হইলে দেশের অধিক অনিষ্ট ঘটিবেক না, কারণ তাহারা আমাদিগের দেশের মংগলোন্নতির চেষ্টা বিলক্ষণ রূপে পাইবেন। কিন্তু আমাদিগের সেই আশা এইক্ষণে দুরাশা হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগের দ্বারায় দেশের উন্নতি সম্ভাবনা দূরে থাকুক, তাহারা কিরূপে লোকের সর্বস্ব হরণ করিবেন, সেই চেষ্টাই তাহাদিগের মনে সতত প্রবাহিত হইতেছে। আহা, কি পরিতাপের বিষয়!....”১

সুতরাং প্রজা-পীড়নের ভূমিকায় দেশীয় জমিদার ও নীলকর জমিদার উভয়েই সমান। তবে ইংরেজ জমিদারগণ শক্তি ও ক্ষমতার মদে এতই মত্ত হয়ে উঠেছিল যে নিরীহ চাষীদের সাধারণভাবে বেঁচে থাকার প্রতিও তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। চাষীদের বাঁচার প্রশ্নে তারা ছিল নির্বিকার। নিজের জমিতে ধান বুনে পেটের অন্ন যোগাড় করার অধিকারটুকু দিতেও তারা ছিল নারাজ, তারই ফলে সারাদেশ জুড়ে অসন্তোষের ঝড় উঠেছিল। বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল দেশের প্রতি আনাচে-কানাচে।

দেশীয় জমিদার শ্রেণী কখনও প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা বা তাদের মঙ্গল কামনা করেনি। যে কোনভাবে হোক প্রজাদের উপর তারা জুলুমই করেছে শুধু। নীলকরদের কাছে জমিদার চড়া দামে জমি পত্তনি দিত। নীলকর চড়াদামে মোটেই আপত্তি জানাত না। কারণ তারা জানত এর চেয়েও অনেক বেশী তারা আদায় করে নিতে পারবে রায়তদের কাছ থেকে। দেশীয় জমিদার যেমন করে অবৈধভাবে আবওয়াব (অতিরিক্ত খাজনা) আদায় করতো, নীলকর তেমনি নীলগাছের মাধ্যমে সেই আবওয়াব আদায় করে নিত। অত্যাচারের দিক থেকে দেশীয় জমিদার আর নীলকরদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জমিদার তার নিজের অধিকার তো বিক্রি করতোই, তার সাথে সাথে রায়তের অধিকার ও বিক্রি করে দিত। দখলকার হিসাবে জমির যে মালিকানা—তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রায়তের। কৃষকের এই যে রায়তী-স্বত্ব তা জমিদারী-স্বত্ব থেকেও প্রাচীন। নীলকরকে জমিদারী ও রায়তী—এই উভয় স্বত্বই কেনার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। জমিদাররা এ বিষয়ে কখনও কোন আপত্তি উত্থাপন করেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্রঃ বিনয় ঘোষ (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ১০৬।

নীলকরদের সহায়তা করেছে। নিজের স্বত্বের সাথে সাথে রায়তের স্বত্বও হাতছাড়া করেছে। অথচ কোম্পানীর আইনে পরিষ্কার নির্দেশ ছিলঃ

"He (Zamindar) ought not to be permitted to violate a right of occupancy vested in the rayot." ১

আশ্চর্যের বিষয় যে, কোম্পানীর প্রচলিত শাসনের সাথে তাদের লিখিত নির্দেশনামার কোন প্রকার মিল ছিল না। কোম্পানীর আইনই বাধ্য করেছিল দেশীয় জমিদারদের প্রজাদের উপর অত্যাচার ও জোর-জুলুম করার কাজে। কোম্পানীর কড়া নির্দেশ ছিল যেমন করে হোক নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব যথা-সময়ে তাকে দিতে হবে। জমিদার জানতো, নির্দেশ মত রাজস্ব আদায় করতে না পারলে পিঠে চাবুক পড়বে, কয়েদ থাকতে হবে। তাই জমিদার রায়তদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে খাজনা আদায় করে নিত। অর্থাৎ কোম্পানীর রাজত্বে আইন ছিল, আইনের প্রয়োগ ছিল না। হাকিম ছিল, কিন্তু বিচার ছিল না। শোষিত কৃষক জনসাধারণ ইংরেজ রাজত্বে আদালতে নালিশ করেও সুবিচার পায়নি। বস্তুত কোম্পানীর রাজস্ব লাভ থেকে কোম্পানীর শাসন—এর সবটাই ছিল বিরাট এক প্রহসনের ব্যাপার। জমিদার হওয়ার আশা ও আশ্বাস নিয়েই নীলকরেরা এদেশে বাসা বেঁধেছিল। প্রথমে এলো তারা নীল-ব্যবসায়ীর রূপ ধরে। নীলের ব্যবসায় রাতারাতি ধনী হয়ে বসল। ক্ষমতা আর দাপট প্রসারিত হল। রাজার জাত হিসাবে এদেশে তাদের একটা আলাদা সম্মান ছিল। তাদের চালচলন আচার ব্যবহারও ছিল রাজার মত। এরপর যখন জমিদার হয়ে বসল. তখন সত্যিই তারা রাজা বনে গেল। ক্ষমতার দাপট, রাজকীয় শান-শওকত দিনের পর দিন বেড়েই চলল।

'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' মোল্লাহাটি কুঠির যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যায়—মোল্লাহাটি কুঠির মালিক ছিল ফারলং এবং ম্যানেজার ছিল লারমুর। বাংলাদেশের নীলকুঠির মধ্যে মোল্লাহাটি কুঠিই ছিল সবচেয়ে বড়। সমস্ত দেশ জুড়ে এর খ্যাতি ছিল। বনগ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে ইছামতি

১. Commercial System of the East India Company in India. P, 176.

নদীর তীরে ছিল এই কুঠির অবস্থান। যশোহর, নদীয়া ও ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে মোল্লাহাটির অধীনে ১৭টা কুঠি ছিল। এর ব্যবসায়িক নাম ছিল বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানী। ১৭টি কুঠিতে দু'লক্ষের উপর লোক কাজ করতো। কুঠির অভ্যন্তরে ছিল প্রাচীর ঘেরা প্রকান্ড বাগান। বাগানে হরিণ পোষা হত নীলকুঠির সাহেবদের চিত্ত বিনোদনের জন্যে। বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর জমিদারী ছিল ৫৯৫টি গ্রাম জুড়ে। জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। কোম্পানী, ঘরবাড়ী প্রভৃতি সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। একমাত্র নদীয়া জেলাতেই কোম্পানীর ১৮ লক্ষ টাকা মূলধন খাটত। যশোহরের ন'হাটা, রাচুখালী ও হাজারাপুরেও কোম্পানীর এ ধরনের বিরাট প্রাসাদ ছিল।[১]

উইলিয়াম নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী কুমারখালীতে কোম্পানীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট ছিল। উইলিয়াম কুমারখালীতে নীলকুঠি স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে আশেপাশের গ্রাম কিনে অনেকগুলো কুঠির মালিক হয়ে বসলো। শেষ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী বনে গেল উইলিয়াম। অনেক বছর পর যখন উইলিয়াম ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্যে তৈরী হল, তখন তার জিনিসপত্র এবং নীল বহন করার জন্যে 'জানোবিয়া' নামে একখানা বিরাট জাহাজ তৈরী করা হল। এই জানোবীয়াতেই উইলিয়ামের যাবতীয় জিনিসপত্র বোঝাই করা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 'জানোবিয়া' ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে উইলিয়ামকে গ্রেপ্তার করা হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল— উইলিয়াম কোম্পানীর অনেক টাকা চুরি করেছে। শেষ পর্যন্ত বেচারা উইলিয়ামের আর হোমে যাওয়া হলো না। অনেক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে ঢাকায় উইলিয়ামের মৃত্যু ঘটে।[২]

এমন দুর্গতি বড় একটা দেখা যায় না। অধিকাংশ নীলকর জমিদার তাদের আধিপত্য ও ঠাঁটবাট বজায় রেখেই এদেশের নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছিল। ইংরেজ শাসনের আইনের ধারা সুরক্ষিত ছিল বলেই নীলকররা তাদের পশুশক্তির দাপটে উম্মাদ হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের

---

১. যশোর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৬৩।
Indigo Commission Report, P, 21-22, 197.

২. নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫।

চাষীদের উপর অত্যাচার করার একটা আইনসংগত অধিকার ছিল বলেই তারা মনে করত। এসব অত্যাচার সব সময় সর্বত্র চাষীরা মুখ বুজে সহ্য করতে পারেনি বলেই শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। দেশীয় জমিদারগণ বরাবরই তাদের সাথে সহযোগিতা করে আসছিল। অবশ্য দু'চার জন জমিদার নিজেদের স্বার্থে ঘা লাগায় নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এমনি একজন জমিদার যশোহর জেলার নড়াইলের রামরতন রায়। জমি পত্তনি দিয়ে তিনি নীলকরদের নিকট হতে ৭,৫০০ টাকার পরিবর্তে ২৯,০০০ টাকা আদায় করেছিলেন। এছাড়া রামরতন রায়ের নিজেরও নীলকুঠি ছিল। ঘোড়াখালী, বাউলিয়া, মহিষকুন্ড, পলদিয়া, জতরকাঠি, ধোপাদি, গোপালপুর শৈলকুপা, শ্রীখন্ডি, কুমারগঞ্জ, আফরা, তুজারডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি জায়গায় রামরতন রায়ের কুঠি ছিল।[১] নিজের কুঠি ছিল বলেই তিনি সাহেবদের জমি দেওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি কয়েকটা কুঠি নীলকর সাহেবদের নিকট হতেই খরিদ করেছিলেন। কাজেই এহেন রামরতন রায়ের সাথে নীলকরদের বিবাদ বাধবে এতো স্বাভাবিক ব্যাপার।

এমনি আরও কয়েকজন জমিদারের সাথে নীলকরদের সংঘর্ষ বেধেছিল এবং কুখ্যাত আর্চিবল্ড হীলের সাথে তাকে বেশ কয়েকবার সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। করম আলী চৌধুরীর লাঠিয়ালদের ভয়ে নীলকরদের গুন্ডামী সাময়িকভাবে থেমে গিয়েছিল।[২]

এমনি আরও কয়েকজন জমিদারের সাথে নীলকরদের সংঘর্ষ বেধেছিল এবং তা একান্তভাবে স্বার্থগত ব্যাপার নিয়ে। নীল বিদ্রোহের কালে কোন জমিদারই প্রত্যক্ষভাবে নীলকরদের বিরোধিতা করেনি। কেউ কেউ পরোক্ষভাবে দূরে বসে কিছুটা সাহায্য করেছিল। তাছাড়া অনেকে কৃষকদের সাথে নীলকরদের এ সংঘাতের সুযোগে অনেকদিনের পুঞ্জীভূত অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা ও কিছুটা বিরোধিতা করেছিলেন। নদীয়ার বিখ্যাত জমিদার

---

২. Hindu Patriot, 12 May, 1860.

১. যশোর-খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড)ঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৭২০।

শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিব-উল-হোসেন বিদ্রোহ দমন করার ইচ্ছায় নীলকর লারমুরকে সাহায্য করেছিলেন।১

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগরের জমিদার শম্ভুনাথ মুখার্জির ৩০০ বিঘা জমিতে নীলের চাষ ছিল। তিনি ৫,০০০ টাকা সেলামী নিয়ে নীলকরদের অনেক জমি পত্তনি দিয়েছিলেন। প্রজারা নীলকরদের জমি না দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিল এবং বলেছিল যে, ঐ পাঁচ হাজার টাকা তারা নিজেরা যোগাড় করে দেবে। শম্ভুনাথ নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিল, নীলকরদের সাথে ঝগড়া হওয়ার ভয়েই আমি জমি পত্তনি দিয়েছিলাম। পত্তনি না দেওয়ায় আমার ভাই বামন দাসের সাথে কয়েকবার নীলকরদের সংঘর্ষ হয়েছিল। শেষে ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়েছিল নীলকরদের জমি পত্তনি দেওয়ার জন্যে।২

নদীয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত দিগম্বরপুরের জমিদার কৈলাশ-চন্দ্র রায় ও নীলকরদের সংঘর্ষ আরও মর্মান্তিক। উনিশ শতকের প্রথম দিকে নীলকরেরা যখন এখানে প্রথম আসে তখন তাদের কেউ জমি দিতে রাযী হয়নি। পরে কৈলাশচন্দ্রের পিতামহ শম্ভুনাথ রায় তাদের কয়েকখানা গ্রাম ও খাল-বোয়ালিয়ার কুঠি তৈরীর জন্য কিছু জমি পত্তনি দেন। নীলকরদের সাথে রায় পরিবারের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠলো। এরপর ক্রমে ক্রমে নীলকরদের ক্ষমতা ও দাপট অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং কৈলাশচন্দ্র রায়ের সাথে নানাভাবে দুর্ব্যবহার শুরু করে। জমিদারের গাছ কেটে নিয়ে যায়, জিনিসপত্র জোর করে নিয়ে যায়, জমিজমার ক্ষতি করতে থাকে। রীতিমত খাজনা দেয় না, খাজনা চাইতে গেলে অপমান করে। ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখে। কৈলাশচন্দ্র বিরক্ত হয়ে নীলকরদের জমি পত্তনি না দিয়ে ঐসব জমির পত্তনি দিলেন তালুকদার প্রাণকৃষ্ণ পালকে। নীলকর কৈলাশচন্দ্রের বাড়ীর চারদিকে লাঠিয়াল মোতায়েন করলো। লোকজনের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করতে থাকল। কৈলাশচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ করলেন। তাতে হিতে-বিপরীত হল। পুলিশ এলো, খানাতল্লাসী করলো।

১. Indigo Commission Report, Evidence P. 9.
২. Indigo Commission Report. Evidence, P. 91.

কৈলাশচন্দ্রের কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে গেল। ভয় পেয়ে কৈলাশচন্দ্র সপরি-বারে কৃষ্ণনগর পালিয়ে গেলেন।

এরপর নীলকরদের সাথে একটা আপোস করার ইচ্ছায় প্রাণকৃষ্ণের কাছ থেকে পত্তনি ফিরিয়ে নিয়ে আবার নীলকরদের ১০ বছরের জন্যে পত্তনি দিলেন। ইতিমধ্যে নীলকর তার ভিটেবাড়ীতে যা কিছু ছিল সব লুঠ করে নিয়ে গেল। নীলকরের নায়েব কৈলাশ বাবুকে চিঠি লিখে জানালেন যে একবার কুঠিতে এসে নীলকর সাহেবের সাথে দেখা করলেই সব গোলমাল মিটে যাবে। সরল বিশ্বাসে কৈলাশচন্দ্র এলেন কুঠিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করা হল এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁর কাছে ৫,০০০ টাকা দাবী করা হল।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা ছিলেন কৈলাশচন্দ্র রায়ের আত্মীয়। মহারাজা খবর পেয়ে কোন প্রকার হাঙ্গামা বা কোর্ট-কাছারি করতে রাযী হলেন না। তিনি পত্র মারফত একটা আপোস করার চেষ্টা করলেন। তাঁর গুরুকে দিয়ে পত্র পাঠা-লেন কুঠির ম্যানেজারের কাছে। অনেক দর কষাকষির পর ৫,০০০ টাকা থেকে ২,০০০-এ নামল। দু'হাজার টাকা চুকিয়ে দেওয়ার পর কৈলাশচন্দ্র ছাড়া পেলেন। কিন্তু নিজের ভিটায় ফিরে যেতে পারলেন না। অনুমতি পেলেন কৃষ্ণ-নগর যাবার জন্যে।[১]

এমনি আরও অনেক জমিদারের সাথে নীলকরদের সংঘর্ষ বেধেছিল। মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছে। তবে একথা সত্য যে, নিজের আঁতে ঘা না লাগা পর্যন্ত কোন জমিদারই নীলকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। এমনকি কৃষকেরা যখন নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, তখন এসব জমিদাররা কৃষকদের সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। অনেকে পরোক্ষভাবে দূর থেকে সমবেদনা আর সহানুভূতি জানিয়েছেন। নীল কমিশনের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হার্সেল সাহেব বলেছেন, "তারা (জমিদাররা) ইচ্ছা করলে কৃষকদের যতখানি সাহায্য করতে পারত, তা তারা করেনি।"[২] নীল বিদ্রোহের মাত্র তিন

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৭৯-৮০।
২. Indigo Commmission Report, Evidence, P. 53-54.

বছর আগে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় এসব জমিদাররাই ইংরেজদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন, যার ফলে মহাবিদ্রোহের বিরাট আয়োজন ব্যর্থ হয়েছিল।

নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার, চাষীদের অবর্ণনীয় দুঃখযন্ত্রণা, মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং পরিশেষে ভয়াবহ বিদ্রোহ, এ সবকিছুরই মূলে রয়েছে জমিদারী প্রথা তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অনেক জ্ঞানী-গুণী, দেশ-প্রেমিক, সমাজ সেবক, দেশবরেণ্য নেতা এদেশে জন্মেছেন। তাঁরা বক্তৃতা মঞ্চে কিংবা বৃটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে অনেক সারগর্ভ জোরালো বক্তৃতা করেছেন, জনারণ্যে অনেক বাণী ছড়িয়েছেন কিন্তু বাংলার চাষীর অভিশাপ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নিয়ে কেউ কখনও কোন কথা বলেননি। বরং কেউ কেউ জমিদারী প্রথা কায়েম ও নীলকরদের এদেশে বসবাস করার স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন।

বাংলার চাষীদের দুঃখময় জীবনে এ ছিল এক মর্মান্তিক পরিহাস।

## তিতুমীরের ভূমিকা

বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহ তথা নীল বিদ্রোহের ইতিহাসে তিতুমীরের ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তিতুমীর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ বিতর্কিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রমোদ সেনগুপ্ত তাঁর 'নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "ধর্মের গোঁড়ামী ও বৈপ্লবিক রাজনীতির সংমিশ্রণের ফলে তিতুমীরের বিদ্রোহ যে একটা জটিল আকার ধারণ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১]

... কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁর 'নদীয়া কাহিনী'তে তিতুমীরের বিদ্রোহকে 'ধর্মোন্মাদ মুসলমানের কান্ড' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২] আবার

---

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, পৃঃ ৮২।
২. নদীয়া-কাহিনীঃ কুমুদনাথ মল্লিক, পৃঃ ৭৫।

কারও কারও মতে উহা ছিল 'হিন্দু বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা' মাত্র। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মত কৃষক দরদী ব্যক্তিও এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের ভুল ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি তাঁর 'ভারতে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামক গ্রন্থে একে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের Direct Action বলে অভিহিত করেছেন।১

বিহারী লাল সরকার মহাশয় তিতুমীরের সংগ্রাম যে জমিদারদের শোষণ-উৎপীড়নের ফলেই ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করেও তিতুমীরকে ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁর মতে, "তিতু বড়ই দুর্বুদ্ধি। তাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ কত ক্ষমতাশীল কত করুণাময়। দুর্বুদ্ধি তিতু ইংরেজের সে করুণা, সে মমতা বুঝিল না।"২

কিন্তু একালের বহু সত্য-সন্ধানী ইতিহাস গবেষক এই বিদ্রোহকে নীলকর ও জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষক জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান বলে আখ্যায়িত করেছেন। জমিদারদের শোষণ-উৎপীড়নই তিতুমীরের শান্তিপূর্ণ সংস্কার আন্দোলনকে ব্যাপক বিদ্রোহে রূপান্তরিত করেছিল। অধ্যাপক উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ তাঁর Modern Islam in India নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "বারাসাতের বিদ্রোহ জমিদার নীলকর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর সংগ্রাম।"৩

ওহাবী বিদ্রোহে আত্মনিবেদিত কর্মী কলকাতা কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁর মামলার আপীলের সময় বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট এনেস্টি সাহেব স্বদেশী ও বিদেশী বহু ভুয়া ঐতিহাসিকের মনগড়া ইতিহাস মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, ওহাবী বিদ্রোহ ছিল ভারতের ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসীর বিদ্রোহ। এনেস্টি সাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যে সকল তথ্য

---

১. ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামঃ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৮৯।
২. তিতুমীরঃ বিহারীলাল সরকার, পৃঃ ১০০।
৩. Modern Islam in India : Wilfred Cantwell Smith. P. 189.

প্রকাশ পেয়েছিল, সেই সকল তথ্য পরবর্তীকালের স্বদেশী আন্দোলনের শত শত কর্মীর মনে জ্বলন্ত প্রেরণা জুগিয়েছিল।১

মোদ্দাকথা তিতুমীরের বিদ্রোহ ছিল জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের শোষণ-পীড়ন ও স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ থেকে বাংলাদেশ তথা সারা ভারতের মুসলমানগণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভয়ানক হতাশা-গ্রস্ত ও বিপর্যস্ত ছিল। মুসলিম শাসনের অবসানের সাথে সাথে তাদের রাজ-নৈতিক প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়। ইংরেজ সংস্পর্শ পরিত্যাগ ও ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করায় রাজনৈতিক ও শাসন বিভাগীয় সর্বস্তর হতে ধীরে ধীরে তাদের আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায়। জমিদার-মহাজন থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরে আধিপত্য বিস্তারিত হল হিন্দুদের। হিন্দু জমিদারদের উৎপীড়ন ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের বদৌলতে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নেমে আসে ঘোর দুর্দিন।

বাংলাদেশের মুসলমানদের একটা অংশ এসেছে হিন্দু সম্প্রদায় হতে ধর্মান্তরের মাধ্যমে। হিন্দু ধর্মের জাতি-ভেদাভেদ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক উৎপীড়ন প্রভৃতি কারণে এক শ্রেণীর হিন্দুরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইসলাম ধর্মের উদার নীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে মুগ্ধ হয়ে বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিল। কিন্তু মুসলমান হয়েও এরা জন্মগত আচার-ব্যবহার বর্জন করে খাঁটি মুসলমান হতে পারলো না। বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্কারের অভাবে বিধর্মীয় রীতিনীতি তাদের মধ্যে বংশপরম্পরায় চলে আসছিল। এমনকি, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনেক মুসলমান পরিবার 'মা শীতলা দেবী'র পূজা করতেও কুন্ঠাবোধ করত না।২ ১৯১১ সালের সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক লোক এমনও দেখা গিয়েছে যারা না হিন্দু না মুসলমান, উভয় ধর্মমিশ্রিত তাদের আচার অনুষ্ঠান।৩

১. মুক্তিসন্ধানে ভারতঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৯৯।
২. British policy : A. R, Mullick, P. 7.
৩. Census of India Report, 1911 Vol. I, part I p. 118
British Policy : A. R. Mullick, P. 7.

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রাম্য স্কুল পাঠশালায় হিন্দু গুরু-মহাশয়ের আধিপত্য ছিল প্রবল। পাঠ্য পুস্তকে ইসলামী ভাবধারা সম্বন্ধীয় গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধের স্থান ছিল অতি নগণ্য। পাঠশালায় হিন্দু ছাত্রদের সাথে সাথে মুসলমান ছাত্রদেরও নানা দেবদেবীর নাম ও মন্ত্র, বিশেষ করে, দেবী সরস্বতীর বন্দনা আবৃত্তি কন্ঠস্থ করতে হতো। দেবীর উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের বলতে হতোঃ

সরস্বতী ভগবতী মোরে দাও বর,
চল ভাই পড়ে সব মোরা যাই ঘর।
ঝিকিমিকি ঝিকিরে সুবর্ণের চক,
পাও-দোও নিয়ে চল জয় গুরুদেব।

পরিশেষে গুরুদেবকে নমস্কার জানিয়ে সবাইকে ঘরে ফিরতে হতো। সালাম-আদাব ছিল বিশেষভাবে বর্জনীয়। কেউ সালাম-আদাব জানালে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হতো।- এমনকি হিন্দু গুরুমশাই ও জমিদার বাবুদের প্রবল আধিপত্যের দরুন মুসলমান চাষীদের ছেলেমেয়েদের নামও বদলে যেতে লাগলো। গোপাল শেখ, নেপাল শেখ, গোবর্ধন শেখ, নবাই শেখ, কুশাই খাঁ, পদ্মা, চাঁপা, পটল প্রভৃতি নামের আধিপত্য ছড়িয়ে পড়লো দেশের সর্বত্র। ইসলামের কোন চিহ্নই থাকলো না বাংলাদেশের, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের মধ্যে।"১

হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনেক। বার মাসে তের পার্বণ। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব মানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। মুসলমানদের মহরম এমন এক অনুষ্ঠান যাতে প্রকৃতপক্ষে আনন্দ-উৎসবের কোন সুযোগ নেই। অথচ বিভাগ-পূর্ব ভারতের অনেক জায়গায় মহররম পালিত হতো বিশেষ ঝাঁকজমকের সাথে। বহু অর্থব্যয়ে 'তাজিয়া' সহকারে শোভাযাত্রা বের হতো। শেষ পর্যন্ত তা বিসর্জন দিতে হতো পুকুর কিংবা নদীতে। প্রকৃতপক্ষে এটা হিন্দু-দের দুর্গা-পূজারই অনুকরণ মাত্র। দুর্গা-পূজা মূলত দশ দিনের উৎসব। দশ

১. শহীদ তিতুমীরঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৮-৯।

মীর দিন প্রতিমা বিসর্জিত হয়। মহররমও দশ দিনের অনুষ্ঠান। দশ দিনের তাজিয়া বিসর্জিত হয় হিন্দুদের দুর্গা প্রতিমারই অনুকরণে।১ হিন্দুদের দুর্গা-পূজার সাথে মহররমের 'তাজিয়া' এবং তার বিসর্জনের বিশেষ মিল বলেই হয়তো বাংলাদেশের অনেক হিন্দু জমিদার 'তাজিয়া নির্মাণে রীতিমত চাঁদা দিয়ে উৎসাহিত করতেন।২

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের পীর এবং পীরের মাযারের প্রতি ভক্তি চরম আকার ধারণ করে। পীর-মুরীদের সম্পর্ক দাঁড়ায় হিন্দু-গুরুচেলা সম্পর্ক সমতুল্য। মুসলমানদের যা অবশ্য করণীয় 'ফরয' কাজ নামায-রোযার পরিবর্তে প্রবল হয়ে ওঠে মাযার পূজা আর পীরের সেবা। দেশ ভরে যায় মাযার আর পীর-মুরীদে।

এ বিষয়ে জেম্‌স ওয়াইজ-এর উক্তি বিশেষ লক্ষণীয়, "১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত—এ পঞ্চাশ বছর পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা ছিল রাখালবিহীন মেষপালের মত। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস হতে বহু দূরে হিন্দু-ধর্মীয় বহুবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।"৩

এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ও ফরিদপুরের হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া ওহাবী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার দূরীকরণে সচেষ্ট হন। এই সংস্কার আন্দোলন 'ওহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত। বস্তুত ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন হলেও এই আন্দোলন পরে ব্রিটিশ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার ও উৎপীড়ক জমিদারদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে।

হিন্দুরা যখন ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত, মুসলমানরা তখন ইংরেজদের এদেশের মাটি হতে বিতাড়িত করে

১. British policy : A. R. Mullik, P. 9.
২. Journal Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIII. part III. No. 1. P. 35.
৩. The Estern Bangal : James wise, P. 21.

দেশে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত। কুসংস্কার ও কুশাসনের বিরুদ্ধে এই দারুণ মুক্তি সংগ্রামে হাজার হাজার ওহাবী গ্রেপ্তার হয়েছে। কারা-বরণ করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধৃত ওহাবীদের বিচার আরম্ভ হয় ১৮৭০ সালে ওহাবী বিদ্রোহের অবসানের পর। বিচারকালে ওহাবীদের কর্ম-পন্থা ও আত্মত্যাগের যে সব চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়, তাতে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিদ্রোহের সংগঠন ও রাজনৈতিক চরিত্র। প্রথমে বিচার হয় রাজশাহী, মালদহ ও রাজমহল প্রভৃতি স্থানে। এসব মামলায় প্রায় সব আসামীরই যাব-জ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ওহাবী বিদ্রোহের সংগঠন, কর্মপদ্ধতি ও একনিষ্ঠতাই পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের শত শত কর্মীকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[১]

ডঃ সুনীল কুমার গুপ্ত বলেছেন, "ওহাবী আন্দোলন বাংলার মুসলমান কৃষক সমাজে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধে ওহাবীগণ আন্দোলন চালাইয়াছিল। বলিতে গেলে ইহারাই বাংলার প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং ইহাদের মধ্য হইতেই প্রথম রাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।"[২]

বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি কামনাই ছিল তিতুমীর পরিচালিত ওহাবী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য। ইংরেজ শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার ফলে অন্য সম্প্রদায়ের মত মুসলমান জনসাধারণের জীবন ছিল বিপর্যস্ত, ধর্ম ছিল বিপন্ন। তাই ওহাবী মতে বিশ্বাসী তিতুমীরের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদ করে এবং সকল অত্যাচারের মূলোৎপাটন করে দেশে সত্যিকার শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশের জমিদার-মহাজনদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। কাজেই কৃষক জনসাধারণের মুক্তির কাম-নার এ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত কৃষকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হল। একদিকে স্বৈরাচারী ইরেজ শাসকদের শোষণ-পীড়ন, অপরদিকে জমিদার-মহাজন ও নীল-করদের অকথ্য অত্যাচার। কাজেই তিতুমীরের এ মুক্তিসংগ্রাম একই সাথে ইংরেজ

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২১৯।
২. উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণঃ ডঃ সুনীলকুমার গুপ্ত, পৃঃ ২৫০।

শাসক, জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। ওহাবী আন্দোলন মোড় নিল কৃষক আন্দোলনরূপে। মুসলমানদের সাথে জমিদার-মহাজন কর্তৃক অত্যাচারিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাও যোগ দিয়েছিল। প্রথম থেকেই জমিদার মহাজনরা তাদের দুষ্ট বুদ্ধি প্রয়োগে এ মহান আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এ আন্দোলনের প্রারম্ভে ধর্মীয় সংস্কারমূলক প্রশ্ন জড়িত থাকলেও শেষ পর্যন্ত উহা গণ-বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব লিখেছিলেন, "১৮৩১ সালে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থানে তাহারা (কৃষকরা) সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত জমিদারের গৃহ লুণ্ঠন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ধনীদের অবস্থা অধিক শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মীয় আন্দোলন সত্ত্বেও উচ্চ শ্রেণীর (ধনী) মুসলমানগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।"১ অর্থাৎ একথা ইতিহাসগতভাবে সত্য যে, প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলনরূপে দেখা দিলেও পরে এই আন্দোলন কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল এবং সর্বশ্রেণীর কৃষক জনসাধারণ এতে অংশ নিয়েছিল। আর এদের বিদ্রোহ সর্বশ্রেণীর জমিদার-মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে।

স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে এই সব বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ করেনি। তাদের সচেতনতা ছিল সমষ্টিগত। হান্টার সাহেবের ভাষায়, "এদের (ওহাবীদের) মধ্যে এমন হাজার হাজার কর্মী আছে, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেয়াকেই জীবনের প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করে। এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য যার জন্য পার্থিব লাভ-লোকসান নিয়ে ব্যাপৃত জনসাধারণ তাদেরকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখে। আদর্শ ওহাবীরা নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভীতিমুক্ত ও অন্যের ব্যাপারে ক্ষমাহীন। তার চলার পথ খুবই স্পষ্ট এবং কোন কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না।"২

এমনি মহান নিবেদিত প্রাণ নিয়েই ওহাবীরা সমগ্র ভারত জুড়ে বছরের পর বছর আন্দোলন চালিয়েছিল। একটা বিরাট আন্দোলন এবং দুর্জয়

---

১. The Indian Mussalmans : Hunter, অনুবাদ, (বাংলা একাডেমী) পৃঃ ৩৯, Modern Islam in India : C. W. Smith, P. 189.
২. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯৪।

শক্তিকে দমিয়ে রাখার জন্যেই প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-মহাজন গোষ্ঠী এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামারূপে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছিল।

ধর্মীয় সংস্কাররূপে তিতুমীর প্রচার চালিয়েছিলেনঃ বিধর্মীয় আচার-ব্যবহার পরিহার কর, টুপি পর, দাড়ি রাখ, নামায পড়। পীরের পেছনে ঘোরাঘুরি করো না। অপব্যয় বন্ধ কর। টাকা ঋণ দিয়ে সুদ খেয়ো না, কেননা সুদ খাওয়া হারাম।

সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের প্রতি তিতুমীরের বক্তব্য ছিলঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম। যারা অমুসলমান তাদের সাথে শুধুমাত্র ধর্মের পার্থক্যের জন্যে অহে-তুক বিবাদ করা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুল পছন্দ করেন না এবং আল্লাহ্র প্রিয় রসুল ঘোষণা করেছেন, 'কোন শক্তিশালী অমুসলমান যদি কোন দুর্বল অমুসলমানের প্রতি অন্যায়ভাবে অত্যাচার বা জুলুম করে, তবে মুসলমানদের উচিত দুর্বলকে সাহায্য করা এবং মুসলমান তা করতে বাধ্য।"[১]

অথচ তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কারমূলক প্রচারে ক্রুদ্ধ হয়ে নীলকর ও জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ঘোষণা করলেনঃ

"তাহার (কৃষ্ণদেব রায়) জমিদারীর মধ্যে যাহারা ওহাবী মতাবলম্বী তাহাদের প্রত্যেকের দাড়ির উপর আড়াই টাকা করিয়া খাজনা দিতে হইবে।"[২] জমিদার কৃষ্ণদেব রায় পুড়া গ্রাম থেকে দাড়ির খাজনা আদায় করেছিলেন। অন্যান্য কিছু হিন্দু জমিদারও মুসলমান প্রজাদের উপর এরূপ খাজনা ধার্য করেছিলেন। ঐতিহাসিক থর্নটনের উক্তিঃ

"জমিদারগণ মুসলমান প্রজাদের উপর যে জরিমানা ধার্য করেছিলেন, সাধারণভাবে তাকে বলা হতো 'দাঁড়ির খাজনা'। শুদ্ধি আন্দোলনকারী মুসল-মানরা দাড়ি রাখাকে ধর্মের একটা অঙ্গ বলেই মনে করতো। তাই তারা শারী-রিক একটা অলংকারের মতই পরম যত্ন সহকারে দাড়ি রাখতো এবং দাড়ির চর্চা করতো। স্বাভাবিকভাবে দাড়ির উপর করের কথা শুনেই মুসলমান প্রজারা ক্ষেপে উঠলো।"[৩]

---

১ শহীদ তিতুমীরঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পৃঃ ৪৪।
২. তিতুমীর : বিহারীলাল সরকার, পৃঃ ৩৬।
৩. History of India. Vol. V, Thornton, P. 179. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১২৪।

তিতুমীর রুখে দাঁড়ালেন। তিনি কৃষকদেরকে জমিদারের খাজনা দিতে নিষেধ করে দিলেন। সরফরাজপুরের মুসলমান প্রজারা খাজনা দেবার জন্যে দশ দিনের সময় নিয়েছিল। কিন্তু দশ দিন পরেও যখন কেউ খাজনা দিতে এলো না, জমিদার প্রজাদের ডেকে আনার জন্যে চারজন বরকন্দাজ পাঠালেন। প্রজারা বরকন্দাজের উপর হামলা চালাল। একজন বরকন্দাজ ধরা পড়লো। বাকী তিনজন পালিয়ে বাঁচল।[১]

কৃষ্ণদেব রায় বুঝলেন প্রজারা সহজে খাজনা দেবে না। তিনি প্রজাদের দমন করার জন্যে স্বয়ং একদল লাঠিয়াল অনুচর নিয়ে ঐ গ্রামে হানা দিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ দাঙ্গা শুরু হলো। জমিদারের লোকেরা প্রজাদের বাড়ি-ঘর লুট করলো। মুসলমানদের নামাযের ঘরে লাঠিয়ালরা আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয় নির্ধারিত হলো না।[২]

উভয় পক্ষ থানায় পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো। তদন্তের জন্যে হিন্দু দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীকে পাঠানো হল। দারোগা মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করলো যে, জমিদারকে ফ্যাসাদে ফেলার জন্যেই তিতুমীরের লোকেরা নামাযের ঘর পুড়িয়ে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। তিতুমীর দারোগার বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ করলেন এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী প্রমাণ তলব করার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষকে খালাস দিয়ে দিলেন।[৩] অবশ্য মুসলমানদের কয়েকজনের নিকট হতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের মুচলিকা আদায় করা হয়েছিল।[৪] এরপর তিতুমীর সম্মিলিত জমিদার শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এ সময় গোবর-ডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও কলকাতার প্রতাপশালী অত্যাচারী জমিদার লাটু বাবু লাঠিয়াল ও পাইক-বরকন্দাজ দিয়ে কৃষ্ণদেবকে সাহায্য করতে লাগলেন। জনৈক জমিদার কয়েকজন

---

১. History of India. Vol. V. Thornton, P. 180.
২. তিতুমীরঃ বিহারীলাল, পৃঃ ৩৬-৩৭।
৩. পূর্বোক্তঃ পৃঃ ৩৭-৩৮।
৪. History of India. Vol. V, Thornton, P. 180.

ওহাবীর বিরুদ্ধে ২৪ পরগণার সদর আদালতে একটা মামলা দায়ের করলেন। মামলাটি শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। কিন্তু জমিদারের অত্যাচার থেকে তারা রেহাই পেল না।। তাদের জমিদার কাচারীতে আটক করে নানাভাবে অত্যাচার এবং জরিমানা আদায় করা হল।[১]

তিতুমীর বুঝলেন, এভাবে আর চলা সম্ভব নয়। স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসকদের কাছে সুবিচারের কোন আশা নেই। এবার ওহাবীরা ইংরেজ শাসন ও জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক আপোসহীন সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো।

১৮৩০ সালের ৬ই নভেম্বর তিতুমীর প্রায় তিন'শ অনুচরসহ জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ী আক্রমণ করলেন। কিন্তু জমিদার খবর পেয়ে আগেই সদর ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল। ওহাবীরা ক্ষিপ্ত হয়ে পুড়ো বাজারে প্রবেশ করল এবং যে সব ধনী মুসলমান ওহাবীদের বিরোধিতা করেছিল, তাদের বাড়ী লুঠ করলো।

নীলকরদের অত্যাচারে দেশের চাষী-সমাজের মধ্যে পূর্ব হতেই বিষবাষ্প জমা হয়েছিল। জমিদারদের সাথে বিবাদের সুযোগে নীলকররা জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করলো। ওহাবীদের দৃষ্টি পড়লো এবার অত্যাচারী নীলকরদের উপর। বেগতিক দেখে জমিদার ও নীলকর সম্মিলিতভাবে তিতুকে জব্দ করার জন্যে এগিয়ে এল।

মোল্লাহাটি নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস বহু লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা ও বন্দুকধারী পাইকসহ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সাথে মিলিত হয়ে তিতুকে আক্রমণ করলো। তিতুমীরের লোকজন জমিদার ও নীলকরদের সমূলে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। যুদ্ধে নীলকর ডেভিসের বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো। ডেভিস কোন রকমে প্রাণ নিয়ে বাঁচলো। তিতুর লোকজন কুঠি লুট করলো।[২]

গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় ডেভিস ও তার বহু লোককে আশ্রয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। তাই দেবনাথ রায়ের সাথে তিতুর ঘোরতর

---

১. History of India, Vol. V. Thornton, P. 180.
২. তিতুমীরঃ বিহারীলাল, পৃঃ ৫০।

বিবাদ বাধে। তিতুমীর পাঁচশ' লাঠিয়াল নিয়ে গোবরা-গোবিন্দপুর আক্রমণ করলেন। দেবনাথ রায়ও বহু লোকজন নিয়ে তিতুকে বাধা দিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে দেবনাথ রায় মারা গেলেন এবং তার লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো।১

এ যুদ্ধের পর তিতুমীরের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। তিতুমীরের ভয়ে বহু নীলকর ব্যবসা ছেড়ে পলায়ন করলো। আশেপাশের বহু তালুকদার, মহাজন ও ধনী মুসলমান, যারা আগে ওহাবীদের বিরোধিতা করেছিল, এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। তিতুমীরের আদেশে প্রজারা জমিদারের খাজনা ও নীল-চাষ বন্ধ করে দিল।

যে সব নীলকর পালিয়ে গিয়েছিল তারা এবং জমিদারগণ একত্রিত হয়ে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট ও বাংলার ছোটলাটের কাছে তিতুমীরকে অবিলম্বে দমন করার জন্যে এক আবেদন জানাল।

এই আবেদন অনুযায়ী ছোটলাট সাহেবের নির্দেশে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার ১৮৩১ সালের ১৫ই নভেম্বর একজন হাবিলদার, একজন জমাদার ও বিশজন সিপাহীসহ তিতুমীরকে আক্রমণ করার জন্যে রওয়ানা দিলেন। তিতু পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। কাজেই পাঁচ'শ বলিষ্ঠ যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ম্যাজিস্ট্রেট তার লোকজন নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করা মাত্রই তিতুমীরের লোকেরা তাদের ঘিরে ফেললো। বন্দুকের গুলী বের হওয়ার আগেই লাঠি ও ইট-পাটকেলের আঘাতে বহু সিপাহী ধরাশায়ী হল। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন।২

এ যুদ্ধে জয়ের পর ওহাবীদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে গেল। দলে দলে লোক তিতুমীরের দলে যোগ দিতে থাকল। তিতুমীর এবার সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা দাবী করলেন। আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় তিতুমীর আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকলেন। স্থির করা হল যে, নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে একটা 'বাঁশের কেল্লা' প্রস্তুত করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরী করা হল এক অপূর্ব দুর্গ। এই দুর্গই ইতিহাসে 'বাঁশের কেল্লা' নামে পরিচিত।

১. তিতুমীর ঃ বিহারীলাল, পৃঃ ৫৩।
২. পূর্বোক্ত পৃঃ ৬৬।

এদিকে ভারতব্যাপী ওহাবী আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ এবং আলেক-জাণ্ডারের পরাজয় প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি নদীয়ার কালেক্টরকে অবি-লম্বে তিতুমীরকে দমন করার জন্যে আদেশ দিলেন।

এই আদেশের বলে নদীয়ার কালেক্টর বহু সৈন্য নিয়ে নদী ও স্থলপথে নারিকেলবাড়িয়ায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু বাঁশের কেল্লার নিকটবর্তী হওয়ার আগেই তিতুমীরের সহকারী গোলাম মাসুম তাদের আক্রমণ করলো। ওহাবী-দের প্রবল আক্রমণে এবারও ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হল। কালেক্টর সাহেব প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন।

এ খবর পেয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক বড়ই বিচলিত হলেন। তিতুমীরের বিদ্রোহ চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এবার একজন কর্নেলের নেতৃত্বে দুটি কামানসহ এক'শ গোরা সৈন্য, তিন'শ দেশীয় সিপাহী পাঠান হল। বহু সশস্ত্র কুলিও তাদের সাথে ছিল।

১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর সকাল বেলা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রান্ত হল। ইংরেজ বাহিনী চারদিক থেকে কেল্লা ঘিরে ফেললো। বিদ্রোহী-দের ইট, বেল ও তীর বর্ষণে বহু সৈন্য হতাহত হল। এবার কর্নেল সাহেব কামান দাগাবার হুকুম দিলেন। অনবরত গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা ধসে পড়লো। একটা গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লার অধিনায়ক এবং কৃষক বিদ্রো-হের দুঃসাহসী বীর তিতুমীর প্রাণ হারালেন। তিতুমীর সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেছেনঃ

"পরাধীন ভারতে তিতুমীর প্রমুখ ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়কগণই সর্ব-প্রথম সচেতনভাবে ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদ করিয়া ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। এবং সেই ধ্বনিকে কার্যকরী রূপ প্রদানের জন্য নির্ভয়ে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ভারতব্যাপী ওয়া-হাবী বিদ্রোহের পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ধ্বনি সত্ত্বেও পরা-ধীন ভারতে ওয়াহাবী বিদ্রোহীরাই সর্বপ্রথম ইংরেজ কবলমুক্ত অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের জনগণের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিল। বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভারতের

পূর্ণ স্বাধীনতা ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার আদর্শ স্থাপনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত বারাসাত বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ ও অবিস্মরণীয় অবদান।১"

যে জমিদার মহাজন ও নীলকরদের শোষণ-পীড়ন ও অত্যাচারে এদেশের কৃষক জনসাধারণ লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল, প্রাণ দিয়েছিল অনেক হতভাগ্য কৃষক সন্তান, সেই জমিদার আর নীলকরদের চক্রান্তে আবদ্ধ হয়েই তিতুমীরের মত একজন আদর্শ মুজাহিদ অকালে শহীদ হলেন। তবে একথা সত্য যে, তিতুমীরের শাহাদাত বরণের পথ ধরেই পরবর্তীকালে এদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

## ফারায়েযী আন্দোলন ঃ হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ও দুদু মিয়া

### হাজী শরীয়তুল্লাহ

হিন্দু জমিদার মহাজন ও তাঁদের সহযোগীদের উৎপীড়ন ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের ফলে মুসলমানগণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভয়ানক হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে নানা প্রকার কুসংস্কার, বিজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও শিক্ষা-দীক্ষার ফলে মুসলমানরা তাদের ধর্মপথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিল।

তিতুমীরের পর যিনি এসব ধর্মীয় কুসংস্কার ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি হলেন বাংলাদেশে ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়ক ফারায়েযী মতবাদের প্রচারক হাজী শরীয়তুল্লাহ্। কিন্তু ওয়াহাবী আন্দোলনের পেছনে যে একটা বলিষ্ঠ সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক মতবাদ ও উদ্দেশ্য ছিল, ফারায়েযী আন্দোলনের মধ্যে তেমন কোন সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। ধর্মীয় কুসংস্কার ও কুশিক্ষা দূর করা এবং একটা বিশেষ ধর্মমত প্রচার ছিল

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২৩০।

ফারায়েযী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঢাকা ও ফরিদপুরের জনগণের মধ্যে এ ধর্মমত বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল।

১৮৭২ সালের ভারতীয় আদমশুমারীর পরিচালক ডঃ জেম্স ওয়াইজ হাজী শরীয়তুল্লাহ্র জীবনকাহিনী লিখতে গিয়ে বলেছেন, "প্রথমে যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধন করে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ্।"[১] ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শ্যামাইল গ্রামে ১৭৮১ সালে শরীয়তুল্লাহ্র জন্ম হয়।[২] মাদারীপুর ছিল সে সময় বরিশাল জেলার অধীন। মাদারীপুর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হয় ১৮৭৩ সালে।[৩] শরীয়তুল্লাহ্র পিতা আবদুল জলিল ছিলেন একজন সাধারণ তালুকদার শ্রেণীর লোক। শরীয়তুল্লাহ্র বয়স যখন ৮ বছর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।[৪] এ সময় তাঁকে আশ্রয় দেয় তার এক চাচা। ১২ বছর বয়সে সেখান থেকে তিনি পালিয়ে কলকাতা চলে যান। কলকাতায় মৌলভী বাসারত আলী নামক একজন শিক্ষিত ধার্মিক ব্যক্তি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। এরপর আরবী পার্সীতে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয়ের আশায় তিনি হুগলীর ফুরফুরায় যান। কিছুদিন আরবী-পার্সীতে ভালভাবে লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি চলে যান মুর্শিদাবাদে তাঁর অপর এক চাচা আসিক মিয়ার কাছে। মুর্শিদাবাদে এক বছর আরবী-পার্সীতে আরও লেখাপড়া করেন। অতঃপর চাচা আসিক মিয়ার সাথে মাদারীপুর নিজ গ্রামে রওয়ানা হন। পথে ঝড়ে নৌকাডুবি হওয়ায় তাঁর চাচা ও চাচী মারা যান। শরীয়তুল্লাহ্ কোন রকমে বেঁচে যান এবং মাদারীপুর না গিয়ে পুনরায় কলকাতায় ফিরে যান। এ সময় বাসারত আলী সাহেব বৃটিশ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কায় যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। মৌলভী

---

১. Article on Shariyatulla and the Farazis : Dr. James Wise Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Part III for 1894 ).

২. V. A. S. P. Vol. 111, P. 187.

৩. District of Bekerganj, it's history and statistics : Beveridge, London. 1876, P. 249. and History of Faridi Movement in Bengal. P. 2.

৪. Muslim Ratnahar : Wazir Ali, P. 2.

বাসারত আলীর সাথে শরীয়তুল্লাহ্ ১৭৯৯ সালে মক্কায় রওয়ানা হন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি আরবী, পার্সী এবং ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন।১ সুদীর্ঘ বিশ বছর পর তিনি মক্কা হতে দেশে ফিরে আসেন। মক্কা হতে দেশে ফেরার পথে শরীয়তুল্লাহ্ একদল ডাকাতের হাতে পড়েন। ডাকাত-দল তাঁর টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় এবং বই-পুস্তক সবই লুন্ঠন করে। শরীয়তুল্লাহ্ এভাবে সর্বহারা হয়ে দেশে ফেরার চেয়ে ডাকাতদলে যোগ দান করাই শ্রেয় মনে করলেন। ডাকাতদল তাঁর সরলতা এবং চরিত্রের বলিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ২

ডাকাতদল ছেড়ে দেশে ফেরার পথে বিহারের মুঙ্গেরে মুসলমানদের কুসংস্কার ও ধর্মীয় অধঃপতন দেখে বিশেষ ব্যথিত হন। সেখানে তিনি কিছু দিন অবস্থান করেন এবং ধর্মের মৌল সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সরল ধর্ম-ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে সেখানকার মুসলমানরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। কুসংস্কার মুক্ত হয়ে ধর্মপথে ফিরে আসে।

দেশে ফিরে শরীয়তুল্লাহ্ দেখলেন আজিমউদ্দিন রোগশয্যায়। মাগ-রেবের নামাযের আযান দিয়ে তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটা লোকও তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। অগত্যা একলাই তাঁকে নামায পড়তে হল। অল্প কিছুদিন পরই তাঁর চাচা মারা গেলেন। চাচার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেখানকার মুসলমানদের সাথে তাঁর মতের গরমিল ঘটে। তাদের কুসংস্কার ও ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ দেখে তিনি অন্তরে বড়ই আঘাত পেলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি নির্যাতিত জনগণের মধ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন এবং ইসলামের সত্যিকার উদ্দেশ্য ও কাজ কি, তা বোঝবার চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়বার মক্কা যাওয়ার পর তিনি ওয়াহাবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা সুদৃঢ় ধারণা আয়ত্ত করেন। ১৮২০/২১ সালে তিনি মক্কা থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। এবার তিনি ব্যাপকভাবে ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ এলাকায় তাঁর ধর্মমত ও উদ্দেশ্য প্রচার করতে লাগলেন। ঢাকা জেলার প্রায়

---

১. Eastern Bengal : James Wise, P. 22.
২. Ibid : P. 22.

এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম অধিবাসী তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিল।১ ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ লোক ফারায়েযী মতাবলম্বী ছিল।২

প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলো ও আসামের কিয়দংশ ছাড়া অন্য কোথাও ফারায়েযী আন্দোলনের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেনি। ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের মত শহর এলাকায়ও এ আন্দোলন বিশেষভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। কারণ, যে সব এলাকায় মুসলমান ধনী এবং অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য বেশী ছিল সে সব এলাকায় ফারায়েযী আন্দোলন জোরদার হতে পারেনি। যে সব এলাকায় হিন্দু জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য ও অত্যাচার ব্যাপক ছিল সে এলাকাতেই ফারায়েযী আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকার গরীব চাষীদের মধ্যে এ আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল।৩ অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায় জমিদার মহাজনদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করেছিল। তারা বিশ্বাস করতো যে, ফারায়েযী নেতার ছত্রছায়ায় থাকলে জমিদার-মহাজনরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে শরীয়তুল্লাহ্‌র ব্যাপক প্রভাব এবং তাঁর নেতৃত্বে কৃষক জনসাধারণের সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধতা ও কর্মচাঞ্চল্য দেখে জমিদার মহাজনগণ ভীত হয়ে পড়লেন। এছাড়া শরীয়তুল্লাহ্ মুসলমান ধর্মের প্রচলিত কুসংস্কার এবং ইসলাম-বিরুদ্ধ রীতি-নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। সাধারণ লোক তাঁর আদর্শ ও মতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দলে যোগ দিতে লাগলো। শরীয়তুল্লাহ্‌র প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখে মুসলমান ধর্মের গোঁড়া সমর্থক ধনী মুসলমানগণ তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।৪ বস্তুত মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণই ছিল শরীয়তুল্লাহ্‌র প্রচারিত ফারায়েযী মতের অনুসারী।

শিষ্যদের কাছে শরীয়তুল্লাহ্ ছিলেন এক মহান আদর্শ। তারা প্রাণ দিয়ে

১. Topography : James Taylor, P. 248.

২. Jessore, Foreedpore and Bakerganj : J. E. Gastrall, P. 36.

৩. The Faraidi Movement in Bengal : Main-Ud-Din Ahmed Khan, P. xxxv.

৪. Article on Shariyatulla and the Farazis : Dr. James Wise (Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Part III for 1894).

ভালবাসতো তাদের এই বিপদের বন্ধুকে। একমাত্র ধর্মীয় সংস্কার সাধনই তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি দরিদ্র জনসাধারণকে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় শোষণ-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে তিনি বহুলাংশে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অভাবনীয় সাফল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে জেম্‌স ওয়াইজ লিখেছিলেনঃ

"একজন অতীব দরিদ্র তাঁতীর সন্তান ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌। পূর্ব-বঙ্গের হিন্দু ধর্মের বহু দেবদেবীর সংযোগে মুসলমান ধর্মে যে কুসংস্কার ও বিকৃতি ঘটেছিল তিনি সেই কুসংস্কার ও বিকৃতি হতে মুসলমান জনসাধারণকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই সর্বপ্রথম প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি নির্বিকার মেরুদণ্ডহীন কৃষক জনসাধারণের মধ্যে যে অভাবনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ ঘটনা। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল একজন বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল প্রচারকের। এ বিষয়ে শরীয়তুল্লাহ্‌ অপেক্ষা অধিক সাফল্য অর্জন করার মত আর কেউ ছিলেন না। সমাজের নিম্নশ্রেণী হতে আবির্ভূত হলেও তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ জীবন দেশের সকল মানুষের শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল। জনসাধারণ তাঁকে বিপদে পরামর্শদাতা ও দুঃখ-দুর্দশায় সান্ত্বনাদানকারী পিতার ন্যায় সম্মান করতো।"১

কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সমাধা করার পূর্বেই এ অসাধারণ সংগ্রামী পুরুষ মাত্র ৫৯ বছর বয়সে ১৮৪০ সালে অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন।

## দুদু মিয়া

শরীয়তুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহম্মদ মুহসীন (কারও কারও মতে মুহসীনউদ্দীন আহমদ) ফারয়েযী মতবাদের প্রচার ও সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুহম্মদ মুহসীন সাধারণভাবে দুদু মিয়া নামেই সর্বাধিক পরিচিত। জমিদার-মহাজন ও নীলকরদের শোষণ-পীড়ন এবং বিদেশী ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার এক মহাপরিকল্পনা

১. Article on Shariyatulla and the Farazis : Dr. James Wise (Journal of the Rayal Asiatic Society of Bengal, Part III for 1894).

নিয়ে দুদু মিয়া অগ্রসর হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে। গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে দুদু মিয়া প্রচার করতে লাগলেন যে, আল্লাহ্‌র দুনিয়াতে সব মানুষ সমান। জমির উপর ইচ্ছামত কর ধার্য করার কারও অধিকার নেই। তিনি তথাকথিত মোল্লা-মৌলভীদের প্রচলিত উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় রীতিনীতি রদ করে মুসলমানদের ঈমানের বলিষ্ঠতা নিয়ে অন্যায়-অত্যাচারের মুকাবিলার জন্যে আহবান জানালেন।

দ্রুতগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো দুদু মিয়া এবং তাঁর উদ্দেশ্য ও মতবাদের কথা। কৃষক-শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে উঠলো। অত্যাচারী জমিদার-মহাজন, নীলকর ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার অসীম সাহস ও অদম্য মনোবলের অধিকারী হল তারা। আগেই বলেছি, ফরায়েযী আন্দোলন একদিকে ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রচলিত উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলন। অপরদিকে জমিদার-মহাজন ও উৎপীড়ক নীলকরদের অমানুষিক হাত হতে দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের রক্ষা করার আন্দোলন।১

তৎকালে হিন্দু জমিদাররা পূজার সময় মুসলমান প্রজাদের উপর অতিরিক্ত পূজা-কর ধার্য করতেন। এছাড়া অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া অন্যান্য কর ও আবওয়াব তো ছিলই। মুসলমানদের গো-মাংস ভক্ষণের উপরও জমিদারের বিধি-নিষেধ ছিল। দুদু মিয়া ভবিষ্যতে এসব কর ও আবওয়াব না দেওয়ার জন্য প্রজাদের মধ্যে প্রচার চালালেন। সর্বশক্তি নিয়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো প্রজারা।

কৃষক জনসাধারণের সাধারণ সমস্যা সমাধান ও জমি-জমার সর্বপ্রকার বিরোধ মীমাংসার জন্য দুদু মিয়া বিচার কার্য নির্বাহের ব্যবস্থা করলেন। আশ্রয়প্রার্থী দরিদ্র কৃষকদের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বশক্তি প্রয়োগে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। প্রয়োজনবোধে জমিদার-মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল

১. History of Faraidi Movement in Bengal : Muin-ud-Din Ahmed Khan, P. xxxvi.

পাঠাতেন। এভাবে ধীরে ধীরে দুদু মিয়া জমিদার-মহাজন ও নীলকর দস্যুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এক আপোষহীন প্রবল শক্তিরূপে।১

হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র ডান হাত ছিলেন ফরিদপুরের জালালউদ্দীন মোল্লা নামক এক প্রতাপশালী লাঠিয়াল। জালালউদ্দীনের সহায়তায় হাজী শরীয়তুল্লাহ্ জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে একদল শিক্ষিত লাঠিয়াল সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের নিজের ইচ্ছামত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ অপরাধে পুলিশ ১৮৩৮ সালে তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল এবং ১৮৩৯ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছিল।২ পরবর্তীকালে দুদু মিয়াও জালালউদ্দীনের সহায়তায় লাঠিয়াল দল গঠন করেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন। কারণ, জমিদার-মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দুদু মিয়া চিন্তা করতে পারলেন না।

জমিদাররাও দুদু মিয়া এবং ফারায়েযীদের বিরুদ্ধে এক দল গঠন করলো। অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করলো নিরীহ প্রজাদের উপর। জেম্‌স ওয়াইজের ভাষায়ঃ প্রজাদের ফারায়েযী দলে যোগ না দেওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাতে লাগলো। যারা দুদু মিয়ার দলে যোগদান করতো তাদের উপর চলতো বিভিন্ন ধরনের অকথ্য অত্যাচার। শরীরে কোন দাগ থাকবে না অথচ অসহ্য যন্ত্রণা— এমন এক অভিনব শাস্তি উদ্ভাবন করলো তারা। দু'জন মুসলমান প্রজার দাড়ি এক সাথে বেঁধে দিয়ে উভয়ের নাকে মরিচের গুঁড়া দিয়ে দেওয়া হত।৩

এ ছাড়া আরও বহুবিধ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। উলঙ্গ করে সারা গায়ে লাল-পিঁপড়া ছেড়ে দেওয়া। হাত-পা বেঁধে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে জামার ভিতর দিয়ে পেটের উপর এক প্রকার বিষাক্ত সাদা পিঁপড়া অথবা ঘাসের পোকা ছেড়ে দেওয়া। বিশেষভাবে তৈরি আবর্জনা ভর্তি কুয়ার মধ্যে বুক পর্যন্ত পুঁতে

---

১. Civil Disturbances in India : Shahi Burhan Chowdhury 765-1857.

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ২৪৩।

২. History of the Faraidi Movment in Bengal : Muin-ud-Din Ahmed Khan, P. 25.

Topography : James Taylor, P. 250.

৩. Eastern Bengal : James Wise, P. 24.

রাখা। এ ছাড়া ছিল দাড়ির উপর আট আনা থেকে আড়াই টাকা পর্যন্ত জনপ্রতি খাজনা। অনাদায়ে অকথ্য অত্যাচার।[১] এভাবে জমিদারদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলো।

অবশেষে ১৮৪১ সালে এক রাতে দুদু মিয়া তাঁর সহকারী জালালউদ্দীন-সহ কয়েকশ' লাঠিয়াল নিয়ে কানাইপুরে জমিদারের প্রাসাদ আক্রমণ করলো। জমিদার শিকদারকে ধরে বলা হল যে, যদি সে তাদের সাথে কোন আপোষে না আসে এবং প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধ না করে তবে তার প্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে নেওয়া হবে। শিকদার নিরুপায় হয়ে দুদু মিয়ার সাথে আপোস করতে বাধ্য হল।

পরের বছর (১৮৪২ সাল) ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষদের বাড়ী আক্রমণ করলো। বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্র ধ্বংস করে জমিদার-ভ্রাতা মদন নারায়ণ ঘোষকে বেঁধে নিয়ে গেল। পরে মদন ঘোষকে হত্যা করে পদ্মার পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

এ ব্যাপারে পুলিশ ১১৭ জন ফারায়েযীসহ দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করেছিল। দায়রা জজের আদালতে ১০৬ জনের বিচার হয়েছিল। ২২ জনকে ৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হল। বাকী সব খালাস পেয়েছিল।[২] কোন প্রকার সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় দুদু মিয়াও খালাস পায়।

এরপর ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, পাবনা ও নোয়াখালীর প্রতি ঘরে ঘরে দুদু মিয়ার নাম ছড়িয়ে পড়লো।[৩] ১৮৪৩ সালের পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী দুদু মিয়া ছিলেন ৮০ হাজার শিষ্যের একমাত্র নেতা। এই ৮০ হাজার মানুষের

---

১. History of the Faraidi Movement in Bengal : Muin-ud-Din Ahmed Khan, P. 27.

২. Calcutta Review : Vol. 1. 1844, P. 215-216.

৩. Eastern Bengal : James Wise, P. 23.

প্রত্যেকে ছিল পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল। সবাই ছিল সমান স্বার্থ ও অবস্থার অধিকারী।১

এভাবে দুদু মিয়ার শক্তি ও ক্ষমতা ক্রমাগত বেড়েই চললো। এদিকে পাঁচচর কুঠির ম্যানেজার নীলকর ডানলপের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলো। নীল বোনা নিয়ে প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করলো ডানলপ। পাঁচচর কুঠির গোমস্তা কালীপ্রসাদ কাঞ্জিলাল ফারায়েযীদের বিশেষ শত্রু। ডানলপের পৃষ্ঠপোষকতায় কালীপ্রসাদ বিরাট জমিদারীর অধিকারী হয়ে উঠলো। ফারায়েযী-দের সে মনে করতো জাত শত্রু। প্রজাদের ভাল ধানি জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করতো। নতুবা চলতো অকথ্য অত্যাচার।২ ডানলপ ও কালীপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রে পুলিশ কয়েকবার দুদু মিয়াকে গ্রেতার করেছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে প্রতিবারই দুদু মিয়া মুক্তি পেয়েছিলেন।

শিকদার এবং ঘোষদের জব্দ করার পর দুদু মিয়া এবার দৃষ্টি দিলেন কালীপ্রসাদের দিকে । দুদু মিয়া তাঁর শিষ্য নারায়ণগঞ্জের কাদির বক্সকে নির্দেশ দিলেন কালীপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যে। স্বয়ং দুদু মিয়া রওয়ানা হয়ে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে বন্য মহিষ শিকারে।

১৮৪৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর প্রায় পাঁচশ' লোকের একটা দল নিয়ে কাদির বক্স আক্রমণ করলো পাঁচচরের নীলকুঠি। কুঠিতে আগুন ধরিয়ে দিল তারা। এরপর পার্শ্ববর্তী শিমুলিয়া গ্রামের কালীপ্রসাদের বাড়ী আক্রমণ করলো। জিনিসপত্র লুট করলো। ধরে নিয়ে গেল কালীপ্রসাদকে। পরে বরিশালে নিয়ে তাকে হত্যা করে ভাসিয়ে দিল নদীর পানিতে।৩ অত্যাচারী নীলকর হিসাবে ডানলপের সাথে দুদু মিয়ার পূর্ব হতেই শত্রুতা ছিল। ডানলপকে শায়েস্তা করার জন্যেই এ অভিযান চালিয়েছিলেন দুদু মিয়া।৪ ১২৫৩ সালের ৩০শে ভাদ্র (পূর্বোক্ত ঘটনার আশি দিন পূর্বে) ডানলপের গোমস্তা কালীপ্রসাদ

১. The Indian Musalman : W. W. Hunter, P. 100.
২. District of Bakerganj : H. Beveridge. P. 399.
৩. Estern Bangal : James Wise, P. 25.
৪. Ibid : P. 25.

ও পাঁচচরের কুঠির হিন্দু বাবুরা প্রায় সাত-আটশ' সশস্ত্র লোকজনসহ দুদু মিয়ার বাহাদুরপুরের বাড়ী আক্রমণ করে। তারা সদর দরজা ভেঙে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে এবং ৪ জন প্রহরীকে হত্যা করে। অনেক লোক আহত হয়। আক্রমণকারীরা প্রায় নগদ দেড়লাখ টাকা ও অনেক জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। যারা নিহত হয়েছিল তাদের লাশও তারা নিয়ে গিয়েছিল। যারা আহত হয়েছিল তাদের পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। আহত আমিরুদ্দীন হাসপাতালে মারা যায়। পুলিশ আহতদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করেছিল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট এ মামলায় কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ডানলপের লোকেরা দুদু মিয়াকে অপহরণ করে পাঁচচর নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তাঁকে দু'দিন এক রাত্রি আটক করে রাখা হয়। ছাড়া পেয়েই দুদু মিয়া সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ পেশ করেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সে অভিযোগ তখনই নাকচ করে দিলেন। উপরন্তু দুদু মিয়াকে পরামর্শ দিলেন ডানলপের সাথে আপোষ করার জন্যে।

দুদু মিয়ার বারবার অনুরোধে অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনা তদন্তে যেতে রাযী হলেন এবং শিবচরের দারোগাকে আদেশ পাঠালেন রাস্তা মেরামত করার জন্য।[১] ইতিমধ্যে অনেকদিন গত হয়ে গেছে। বাংলা ১২৫৩ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ অর্থাৎ পাঁচচরের ঘটনার মাত্র দু'দিন আগে ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা হতে কিছু লোকজনসহ পারাগ্রামে মহিষ শিকারে গেলেন। পারাগ্রাম হতে ম্যাজিস্ট্রেট লোক পাঠালেন সেখানে, যেখানে দুদু মিয়া তার লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে দুদু মিয়া ১৬ই অগ্রহায়ণ থেকে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট একটা মহিষ শিকার করে ২০শে অগ্রহায়ণ ঢাকা ফিরে গেলেন। দুদু মিয়াকে জানালেন যে, দু'একদিনের মধ্যে ফিরে এসে তাদের মকদ্দমা তদন্ত করবেন। ২১শে অগ্রহায়ণের বিকেল পর্যন্ত দুদু মিয়া সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন। বিকেল বেলা একজন নিম্নপদস্থ অফিসারের অনুমতি নিয়ে তিনি ঢাকা রওয়ানা হয়ে যান। পাঁচচরের ঘটনা ঘটেছিল ঐদিনই ভোরবেলায়। ২২শে অগ্রহায়ণ দুদু মিয়া ঢাকা পেঁৗছে যান। দুদু মিয়াকে দেখে

১. Trial of Dudu Miah : P. 47-48.

ম্যাজিস্ট্রেট রাগ করলেন এবং তখনই আবার ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। অগত্যা দুদু মিয়া পারাগ্রামে ফিরে যান। পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট গেলেন মামলা তদন্তে। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাঁচচরের ঘটনায় দুদু মিয়া জড়িত ছিলেন না। কারণ দুদু মিয়ার অবস্থান হতে পাঁচচর দেড়দিনের রাস্তা। তবুও ডানলপ এ মামলায় দুদু মিয়াকে আসামী করেই এজাহার দিয়েছিলেন।১

যে ম্যাজিস্ট্রেট দুদু মিয়ার মামলার তদন্তে যেতে সুদীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছিলেন, সেই ম্যাজিস্ট্রেট ডানলপের অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই তদন্তে রওয়ানা হয়ে যান। ডানলপের তাঁবুতে বসেই ম্যাজিস্ট্রেট একত্রে আহার করেন এবং পরে মামলা নিয়ে দীর্ঘসময় আলাপ-আলোচনা করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট দুদু মিয়াকে দায়রায় সোপর্দ করলেন।২ দুদু মিয়ার সাথে আরও ৬৩ জনকে ফরিদপুরের সেশন কোর্টে চালান দেওয়া হল। ১৮৪৭ সালে সেশন জজের রায়ে তাঁদের শাস্তি হয়, কিন্তু কলকাতায় নিজামত আদালতে আপীল করার ফলে সবাই বেকসুর খালাস পায়।৩

নিম্ন আদালতের রায়ের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর Edward de Latour মন্তব্য করেছিলেন যে, এ রায় একজন ব্রিটিশ জজের চরিত্রে লজ্জাজনক কলঙ্ক। ব্রিটিশ কোর্টের বা জজের বিচারের উপর এ দেশীয় লোকদের আর কোন প্রকার আস্থাই থাকবে না। যেখানে এ ধরনের নৈতিক দুর্নীতি ঘটে সেখানে কোন ভরসায় তারা তাদের অভিযোগ পেশ করবে? এ ধরনের দুর্নীতি এবং বিশৃংখল অবস্থার ফলেই ফরিদপুর এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে ফারায়েযী খিলাফত আন্দোলন বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।৪

---

১. Trial of Dudu Miah : P. 88-89.

২. Parliamentary Papers : Vol. XIIV, 1861 P. 256, Reply no, 3917.

৩. Eastern Bengal : James Wise P. 25 : Muslim Ratnahar : Wazir Ali, P. 8.

৪. Parliamentary Papers. Vol. XIIV, 1861. P. 265. Reply 3918. History of Faraidi Movement in Bengal, P. 41.

যা হোক, কালীপ্রসাদ কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে সার্থক অভিযানের ফলে দুদু মিয়ার সামনে আর কোন বাধাই থাকলো না। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি বেশ শান্তি ও নিরাপদে ছিলেন।

১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময় দুদু মিয়াকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং কলিকাতা জেলে পাঠানো হয়। জেম্স ওয়াইজের মতে দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করা হত না, যদি না দুদু মিয়া গর্ব করে কোর্টের সামনে বলতেন, "আমি ডাকার সাথে সাথে ৫০,০০০ হাজার লোক এসে হাজির হবে। এবং যা করতে আদেশ করব, তারা তা-ই করবে।"১ ১৮৪৩ সালে Mr. Dampier পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী দুদু মিয়া ৮০ হাজার লোকের একজন ওহাবী নেতা। দুদু মিয়ার গ্রেফতারের কারণ হিসাবে এই রিপোর্ট বিশেষ কার্যকরী।২ তবে একথা সত্য যে ১৮৫৯ সালে মহাবিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হওয়ার পর পরই দুদু মিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।৩

কিন্তু মুক্তি পেয়ে ফরিদপুর ফিরে আসার পর পরই তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। একজন দারোগা ও দু'জন কনস্টেবল ছদ্মবেশে একদিন দুদু মিয়ার সামনে গিয়ে জানাল যে, তারা ফারায়েযী দলে ভর্তি হতে চায়। দুদু মিয়া কোন প্রকার সন্দেহ না করেই তাদের গুপ্ত আড্ডাখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। দারোগা দুদু মিয়াকে তখনই গ্রেফতার করে ফরিদপুরে চালান দিলেন। এবারও কোন প্রকার সঠিক অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় দুদু মিয়াকে সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দিতে হল। এরপর দুদু মিয়া আর ফরিদপুর থাকলেন না। স্থায়ীভাবে ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

অনবরত সংগ্রাম ও কারাবাসের ফলে দুদু মিয়ার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। অবশেষে নানা প্রকার রোগের শিকার হয়ে ১৮৬২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় তাঁর নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকার ১৩৭ নং বংশাল

---

১. Eastern Bengal : James Wise. P. 25.
২. The Indian Musalmans : W. W. Hunter, P. 100-109.
৩. Jessore, Fareedpore and Backerganj : J. E. Gastrell, P. 36.

রোডে এখনও তাঁর কবরের নিদর্শন বর্তমান রয়েছে।[১] কারও কারও মতে দুদু মিয়ার মৃত্যু হয়েছিল ১৮৬০ সালে তাঁর জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামে।[২] কিন্তু দুদু মিয়ার মৃত্যু যে ঢাকায় হয়েছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মুসলিম রত্নহারের লেখক ওয়াজীর আলী সাহেব দুদু মিয়ার মৃত্যু তারিখ বাংলা সন ১২৬৮ সাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] অন্যদিকে ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার-এ উল্লেখিত হয়েছে ইংরেজী সন।[৪] যেহেতু ইংরেজী ও বাংলা সন একে অন্যের অনুরূপ, সেইহেতু দুদু মিয়ার মৃত্যু তারিখ বা সন নিয়ে অন্যরূপ চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই বলেই আমি মনে করি।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর জমিদার, পুলিশ, নীলকর ও সামরিক বাহিনীর সমবেত অত্যাচারে কৃষকদের সংগ্রামী শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ফারায়েযী সম্প্রদায়ের আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবদুল গাফ্ফার কিছু দিন ফারায়েযী আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। আবদুল গাফ্ফার ঐ এলাকায় নোয়ামিয়া নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৫২ সালে বাহাদুরপুরে নোয়ামিয়ার জন্ম হয়। পূর্বের মত ফারায়েযী আন্দোলনের সংগ্রামী শক্তি না থাকলেও কৃষক জনসাধারণের মধ্যে নোয়ামিয়ার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭৯ সাল থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত মাদারীপুর মহকুমার এস. ডি. ও. ছিলেন। নোয়ামিয়ার প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন, "নোয়ামিয়া স্বনামখ্যাত দুদু মিয়ার পুত্র এবং ফরাজী মুসলমানদের অধিনায়ক।......নোয়ামিয়ার মুখের কথা তাহাদের পক্ষে বেদ।...এ অঞ্চলে নোয়ামিয়া ইংরেজ রাজ্যের উপর এক প্রকার আপনার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে তাহার একজন সুপারিনটেনডেন্ট ও পেয়াদা নিয়োজিত ছিল এবং তাহাদের দ্বারা সে ফারাজীদিগকে শাসনার্থে করায়ত্ত রাখিত। গ্রামের কোন

---

১. History of Faraidi Movement in Bengal : Muin-ud-Din, P. 46.
২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২৪৩।
৩. Muslim Ratnahar : Wazir Ali, P. 9.
৪. Imperial Gazetteer of India : Vol. IV, P. 399.

বিবাদ সুপারিনটেন্ডেন্টের অনুমতি ভিন্ন দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত না।"১ দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ফারায়েযী জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সত্য। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে ও ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে ফারায়েযী মতবাদের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য বৃহৎ গণ-সংগ্রাম ও বিদ্রোহের মত ফারায়েযী বিদ্রোহও প্রথমে ধর্মীয় সমস্যার উপর ভিত্তি করেই আরম্ভ হয়েছিল। পরে তা রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়। জমিদার-মহাজন নীলকর ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত হওয়ার ফলে এই ধর্মীয় জাগরণ রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। ফারায়েযী আন্দোলন প্রথমে ইসলাম ধর্মের সংস্কার আন্দোলন রূপে আরম্ভ হলেও পরে ইহা সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ-পীড়ন হতে মুক্তির প্রশ্নে হিন্দু কৃষক শ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশও সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা আংশিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন, জনসাধারণের নিকট হতে কর আদায়, স্বেচ্ছা-সেবকদের নিয়ে স্বাধীন সরকারের সৈন্যবাহিনী গঠন, স্বাধীন বিচারালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্য পদ্ধতিতে ফারায়েযী আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করেছিল। শুধুমাত্র সংগ্রামে রাজনৈতিক চেতনার ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে এই মহৎ আন্দোলন ব্যর্থ হল। এ ছাড়া দুদু মিয়া ব্যতীত অন্য কোন যোগ্য সংগ্রামী না থাকায় এ সংগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। তবুও একথা সত্য যে, দীর্ঘ দশ বছর চলার পর ফারায়েযী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেলেও দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের যে আদর্শ ইহা রেখে গিয়েছে তা আজও উপমহাদেশের কৃষক জনসাধারণকে সংগ্রামের প্রেরণা দান করে।২

---

১. আমার জীবনঃ নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬।

২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ২৪৮।

## নীলচাষীর সংগ্রাম ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে নীল-করদের সাথে চাষীদের সংগ্রাম চলতে থাকে। এসব প্রতিরোধমূলক সংগ্রামের পেছনে ছিল না কোন বুদ্ধির মারপ্যাঁচ কিংবা সংঘবদ্ধ সুষ্ঠু পরিকল্পনা। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংগ্রামের ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশের চাষীরা মুখ বুজে নীলকরদের অত্যাচার সহ্য করেনি। ফাঁক পেলেই রুখে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। গড়ে তুলেছে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

বস্তুত বাংলাদেশের চাষীরা কোনদিনই বিদেশী ইংরেজদের শোষণ-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করেনি। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই জীবন-পণ সংগ্রাম করে আসছে। এ ছিল তাদের জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম। এসব নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে কোথাও তাদের জয় হয়েছে, কোথাও হয়েছে পরাজয়। সহ্য করেছে অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন আর শোষণ। ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিয়েছে বৃহত্তর সংগ্রামের।

নীলচাষীদের বিক্ষিপ্ত সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে সবার আগে বলতে হয় পক্ষীমারীর অখ্যাত অশিক্ষিত চাষী কালু চুনিয়ার কথা। কালু অস্বীকার করেছিল দাদন নিতে। তাই দেখে নান্দিনা কুঠির ম্যানেজার আর্থার রুস ক্ষেপে গেলেন। কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারীসহ ঘোড়ায় চেপে ছুটে এলেন কালু চুনিয়ার বাড়ী। কালুর বলিষ্ঠ জবাবে সাহেব ক্ষুব্ধ হলেন এবং কালুর পিঠে বেত্রাঘাত করলেন। মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না কালু। বাঁশের একটা লাঠি হাতে নিয়ে তাড়া করলো রুস সাহেবকে। প্রচন্ড আঘাত হানলো সাহেবের পিঠে। এরপর সামনে যাকে পেলো তাকেই মারতে লাগলো। ঘোড়া ছুটিয়ে সাহেব এবং তার দলবল সে যাত্রা রক্ষা পেলো। এরপর থেকে ঐ অঞ্চলের মানুষের মন থেকে সাহেব-ভীতি কমে গেল।[১]

কালু চুনিয়ার মত এমনি আরও অসংখ্য চাষী রুখে দাঁড়িয়েছে নীল দস্যুদের

---

১. জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্তঃ গোলাম মোহাম্মদ।

বিরুদ্ধে। প্রাণ দিয়েছে কুঠির অন্ধকার কারাগহবরে। এ সব অখ্যাত অনাদৃত সংগ্রামী চাষীদের হিসাব রাখেনি কোন মানুষ। ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই তাদের কথা, তাদের আত্মত্যাগের কাহিনী। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে এমনি অগণিত খন্ডযুদ্ধ হয়েছে নীলকরদের সাথে। কোথাও চাষীরা হার মেনেছে, প্রাণ বলি দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নীলকর ও তাদের ভাড়াটে গুন্ডারা চাষীদের তীর-ধনুক আর লাঠি-বল্লমের ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। বিনা সংগ্রামে চাষীরা কোথাও তাদের অধিকার ছেড়ে দেয়নি।

নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিশ্বনাথ সর্দার আরেক সংগ্রামী পুরুষ। বিশ্বনাথ 'বিশে ডাকাত' নামেই সর্বত্র পরিচিত ছিল। নীলকরদের অত্যাচার আর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথ রুখে দাঁড়িয়েছিল এক প্রবল শক্তি নিয়ে। চাষীদের বুকে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার জন্যে। উনিবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বা আন্দোলনের কথা গ্রাম্য চাষীরা ভাবতেও পারতো না। এমনি দিনে বিশ্বনাথ নীলকরদের জব্দ করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। নদীয়ার নীলকুঠির কুঠিয়াল স্যামুয়েল ফেডী ছিল ভয়ানক অত্যাচারী এবং প্রবল পরাক্রান্ত। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সাহস সে সময় কারও ছিল না। নীলকুঠির পাশেই ছিল জেলা শাসক মিঃ ইলিয়টের বাংলো। বিশ্বনাথ লোকজন নিয়ে তৈরি হয়ে থাকলো। সুযোগ বুঝে আক্রমণ করবে।

দীপালীর রাত্রে হঠাৎ সুযোগ বুঝে বিশ্বনাথ লোকজন নিয়ে ফেডীর বাংলো আক্রমণ করলো। লোকজন যে যেদিকে পারলো পালিয়ে বাঁচলো। মিসেস ফেডী মাথায় কালো হাঁড়ি দিয়ে পুকুরের পানিতে গলা ডুবিয়ে জীবন রক্ষা করলো। মিঃ ফেডীকে বন্দী করে খালের ধারে এনে দাঁড় করানো হলো। এক কথায় সবাই ফেডীর মৃত্যু কামনা করলো। ফেডী করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো বিশ্বনাথের কাছে। প্রতিজ্ঞা করলো এ কাহিনী আর কারও কাছে বলবে না। কিন্তু ফেডী তার প্রতিজ্ঞা রাখলো না। মুক্তিলাভের পরই সে বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দিল। সাথে বিশ্বনাথের কয়েকজন অনুচরও ধরা পড়লো। বিশ্বনাথ জেল থেকে পালিয়ে

জীবন রক্ষা করলো এবং প্রতিজ্ঞা করলো, যেমন করে হোক ফেডীকে শাস্তি দেবে।১

প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ১৮০৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রির দিকে বিশ্বনাথ তার লোকজন নিয়ে ফেডীর কুঠি আক্রমণ করলো। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের লোকজন গৃহের চারধার ঘিরে ফেলেছিল। ফেডীর লোকজন যথাসাধ্য বাধা দিয়েও পারলো না বিশ্বনাথের দুর্বার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। ফেডী ও লেভিয়াড ধরা পড়লো। বিশ্বনাথ তাদের প্রাণে মারলো না, কিন্তু যথেষ্ট অপমান করলো। ইতিমধ্যে রাত ভোর না হলে হয়ত তাদের ভাগ্যে আরও ভয়ানক কিছু ঘটতো। ভোর হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বনাথের দল নগত সাতশ' টাকা এবং আরও দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে পালিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে বিশ্বনাথ ইংরেজ সৈন্যদের হাতে বন্দী হল। ইংরেজ বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হল।২

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিতুমীরের বিদ্রোহ বাংলাদেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তীতুমীর পরিচ্ছেদে নীলকর ও জমিদারের বিরুদ্ধে তিতুমীরের বিদ্রোহ ও সংগ্রামের কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৩১ সালে এক বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনীর সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁর প্রতিরোধ সংগ্রামের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৮২৯ সালে জামালপুরে নীলকর ও চাষীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ বেধেছিল, তাকে চাষীদের ঐক্যবদ্ধতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন বলা চলে। নীলকরদের সুশিক্ষিত পাঁচশ' লাঠিয়ালের সাথে কয়েক হাজার গ্রাম্য অশিক্ষিত চাষীর এ সংগ্রাম নীল বিদ্রোহের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ঘটনা। পুলিশ এসে যখনই গ্রামে প্রবেশ করতো বা কাউকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করতো সমবেতভাবে চাষীরা তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিত। পুলিশ বা নীলকরদের আক্রমণ গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে চাষীরা উঁচু গাছের উপর বসে ঘন্টাধ্বনি করত।

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। পৃঃ ২১২-২১৩।
২. ঐ পৃঃ ২১৩

সংকেত পাওয়া মাত্র চাষীরা তীর ধনুক ও লাঠি বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। একবার দু'হাজার চাষী এভাবে এক দল পুলিশকে বেদম প্রহার করে এবং বন্দী করে রাখে। পরে অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেট সেনাবাহিনীর সহায়তায় পুলিশদের উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। জামালপুরের নীলকরদের সাথে চাষীদের এ সংগ্রাম বহুদিন ধরে চলছিল।১

ময়মনসিংহের কাগমারী নীলকুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব ছিল ভয়ানক অত্যাচারী। ১৮৪৩ সালে প্রজারা নীল বুনতে অস্বীকার করায় কিং কয়েকজন রায়তকে কুঠিতে বন্দী করে রাখেন। একজন প্রজার মাথা মুড়িয়ে তাতে কাদা মাখিয়ে নীলের বীজ বুনতে দেয় এবং অপর একজনকে বাক্সবন্দী করে বেলকুচির কুঠিতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। প্রজারা খবর পেয়ে গোলকনাথ রায়ের নেতৃত্বে কিং সাহেবের কুঠি আক্রমণ করলো। কিং সাহেবকে ধরে জোর করে অন্য একস্থানে আটক করে রাখল। ওদিকে উভয় দলই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার প্রার্থী হল। গোলকনাথ তখন পলাতক। গোলকনাথকে গ্রেফতার করার জন্যে পার্শ্ববর্তী সব থানায় হুলিয়া পাঠানো হল। তবুও গোলকনাথের খবর কেউ দিতে পারলো না। অনেক দিন পর পাকুল্যা থানার দারোগা কিং সাহেবকে খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়।২

ফরিদপুরের দুদু মিয়ার সাথে নীলকরদের ছিল এক আপোসহীন সংগ্রাম। 'ফারায়েযী আন্দোলনঃ হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়া' পরিচ্ছেদে সে কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। দুদু মিয়ার সাথে নীলকরদের সংগ্রামের ঘটনা নীল বিদ্রোহের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

খুলনার হোগলা পরগণার নীলকর রেণী ছিল আরেক অত্যাচারী দস্যু। স্বীয় পৈত্রিক সম্পত্তির চার আনার মালিক হয়ে রেণী প্রথমে হোগলায় আসে। পরে জমিদারের কাছ থেকে ইলাইপুর তালুক পত্তনি নেয় এবং সরকারের নিকট হতে রূপসাচর বন্দোবস্ত নেয়। এরপর ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে নীলকুঠি ও চিনির কুঠি বসিয়ে বিরাট আকারে ব্যবসা ফেঁদে বসে। তার অমানুষিক অত্যাচারে চাষীরা

---

১. Indigo Commission Report. Appx. 16. Part. 1.
২. ময়মনসিংহের ইতিহাসঃ কেদারনাথ মজুমদার, পৃঃ ১৭৪।

অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ক্যুইন্সল্যান্ড সাহেবের মতে এই অত্যাচারী রেণীকে বশে আনার জন্যেই নাকি খুলনায় সর্বপ্রথম মহকুমা স্থাপন করা হয়। ১

রেণীর অত্যাচারের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। রাস্তার লোককে ধরে এনে সে যথা মারপিট করতো, কুঠির কাজ করাতো। এলাকার লোকদের বাগান থেকে গাছ কেটে আনা, সীমানা নষ্ট করার জন্যে বড় বড় পগার খনন করা, জোর করে দাদন দিয়ে নীলচাষে বাধ্য করা, ধান নষ্ট করে সেই জমিতে নীল বপন করা—এসব ছিল রেণীর নিত্যদিনের কাজ। রেণীর অত্যাচারে আশেপাশের গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল।

যেসব জমিদার তালুকদার একদিন রেণীর নিকট জমি পত্তনি দিয়েছিল তারাই পরে তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। অবশেষে চাষীরা একত্রিত হয়ে মিলিতভাবে রেণীকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করল। এ ব্যাপারে শিবনাথ তালুকদার ছিল সবার অগ্রণী। বস্তুত শিবনাথ ও রেণীর মধ্যে অনেক দিন থেকে জমি নিয়ে বিবাদ চলে আসছিল। এতদিন কেউ শিবনাথকে সাহায্য করেনি। শিবনাথ নিজেও একজন নীলকর ছিল। নীলকর রেণীর সাথে নীলকর শিবনাথের বিবাদ, এতে চাষীদের কিছু করার ছিল না এবং এ নিয়ে তারা মাথাও ঘামায় নি।

শিবনাথ প্রায় এক হাজারের বেশী ঢাল-সড়কিওয়ালা যোগাড় করল। বাঁহিরদিয়ার চন্দ্রকান্ত দত্ত, তিলকের রামচন্দ্র মিত্র, পানিঘাটের ভৈরব চন্দ্র মিত্র এবং লাঠিয়াল সর্দার সাদেক মোল্লা, গায়রাতুল্লা, গোর ধোপা, ফকির মামুদ, আফাজদ্দি, খান মামুদ জোলা প্রভৃতি বড় বড় লাঠিয়ালরা যোগ দিল শিবনাথের সাথে। শিবনাথ রেণীর ছত্রিশখানা নীল ও চিনি বোঝাই নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দিল। এভাবে বিবাদ ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং অনবরত চলতে থাকল। রেণী শেষ পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং তার অত্যাচারের মাত্রাও ধীরে ধীরে কমে গেল। ২ গ্রাম্য কবিতায় এখনও শোনা যায়ঃ

গুলি গোলা সাদেক মোল্লা
রেণীর দর্প করলে চুর

---

১. Westland's Report, P. 122-123 : Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।

২. যশোর-খুলনার ইতিহাসঃ পৃঃ ৭৯১-৭৯৩।

বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা
ধন্য বাংলা বাঙালী বাহাদুর।

শিবনাথের লোক-লস্করের সাথে রেণীর লোকজনের প্রায়ই খন্ডযুদ্ধ বাধত। পরাজিত হয়ে রেণীর লোকেরা যেত পালিয়ে। এমনকি পুলিশের লোকেরাও ভয়ে পালিয়ে বাঁচত।

এভাবে দেশের বিভিন্ন জেলায় এখানে-ওখানে খণ্ড-খণ্ডভাবে সংগ্রাম চলতে থাকল। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রথম যে দিন এদেশের মাটিতে নীলকরদের পা ঠেকেছিল, সে দিন থেকে বাংলাদেশের কৃষককুল কোথাও একাকী, কোথাও বা দলবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে আসছিল। ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মত একটা ব্যাপক আকারের বিদ্রোহ সমগ্র দেশের উপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু নীলবিদ্রোহের প্রজ্বলিত শিখা তখনও নেভেনি। একটু একটু করে এখানে ওখানে জ্বলছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৯-৬০ সালে এই বিদ্রোহ সমগ্র দেশ আলোড়িত করে প্রচন্ড বিস্ফোরণের মত আত্মপ্রকাশ করলো এবং নীলকরদের অত্যাচার সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। এদিক থেকে অন্যান্য বিদ্রোহ অপেক্ষা নীল বিদ্রোহের ভয়াবহতা ছিল অনেক বেশী। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও মহাবিদ্রোহের সময় জমিদার ও মধ্যশ্রেণী যেভাবে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে শাসক গোষ্ঠীকে সাহায্য করেছিল, নীল বিদ্রোহের সময় তাদের সাহায্য পেলেও শেষরক্ষা হবে না—এমন একটা সন্দেহ শাসক গোষ্ঠীর মনে বরাবরই ছিল। তাই হয়ত বড়লাট লর্ড ক্যানিং আতঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন:

"নীল চাষীদের বর্তমান বিদ্রোহের সময় প্রায় এক সপ্তাহকাল আমি এতটা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম যে, উৎকণ্ঠা দিল্লীর ঘটনার (মহাবিদ্রোহের ঘটনা) সময় আমার ছিল না। আমি সব সময় ভেবেছি যদি কোন নির্বোধ নীলকর এ সময় ভুল করে ভয়ে বা ক্রোধে একটাও গুলী ছোঁড়ে তা হলে সেই মুহূর্তে দক্ষিণ বঙ্গের সব কুঠিতে আগুন জ্বলে উঠবে।"১

---

১. Bengal under the Lt. Governors : Buckland, Vol. I, P. 192.

শেষ পর্যন্ত সত্যই সে আগুন জ্বলে উঠেছিল। সে সময় 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ ও বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে থাকেন। বারাসাতে ম্যাজিস্ট্রেট এসলী ইডেন এক পরোয়ানা জারি করে বলেছিলেন যে, নিজের জমিতে নীলচাষ করা চাষীদের ইচ্ছাধীন। এ ব্যাপারে জোর-জুলুম করা হলে তা বে-আইনী বলে ঘোষিত হবে।

ইডেনের এ ঘোষণার পর পরই ১৮৫৯ সালে আনুমানিক ৫০ লক্ষ চাষী ধর্মঘট করে। নীল আর বুনবো না বলে তারা প্রতিজ্ঞা করে।

নীল চাষকে কেন্দ্র করেই বাংলার চাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ তিলে তিলে দানা বেঁধে উঠেছিল এবং তারা সমগ্র দেশব্যাপী একটা সংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিল। কিন্তু দেশের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও জমিদার-মহাজনদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকায় এককভাবে তারা বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হচ্ছিল না। তবুও এখানে ওখানে খন্ড-খন্ডভাবে বিদ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ অনবরতই চলছিল।

আসন্ন বিদ্রোহের পূর্বাভাষ দিয়ে তৎকালীন Calculla Review পত্রিকা লিখেছিল:

"বাংলার গ্রামবাসী চাষীদের মধ্যে একটা আকস্মিক ও আশ্চর্যজনক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। যে চাষীদের সাথে আমরা রুশ দেশের ভূমিদাস অথব ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করে আসছিলাম, যাদের আমরা জানতাম নীলকর ও জমিদারদের নির্বাক যন্ত্ররূপে, অবশেষে তারাও জেগে উঠেছে। কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে, আর তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে না। বর্তমানে চাষীরা আশ্চর্যজনকভাবে অনুভব করছে এবং মনস্থির করছে যে তারা আর নীলচাষ করবে না। এরই ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছে, তা আমাদের বিজ্ঞব্যক্তিরা কল্পনাও করতে পারেনি।"[১]

১৮৫৯ সাল থেকেই সংঘবদ্ধভাবে নীলচাষীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হল। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নরূপে চাষীরা নীলচাষের বিরোধিতা করতে

---

১. Calcutta Review : June, 1860.

লাগল। বহু জায়গায় ছোট-খাট দাঙ্গা-হাঙ্গামাও ঘটে গেল। মামলা-মোকদ্দমা তো বরাবরই চলে আসছিল। তবুও কিন্তু সরকার পক্ষের টনক নড়লো না। কুঠিয়ালগণ চাষীদের এবার ভয়ের চোখে দেখতে লাগল। প্রতি-রোধ ব্যবস্থার তীব্রতা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করলো। কোন কাজই আর আগের মত সহজভাবে সমাধা হয় না। চাষীরা আদেশ শুধু অমান্যই করে না, আঘাত করতেও কসুর করে না। ভীত-সন্ত্রস্ত নীলকরগণ ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে বাংলার ছোট লাট সাহেবের কাছে এক স্মারকপত্র পেশ করলো। তাতে আসন্ন বিদ্রোহের একটা ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল। আয়োজিত বিদ্রোহের কথা বর্ণনা করে তারা জানালো:

"কৃষকগণ যেভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাতে নীলের চাষ করা আর সম্ভবপর হচ্ছে না। কারণ অভিযোগ প্রমাণের জন্য সাক্ষী পাওয়া যায় না। এমনকি আমাদের বেতনভোগী কর্মচারীরাও আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিতে সাহস করে না। রায়তগণ বর্তমানে ভয়ানক রকম উত্তেজিত। যে কোন রকমের অঘ-টনের মুকাবিলায় তারা প্রস্তুত। প্রতিদিন তারা চেষ্টা করছে—কি করে আমা-দের কুঠিতে কিংবা বীজের গোলায় আগুন ধরিয়ে দিবে। ভয়ে আমাদের গৃহের চাকর-চাকরাণীরাও পালিয়ে গেছে। চাষীরা তাদের হত্যা ও ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছে। দু'একজন যারা আছে তারাও চলে যাবে। কারণ বাজারে গেলে তারা জিনিসপত্র কিনতে পারে না। কেউ তাদের কাছে কিছু বিক্রি করে না।......সব জেলাতেই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।"

এছাড়া উক্ত স্মারকলিপিতে কয়েকটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। (১) বিদ্রোহী চাষীরা মোল্লাহাটির কুঠির সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পবেল সাহেবকে দারুণভাবে প্রহার করেছে এবং মৃত মনে করে মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে গেছে। (২) বিদ্রোহী চাষীগণ খাজুরার কুঠি লুণ্ঠন করেছে এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। (৩) লোকনাথপুরের কুঠি আক্রমণ করেছে। (৪) চাঁদপুরের গোলদার কুঠির গোলায় চাষীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। (৫) বামনদি কুঠির চাষীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

অন্যান্য কুঠিতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। সমগ্র কৃষ্ণনগর (নদীয়া) বর্তমানে আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে।"[১]

নীল বিদ্রোহের আদ্যোপান্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্রোহ হয়ত সুসংগঠিত ছিল না, কিন্তু গ্রাম্য চাষীরা বিদ্রোহের প্রারম্ভে যে কৌশল অবলম্বন করছিল, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিদ্রোহের পূর্বে তারা নীলকর ও তাদের অনুচরগণকে সামাজিক বয়কট ব্যবস্থা দ্বারা শায়েস্তা করার চেষ্টা করে। বিদেশী দস্যুদের দমন করার পূর্বে দেশীয় দালাল অত্যাচারীদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

নীলকর সমিতির সম্পাদক বাংলার গভর্নমেন্টের সেক্রেটারীকে লিখেছিলেন, "আমার মনে হয় নিম্নবঙ্গে বিদ্রোহ অত্যাসন্ন।" সেক্রেটারী তাঁর জবাব দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, সরকারের সাহায্য ছাড়া এখন চাষীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দমন করা নীলকরদের আয়ত্তের বাইরে।"[২]

১৮৬০ সালে নদীয়া জেলার একজন জার্মান পাদ্রী 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামক মাসিক পত্রিকায় একখানা পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে বিদ্রোহী চাষীদের সংগঠন ও কৌশলের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে—"চাষীরা ভিন্ন ভিন্ন দলে নিজেদের ভাগ করেছিল। একদল ছিল শুধুমাত্র তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ করার জন্যে। একদল ছিল গোলা নিক্ষেপকারী। এদের কাজ ছিল প্রাচীনকালের ডেভিডের মত ফিঙ্গাদ্বারা গোল নিক্ষেপ করা। আর একদল ছিল যারা চারিদিক থেকে ইট কুড়িয়ে এনে জমা করতো। একদল কাঁসা ও পিতলের থালা অনুভূমিকভাবে শত্রুদের লক্ষ্য করে ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করতো। এ ছিল একটা উত্তম অস্ত্র। আরেক দল কাচা বেল নীলকরদের লাঠিয়ালদের মাথা লক্ষ্য করে সুনিপুণভাবে নিক্ষেপ করতো। আরেক দল ছিল যারা উত্তমরূপে পোড়ানো মাটির খণ্ড কিংবা অখণ্ড বাসন ছুঁড়ে মারতো শত্রুদের লক্ষ্য করে। এ কাজ সবচেয়ে ভাল পারতো মেয়েরা। একদল নীলকর লাঠিয়াল আক্রমণ করার জন্য যখন এগিয়ে আসতো স্ত্রীলোকগণ তখন মাটির বাসন নিয়ে তাদের তাড়া করতো। ভয়ে লাঠিয়ালগণ পালিয়ে যেতো। আরেক দল ছিল যারা শুধুমাত্র লাঠি চালাতো। এরা লাঠিয়াল। এদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ দল ছিল বল্লমধারী

১. Hindu Patriot : 17th March. 1860.
২. নীল বিদ্রোহঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৮৬।

বাহিনী। একজন বল্লমধারী একশ জন লাঠিয়ালকে শায়েস্তা করতে পারে। এরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ভয়ানক দুর্ধর্ষ। এদের ভয়ে নীলকর লাঠিয়াল দল সদা তটস্থ থাকত। এখন পর্যন্ত আক্রমণ করতে সাহস করছে না।"১

উল্লিখিত বিবরণটি নদীয়া জেলার। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা-তেও ঠিক একই রকম কৌশল অবলম্বন করা হত। বিদ্রোহীরা কোন কোন স্থানে তীর-ধনুক ও বন্দুক ব্যবহার করত। লাঠি চালনা, অস্ত্র চালনা, বন্দুক চালনা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দূর দূর থেকে পারদর্শী ওস্তাদদের যোগাড় করে আনা হয়েছিল। এতেই বোঝা যায় যে, চাষীদের আয়োজন কত ব্যাপক এবং তারা কতখানি মরিয়া হয়ে বিদ্রোহে নেমেছিল। নীল বিদ্রোহে চাষীরা যে কৌশল অবলম্বন করেছিল এবং যে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছিল তা সর্বকালের গণবিদ্রোহের জন্যে একটা আদর্শ হয়ে থাকবে। সংগ্রামের কৌশল সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোর খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন:

"প্রত্যেক গ্রামের সীমানায় একটি করে ঢাক থাকত। নীলকর লাঠিয়াল-দের দেখলেই কেহ একজন সেই ঢাক বাজাত। অমনি প্রস্তুত হয়ে থাকা শত শত কৃষক লাঠি বা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দৌড়ে আসত। এ কৌশলের ফলে নীল-করদের লোকেরা কিছুতেই রেহাই পেতো না। অক্ষত দেহে কেহ পালিয়ে যেতে পারতো না। চাষীদের সম্মিলিত শক্তির সামনে টিকে থাকা সহজ ব্যাপার নয়।......সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশময় (সিপাহী বিদ্রোহের দুই নায়ক) নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপীর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নীল বিদ্রোহী কৃষকগণও তাদের দলের নেতাদের এসব নামে অভিহিত করতো।"২

কৃষকদের এই বিদ্রোহ দেশময় হু হু করে ছড়িয়ে পড়লো। নদীয়া (কুষ্টিয়া), যশোর, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, ২৪ পরগণা (বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে) সর্বত্র সমানভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। গ্রামে গ্রামে শুরু হল সংগঠন ও আয়োজন। প্রতিটি চাষীর চোখে আগুনের হল্‌কা। সবার একই প্রতিজ্ঞা। নীলকর তথা ইউরোপীয়দের এদেশ থেকে তাড়াতেই হবে।

---

১. Hindu Patriot : February 11, 1860
২. যশোর-খুলনার ইতিহাস: পৃঃ ৭৮৯।

বিদেশী শাসন আর কেউ মানবে না। হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান সবাই এক জোটে বিদ্রোহে সামিল। সবার এক কথাঃ প্রাণ থাকতে আর নীল বুনবো না। ভিক্ষা করে খাব। বাড়ীঘর ছেড়ে বনে জঙ্গলে চলে যাব, তবুও নীল বুনবো না। প্রাণ দিয়ে দেব। গুলী খেয়ে মরে যাব, তবুও নীল আর বুনবো না। 'কারও জন্যে নয়। নিজের মায়ের জন্যে হলেও নীল আর বুনবো না। দেখি কার সাধ্য আছে আমাদের দিয়ে নীল বোনায়।১

১৮৫৯ সালে হার্সেল সাহেব নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন দেখতে পেয়েছিলেন, নীলচাষ নিয়ে চাষীরা ভয়ানক উত্তেজিত। রায়তদের মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, মুক্তি এবার আসবেই। আর বিলম্ব নেই। তাদের হাব-ভাব দেখে মনে হয় যে তারা সাংঘাতিক রকমের উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়। কিন্তু মুক্তির আগমনে বিলম্ব ঘটায় তারা অস্থির। ..... নীলচাষের ব্যাপারে চাষীরা আগের চেয়ে দশগুণ বেশী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।২

এই বিদ্রোহে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের একজন হলেন বাবু শিশির কুমার ঘোষ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলঃ

"বাংলাদেশের ৬০ লক্ষের অধিক চাষী এক জোটে যে দেশ প্রেম, একনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল। যে সব কৃষকেরা জেলখানায় বন্দী ছিল, তারাও নীল বুনতে রাজী হয়নি। যদিও তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের ঘরদোর মেরামত করে দেওয়া হবে, তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার যারা সব হারায়ে ভিখারী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও ফিরিয়ে এনে দেওয়া হবে। তবুও তারা নীল বুনতে রাজী হয়নি। সর্বস্ব হারায়ে পথের ভিখারী হতে রাজী, জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকবে চিরদিন, তবুও নীল বুনবে না। এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল বলেই বাংলার চাষীরা কোন আদর্শ নেতা ছাড়াও এতবড় একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে তুলতে পেরেছিল। এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা বিদ্রোহের নমুনা হয়ত বা সারা পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

---

১. নীল কমিশনে সাক্ষীদের উক্তি।

২. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৮৭।

মধ্যশ্রেণী হতে আগত কতিপয় উদার ব্যক্তি মানবতাবোধের তাকীদে বিদ্রোহী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থহানিরই অনুপ্রেরণায়। তাছাড়া দরিদ্র নিরক্ষর রাজনৈতিক জ্ঞানবর্জিত কৃষকদের মনের দৃঢ়তা, অতুলনীয় সহনশক্তি ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের চেহারা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। সংগ্রাম তাঁদের জোর করে টেনে এনেছিল। এ ছাড়া বাকী উচ্চ বা মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে নীলকরদের সহায়তা করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন বিদ্রোহী চাষীদের দমন করতে।

কৃষকদরদী অন্যতম বুদ্ধিজীবী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উন্মুক্ত মনে স্বীকার করেছেন কৃষকদের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কথা। ১৮৬০ সালের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন : বাংলাদেশ তার কৃষকদের নিয়ে গর্ব করতে পারে। নীল আন্দোলনের শুরু থেকে বাংলাদেশের রায়তগণ নৈতিক শক্তির দৃঢ়তার যে পরিচয় দিয়েছে তা আর কোন দেশের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দরিদ্র, অশিক্ষিত, রাজনৈতিক জ্ঞানবর্জিত ও ক্ষমতাহীন কৃষকেরা নেতৃত্বশূন্য হয়েও এরূপ একটা সার্থক বিপ্লব ঘটাতে পেরেছে, যা গুরুত্বে ও মহত্ত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। তারা এমন একটা শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল যাদের হাতে ছিল দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সর্বপ্রকার উপকরণ। দেশের সরকার, সংবাদপত্র এবং আইন আদালত সবই ছিল তাদের বিরুদ্ধে। এতগুলি বিশিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তারা সফলতা অর্জন করেছে এবং তাদের সফলতার ফল ভোগ করবে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ।......ইতিমধ্যে উৎপীড়নকারীরা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, তাদের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটতে আর দেরী নেই।......এই বিপ্লবের জন্য তাদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে। প্রহার, অপমাণ, গৃহচ্যুতি, সম্পত্তি ধ্বংস সবই তাদের ভাগ্যে ঘটেছে। সর্বপ্রকার অত্যাচার তাদের উপর চলছে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরুষদের ধরে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, স্ত্রীলোকদের উপর চলেছে পাশবিক অত্যাচার। ধানের গোলা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সকল প্রকার নৃশংসতার শিকার হয়েছে তারা। তবুও চাষীরা মাথা নত করেনি।"[১]

---

১. Hindu Patriot : May 19, 1860.

হরিশচন্দ্র এ বিদ্রোহের ফলে চাষীদের সামাজিক অবস্থার উপর ভয়াবহ প্রভাব বিস্তারিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "যদি তারা আরও কিছুদিন নির্যাতন সহ্য করে যেতে পারে, তবে তাদের সামাজিক অবস্থায় এমনি একটা বিপ্লব দেখা দেবে যার প্রতিক্রিয়া দেশের সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।"১

বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই এদেশের কৃষক সমাজের উপর চলে আসছিল অমানুষিক অত্যাচার, অবিচার আর শোষণ। ক্রমে ক্রমে সেই শোষণ-পীড়ন এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যে কৃষকগণ আপনা হতেই সংঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বিদ্রোহের অগ্নিশিখা নিয়ে। তারা অপেক্ষা করেনি কোন শিক্ষিত, ভদ্র, রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন নেতার নেতৃত্বের। নীল বিদ্রোহ ও তার নেতৃত্বের ধারা ও প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে 'যশোর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেছেনঃ

"এ বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে, যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল, সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্য বীর নেতার উদয় হইয়াছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস।......লড়াই হইয়াছিল তাতে কত লোক কত স্থানে হত বা আহত হইয়াছিল তাহার খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লম্বা লাঠির বলে নীলকরেরা বাঘের মত দেশ শাসন করিতেন, প্রজারা চাষ বন্ধ করিলে সেই লাঠির আঁটি পড়িয়া রহিল, উহা ধরিবার লোক জুটিল না। নীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়া আসিল।"২

নীল বিদ্রোহের মত একটা বিদ্রোহ কোন নেতৃত্ব ছাড়াই যে এমনভাবে সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করতে পারে এবং কৃষকগণ নিজেরাই যে এ বিদ্রোহের পরিচালক ও সংগঠক—এমন একটা সত্য কথা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সহজে মেনে নিতে পারলো

১. Hindu Patriot: May 19. 1860.

২. যশোর-খুলনার ইতিহাসঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৯।

না। তাদের বরাবরই একটা ধারণা ছিল যে, এর পেছনে কোন লোক বা সংঘ কাজ করছে। নীল কমিশনে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ "আপনি কি গ্রামের এমন একজন মাতবরকে জানেন, যিনি নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও কার্যক্ষমতা দ্বারা রায়তগণকে উত্তেজিত করতে পারেন?" জবাবে হার্সেল সাহেব বলেছিলেন, "এমনি শত শত লোকের নাম করা যেতে পারে। কোন কোন গ্রামে এমন নেতারও আবির্ভাব ঘটেছে, পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতেও যাদের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।......নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত দু'চারজন স্থানীয় জমিদার এবং তাদের কর্মচারীরা ছাড়া অন্য কোন চক্রান্তকারীর সন্ধান পাওয়া যায়নি, যারা চাষীদের উত্তেজিত করতে পারে।"১

নীল বিদ্রোহের সত্যিকার নায়ক বা নেতা খুঁজতে গিয়ে কমিশন শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। কমিশনকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছিল যে, নীল-চাষের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাই এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী। কৃষকেরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিকারের চেষ্টায় রুখে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম হতে একদল আরেক দলকে সাহায্য করেছিল।"২

নীল বিদ্রোহের নামী-দামী কোন নেতা সক্রিয় ছিলেন না, এ কথা সত্য। কিন্তু এমন দু'চারজন সাধারণ লোক ছিলেন, যাঁরা কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে নিজেদের সর্বস্ব হারাতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমন দু'জন জন-দরদী ব্যক্তি ছিলেন নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস। প্রথমে এ'রা দু'জনই ছিলেন নীলকুঠির দেওয়ান। মূলত একজন জোতদার আরেক জন মহাজন। দরিদ্র কৃষকদের উপর নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার দেখে তাদের মনে প্রচ্ছন্ন একটা বেদনাবোধ জেগে ওঠে। তারপর যখন দেখলেন যে, কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে, উভয়েই কুঠির দেওয়ানী ছেড়ে দিয়ে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চাষীদের শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্যে বরিশাল এনে তাদের শিক্ষা দিলেন, যাতে

---

১. Indigo Commission Report : Evidence, P. 6.
২. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৯৬।

করে চাষীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। নীলকরদের হাজার হাজার লাঠিয়ালও এদের শায়েস্তা করতে পারেনি। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ঘুরে বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় চাষীদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুললেন। চাষীরা নীল বুনলো না। কুঠি বন্ধ হয়ে গেল। প্রজাদের নামে নালিশ পড়লো। বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় প্রজাদের জরিমানা ও দাদনের টাকা শোধ করে দিলেন। মামলা-মোকদ্দমার খরচ চালালেন। যারা জেলে ছিল তাদের পরিবারবর্গ প্রতিপালন করলেন। নিজেদের সর্বস্ব খুইয়ে চাষীদের মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এভাবে তাদের সঞ্চিত ১৭ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হল। তারা গ্রাম পাহারা দিতে থাকল। বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় একবার চিন্তাও করলেন না যে. এতে তাদের প্রাণ যেতে পারে। বহুবিধ ক্ষতি হতে পারে। তাদের একমাত্র ইচ্ছা—যেমন করে হোক চাষীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সংগ্রামে জয়লাভ করতে হবে ; ভাঙতে হবে নীলকর লাঠিয়ালদের বিষদাঁত।

বিপুল উৎসাহের সাথে চাষীরা তীর, ধনুক, লাঠি ও সড়কি চালনা শিখে চরম সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকল। এদিকে একদিন দেখা গেল কাঠগড়া কুঠি বন্ধ হয়ে গেছে। কুঠিয়াল সাহেব ক্ষেপে গেলেন। তারও প্রতিজ্ঞা—যেমন করে হোক চাষীদের শায়েস্তা করতে হবে। ১৫০০ লাঠিয়াল নিয়ে সে লোকনাথপুর আক্রমণ করলো। 'পাল্টা আক্রমণ চালালো চাষীরা। তুমুল লড়াইয়ের পর লাঠিয়ালরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। এটা ছিল কৃষকদের পক্ষে প্রথম বড় আকারের জয়। পরে অবশ্য আরও বহু সংগ্রামে কৃষকেরা জয়লাভ করেছিল।[১]

মালদহের নারায়ণপুর গ্রাম নিবাসী রফিক মন্ডল আরেক সংগ্রামী পুরুষ। রফিক মন্ডল ছিলেন সামান্য একজন চাষী। আবেদুর রহমান নামক একজন সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক লক্ষ্ণৌ থেকে আসেন ধর্ম প্রচার কাজে। এখানকার আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা ভলা লাগায় তিনি নারায়ণপুরে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন এবং স্থানীয় এক মাদ্রাসায় মাস্টারী করতে থাকেন। এই আবেদুর

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৯১।

রহমান চেষ্টা তদবির করে রফিক মন্ডলকে ট্যাক্স ইন্সপেক্টরের কাজ যুগিয়ে দেন। এ কাজে রফিক মন্ডল নিজেকে বিশ্বাসী, উৎসাহী ও দক্ষ বলে প্রমাণ করলেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে রফিক মন্ডল গ্রামের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বলে পরিচিত হলেন। এ সময় সারাদেশে ওহাবী আন্দোলনের ঢেউ চলছিল। ওহাবীদের হয়ে রফিক অনেক কাজকর্ম করলেন। হঠাৎ সন্দেহক্রমে রফিকের ঘরে তল্লাসী চালানো হল। সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হল। ১৮৫৩ সালে সীমান্তের বিদ্রোহীদের সাথে এক হয়ে নাশকতামূলক কাজে সহায়তা করার অভিযোগে রফিক মণ্ডলের শাস্তি হল।১

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর রফিক মন্ডল যোগ দিল নীল আন্দোলনে। একজন ইংরেজ লেখক বলেছিলেন—"নীল সংক্রান্ত আন্দোলনে রফিক মণ্ডল সর্বাপেক্ষা বড় নায়ক। তিনি নীলকরদের প্রলোভন সংযত করার জন্যে চাষীদের সুবিধার্থে একান্তভাবে অর্থ ব্যয় করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। অতিশয় তীব্র ও তিক্ত অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেও তিনি পিছপা হতেন না। সর্বদা সাহসের সাথে এগিয়ে যেতেন। এভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে থাকার ফলে তার নিজের বিষয়-ধর্ম অবহেলিত হতে থাকে। উপযুক্ত সময় খাজনা দিতে না পারায় তাঁর জমি-জমা নিলাম হয়ে যায়। তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন।২ রফিক ও বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের এ আন্দোলন শুধুমাত্র নীল আন্দোলন নয়, প্রকৃত সংঘবন্ধ গণ-আন্দোলন।

খুলনা জেলার বীর চাষী রহীমুল্লাহ্‌র কাহিনী নীল বিদ্রোহের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। খুলনা জেলার মোড়েলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা নীলকর মোড়েল সাহেবের প্রজা ছিলেন স্থানীয় বড়খালি বা বারুইখালি গ্রামের বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ রহীমুল্লাহ্‌। মোড়েলগঞ্জে ছিল অত্যাচারী মোড়েল সাহেবের নীলকুঠি। নীলচাষ নিয়ে রহীমুল্লাহ্‌র সাথে মতবিরোধ ঘটে মোড়েল সাহেবের। মোড়েল চেয়েছিলেন, রহীমুল্লাহ্‌কে দিয়ে ইচ্ছামত নীলচাষ করাতে। কিন্তু রহীমুল্লাহ্‌ তাতে রাজী ছিলেন না। রহীমুল্লাহ্‌র এক

১. The Indian Musalmans : Hunter, P. 79-80.

২. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসঃ ডঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

কথা— জান যায় যাক, তবু নীলচাষ করব না। ফলে বাধলো সংঘর্ষ। অনেক চেষ্টা করেও রহীমুল্লাহ্‌কে বাগে আনতে পারলো না মোড়েল।

১৮৬১ সালের ২৬শে নভেম্বর। শেষরাতের অন্ধকারে মোড়েলের লাঠিয়ালরা ঘিরে ফেললো সমস্ত বারুইখালি গ্রাম। সংখ্যায় ছিল তারা প্রায় তিন-শরও বেশী। তাদের হাতে ছিল লাঠি, সড়কি আর বন্দুক। দলের নেতা ছিল হিলি নামক এক ডেনিস যুবক।

বারুইখালির প্রজারা ছিল বরাবরই দুর্দান্ত প্রকৃতির এবং রহীমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একতাবদ্ধ। সমস্ত বারুইখালির চাষীদের এক জবাব—নীলচাষ করবো না।

তাই বারুইখালি গ্রামের অবাধ্য চাষী আর তাদের নেতা দুর্ধর্ষ রহীমুল্লাহ্‌কে শায়েস্তা করার জন্যে নীলকর দস্যু মোড়েলের এই অভিযান।

ভোর না হতেই গ্রামবাসীরা তাদের বিপদ অনুভব করলো। যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপর। কিন্তু সুসজ্জিত মোড়েল বাহিনীর সামনে তারা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না।

বিপদ বুঝে রহীমুল্লাহ্‌ও লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গ্রামবাসীরা বুকে সাহস নিয়ে আবার রুখে দাঁড়াল। রহীমুল্লাহ্‌র লাঠির ঘায়ে মোড়েলের বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী অনুচর ধরাশায়ী হল। এ সময় রহীমুল্লাহ্‌র হাতে একটি বন্দুকও ছিল। রহীমুল্লাহ্‌ বীর বিক্রমে মোড়েল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। রহীমুল্লাহ্‌র স্ত্রী ভগ্নি বিবি এ সময় রহীমুল্লাহ্‌র পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য করেন। মোড়েলের অনেক অস্ত্রধারী অনুচর রহীমুল্লাহ্‌র লাঠির ঘায়ে ও বন্দুকের গুলীতে মৃত্যুবরণ করলো। এই সময় হঠাৎ একটা গুলী এসে বিঁধলো রহীমুল্লাহ্‌র পায়ে। রহীমুল্লাহ্‌ তখনই স্থান ত্যাগ করলেন।

রহীমুল্লাহ্‌র বাড়ীটি ছিল ছোটখাট একটা দুর্গ বিশেষ। চারদিক পরিখা বেষ্টিত। তারপর নারিকেল-সুপারি গাছের সারি। গাছের পাশ দিয়ে উঁচু দরমার বেড়া। রহীমুল্লাহ্‌ বেড়ার পাশে বসে পায়ে বেন্ডেজ বাঁধছিলেন, এমন সময় হিলির একটা গুলী এসে রহীমুল্লাহ্‌র বক্ষভেদ করলো। সবাই হায় হায় করে উঠলো। রহীমুল্লাহ্‌ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রহীমুল্লাহ্‌র মৃত্যুর সাথে সাথে গ্রামবাসীরা ভীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য অবস্থায় পালাতে শুরু করলো। সুযোগ বুঝে মোড়েলের লাঠিয়ালরা গ্রাম লুট করতে লাগল। বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। যা নেওয়া যায় না বা আগুনেও পোড়া যায় না, সেসব জিনিস ফেলে দিল পানিতে। সামনে যাকে পেল, তাকেই মারল। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা কেউ রেহাই পেল না তাদের হাত থেকে। যুবতী যারা, তাদের নিয়ে গেল বন্দী করে। রহীমুল্লাহ্‌র স্ত্রী আর ভগিনীও রেহাই পেল না। যাবার সময় তারা রহীমুল্লাহ্‌র মৃতদেহও নিয়ে গেল।১

পৃথিবীর ইতিহাসে ইংরেজ একটি সুসভ্য জাতি বলে সুপরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশে নীলচাষ বিস্তার এবং তৎকালীন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তারা যে কূট-কৌশল, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত আর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিল, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল। অত্যাচার আর বর্বরতার যে নিদর্শন তারা সৃষ্টি করেছিল সমকালীন ইতিহাসে তা নজীরবিহীন।

নীলকরদের অত্যাচার-অবিচারের বিচার হত না এদেশে। মামলা চলতো। সাক্ষীর জবানবন্দীও হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারের ফল দাঁড়াত শূন্য। অর্থাৎ আসামী বেকসুর খালাস। বারুইখালির ঘটনা আর রহীমুল্লাহ্‌র মৃত্যু নিয়েও মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। ঘটনাচক্রে এ সময় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্র ছিলেন খুলনা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম। ঘটনার দিন তিনি এসে-ছিলেন পার্শ্ববর্তী ফকীরহাট থানায়। পরদিন ভোরে বারুইখালির ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হলেন। তিনি তখনই কয়েকজন সিপাহী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাযির হলেন।

এই তদন্তের সময় নাকি জনৈক সাহেব এক হাতে এক লাখ টাকার নোট এবং অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহে-বের পিস্তল এবং এক লাখ টাকা অগ্রাহ্য করে তখনই তাকে গ্রেপ্তার করেন।২ সরকারীভাবেই বঙ্কিচন্দ্র এই ঘটনার তদন্তের ভার পেয়েছিলেন। দুই বছর

---

১. বঙ্কিম জীবনীঃ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং, কলকাতা ১৩৩৮, পৃঃ ৯০-৯৩।

২. দৈনিক বার্তা, ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৬, মহাম্মদ আবু তালিব সাহেব লিখিত প্রবন্ধ 'নীল বিদ্রোহের কাহিনী ও বীর চাষী রহীমুল্লাহ'।

পর্যন্ত এই মামলার বিচার চলেছিল। প্রথমে খুলনায়, পরে যশোহর ও কলিকাতায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই মামলায় সাক্ষ্যদান করেছিলেন।

দায়রার বিচারে আসামী দৌলত চৌকিদারের ফাঁসি হয়। ৩৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং আরও বহু আসামীর বিভিন্ন মেয়াদের জেল ও জরিমানা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও হিলি বেকসুর খালাস পায়। হিলির বিচার হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ জুরীদের সাহায্যে।

১৮৬২ সালে মোড়েল তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ফেলে বাংলাদেশ ছেড়ে পলায়ন করে। কিন্তু বোম্বাইয়ের কাছে ধরা পড়ে। ১৮৬৩ সালে হাইকোর্টের বিচারে বেকসুর খালাস পায় এবং চিরতরে বাংলাদেশ পরিত্যাগ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমসাময়িককালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর'-এর শুরুতে দাঙ্গাহাঙ্গামার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা হুবহু মোড়েল সাহেবের লাঠিয়াল বাহিনীর আক্রমণের অনুরূপ। গ্রামবাসীর চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ, কান্নার ধ্বনি, মশালের আলো, স্ত্রীলোক নিয়ে পলায়ন সবই হুবহু এই দাঙ্গায় ছিল।[১] বারুইখালি গ্রামের মানুষের কণ্ঠে হিলি-রহীমুল্লাহ্র সংঘর্ষের কাহিনী সম্পর্কিত ছড়া আজও শোনা যায়ঃ

রহীমুল্লাহ্ বলে গো আল্লাহ্ এই বিপদের কালে
আল্লাহ বারুদ নেই মোর ঘরে।
রহীমুল্লাহ্র বধূ বলে চিন্তা করেন কেনে
পাটের শাড়ী পোড়ায়ে দেব যত বারুদ লাগে।
রহীমুল্লাহ্ বলে গো আল্লাহ্ এই বিপদের কালে
আল্লাহ্ গুলী নাই মোর ঘরে।
রহীমুল্লাহ্র বধূ বলে ভাবনা করেন কেনে
হাসলা-খাড়ু কাটিয়া দেব যত গুলী লাগে।

দুঃখের বিষয় এমন একজন স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী পুরুষের কথা লেখা নেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে। একটুখানি স্মৃতিচিহ্নও বিদ্যমান নেই।

১. সাহিত্যের কথাঃ শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পৃঃ ৩।

অথচ আমাদের এই দেশে অত্যাচারী বিদেশী কুঠিয়াল মোড়লের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। মোড়েলগঞ্জে আজও সেই স্মৃতি বিদ্যমান।

এমনি আরও কত অখ্যাত চাষী নীল বিদ্রোহের প্রজ্বলিত আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়েছে, বিসর্জন দিয়েছে নিজেদের সুখ-শান্তি তার খবর আমরা জানি না। সে ইতিহাস কেউ ধরে রাখতে পারেনি। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী আসাননগরের মেঘাই সর্দার এমনি এক অখ্যাত চাষী। অনেকবার নীলকরদের লাঠিয়ালদের সাথে মেঘাই সর্দারের সংঘর্ষ হয়েছিল। একবার সুযোগ মত নীল-কর দস্যুর লোকেরা মেঘাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মেঘাইয়ের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংঘবদ্ধ করার কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিল। মেঘাইয়ের স্ত্রীর শেষ পরিণতি জানা যায়নি। সে ইতিহাস কেউ ধরে রাখতে পারে নি।১

কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেবকে নীল কমিশন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কি গ্রামের এমন কোন মোড়ল বা সর্দারের কথা বলতে পারেন, যিনি নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে চাষীদের উত্তেজিত করে তুলেছিল বা তাদের একতা-বদ্ধ করেছিল? উত্তরে হার্সেল সাহেব বলেছিলেন, "একজন নয়, এ ব্যাপারে আমি একশ জনের নাম করতে পারি। একটা গ্রামে এমনি সব নেতাদের আবির্ভাব ঘটছে যারা অল্প সময়ে পাশের গ্রামগুলোর মধ্যেও তাদের মতামত প্রকাশ করেছে।"২

আগেই বলেছি এ সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়েছিল চাষীরাই। তারাই গ্রামে গ্রামে জটলা করেছে, গোপনে সভা-সমিতি করেছে, আলাপ-আলোচনা করেছে। রাতের পর রাত চিন্তা করেছে কি করে নীল দস্যু ও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের জব্দ করা যায়।

বস্তুত দুটো প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করার পরই অবশেষে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম স্তরে চাষীরা সরকার তথা হাকিম-ম্যাজিস্ট্রেট-কমিশনার প্রভৃতির কাছে বিনীত আবেদন জানাল। তদন্তের দাবী জানাল। কোন ফল হল

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৯৩।
২. Indigo Commission Report. Evidence : P. 6.

না তাতে। দ্বিতীয় স্তর হল—ধর্মঘটের স্তর। চাষীরা সরাসরি অস্বীকৃতি জানাল, আর তারা নীল বুনবে না। জান দেবে, তবুও নীল বুনবে না। এবার চললো জোর করে নীলচাষে বাধ্য করার প্রচেষ্টা। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সহায়তায় জোর করে নীলচাষে বাধ্য করার চেষ্টার ফলেই শুরু হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

দেশের আইন নীলকরদের পক্ষে। হাকিম ম্যাজিস্ট্রেট তাদের পক্ষে। দেশের শান্তিরক্ষক পুলিশ বাহিনী নীলকরদের আজ্ঞাবহ। কাজেই চাষীরা বুঝলো —এবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হবে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া অন্য গতি নেই। গ্রামে গ্রামে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই প্রস্তুত। প্রাণ যায় যাবে—তবুও নীল বুনবে না।

এই ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে ছোট ছোট বালক-বালিকারাও অংশ নিয়েছিল। পাবনা জেলার বার পাখিয়ায় ছিল এক বিরাট নীলকুঠি। একদিন কাওলিয়ার কয়েকটি দুরন্ত তরুণ ঘোড়ায় চড়ে নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিল। পথে দেখল নীলকুঠির কয়েকজন পেয়াদা গ্রামের দুজন কৃষককে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। এ দু'জন চাষীর অপরাধ ছিল তারা ধানের জমিতে নীল বুনতে রাজী হয়নি। সামান্য ধানের জমিতে নীল বুনলে তারা খাবে কি?

তরুণ ছেলেগুলোর মাথায় খেয়াল চাপলো—যেমন করে হোক চাষী দু'জনকে ছাড়াতে হবে। সবাই মিলে একসাথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পেয়াদাদের উপর দিয়ে। এদিক-ওদিক পড়ে, ঘোড়ার পায়ের আঘাতে পেয়াদাদের অবস্থা কাহিল। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে থাকল সেখানে। চাষীরা ছাড়া পেয়ে গেল।

ছেলেগুলো ছিল গ্রামের মাতবরদের। কাজেই এ নিয়ে পেয়াদারা বেশী বাড়াবাড়ি কিছু করার সাহস করলো না। ছেলেরা কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হলো না। এবার তারা চিন্তা করতে থাকলো, কি করে খোদ নীলকর ফেল্টন সাহেবকে জব্দ করা যায়।

যে পথ দিয়ে নীলকর ফেল্টন রোজ ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া-আসা করে, সেই পথের উপর গোপনে বিরাট একটা গর্ত কাটলো তারা। লতাপাতা দিয়ে গর্তের

মুখটা সুন্দরভাবে ঢেকে রাখলো। যথাসময়ে নীলের জমি তদারকে যাবার পথে ঘোড়াসহ ফেল্টন পড়ে গেল সেই গর্তে। গর্তে পড়ে সাহেবের ডান পা গেল ভেঙে। চীৎকার করে উঠলো সাহেব। ছেলেরা কাছাকাছি লুকিয়ে ছিল। গর্তের কাছে এসে তারা ফেল্টনকে সান্ত্বনা দিল—পা ভেঙেছে তো কি হয়েছে। কতজনারই পা ভাঙে। কারও ভাঙে এমনি করে গর্তে পড়ে, কারও ভাঙে তোমার মত সাহেবের বুটের লাথি খেয়ে।

গোলাম রইছ খাঁ ছিলেন গ্রামের মাতব্বর। সাহেব বিচার দিল মাতব্বরের কাছে। বিচারে মাতব্বর রায় দিলেন—যারা এ কাজ করেছে, সাহেব তাদের কারও নাম বলতে পারে নি। কাজেই মামলা ডিস্‌মিস্। বিচার চলতে পারে না।

সাহেব বিচারে খুশী হতে পারলো না। নিজ হাতে এর বিচার করবে বলে ঠিক করলো। একদিন কয়েকজন লাঠিয়াল নিয়ে ফেল্টন ঘোড়া ছোটালো গ্রামের দিকে। উদ্দেশ্য পা ভাঙার প্রতিশোধ নিতে হবে।

চাষীরা খবর পেয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল। এহচান খাঁ, গুলজার খাঁ, ও জাহান্দার খাঁ—এরা ছিল গ্রামের নামকরা লাঠিয়াল। এরা লোকজন নিয়ে এক জোটে সাহেবের লাঠিয়ালদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুঠির লাঠিয়ালরা মার খেয়ে পালালো। ফেল্টন বন্দী হলো। গ্রামবাসীরা তার বিচারে বসলো। সাহেব করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। মাতব্বর বিচারে রায় দিয়ে সাহেবকে বললেন, তোমার প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে এক শর্তেঃ এই মুহূর্তে তোমাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সাহেব সে রায় মেনে নিল। তখনই সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। ফেল্টন বুঝেছিল, জনতা জেগেছে। সময় ঘনিয়ে এসেছে। জনতার এ জাগরণকে কোন কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এমনি করে গ্রামে গ্রামে চলছিল চাষীদের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানের লড়াই। বাঁচার সংগ্রাম। চলনবিল এলাকার নাড়ী-বাড়ীতে বিক্ষুব্ধ জনতা এক নীলকর সাহেবকে পিটিয়ে মেরেই ফেললো।[১]

১. দৈনিক আজাদ, ১৭ই আগস্ট, ১৯৬৭ ইং।

এমনি করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো চাষীদের নীল-বিরোধী আন্দোলন। ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে নীল বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র বিক্ষুব্ধ জনতা নীলকুঠিগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে লাগলো। পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করলো। প্রথম দিকে নীল বিদ্রোহের ব্যাপকতার সাথে সাথে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য সংগ্রামী চাষীদের ঐক্যজোট ও তার ভয়াবহ পরিণাম দেখে অনেক অত্যাচারী নীলকর দমে গিয়েছিল। দেশীয় লাঠিয়াল গোমস্তারা তো শেষের দিকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ব্যস্ত থাকত।

বাংলাদেশের মধ্যে নদীয়া জেলা ছিল নীল উৎপাদনের একটা প্রধান কেন্দ্র। ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে ওঠে এই জেলার সর্বত্র। সমগ্র বাংলাদেশে যত নীল উৎপন্ন হত তার এক-পঞ্চমাংশ কেবলমাত্র নদীয়া জেলা হতেই পাওয়া যেতো।

বর্তমান কুষ্টিয়া থেকে ৮/৯ মাইল দূরে শালবন মথুরা গ্রামে টি, আই, কেনীর প্রধান কুঠি ছিল। কেনী যেমনি ছিল নিষ্ঠুর, তেমনি ছিল চরিত্রহীন। যেসব চাষী নীলচাষ করতে অস্বীকৃতি জানাতো, কেনীর হুকুমে তাদের মাথার উপর মাটি দিয়ে তাতে নীলের বীজ বুনে দেওয়া হতো, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই হতভাগ্য চাষী নীল বুনতে রাজী হত ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হতভাগ্যের উপর চলতো এমনি আরও অসংখ্য অকথ্য অত্যাচার।

কুষ্টিয়ার সদরপুরের তদানীন্তন মহিলা জমিদার প্যারী সুন্দরীর নাম-ডাক ছিল এলাকার সর্বত্র। কেনী যখন নীলচাষ নিয়ে প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যা-চার আরম্ভ করলো প্যারী সুন্দরী এর প্রতিবাদ জানালেন কেনীর কাছে। কিন্তু কেনী তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলো না। অবশেষে প্যারী সুন্দরী তার লাঠি-য়াল বাহিনী পাঠালেন কেনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু কেনীর বাহিনীর সাথে পেরে উঠলো না তারা। পরাজিত হয়ে ফিরে এলো। প্যারী সুন্দরী সহজে হজম করতে পারলেন না পরাজয়ের এ গ্লানি। তিনি ঘোষণা করলেন—প্রজাদের মধ্যে যে কেনীর স্ত্রীকে ধরে আনতে পারবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।

প্যারী সুন্দরী নিজেও খুঁজতে লাগলেন কি করে ফেনীকে জব্দ করা যায়। সত্যিই একদিন সুযোগ এসে গেলো। ফেনী গিয়েছিল যশোহরে বিশেষ একটা কাজে। এই সুযোগে প্যারী সুন্দরী লোকজন নিয়ে ফেনীর কুঠি আক্রমণ করলেন। আদেশ করলেন ফেনীর স্ত্রীকে ধরে সদরপুর নিয়ে যেতে। মিসেস ফেনীও ছিল বিশেষ বুদ্ধিমতী। অকস্মাৎ সে থলে ভর্তি কাঁচা টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল প্যারী সুন্দরীর লোকদের, যারা মিসেস ফেনীকে ধরার জন্যে এগিয়ে আসছিল তাদের মধ্যে। মুহূর্তে টাকা নিয়ে লাঠিয়ালদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। এ সুযোগে ফেনীর লাঠিয়ালগণ পাল্টা আক্রমণ চালালো। এ পাল্টা আক্রমণ সামলাতে পারলো না তারা সহজে। পরাজিত হল প্যারী সুন্দরীর লাঠিয়ালরা।

এরপর মিসেস ফেনী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কুঠি লুটের মামলা দায়ের করল। ম্যাজিস্ট্রেট মামলা তদন্তে এসে রাত্রি যাপন করলেন ফেনীর কুঠিতে। এ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, মিসেস ফেনী নাকি সেই রাত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের অঙ্কশায়িনী হয়েছিল। যা হোক, তদন্তের পর চাষীদের উপর কিছুটা অত্যাচারও সংঘটিত হয়েছিল।

এ সময় বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার পিটার গ্রান্ট সরেজমিনে নীল অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করার জন্যে স্টীমারযোগে উক্ত এলাকায় আসেন। হাজার হাজার কৃষক জনতা গ্রান্ট সাহেবকে ঘিরে ধরলো এবং ফেনীর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য সুবিচার প্রার্থনা করলো। গ্রান্ট সাহেব তাদের পাবনার দরবারে নালিশ জানাতে বললেন।

পাবনার দরবারে নালিশ শুনানীর পর গভর্নর গ্রান্ট ঘোষণা করলেন—চাষী-দের মতের বিরুদ্ধে কেউ যদি নীলের চাষ করায় তবে সে আইনত দণ্ডনীয় হবে। নীল বুনবে কি বুনবে না সেটা নির্ভর করে চাষীদের ইচ্ছার উপর। কিন্তু তিনি ফেনীর উপযুক্ত বিচার করলেন না। ফেনী পূর্বের মত অত্যাচার চালাতে লাগল। চাষীরা তাই আবার নতুন করে সলা-পরামর্শ করতে লাগল—কি করে ফেনীকে জব্দ করা যায়। ফেনীর বিরুদ্ধে একটা সংঘবদ্ধ দল গঠন করা হলো। প্রথমেই তারা ফেনীর এলাকার নীলগাছ কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিল। একজোটে

সরকারের খাজনা বন্ধ করে দিল। নিরুপায় ফেনী বিলেত থেকে কলের লাঙ্গল এনে নীল চাষ শুরু করলো। কিন্তু কৃষকদের দারুণ ঐক্যজোটের সামনে সে বেশী দিন টিকতে পারলো না। বিদ্রোহী কৃষকগণ নতুন করে ফেনীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো। এ সময় ফেনীও নানা কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত ফেনী বাধ্য হল সব ছেড়ে পালিয়ে যেতে।

এই ফেনী চিরদিন ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে থাকবে। কুষ্টিয়ার চারপাশের লোকেরা এখনও ঘৃণার সাথে স্মরণ করে ফেনীকে। কুষ্টিয়া থেকে যে রাস্তা চলে গেছে সোজা শালঘর মধুয়া পর্যন্ত—এ রাস্তা এখনও ফেনী রোড নামে পরিচিত। কালী নদীর পারে শালঘর মধুয়া নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান।[১] এমনি আরও অসংখ্য কুঠি ছিল এ এলাকায়। কত নিরীহ প্রজার পাঁজরের হাড় লুকিয়ে আছে এ সব কুঠির অন্তরালে, কে তার খবর রাখে? কত বীর বিদ্রোহী হারিয়েছে তাদের অমূল্য প্রাণ, ইতিহাস তার কতখানি হিসাব রাখতে পেরেছে?

এখানে ওখানে গ্রামে গ্রামে নীলকর দস্যুদের অত্যাচারে উন্মত্ত কৃষকদল নীলচাষ বন্ধ করে দিয়ে হাতিয়ার ধরলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো নীলকর আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের উপর। বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ ও ব্যাপকতা দেখে ইংরেজ কর্ম-চারীগণ যারা নীলচাষ বা নীল ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল না তারাও ভীত হয়ে উঠলো। কারণ এ বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত এ দেশ থেকে ইংরেজ উচ্ছেদ বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। তারা ইংল্যান্ড ও প্রদেশের কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য ও প্রতি-কারের আবেদন জানাল। ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ জমিদার ও বণিক সমিতির সভাপতি ইল্যাংল্ডে ভারত সচিব চার্লস উডকে এই মর্মে এক পত্র পাঠান:

"গ্রামাঞ্চলের অবস্থা সম্পূর্ণ বিশৃংখল। বিদ্রোহী কৃষকগণ শুধু মাত্র ঋণ বা চুক্তিপত্রই অস্বীকার করছে না, বরং তারা এদেশ থেকে জমিদার ও মহাজন

১. আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'নীলচাষের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। ৯ই জুলাই, ১৯৬৯ ইং।

(ইংরেজ)-দিগকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। এ দেশ থেকে সকল ইউ-রোপীয়দের বিতাড়িত করে তাদের হাত সম্পত্তি উদ্ধার করা এবং ইউরোপীয়দের কাছ থেকে গৃহীত সকল ঋণ রদ করাই তাদের উদ্দেশ্য।"১

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এমন এক ঐক্যবোধ বোধ হয় এদেশের ইতিহাসে আর ঘটেনি। হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবার শত্রু নীলকর দস্যুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে সৃষ্টি করলো এক ভয়াবহ আতঙ্কের। ১৮৬০ সালের জুন মাসে Calcutta Review তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিল:

"প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে, এটাই নিয়ম। নীলকরদের অত্যা-চারের মাত্রার উপরই নির্ভর করবে রায়তদের প্রতিরোধের পরিমাপ। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যে মহকুমা থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফকে একান্ত সম্মানজনকভাবে বদলী করা হয়েছিল, নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রাম শুরু হয় সেখান থেকেই। নীলচাষ না করার প্রতিবাদে কৃষকদের এই দৃঢ় সংকল্প যেমনি আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত।"২

উত্তরবঙ্গে নীল বিদ্রোহের ভয়াবহতা ছিল সবচেয়ে প্রকট। দ্বিতীয় বেঙ্গল পুলিশ ব্যাটালিয়নের প্রধান নায়ক হাবিলদার সেভো খানকে পাবনা জেলায় বিদ্রোহ দমনের জন্যে পাঠানো হয়েছিল। সেভো খান ১৮৬০ সালে তার দেশে একখানা পত্র পাঠিয়েছিল। তাতে তিনি কৃষকদের সাথে খন্ড যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত হল:

"সকাল বেলা প্রস্তুত হয়ে মার্চ করে গেলাম পিয়ারী নামক একটা গ্রামে। সেখানে পৌঁছা মাত্রই লাঠি বল্লম তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত দুই হাজার সংগ্রামী কৃষক আমাদের ঘিরে ফেললো। তারা ক্রমশ আমাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অশ্ব তাদের বল্লমের আঘাতে আহত হল। আমরা জানতে পারলাম পার্শ্ববর্তী ৫২ খানা গ্রাম থেকে তারা সমবেত হয়েছিল। এদের মধ্যে

---

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ: প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৮১, ৮৭।
২ পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৩।

এক ব্যক্তি বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তার দিক থেকে বন্দুকের শব্দও আসছিল।”১

শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় কলকাতার হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার নিয়মিত সংবাদ পাঠাতেন। তাঁরই প্রেরিত সেসব পত্র থেকে জানা যায়ঃ

“নীলকর কেনির লোকেরা একজন চাষীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে সাতাশখানি গ্রামের কৃষকরা কেনির কুঠির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে।... বিজনিয়া কুঠির ওকান সাহেব গ্রামের কয়েকজন মন্ডলকে গ্রেফতার করে এবং তাদের নীল চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। তারা গ্রামে ফিরে এসে সকল চাষীকে একত্রিত করে এবং কুঠির আমিন, গোমস্তা ও তাগিরদারদের প্রহার করতে করতে গ্রাম থেকে বের করে দেয়।...কৃষকেরা তাদের অধিকার বজায় রাখার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ২৪শে জুন তারিখে মল্লিকপুরের মীরগঞ্জের কুঠির জন ম্যাকার্থার এর দলের সাথে কৃষকদের একটা প্রবল সংঘর্ষ ঘটে।.........মল্লিকপুরের কৃষক পাচু শেখকে নীলকরের লোকেরা গ্রেফতার করতে আসলে তাদের সাথে ২৫ জন কৃষকের সংঘর্ষ বাধে। উভয় পক্ষের বহু লোক আহত হয়। শেষ পর্যন্ত পাঁচু শেখ লাঠির আঘাতে প্রাণ হারায়।”...

“যশোহরের রায়তগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।...সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র ছালকোপা, বিজলিয়া, রামনগর প্রভৃতি স্থানের নীলকুঠি। হাজার হাজার কৃষক এসব কুঠির আক্রমণ প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণ করার জন্য দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুত। জোর করে চাষীদের ফসল কেড়ে নেওয়ার জন্যে কুঠিয়ালরা রিভলবার, গোলা-বারুদ ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করছে। কৃষকগণও লাঠি-বল্লম সংগ্রহ করছে। তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে মূল্য না দিলে ফসল নিতে দেবে না”।২

বগুড়ার সারিয়াকান্দি থানার অধীন হরিনা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ রায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। নীলদস্যু ফারগুসনের অত্যাচারে এলাকার চাষীরা

---

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৮৬।
২. পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৯।

অস্থির হয়ে উঠলো। কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের নেতৃত্বে চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ফারগুসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। নীলকুঠি আক্রমণ করলো তারা। এ ফারগুসন শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারায়। এ ঘটনার পর থেকে বগুড়ায় নীলদস্যুদের দৌরাত্ম থেমে যায়।[১]

নীলদস্যুদের অত্যাচার থেকে বাঁচার প্রয়াসে সমগ্র বাংলাদেশের চাষীরা শেষ পর্যন্ত জান বাজী রেখেছিল। তাই বিক্ষিপ্তভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক ঘটনা ঘটেছে। সব ঘটনা বা কাহিনী সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। এর উপরে ধারাবাহিক কোন ইতিহাসও লেখা হয়নি। অশিক্ষিত গেঁয়ো চাষী, শিক্ষিত লোক দেখলে যারা চিরদিন হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছে, সাদা চামড়া দেখলে ভয়ে কেঁপেছে, দারোগা-পুলিশ দেখলে যারা ঘরের দরজা বন্ধ করেছে, না হয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে, সেই সব নিরীহ, ভীরু চাষীরা যে সংঘবদ্ধভাবে এমন একটা বিদ্রোহ ঘটাতে পারে—এ কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। অত্যাচার কতখানি অসহনীয় হলে এমন অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে তার গুরুত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা হয়ত অনেকেই করেন নি তাই হয়তো বারবারই প্রশ্ন উঠেছে, এর পেছনে কাদের হাত ছিল? এতে নেতৃত্ব দিয়েছে কারা? কারা উস্কানি দিয়ে চাষীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে?

নীল কমিশনে এ প্রশ্ন উঠেছিল। নদীয়ার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকলিন সাহেব জবাবে বলেছেন, "বাইরে থেকে এসে কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে এমন কোন লোকের খবর তিনি পাননি।" আর্চিবল্ড হিল সাহেবও নীল কমিশনকে বলেছেন, "না, এমন কোন লোকের খবর আমার কানে আসেনি।"

কমিশনে মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরিশচন্দ্র মুখার্জির নাম উঠেছিল। হার্সেল সাহেব জোর গলায় প্রতিবাদ করেছেন, "রায়তেরা কলকাতা গিয়ে হরিশ মুখার্জিকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়েছে। নানাভাবে তার পরামর্শ ও উপদেশ নিয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি, সেসব উপদেশ অসংগত ছিল না।"[২]

নীল কমিশন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, কারো ঘাড়ে নীল বিদ্রোহের দোষ চাপানো যায় না। কৃষকেরা তাদের দুরাবস্থার হাত থেকে

---

১. বগুড়ার ইতিহাসঃ প্রভাসচন্দ্র সেন দেব বর্মা, পৃঃ ২৪৮।

২ Indigo Commision Report, Evidence. 5, 31, 32.

বাঁচার প্রচেষ্টাতেই নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেছে।

নীলচাষ বিরোধী চাষীদের যারা উপদেশ, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সংগ্রামমুখী করে তোলার কাজে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে 'অমৃতবাজার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশির কুমার ঘোষ, সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য, চন্ডিপুরের জমিদার শ্রী হরি রায়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জি ও 'নীলদর্পণ' নাটক প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে যারা সংগ্রামের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'বিশবাস ভ্রাতৃদ্বয়' মালদহের রফিক মন্ডল ও বগুড়ার কৃষ্ণপ্রসাদ রায়, খুলনার রহীমুল্লাহ, ফরিদপুরের দুদু মিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় নীল বিদ্রোহের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "এই নীল বিদ্রোহই দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিল। বস্তুত বাংলাদেশের ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহই হচ্ছে প্রথম বিপ্লব।১ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য হতে যারা প্রত্যক্ষভাবে নীল বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিলেন, শিশির কুমার ঘোষ তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। বস্তুত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নির্ভয়ে নীলকর-দস্যুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। যশোহরের ঝিকরগাছা কুঠির নীলকর সাহেবের সাথে শিশির কুমার ঘোষের পিতা হরিনারায়ণের একবার মোকদ্দমা হয়েছিল। মোকদ্দমায় হরিনারায়ণ জিতে ছিলেন। মোকদ্দমায় পরাজিত হয়ে সাহেব হরিনারায়ণের বাড়ী আক্রমণ ও লুন্ঠন করার মতলব করেন। হরিনারায়ণ তা জানতে পেরে ছেলেদের বলেছিলেন মেয়েদের নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে। শিশির কুমার তখন বালক মাত্র। তিনি পিতার কথা শুনে রেগে গিয়ে বললেন—দেহে যতক্ষণ শক্তি আছে, বাড়ী ছেড়ে যাব না। কার সাধ্য আছে আমাদের বাড়ী লুট করে। সাহেবদের ভয়ে যদি বাড়ী ছেড়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে যেতে হয়, তবে মানুষ যে আমাদের ভীরু-কাপুরুষ বলে উপহাস করবে। শিশির কুমার বাড়ী না ছেড়ে লাঠিয়াল এবং বাড়ীর ছাদের উপর ইট-পাটকেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকলেন।

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৯৭।

শিশির কুমারের এ প্রস্তুতির খবর পেয়ে নীলকর সাহেব শিশির কুমার ঘোষের বাড়ী আক্রমণ করতে আর সাহসী হলেন না।১

শিশির কুমার নীল বিদ্রোহে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। পুলিশ তাকে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। নীল-করেরাও তাঁকে দমন করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু কোনমতেই শিশির কুমারকে দমন করতে পারেনি।২

নীলকরদের এ অমানুষিক অত্যাচারকে শিশির কুমার একটা জাতির উপর আরেকটা জাতির অর্থাৎ বাঙালী জাতির উপর সুসভ্য ইংরেজ জাতির অত্যাচার বলে মনে করতেন। তাই তিনি ১৮৬০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে লিখে-ছিলেন, "যখন অন্য দেশের রাজারা অন্যায় করার অপরাধে সিংহাসনচ্যুত হচ্ছেন, তখন দু'একজন পুলিশ অফিসারের সামনে আমরা চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছি।......একটা জাতির উপর আরেকটা জাতির অত্যাচার করার কোন অধিকার নেই।"৩

কৃষকদের এই ন্যায্য সংগ্রামে হরিশচন্দ্রের ভূমিকা যে কতটা মূল্যবান ছিল, তা তখনকার দেশের বাস্তব অবস্থা ও সমসাময়িক সংবাদ পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। যেখান থেকে যতখানি সংবাদ সংগ্রহ করতে পারতেন বা মফস্বল থেকে যারা নীলকরদের অত্যাচার বিষয়ক সংবাদ পাঠাতেন, হরিশচন্দ্র যথারীতি তা 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। প্রয়োজন মত মন্তব্য করতেন। হরিশচন্দ্রের চেষ্টাতেই বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোশিয়েশন নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল।৪

তখন সবেমাত্র সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। দেশের মানুষ বিশেষভাবে ভীত এবং আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। সরকার তখন সন্ত্রাস নীতি চালিয়ে অনেককে

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১০৪।
২. ঐ ঐ পৃঃ ১০৫।
৩. ঐ ঐ পৃঃ ১০৭-৮।
৪. ঐ ঐ পৃঃ ৯৮।

গ্রেফতার করছেন। এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে নিজের বিপদ ডেকে আনার সাহস কারও ছিল না। অথচ হরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ একা নির্ভয়ে নীলচাষী-দের সমর্থন করে সংগ্রাম চালিয়েছেন। এর জন্যে হরিশচন্দ্রকে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল। নীলকররা অতি জঘন্য ভাষায় তাকে গালি দিতেও ছাড়েনি। কিন্তু তেজস্বী হরিশচন্দ্রকে কোন অবস্থাতেই দমন করতে পারেনি তারা।

চাষীদের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম যখন খুবই জোরদার এবং যখন চাষীরা মরণ-পণ প্রতিজ্ঞা করে বসেছে কোন অবস্থাতেই আর তারা নীল বুনবে না, তখন সদাশয় সরকার নীলকরদের দুঃখে ব্যথিত হলেন। উদার কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, নীল-করদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

এ বিষয় নিয়ে হরিশচন্দ্র ১৮৬০ সালের ১২ই মার্চ হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় লিখেছিলেন, "উৎপীড়নের জাল ভালভাবেই বিস্তার করা হয়েছে।...... অসংখ্য রায়তদের জেলে পোরা হয়েছে। এই শাস্তি দেওয়া একেবারেই বিফল হয়েছে, কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রায়তদের দিয়ে নীল বপন। সরকার এখন কৌশল বদলে ফেলেছেন। মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেটরা এখন প্রতি বিঘা জমির জন্য নীলকর-দের ২০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে শুরু করেছেন। মিঃ হার্সেল খালবোয়ালিয়া কুঠির জন্য ১৯ টাকা করে দিচ্ছেন। এমনকি এই অসঙ্গত শর্ত অনুসারেও এই রকম ক্ষতিপূরণের হার বিঘা প্রতি ৮ অথবা ৯ টাকার বেশী হতে পারে না। গত বছর কাছিকাটা কুঠি ১৯,০০০ বিঘার চাষে ১,৪৫,০০০ টাকা লাভ করে-ছিল। এই বছর ঐ কুঠির ৬,০০০ বিঘায় নীল চাষ হয়নি। সুতরাং তারা এর জন্যে ১,২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। যদি ১৯,০০০ বিঘার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তা হলে তারা পেতে পারে ৩,৮০,০০০ টাকা অর্থাৎ তারা নীলচাষ করে যা লাভ করে তার ৩ গুণ। এমনিতেই যখন নীলকররা দুই তিন গুণ লাভ করবে, তখন তাদের কর্মচারীদের তারা হুমকি দিয়েছে যেন এ বছর কোনো নীল না বোনা হয়।"১ এমনি নির্ভীক ছিলেন হরিশচন্দ্র। এমনিভাবেই তিনি চাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছেন।

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১০০।

খবরাখবর দেওয়ার জন্যে এবং হরিশচন্দ্রের পরামর্শের জন্যে গ্রাম থেকে চাষীদের লোকজন সব সময়েই কলকাতা আসত। হরিশচন্দ্রের গৃহেই তারা অবস্থান করতো। এ সময় হরিশচন্দ্রের গৃহ অতিথিশালায় পরিণত হতো। পত্রিকার খরচ-পত্র চালিয়ে বেতনের টাকার যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তা ব্যয় হত নীল-চাষীদের কাজে। অমানুষিক পরিশ্রমের ফলেই হরিশচন্দ্র মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল বাংলার নিরীহ চাষীদের। তাঁর মৃত্যুর পর চাষীদের হয়ে কথা বলার মত আর কেউ থাকলো না। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে চাষীরা মনের দুঃখ প্রকাশ করে গাইলো :

নীলবাঁদরে সোনার বাংলা
করল এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মল,
লঙের হল কারাগার।

হরিশচন্দ্র ছিলেন একজন মহৎ-প্রাণ আত্মত্যাগী পুরুষ। এ দেশে বহু ত্যাগী সংগ্রামী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু হরিশচন্দ্র ছিলেন তাদের মধ্যে এক আলাদা ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুতে ১৮৬১ সালের ১৭ই জুন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা লিখেছিল: "তিনি একাকী নীল প্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাহার এত উদ্যোগ, এত চেষ্টা ও এত পরিশ্রম ছিল যে, আমরা সেই অত্যুক্তি দোষ স্বীকারেও অসম্মত নহি। তিনি নীলকরদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার আদি কারণ সন্দেহ নাই।

হরিশচন্দ্রের সহকর্মী এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'Mukherjee's Magazine'-এর ১৮৬১ সালের জুন মাসে লিখেছিলেন:

"A thunderbolt has fallen upon native society. Hushed is every voice and fixed is every eye. The friend of the poor and the menter of the rich, the spogesman, the patriot, the brave heart that defied danger and battled fore-

most in the strife of politics has been swept away like a vision from our aching eyes....our lost is great. We were only just pulling forth the buds and blossoms of a healthy eristence. From the darkness of ages we were only faintly emerging into light, grouping our way through a choking mass of prejudices and struggling fully, though earnestly, through abstruction and difficulty. We had only recently learnt the value of political liberty ....Harish Chandra Mukherjee was the soul of this movement."

নীল বিদ্রোহের প্রজ্বলিত আগুন হঠাৎ নিভে যায়নি। নীলচাষ আস্তে আস্তে কমে আসছিল, নীল বিদ্রোহও তেমনি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছিল। অবশ্য সরকার ও নীলকরদের ইচ্ছা ছিল নীলচাষ অব্যাহত রাখা। কিন্তু নীল কমিশনের ত্রুটিপূর্ণ রায় চাষীদের মনোভাব আরও দৃঢ় করে তুললো। তাই শেষ পর্যন্ত ছোট-খাট বিদ্রোহ ঘটেছিল। ১৮৮৯ সালে যশোহর বিজুলিয়া কুঠির অধীন ৪৮ খানা গ্রামের লোক দলবদ্ধ হয়ে নীলের চাষ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। চাষীরা একত্রিত হয়ে নীলকর ড্যাম্বেল সাহেবকে নানাভাবে নাজেহাল করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত এ বিবাদ মিটাবার জন্যে একটি সালিশী কমিটি (Arbitration Committee) স্থাপন করা হয়। এতে প্রজার পক্ষে ছিলেন যদুনাথ উকিল, নীলকরদের পক্ষে জোড়হাট কন্সার্নের টুইডি সাহেব এবং সরকার পক্ষে ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার আলেকজান্ডার স্মিথ্। এ সালিশী কমিটি সবকিছু তদন্ত করে রায় দিলেন যে, প্রতি বাণ্ডিল নীলের মূল্য চার আনার স্থলে ছয় আনা দিতে হবে, নতুবা নীলের চাষ বন্ধ করে দিতে হবে। চাষীদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা চলবে না। ১

অবশ্য এরপর বেশিদিন নীলের চাষ চলতে পারেনি। বিভিন্ন দেশে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কারখানায় নীল তৈরী আরম্ভ হয়েছিল। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে নীলের চাহিদা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। নীলকরগণ বুঝলো এভাবে নীলের চাষ করে আর লাভ করা যাবে না। এরপর তারা একে একে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যায়।

---

১. যশোর-খুলনার ইতিহাসঃ ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৮৭, ৭৮৯।

... বিদ্রোহের আগুন যখন পূর্ণ তেজে জ্বলে উঠছিল তখন ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে বাংলার লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর গ্রান্ট সাহেব কুমার ও কালী গঙ্গা নদীপথে প্রায় সত্তর মাইল পরিভ্রমণ করে নীল বিদ্রোহের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার চেষ্টা করেন।

গ্রান্ট সাহেবের ভাষায়ঃ

"On my return a few days afterwards along the same two rivers, from dawn to dask, as I steamed along there two rivers for some 60 to 70 miles, both banks were literally lined with crowded of villagers, claiming Justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves, the males who stoned at and between the riverside villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliamants for Justice; all were most respectful and orderly, but also were plainly in earnest."১

এ বিষয়ে সুপ্রকাশ রায়ের বর্ণনা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এবং যথার্থঃ

"কুমার নদ দিয়া স্টীমারে চলিয়াছেন বাংলার ছোটলাট গ্রান্ট সাহেব। গোপনতা সত্ত্বেও লাট সাহেবের এই ভ্রমণের কথা চাষীরা জানিয়া ফেলে। সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল জেলায় জেলায়। বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার প্রজা কুমার নদের দুইধারে সারি দিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আজ বোঝাপড়া করিবে বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রধান কর্তা ছোটলাট সাহেবের সংগে। লাট সাহেবের স্টীমার আগাইয়া চলিয়াছে বিশাল নদীর মাঝখান দিয়া। নদীর দুই ধার হইতে হাজার হাজার চাষী দাবি তুলিতেছে, নদীর তীরে লাট সাহেবের স্টীমার ভিড়াইতে হইবে। সমবেত লক্ষ লক্ষ চাষীর ক্রুদ্ধ চীৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিতেছে। লাট সাহেবের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। স্টীমার তীরে ভিড়িল না। দ্রুত চলিতে লাগিল। শত শত ক্রুদ্ধ চাষী নদীর খরস্রোত উপেক্ষা করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লাট সাহেবের স্টীমার তীরে ভিড়াইতে হইবে, চাষীদের দাবী তাহাকে শুনিতেই

১. Minute of Sir I. P. Grants, dt. 17th Sept. 1860.

হইবে। ক্রুদ্ধ চাষীরা যেন লাট সাহেবের স্টীমারখানি ডাঙগায় টানিয়া তুলিবার জন্যই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। চাষীরা লাট সাহেবকে অভয় দিল তাহার জীবনের কোন ভয় নাই। লাট সাহেব অবশেষে নিরুপায় হইয়া স্টীমার ভিড়াইলেন। চাষী নেতাদের নিকট সে স্থানেই তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতে হইল যে, নীলচাষ বন্ধের ব্যবস্থা করা হইবে।"[১]

চাষীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েও গ্রান্ট সাহেব সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারেন নি। শক্তিশালী নীলকর সংঘের প্রভাব এড়িয়ে চাষীদের জন্য তখনই কিছু একটা করার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারলেন না। যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, চাষীদের দাবি অগ্রাহ্য হলে এদেশে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হবে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে সরকারকে। অপরদিকে নীলকররা দাবি তুললো বিদ্রোহী চাষীদের শাস্তি দিতে হবে। গ্রান্ট সাহেব ভবিষ্যতে যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তার ইংগিত দিয়ে নীলকরদের সাবধান করে দিলেন।

নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ঘোষণা করা হল যে, চাষীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক নীলচাষ করান চলবে না। নীলচাষ করবে কি করবে না, তা চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

এই ঘোষণার ফলে চাষীদের জয় ঘোষিত হল। এর পর তেমন ব্যাপকভাবে আর নীলের চাষ হয়নি। অবশ্য যারা চাষীদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করে চলতে পেরেছিল, তারা বহুদিন যাবত নীলচাষ করতে পেরেছিল।

## নীল কমিশন

বাংলাদেশের সর্বত্র যখন নীল বিদ্রোহের পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলো ,তখন বৃটিশ সরকার ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ

১. মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষকঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১২১।

পাঁচজন সদস্য নিয়ে নীল চাষের অবস্হা ও চাষীদের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য নীল কমিশন (Indigo Commission) গঠন করলো। সরকার পক্ষ থেকে সদস্য ছিলেন সীটন্‌কার (সভাপতি) ও আর. টেম্পল, পাদ্রীদের পক্ষ থেকে রেভারেন্ড সেইল, নীলকরদের পক্ষ থেকে রইলেন ফারগুসন ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের (বঙ্গীয় জমিদার সভার) পক্ষ থেকে চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী। জমিদার গোষ্ঠী ও ইংরেজদের স্বার্থ বস্তুত এক, এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই চন্দ্রমোহন বাবুকে মনোনীত করা হয়েছিল। যে রায়তদের কেন্দ্র করেই সকল গন্ডগোলের সূত্রপাত, নিজেদের দাবি পূরণের জন্য উৎসাহিত হওয়ায় যারা ভোগ করল অমানুষিক লাঞ্ছনা, অত্যাচার আর অবিচার, শেষ পর্যন্ত যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করার ফলে বিদেশী বেনিয়া শাসক গোষ্ঠীর শক্ত আসন নড়ে উঠেছিল, সেই রায়তদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হলো না। চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জীই ছিলেন একমাত্র বাঙালী প্রতিনিধি। কিন্তু বাঙালীরা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কারণ চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী না ছিলেন কৃষকদের প্রতিনিধি হওয়ার উপযুক্ত, না ছিলেন শিক্ষিত বাঙালীদের প্রতিনিধি হওয়ার উপযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী অর্থাৎ ইংরেজদের ভাষ্য অনুযায়ী 'নেটিভ' হলেও তিনি নিজেকে 'নেটিভ' বাঙালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা ও চাল-চলনে তিনি ছিলেন খাঁটি ইউরোপীয়। ইংরেজ বিদ্বেষী বলে যে একটা প্রধান পরিচয় ছিল সেকালের বাঙালীদের তিনি ছিলেন তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং তিনি ছিলেন উল্টোটাই, একজন বাঙালী বিদ্বেষী। তাই ১৮৪৯ সালে 'ব্লাক বিল' আন্দোলনের সময় যে একজন বাঙালী ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন, চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জিই হলেন সেই স্বনামধন্য ব্যক্তি।[১]

এ প্রসঙ্গে ১৮৬০ সালের ৯২ই মে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেনঃ

"নীল কমিশনের একটা কর্তব্য হবে জমিদার ও রায়তদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা। নীলকর ও জমিদারদের স্বার্থ এখানে অভিন্ন। চন্দ্রমোহন বাবু নিজে

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১২৯।

একজন জমিদার। কাজেই একথা ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি রায়তদের স্বার্থ সমর্থন করবেন না। তিনি এক সময় দু'বছরের জন্যে একটা নীলকুঠি পরিচালনা করেছিলেন, কাজেই তিনি ওয়াকিফহাল হবেন যে নীলকরদের এ ব্যাপারে অসুবিধা কোথায়।"২

নীল কমিশন ১৮ই মে থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত ১৫ জন সরকারী কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন মিশনারী পাদ্রী, ১৩ জন জমিদার ও ৭৭ জন রায়ত—সর্বশুদ্ধ মোট ১৩৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ২৭শে আগস্ট রিপোর্ট পেশ করেন। মূল রিপোর্টে সই করলেন সিটনকার (সভাপতি), পাদরী সেইল ও চন্দ্রমোহন। টেম্পল এদের সাথে একমত না হয়ে একটা স্বতন্ত্র রিপোর্ট পেশ করলেন। ফারগুসনও তাতে সই করেছিলেন এবং স্বতন্ত্র একটা রিপোর্টও লিখলেন। প্রথম তিনজন এর একটা লিখিত জবাব দিয়েছিলেন।

নীল কমিশনের তদন্তের ফলে নীলকরদের অত্যাচার ও কুকীর্তি যা এতদিন অনেকখানি ছাপা ছিল, তা এবার সরকারীভাবে সমস্ত জগতের সামনে অতি নগ্নরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ল। রিপোর্টে নীল সংক্রান্ত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হল।

প্রজাদের অভিযোগঃ

(ক) তারা স্বেচ্ছায় নীল বপন করে না; যে সময় তারা নিজেদের লাভের কাজে নিযুক্ত থাকতে চায়, সে সময়ে তাদের নীল বপনে বাধ্য করা হয়।

(খ) নীল কাটা ও গাড়ীতে করে কুঠিতে আনা পর্যন্ত সবই বেগারে পরিণত হয়। কুঠির লোক তাদের সবচেয়ে ভাল জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করে। এমন কি জমিতে অন্য ফসল থাকলেও তা নষ্ট করে নীল বুনতে হয়।

(গ) তারা বাধ্য হয়েই নীলকরদের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে এবং সেই ঋণ পুরুষানুক্রমে চলতে থাকে।

(ঘ) কুঠির লোকেরা দাঙ্গা, গুম, কয়েদ, স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অমানুষিক ব্যাপারে ও ঋণে স্বাধীনতা হারিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

২. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত পৃঃ ১২৯।

আর নীলকরদের তরফ থেকে বলা হলঃ

(ক) প্রজাদের উপর নীলকরদের অত্যাচার দেশীয় জমিদারদের শাসন অপেক্ষা বেশী নয়।

(খ) নীলের ব্যাপারে নানা প্রকার অসুবিধা বলেই তাদের জমিদারী করতে হয়।

(গ) সরকারী কর্মচারীদের সন্দিগ্ধতা ও ঈর্ষা, পুলিশের অসাধুতা, আদালতের দূরত্ব ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। দেশীয় প্রজাদের উপকারের জন্যই তো তারা এদেশে পড়ে রয়েছে। সভ্যতা বিস্তার, উন্নতি সাধন ও অত্যাচার দূর করাই তাদের উদ্দেশ্য। তারা এদেশে থাকলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল।

সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণের পর কমিশন যে মন্তব্য করেছিল, তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ

১. নীলকর ও প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণ।

২. প্রচলিত প্রথা যেভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে তার নির্দেশ।

৩. আইন, শাসন ও বিচার বিষয়ে যে সকল পরিবর্তন সম্ভবপর তার নির্দেশ।

চুক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করা হলঃ "স্বেচ্ছায় চাষীরা নীলচাষে রাযী হয় না। দাদন দেওয়া ও চাষীদের চুক্তিতে আবদ্ধ করা—সবই চাষীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়। শুধুমাত্র দাদন নিয়েই চাষী রেহাই পায় না। অতঃপর চাষীকে নীলকরদের ইচ্ছামত নীল বুনতে হয়, নিড়ানি দিতে হয়। গাছ কেটে গাড়ীতে করে কুঠিতে পৌঁছে দিতে হয়। নীল বোনার জন্য নীলকর যে জমিতে দাগ কেটে রাখে, তা হল চাষীদের সবচেয়ে ভাল জমি। এই ভাল জমিতে ধান বা অন্য ফসল বুনলে খুবই ভাল ফসল ফলতো। একবার যে চাষী দাদন গ্রহণ করে তার আর নিস্তার নেই। তার ঋণ সব সময়ই থেকে যায়। একবার যে চাষী নীল বুনতে শুরু করেছে, তাকে এবং তার তৃতীয় চতুর্থ বংশধরকেও নীল বুনতে হয়। বংশ পরম্পরা ঋণের জের চলতে থাকে। বংশধরের কেউ সেই ঋণ শোধ করতে পারে না বা শোধ করতে দেওয়া হয় না। জোর-জবরদস্তি করেই সেই ব্যবস্থা চালু রাখা

হয়। নীলকরদের আমলা-গোমস্তাদের অত্যাচারে তা আরও বিষাক্ত হয়ে ওঠে। নীলকরদের কর্মচারীরা চাষীদের বাঁশ কেটে নেয়, ক্ষেতের ফসল নিয়ে যায়, লাঙল নিয়ে যায়, গরু আটক করে রাখে।

যেসব চাষী নীলকরদের ইচ্ছামত কাজ করতে রাযী হয়নি, নীলকরদের কর্মচারীরা তাদের উপর নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার করেছে, তাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে, লোক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তাদের দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অন্ধকার স্যাঁত-সেঁতে গুদামে আটক করে রেখেছে। স্ত্রীলোকদের উপরও অমানুষিক অত্যাচার করেছে তারা। জমিদারদের সাথেও তাদের গোলমাল হয়েছে। জোর করে তাদের জমি দখল করার ফলে অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মারপিটের ভয় দেখিয়ে কিংবা মারপিট করে জমিদারদের নিকট হতে পত্তনি আদায় করেছে। এভাবে অত্যাচার আর জোর-জবরদস্তিতে তারা জমি দখল করে জমিদার হয়েছে, রায়তদের উপর প্রভাব খাটিয়েছে। জমিদার না হলে এত নীল উৎপাদন করতে পারতো না তারা। এভাবে জোর-জবরদস্তি করে জমি দখল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না; যদি না পুলিশ এত অযোগ্য না হত; আইন এত দুর্বল না হত এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন না করত। ............যেসব জায়গায় নীলের চাষ হয়েছে সেসব জায়গায় কৃষকদের অবস্থার কোন প্রকার উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। ......বর্তমানে কৃষকদের মধ্যে যে অসন্তোষের ঝড় বইছে, তা গত ২০/৩০ বছর ধরে জমাট বাধা ছিল। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ইউরোপীয় কর্মচারী এবং অনেক বেসরকারী রিপোর্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। সর্বোপরি নীলচাষের যে সব ব্যবস্থার কথা এখানে বর্ণনা করা হল তা হচ্ছে নীতিগতভাবে দুরাচারপূর্ণ, কার্যত ক্ষতিকর এবং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ।"১

এ ক্ষেত্রে নীল কমিশন নীলকরদের এদেশে থাকার জন্যে সরকার পক্ষের সুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "দেশের অভ্যন্তরে ইউরোপীয়রা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তাদের এভাবে বসবাস রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত মূল্যবান।

১. Indigo Commission Report : P. 45.

দুঃসময়ে ও সংকট দেখা দিলে সরকারকে নীলকরদের সাহায্য নিতে হবে--অরাজকতা দমন করার জন্য ও অসন্তোষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যে।"১

এই রিপোর্টের অন্যত্র বলা হয়েছে, "গভর্নমেন্টের এ কথা মনে রাখা উচিত যে, দেশের অভ্যন্তরে নীলকরদের বসবাস বিদ্রোহের বিরুদ্ধে একটা Guarantee স্বরূপ, সরকারের শক্তি ও ঐশ্বর্যের একটা উৎস।"২

কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, চিরস্থায়ী প্রথা অনুযায়ী এদেশে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করার মত নীলকরদের এদেশে বসবাস করার এবং জমিদারী করার পেছনেও ইংরেজ সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত একটা উদ্দেশ্য ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোম্পানী সরকারের লাভের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন করে না। এদেশের সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়কে দমন করে রাখার দায়িত্ব একমাত্র নীলকরদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই সরকার নীলকরদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। দেশের আইন তাদের নাগাল পায়নি। দেশের প্রশাসনিক যন্ত্র ছিল তাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকল। কোম্পানী সরকারের এ মহৎ উদ্দেশ্যের কথা দু-চার জন মুৎসুদ্দি শ্রেণীর জমিদার ইংরেজ-দালাল হয়তবা বুঝতে পারেননি তাদের মহৎ স্বার্থসিদ্ধির তাকীদে। কিন্তু এ সত্য যে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার ও বোধগম্য ব্যাপার ছিল এ কথা একান্তভাবে সত্য। তাই যদি না হবে, তবে নীলকরগণ সর্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও কেন তাদের প্রতি কোন প্রকার শাস্তিমূলক বা কৃষকদের জন্য মঙ্গলজনক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো না? এ যেন দু'পক্ষের মধ্যকার সাধারণ একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার মাত্র। আপোষ মীমাংসা হলেই সব শেষ হয়ে যাবে।

১৮১০ সালে দেশীয় প্রজাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে যে ৪ জন নীলকরের অনুমতিপত্র প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তাও সাময়িকভাবে প্রজাদের

১. Indigo Commission Report : P. 21.
২. Indigo Commission Report : P. 6.

খুশী রাখার জন্যে মাত্র। সে সময় গভর্নর জেনারেল সার্কুলার দিয়েছিলেন যে, সামান্য প্রহারের মোকদ্দমা, যা সুপ্রীম কোর্টের উপযুক্ত নয়, তাও গভর্নমেন্টকে জানাতে হবে। ইউরোপীয়গণকে মনে রাখতে হবে যে, এ দেশে থাকতে হলে দেশীয় লোকদের উপর অত্যাচার করা চলবে না। জেলার প্রতিটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপর এ নির্দেশ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ আদেশ বা নির্দেশ কেউ কখনও পালন করেনি বা পালন করার প্রয়োজন বোধ করেনি। অর্থাৎ গভর্নরের আদেশ এবং তা পালনের নির্দেশ সবই ছিল শুধুমাত্র কাগজে-কলমে; এবং পূর্বপরিকল্পিত। শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য সফল হলো না বলেই নীল কমিশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

নীল কমিশনের রিপোর্টের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ছোটলাট গ্রান্ট সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, গত দুপুরুষ যাবত প্রজারা অত্যাচারে জর্জরিত, তারই প্রতিকারের জন্য এ বিদ্রোহ।

মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে গ্রান্ট সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, "পূর্বের কয়েক বছরে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ বেড়েছে। অথচ নীলকরদের প্রদত্ত নীলের দাম এক আনাও বাড়েনি।"

নীল বুনে প্রজারা বছরের পর বছর শুধুমাত্র সর্বাধিক ক্ষতিই স্বীকার করেছে, এক কানাকড়িও লাভবান হয়নি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রান্ট সাহেব বলেছেন, "বাংলার চাষীরা ক্রীতদাস নহে। তারাই জমির প্রকৃত মালিক বা স্বত্বাধিকারী। এরূপ ক্ষতির বিরোধিতা করা তাদের পক্ষে বিস্ময়কর নহে। যা ক্ষতিকর তা করতে বাধ্য করার নামই অত্যাচার। এ অত্যাচারের আধিক্যই প্রজাদের নীল বপনে আপত্তির কারণ।"[১] গ্রান্ট সাহেব স্বচক্ষে চাষীদের দুরবস্থা অবলোকন করার জন্যে কুমার নদ ধরে স্টীমারে ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি চাষীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে, নীলচাষ বন্ধ করে দিবেন এবং এর একটা প্রতিকার করবেন।

---

১. Indigo Commission Report, সাহিত্য পত্রিকা, (কলকাতা) ১৩০৮ বাং, ১২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা হতে উদ্ধৃত।

এরপর নীলকরদের পক্ষ থেকে দাবী তুলে গ্রান্ট সাহেবকে বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লেখা হলে জবাবে গ্রান্ট সাহেব নীলকরদের সতর্ক করে লিখেছিলেন, "শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের যে প্রকাশ আমরা বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে শুধুমাত্র একটা রং সংক্রান্ত বা সাধারণ বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার না ভেবে গভীরতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে যিনি ভাবতে পারছেন না, তিনি আমার মতে সময়ের ইংগিত অনুধাবন করার ব্যাপারে মারাত্মক ভুল করছেন।

আইনের বিপক্ষে নীলচাষের স্বপক্ষে জগতের কোন শক্তিই আর বেশীদিন এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে না। ন্যায়-নীতি উপেক্ষা করে সরকার যদি এমন কোন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করত, তাহলে এক বিপুল কৃষক অভ্যুত্থান বিদ্যুৎ গতিতে সরকারের শাস্তি বিধান করত। আর সে অভ্যুত্থান যে ভারতে ইউরোপীয় ও অন্যান্য মূলধনের পক্ষে সাংঘাতিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারতো তা যে-কোন মানুষের চিন্তার বাইরে।"১

বস্তুত একথা পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হলো যে, নীল বিদ্রোহের ভয়াবহতা দেখে সরকার ভীত হয়ে পড়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র চার বছর পর এমন একটা ব্যাপক বিদ্রোহকে সরকার কোনমতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই এ প্রজ্বলিত আগুন যে কোন প্রকারে নিভানোর পরিকল্পনা নিয়ে নীল-কমিশন গঠিত হয়েছিল। বাংলার অত্যাচারিত কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বা কৃষকদের জন্যে সম্মানজনক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নয় বা নীলকরদের শাস্তি দেওয়ার জন্যেও নয়। তাই যদি না হবে, তবে এত তোড়জোড় হাঁক-ডাক করে নীল কমিশন বসিয়ে, এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র একটা ইশতেহার ছাপিয়েই সব কিছুর মীমাংসা করার পেছনে আর যা-ই থাকুক না কেন, বাংলার চাষীদের প্রতি কোন দরদ বা সহানুভূতি ছিল না। মামুলী একটা ইশতেহার ছাপিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল, (ক) সরকার নীলচাষের পক্ষে বা বিপক্ষে নহে, (খ) অন্যান্য শস্যের মত নীল চাষ

---

১. Parliamentary Papers : Vol. 45th. P. 75, (Quoted from 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'।)

করা বা না করাও চাষীদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, (গ) আইন অমান্য করে অত্যাচার বা অশান্তির কারণ ঘটালে নীলকর ও নীলচাষী উভয়েই দায়ী। শাস্তির হাত থেকে তাদের কেউ রক্ষা পাবে না।১

প্রকৃতপক্ষে সরকার কি সত্যিই নীলকরদের দমন করার জন্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? সরকার 'মোড়ল' সেজে দু'পক্ষের মধ্যকার ঝগড়ার একটা আপোস-মীমাংসা করে দিয়েছেন মাত্র। কৃষকরা বিদ্রোহ করেছে, সরকারের আইন অমান্য করেছে। কৃষকদের সেই অপরাধের (?) কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে জোর গলায় প্রচার করা হলো যে তারা নির্দোষ। তাছাড়া কৃষকদের দমন করার জন্যে হোক বা নীলকরদের সুবিধার জন্যে হোক দেশে আইন আদালতের সংখ্যা বাড়ানো হল। পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হল।২ একথা সত্য যে, নীল কমিশনের তদন্তে সব রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ সবই ছিল চাষীদের স্বপক্ষে। পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত ছিল, "সামগ্রিকভাবে তারা ঘুষখোর ও দুর্নীতিপ্রবণ, একথা অস্বীকার করা যায় না। .........নীলকররা স্বীকার করেছে যে, তারা পুলিশ অফিসারদের দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিয়েছে। ......... সাধারণ পণ্যের মত পুলিশ অফিসারদের কেনা যায়। যাদের পয়সা আছে তারাই এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।"৩

"ম্যাজিস্ট্রেটরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নীলকরদের সাহায্যকারী ও উপদেষ্টা ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটরা রায়তদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে তৎপর বা সচেতন ছিল না। রায়তরা তাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ রক্ষণ বা সহায়তা আশা করেছিল, তা তারা পায়নি। মোদ্দা কথা, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের টান ছিল তাদের স্বদেশী নীলকরদের প্রতি। তাদের তারা (ম্যাজিস্ট্রেটরা) নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতো বা নিজেরা তাদের অতিথি হতো।৪

---

১. যশোহর-খুলনার ইতিহাসঃ পৃঃ ৭৮৪।
২. পূর্বোক্তঃ পৃঃ ৭৮৪।
৩. Indigo Commission Report. Evidence, P.72.
৪. Indigo Commission Report. Evidence, P. 30.

নীল কমিশন ও সরকার পরিস্থিতি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, নীলচাষের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করলে তা আরও জটিল হয়ে উঠবে। ভালো ম্যাজিস্ট্রেট, ভালো জজ, ভালো পুলিশ নিয়োগ করাই হচ্ছে সরকারের কাজ। তারা দেখবেন যাতে সুবিচার হয়। একপক্ষ যাতে অত্যাচার না করে এবং অপরপক্ষ যাতে না ঠকে।"[১] আইন বা সরকার কতখানি দুর্বল হলে এমন হাল্কা অভিমত প্রকাশ করতে পারে তা সহজে বিবেচ্য এবং নীলকরদের প্রতি যে সরকারের পূর্ণ মাত্রায় সমর্থন রয়েছে এ তারই পরিচায়ক।

নীল কমিশনের মত বিরাট একটা প্রহসনের ফলে প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের কোন লাভ হলো না। শুধু তারা এটাই উপলব্ধি করলো যে, কাউকে দিয়ে তাদের কোন উপকার হবে না। তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই তাদের একমাত্র সম্বল। নীল কমিশনের রিপোর্টে তারা সন্তুষ্ট হতে পারলো না। আস্থা রাখতে পারলো না স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের উপর। নীল কমিশনের আলোচনা করতে গিয়ে ১৮৬১ সালের জুন মাসে Calcutta Review লিখলো, "কোন সরকার যখন সার্বজনীনভাবে জনসাধারণের বিরাগভাজন হয় (এবং ভারত সরকার যে ভারতবাসীদের কাছে বিরাগভাজন তা ১৮৫৭ সালেই প্রমাণিত হয়েছে এবং বেসরকারী ইউরোপীয়দের নিকট যে তারা বিরাগভাজন তা কে অস্বীকার করতে পারে?) তাতেই সাধারণভাবে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, গভর্নমেন্ট হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ অন্যায় এবং জনসাধারণের প্রয়োজনে তা অনুপোযোগী ............ আমাদের গভর্নমেন্ট বংশগত, যা বদলায় না এবং যার মধ্যে নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয় না। এ সরকার বাংলাদেশে যা, সমগ্র ভারতবর্ষেও তা। তাদের দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা প্রকাশ পায় তাদের রূঢ় ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে এবং সমস্ত রকমের সংস্কারের প্রতি তাদের অবজ্ঞায়।"[২]

নীলকরদের সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার আর জোর-জুলুমের কথা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের এই কুৎসিত নগ্নমূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ায় তারা এবার

---

১. Buckland : Bengal under the Lt. Governors, 1. P. 256.
২. Calcutta Reveiw : June, 1861.

আরও ক্ষেপে গেল। একটা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তারা হয়ে উঠলো আরও তৎপর। গ্রান্ট সাহেব, সীটনকার, লং সাহেব ও হরিশ মুখার্জি কেউ তাদের আক্রোশ থেকে রেহাই পেলো না।

অপরদিকে নীলচাষীদের বিদ্রোহও চলতে থাকল। তারা ঐ বছর দলবদ্ধ হয়ে হৈমন্তিক নীলের চাষ বন্ধ করে দিল। তাদের দমন করার জন্যে যশোহর ও নদীয়া জেলায় দুই দল পদাতিক সৈন্য পাঠানো হল। দু'খানা রণতরী টহল দিতে থাকল এই দুই জেলার নদীপথে। ক্ষিপ্ত হয়ে চাষীরা শুধু নীলের চাষই বন্ধ করলো না, জমিদার-তালুকদারের খাজনাও বন্ধ করে দিল।১

১৮৬০ সালের নীলচুক্তি আইনের (১১ আইন) দ্বারা চাষীদের দিয়ে জোর করে নীলচাষ করাবার ব্যবস্থা করা হল। এ সময় থেকে চাষীরা সরকারের উপর থেকে সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেললো। তাদের মনের অবস্থা দুঃখজনক ও তিক্ত আকার ধারণ করলো। হাজার হাজার চাষী জেল খাটল। বহু চাষী অন্যত্র পালিয়ে গেল তবুও নীলচাষ করলো না। চাষীদের এ ধরনের দৃঢ় সংকল্পের কাছে সরকারকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হল। সরকার বাধ্য হয়ে ১৮৬৮ সালে 'আট আইন' জারি করে নীলচুক্তি আইন বাতিল করে দিল। নীলচাষ সম্পূর্ণরূপে চাষীদের ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করার পরই চাষীদের উগ্রমূর্তি প্রশমিত হল। এরপর থেকে নীলের চাষ আস্তে আস্তে কমতে থাকল। নীলকুঠি একে একে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। কিছু কিছু নীলকর চাষীদের সাথে আপোষমূলক চুক্তিতে অনেকদিন পর্যন্ত নীলচাষ বহাল রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

অনেক নীলকর বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজে গিয়ে নীলচাষ আরম্ভ করে। ১৮৮২ সালে বাংলাদেশে নীল উৎপন্ন হয়েছিল মোট ৫৮,৫৬৯ মণ। উত্তর প্রদেশ ও অযোধ্যায় উৎপন্ন হয়েছিল ১৫,৭১০ মণ। দোয়াবে ৪৭,০৪২ মণ এবং মাদ্রাজে ৬,১১,০০০ মণ। এসব

১. যশোহর-খুলনার ইতিহাসঃ পৃঃ ৭৮৪।

উৎপন্ন নীলের মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা। মোটকথা এরপর নীলকরগণ বাংলার মাটিতে নীলচাষে আর সুবিধা করে উঠতে পারেনি।১

গ্রান্ট সাহেব নদীপথে ভ্রমণ করে এসে শাসকগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "সরকার যদি ন্যায়নীতি অগ্রাহ্য করে এখনও নীলের চাষ চালাতে থাকেন তবে এর শাস্তিস্বরূপ সরকারকে এক ভয়ংকর কৃষক অভ্যুত্থানের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আর ইউরোপীয় ও অন্যান্য মূলধনের উপর এমন এক বিধ্বংসী আঘাত হানবে যা কেহ কল্পনাও করতে পারে না।"২

গ্রান্ট সাহেবের অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের কৃষকেরা যে ভয়ংকর অভ্যুত্থান ঘটায় তার সামনে নীলকরগণ মাথা তুলে দাঁড়াতে আর সাহসী হলো না। তারা ব্যবসা গুটিয়ে ধীরে ধীরে একের পর এক সরে পড়তে লাগল।

অবশেষে ১৮৮০ সালে জার্মান রাসায়নিক আডলফ্ ফন্ বেইয়্যার রাসায়নিক উপায়ে আলকাতরা থেকে নীল প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। ১৮৯২ সালে সেই নীল বাজারে বের হওয়ার পর থেকে এদেশে নীলের চাষ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। বাংলার চাষীরাও মুক্তি পায় নীলচাষের ভয়ংকর অভিশাপ থেকে।

## নীলচাষ ও রামমোহন-দ্বারকানাথের ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন দেশ জুড়ে একের পর এক অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ভয়ংকর শক্তিতে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে আঘাতের পর আঘাত হানছিল, ঠিক তখনই ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ভূমি-স্বত্বের অধিকারে বলীয়ান জমিদারশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী কৃষক শোষণের ব্যবস্থা আরও পাকাপাকি করার উদ্দেশ্যে এবং ইংরেজ সৃষ্ট শিক্ষিত নব্য সমাজের মঙ্গল কামনায় গড়ে তোলেন 'রিনেসাঁস' নামক নতুন এক আন্দোলন।

১. নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৩৬।
২. Buckland : Bengal under the Lt. Governors, Vol. 1. P. 25.

বস্তুত ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ধনতান্ত্রিক নবযুগের প্রতিনিধি হয়ে এবং তাদের আমল থেকেই কথিত 'রিনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূচনা হয়। যদিও এ নবজাগরণ অত্যন্ত সংকীর্ণ একটা শ্রেণীর মধ্যে এবং প্রধানত নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের বংশধরদের অনেকে পরবর্তীকালে এই নবযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পোষকতা করেন নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে।১

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ঘটে শাসনকার্যের প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক কেরানী সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে। প্রথম থেকেই ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বিশেষ ব্যয়বহুল। সাধারণের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ কেবল অসম্ভব ছিল না, ছিল আকাশ-কুসুম কল্পনা। কাজেই জমিদার শ্রেণীর সাথে সাথে ধনী, ব্যবসায়ী, এবং মধ্যশ্রেণীও এ সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠলো। ইংরেজী শিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা টমাস ব্যারিংটন মেকলে সুদূরপ্রসারী এক উদ্দেশ্য নিয়েই ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল— এদেশের বুকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি শ্রেণী গড়ে তোলা, যারা ইংরেজ শাসকদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে। কোন অবস্থাতেই ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর বিরোধিতা করবে না।

কাজেই নিঃসন্দেহে জমিদার ও শিক্ষিত ধনী মধ্যশ্রেণীর সমাজের সর্বেসর্বা বলে পরিগণিত হল। সীমাবদ্ধ একটা পৃথক সমাজ গড়ে তুললো তারা। গড়ে তুললো পৃথক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক গন্ডী। তারাই জমিদার, তারাই মহাজন। শাসক শ্রেণী তাদের সহযোগিতায় সদা তৎপর। শুধুমাত্র তাদের ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসে সরকারী অর্থব্যয়ে গড়ে উঠলো আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অথচ সামর্থ্য ও সুযোগের অভাবে দেশের শতকরা ৯৮ জনই থাকলো শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত।

মেকলে সাহেবের উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল। সংঘটিত প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রতি জমিদার ও শিক্ষিত

১. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজঃ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৭।

মধ্যশ্রেণীর প্রবল বিরোধিতা এবং ইংরেজ শাসকদের প্রতি তাদের আন্তরিক সমর্থনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেজ শাসকদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বুকের উপর যখন বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ সংঘটিত হচ্ছিল, জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী তখন শাসক গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে এবং বিদ্রোহ দমনের সর্বাত্মক সহায়তায় ব্যস্ত ছিল। তারা সৃষ্টি করলো নতুন সমাজ, নতুন সাহিত্য। তাদের সাহিত্যে স্থান পেলো না নির্যাতিত কৃষকদের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, দুর্দশা ও সমস্যার কথা। থাকলো না তাতে পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানির কোন জ্বলন্ত স্বাক্ষর। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রচারধর্মী লেখার মাধ্যমে ইংরেজ প্রীতির প্রচার অভিযান চালালেন। বঙ্কিম বাবুর সুচিন্তিত অভিমতঃ এ দেশের বুকে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে বা শান্তিতে বসবাস করতে হলে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কিংবা অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কোনো স্পর্শই থাকলো না বঙ্কিম-সাহিত্যে। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই মধ্যশ্রেণীর এই 'রিনেসাঁস' নব-জাগরণ আন্দোলন পূর্ণ বিকশিত রূপ গ্রহণ করলো। মোটকথা, দেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক জনসাধারণকে একপাশে ফেলে রেখেই বঙ্কিম বাবুর মত জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক, রামমোহন রায়ের মত সমাজসেবী এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত জনকল্যাণকামী জমিদার তাঁদের জাতীয় নবজাগরণ গড়ে তুললেন। তাঁদের এই মহান আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি সহযোগিতা ও আপোসনীতি গ্রহণ। কৃষক শোষণ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ়করণ।

১৮৩৩ সালে ইংরেজদের এ দেশে জমি-জমা ক্রয় করে জমিদার হয়ে বসবাস করার ও বাগিচা শিল্প প্রতিষ্ঠা করার অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকার লাভ করার ৫/৭ বছর পূর্ব হতেই জাতীয় আন্দোলনের কর্মকর্তা রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার এবং দালাল বেনিয়ান জমিদার গোষ্ঠী ইংরেজদের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার দেওয়ার ও তাদের অবাধ বাণিজ্য অধিকার প্রকাশ করার জন্যে তুমুল আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এ জন্যে অনেক লেখা-লেখি, সভাসমিতি ও আবেদন-নিবেদন করা হয়েছিল। ইংরেজরা এদেশে এসে

স্থায়ীভাবে বসবাস করলে দেশ ও দশের প্রচুর উন্নতি সাধিত হবে, ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে এদেশের অশিক্ষিত অসভ্য অধিবাসীরা সুসভ্য হবে এমনি একটা ধারণা নিয়েই দ্বারকানাথ-রামমোহন প্রমুখ মহান ব্যক্তি এ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

১৮২৯ সালের ২০শে নভেম্বর ইংরেজ ও ভারতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কলকাতা টাউন হলে সভা করার জন্যে কলকাতার শেরিফের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। এ আবেদনপত্রে ইংরেজদের সাথে যেসব বাঙালী দস্তখত করেছিলেন তাদের মধ্যে রাধামাধব ব্যানার্জি, প্রমথনাথ রায়, রায়চাঁদ বোস, রঘুনাথ গোস্বামী, আশুতোষ দেব, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বড়াল, কাশীনাথ রায়, রামনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায় ছিলেন প্রধান। বলা বাহুল্য, এঁরা সবাই ছিলেন ইংরেজ পদলেহনকারী খয়ের খাঁ। চিরস্থায়ী প্রথার পরম সুযোগেই এঁরা জমিদার হয়েছিলেন। এঁরা ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থা ও মুৎসুদ্দিগিরির ফলেই বিত্তশালী। সেকালের ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাংগালী পরিবারের মধ্যে অধিকাংশই দেওয়ান, বেনিয়ান, সরকার, মুনশী ও খাজাঞ্চির বংশধর। ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর ছিলেন হুইলার সাহেবের দেওয়ান।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর এসব বাংগালী বেনিয়ানরা ছিলেন ইংরেজ সাহেবদের Interpreter, head bookkeeper, head secretary, head broker, Supplier of Cash and Cash-keeper and General cecret-keeper অর্থাৎ অসহায় অন্ধ সাহেবদের যষ্টি-স্বরূপ। বেনিয়ানগিরি করে এঁরা প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের বংশের সকলেই জমিদারী কিনে জমিদার হয়েছেন। হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিস এঁদের নতুন জমিদার হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন সেকালের বনেদী রাজ জমিদারদের উচ্ছেদ করে।। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে তাই করার প্রয়োজন হয়েছিল।[২] কাজেই এদেশে ইংরেজ শাসনকে এঁরা সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাবেন—এ তো তো স্বাভাবিক। এঁরাই উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাঁদের জাতীয় আন্দোলন কখনও বৈপ্লবিক ধারা গ্রহণ করেনি, বরং তা বরাবরই ছিল একটা আপোষপন্থী রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন।

---

১. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজঃ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৬।
২. পূর্বোক্তঃ পৃঃ ৭।

১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে কয়েকজন বাঙালী, ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং মুৎসুদ্দি শ্রেণীর জমিদার গোষ্ঠী যে সভার আয়োজন করেছিলেন তাতে সভাপতিত্ব করেন জন পামার। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হলো যে, ইংরেজরা এদেশে কৃষিকার্য ও অর্থলগ্নি করে বসবাস করতে পারবে। এ অভিপ্রায়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায়সহ কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী ও জমিদার ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর নীলকরদের এদেশে বসবাস ও তাদের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রসংসা করেন এবং তাদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানান।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যান্ডে প্রেরিত স্মারকলিপিতে পরিষ্কারভাবে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। রামমোহন রায় বলেনঃ "নীলকর সাহেবদের সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত প্রকাশ করছি। আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করে দেখেছি, যে অঞ্চলে নীলচাষ হয় তার আশেপাশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় অনেক উন্নততর। হয়ত নীলকরদের দ্বারা এদেশে সামান্য কিছু ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু সরকারী বা বেসরকারী অন্য যারা ইউরোপীয় এদেশে আছেন তাদের যে-কোন অংশের তুলনায় নীলকর সাহেবরা সাধারণ মানুষের অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণ বেশী করেছেন।"১

দ্বারকানাথ ঠাকুর আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

"আমি দেখেছি নীলের চাষ এদেশের জনসাধারণের জন্যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। জমিদারদের উন্নতি হয়েছে, ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকদের বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছে। যে সব অঞ্চলে নীলচাষ হয় নাই, সেসব অঞ্চলের তুলনায় নীলচাষের এলাকার মানুষ অধিকতর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে⋯⋯আমি এসব কথা লোকমুখে শুনে বলছি না, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকেই এসব কথা বলছি।"২

১. Parliamentary Papers, Vol, 45, P. 27.
২. পূর্বোক্ত

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তির সমর্থনে যে স্মারকলিপি প্রেরিত হয়েছিল গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কও তা সমর্থন করেছিলেন। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে অচিরেই তাদের এ আবেদন সমর্থিত হল এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩৩ সালে ইংরেজ বণিকগণকে অর্থাৎ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের বাগিচা শিল্পের দাস পরিচালকগণকে এদেশে জমি ক্রয় করে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হল। ফলে এদেশের বুকের উপর জুড়ে বসল নীলকর নামক একদল ভয়ঙ্কর দস্যু, যাদের অত্যাচার-উৎপীড়নে বাংলাদেশের কৃষক জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নীলকরদের প্রারম্ভের কার্যাবলী লক্ষ্য করে 'সংবাদ কৌমুদী' লিখেছিল যে, নীলকরগণ কৃষকদের ধানের জমি দখল করে সেখানে নীলের চাষ করছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। অপরপক্ষে ধান-চালের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।'

দ্বারকানাথ এর প্রতি উত্তরে ১৮২৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী 'সংবাদ কৌমুদী'-তে 'জনৈক জমিদার' নামে এক চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি নীলকর-দের সমর্থন করে লিখেছিলেনঃ

"গ্রামে যাদের কিছু জমি-জমা আছে বা জমিদারী আছে এবং যারা নিজে তা দেখাশোনা করেন তাঁরা সবাই জানেন যে নিম্ন শ্রেণীর চাষীরা নীলচাষের বদৌলতে কত আরামে কালাতিপাত করছে। পূর্বে যারা জমিদারের জবরদস্তিতে বিনাপারিশ্রমিক বা সামান্য কিছু ধান-চাউলের বিনিময়ে জমিদারদের কাজ করতে বাধ্য ছিল তারা এখন নীলকরদের ছত্রছায়ায় থেকে স্বাধীনভাবে আরামে আছেন। তারা মাসিক ৪ টাকা পারিশ্রমিকে নীলকরদের অধীনে কাজ করছে। কিছু সংখ্যক মধ্যশ্রেণীর লোক আরও উচ্চ বেতনে সরকার গোমস্তা হিসাবে কাজ করছে, অথচ এক সময় এরা ছিল জমিদারদের খেয়াল-খুশীর শিকার।

এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইউরোপীয়দের এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস, চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার ফলে নিম্ন শ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। উৎসাহী হাকিমরা বিভিন্ন সময়ে জমিদারদের নির্দয় ব্যবস্থার বিষয়ে যে সব পত্র সরকার সমীপে

দাখিল করেছে, তাতেই জমিদারদের অত্যাচারের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। যে জমিদাররা শহরে বাস করেন এবং কদাচিত গ্রামে পদার্পণ করেন, তারা জমিদারী দেখা-শোনার সম্পূর্ণ ভার দিয়ে রাখেন তাঁদের ম্যানেজারের উপর। ফলে ম্যানেজারই হয়ে ওঠে প্রকৃত জমিদার। ম্যানেজার জমিদারদের বিশ্বাসের কোন প্রকার মূল্য না দিয়ে নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগের জন্যে প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করে। ম্যানেজারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক প্রজাই নিজেদের জমিজমা ও ঘরবাড়ী ফেলে চলে যায় অন্যত্র। এসব ম্যানেজার তাদের প্রভু জমিদারদের কাছে অভিযোগ জানায় যে, নীলকরদের অত্যাচারে প্রজারা বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এর ফলে প্রকৃত কারণ বিষয়ে জমিদাররা থাকেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে।"১

এ কথা সত্য যে রামমোহন-দ্বারকানাথের জন্মের পূর্ব হতেই বাংলার কৃষক সম্প্রদায় ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এবং জমিদার মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বরাবর সংগ্রাম করে আসছিল। তাই তো সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করার জন্যে ইংরেজদের নিরবচ্ছিন্নভাবে একশ' বছর ধরে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর থেকে সুদীর্ঘ একশ' বছর ধরে দেশের কোন-না-কোন অংশে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং দেখা যায় প্রতিটি সংগ্রামই প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল জমিদার মহাজনের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে এবং পরে তা পরিণত হয়েছিল ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে। কোন কোন সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ কামনা নিয়েই সংঘটিত হয়েছিল। ১৮৩০ সালের তিতুমীরের বিদ্রোহ ও ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ কল্পেই আরম্ভ হয়েছিল।

গ্রাম অঞ্চলে যখন কৃষকদের নেতৃত্বে ইংরেজ ও জমিদারবিরোধী সংগ্রাম চলছিল, তখন রামমোহন রায় কলকাতায় বসে অর্থহীন অসার 'রিনেসাঁস' আন্দোলন নিয়ে মেতে উঠেছিলেন, আর চেষ্টা করছিলেন কি করে এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায়।২ রামমোহন রায় ফরাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে গালভরা বুলি ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ তথা সারা ভারতের বুক থেকে ইংরেজ শাসন ও জমিদার মধ্যশ্রেণীর শোষণ-অত্যাচারের অবসানকল্পে বিপ্লবের কথা

১. সংবাদ কৌমুদীঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮।
২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১৬৬।

বলতে পারেননি। বরং তেমন কোন বিপ্লবের আভাস মাত্র পেলে আশংকাজনক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ রামমোহন রায় সারাজীবন এই একটা শ্রেণী অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীকে সমর্থন করেছেন এবং মঙ্গলজনক যা কিছু করার চেষ্টা করেছেন তা কেবল ঐ শ্রেণীরই উপকারার্থে করেছেন।

বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর History of Political Thought' নামক গ্রন্থে যথার্থ বলেছেনঃ "(রামমোহন) বৃটিশ শাসনের উপকারিতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ভারতীয়গণ যতখানি রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্য, ততখানি আদায়ের জন্য তিনি সিংহ বিক্রমে সংগ্রাম করেছিলেন।.........ইংলন্ডের রাজা ও পার্লামেন্ট এবং ইংলন্ডের সমাজ ব্যবস্থার নায়কদের উদারতা ও সদিচ্ছার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।। তাঁর মতে ইংলন্ড ভারতের পরম মঙ্গলাকাঙ্খী ও মুক্তিদাতা।"১

বারাসাতে তিতুমীরের সংগ্রাম ও কৃষক আন্দোলনের পর ১৮৩১ সালে রামমোহন রায় লিখলেনঃ

"গ্রাম্য কৃষকগণ ও সাধারণ লোকেরা অতিশয় নির্বোধ। তারা পূর্বের ও বর্তমানের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।.........যারা ব্যবসা পত্র করে ধনী হয়েছে বা যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীর মালিক হয়েছে তাদের বুদ্ধি বিচক্ষণতা দ্বারা তারা ইংরেজ শাসনাধীনে থেকে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করতে সক্ষম হবে। আমি তাদের সাধারণ মনোভাব জানি এবং বিনা দ্বিধায় বলতে পার যে, যদি ইংরেজ সরকার তাদের আরও উচ্চতর মর্যাদা দান করেন তবে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাদের আসক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে।"২

এমনকি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্যে যে আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন তাতে তিনি দেশবাসীকে মহামহিম ইংলন্ডেশ্বরের অতি 'বশংবদ প্রজাবৃন্দ' বলে উল্লেখ করেছিলেন।৩

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইংরেজ শাসনের প্রতি রামমোহনের আসক্তি ছিল অচিন্তনীয়। এর বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁর পক্ষে একদিকে যেমন

১. Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১৬৮-৬৯।
২. Rammahon's Works. P. 300.
৩. History of Political Thoughts. Vol, I.

ছিল অসম্ভব, অপরদিকে ছিল একান্তভাবে ক্ষতিকর। তাঁর সমস্ত সদিচ্ছার পিছনে ছিল নিজের এবং একটা বিশেষ শ্রেণীর মঙ্গলচিন্তা। বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং মুৎসুদ্দিগিরির ফলস্বরূপ যারা জমিদার হয়েছিলেন বা যাদের জমিদার করা হয়েছিল, তারা সবাই ইংরেজ সরকারের একান্ত অনুগত। ইংরেজ সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা বা রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নির্ভরশীল ছিলেন তাদেরই উপর। গ্রামের দরিদ্র মুসলমান কৃষক শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ছিল তাদের অত্যাচারের শিকার। পরম জাতীয়তাবাদী ও সমাজসেবী রামমোহন রায়ের কাছে এসব অশিক্ষিত কৃষক ও গ্রাম্য জনগণ ছিল একান্তভাবে অবহেলিত। তাই হয়ত তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য ইংলন্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন প্রবর্তনের নিশ্চয়তার জন্যে ভারতের ধনবান অভিজাত শ্রেণীর মত গ্রহণ অপরিহার্য। আশ্চর্য! তবুও তিনি ছিলেন বঙ্গীয় রিনেসাঁসের প্রধান নায়ক বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা। যে সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীতে আন্দোলন চলছিল, সে সময় রামমোহন রায় দাবী জানালেন যে, একমাত্র ভারতের অভিজাত শ্রেণী বা শিক্ষিত বুদ্ধি-জীবীরাই পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত আইনের আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকারী।[১]

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 'এদেশের কৃষক সম্প্রদায় তথা এদেশের শতকরা নব্বই-জন লোকের সর্বনাশের মূল—একথা অনস্বীকার্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ব্যক্ত করে যে সময় স্যার জন শোর প্রমুখ ইংরেজও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান কামনা করেছিলেন, সে সময় রামমোহন রায় জমিদারী প্রথাকেই আদর্শ ভূমি ব্যবস্থা রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর মতে জমিদারী ব্যবস্থার ফলে একটা শ্রেণী অন্ততপক্ষে সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকতে পারবে কিন্তু রায়তওয়ারী ব্যবস্থার ফলে দেশের শ্রেণী সমান দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।[২] অর্থাৎ দেশের চৌদ্দ আনা লোককে (কৃষক শ্রেণী) শোষণ করার চাবিকাঠি মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের হাতে থাকুক এটাই ছিল রামমোহন রায়ের কাম্য। মোটকথা রামমোহন রায়, দ্বারাকানাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহান জাতীয়তাবাদী নেতার

১. History of Political Thoughts. Vol. I. P. 39.
২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম: পৃঃ ১৭০।

কেউই সাধারণ কৃষিজীবী গ্রাম মানুষগুলোর মঙ্গল কামনা করেননি। বরং এদের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করার কামনায় অনেক কঠিন পথ অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি তাঁরা। মূলত তাঁদের আন্দোলন ও প্রচেষ্টা সর্বাত্মকভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল হিন্দু ভূস্বামী ও মধ্যশ্রেণীর মঙ্গল কামনায়।

রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সামন্ত ভূ-স্বামী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অন্ধ সমর্থক। তাই অনেক সংগুণ ও কর্মস্পৃহা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দুর্বলতা ছিল বিশেষ একটা শ্রেণীর প্রতি। তাঁদের আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ভাব-ধারা ছিল একান্তভাবে অনুপস্থিত। অতিস্বাভাবিকভাবেই তাঁরা নীলচাষীদের অমানুষিক শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করেছিল তাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন প্রগতিশীল ভাব-ধারার বিরুদ্ধবাদী। তাই তো তারা নীলচাষীদের এদেশে স্থায়ীভাবে জমি কিনে বসবাস ও ব্যবসা করার পক্ষে ওকালতী করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ইংল্যান্ড হতে এদেশে লবণ আমদানী করার পরামর্শ দিয়েছিলেন রামমোহন রায়ই, যার ফলে বাংলাদেশের ছয় লক্ষ লবণ কারিগর বেকার হয়ে পড়েছিল; ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এদেশের একটা বিরাট শিল্প।

এই রামমোহন রায়ই ইংল্যান্ডে পার্লামেন্ট কমিশনের নিকট বলেছিলেন যে, ইংরেজ জাতির মত একটা অভিজাত শ্রেণী যদি ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করে তবে তা হবে ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। এবং রামমোহন রায়ের এহেন উক্তির দৃঢ় সমর্থক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এ'দের ইংরেজ তোষণের ফলেই বাংলার চাষীদের ভোগ করতে হয়েছিল অমানুষিক শোষণ, পীড়ন আর অত্যাচার। বুকের রক্ত ঢেলে সংগ্রাম করতে হয়েছিল ইংরেজ শাসক, জমিদার-মহাজন ও নীলকর দস্যুদের বিরুদ্ধে।

প্রমোদ সেনগুপ্ত তাঁর 'নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে "ধর্মে, রাজনীতিতে, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে রামমোহন যেমন নতুন একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার স্রোত বাঙালী জীবনে এনে দিয়েছিলেন, সেই রকম দ্বারকানাথ ঠাকুরও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন।"

নিঃসন্দেহে উপরিউক্ত মন্তব্য সমর্থনযোগ্য। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বিলোপ, শিক্ষার সংস্কার সাধন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি সমাজ ও জনহিতকর কার্যাবলীর দ্বারা ইতিহাসে মহৎ আসন প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এসব হিতকর কার্যাবলীর ফলে লাভবান হয়েছিল কারা? সতীদাহ প্রথা বিলোপের ফলে হিন্দু সমাজ একটা কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। শিক্ষার সংস্কার সাধন করার সুফল ভোগ করেছিল ভূ-স্বামী ও মধ্যশ্রেণীভুক্ত মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক এবং এ শিক্ষা মানে এদেশের শতকরা ৯০ জন নিরীহ সাধারণ লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া। শোষণ-উৎপীড়নের ক্ষেত্রে আরও দক্ষতা অর্জন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনকে আরও শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় করে তোলা। তাঁর আবেদন পত্রে তিনি বলেছিলেন, "প্রজাদের অভাব-অভিযোগ যথাস্থানে পেশ করা সম্ভব না হলে অথবা প্রতিকার না হলে দেশে বিপ্লব ঘটতে পারে। কিন্তু স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র সে বিপদ নিবারণ করতে সক্ষম হবে।"১ অর্থাৎ ভারতে স্বাধীনতার জন্যে যদি কখনও গণ-বিপ্লব বা আন্দোলন দেখা দেয়, তখন তাতে বাধাদানের জন্যেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আবশ্যক।

দ্বারাকানাথ ঠাকুর ছিলেন মূলত জমিদার। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি ইংরেজ-প্রীতির অধিকারী। জমিদারী কায়দাকানুন অর্থাৎ প্রজাদের শায়েস্তা করার কাজে তিনি ছিলেন পাকা-পোক্ত। শুধুমাত্র প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য ১৮৩৬ সালে বিরাহিমপুরে মিঃ রাইস নামক একজন ইংরেজ ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন। ঐ একই সালে শাহাজাদপুরেও মিঃ মিলার নামক একজন ইংরেজ ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, প্রজাদের ঠান্ডা করার কাজে ইংরেজ ম্যানেজারই উপযুক্ত। এ দেশীয় সব জমিদারের মত তিনি প্রজাপীড়নেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।২

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ১৬৯।
২. দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪৯।

ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্য প্রসারে ঈর্ষান্বিত হয়েই তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজদের সমতুল্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ইতিপূর্বে দ্বারকানাথ ঠাকুর সল্টবোর্ডের দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে জুয়াচুরি ও ঘুষের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ঐ একই সময় তিনি অনেক নিলামী জমিদারী সস্তায় কিনে নিয়েছিলেন। এক সময় তিনি ২৪ পরগণা কালেক্টরের সেরেস্তাদার ছিলেন। কাজেই তিনি জানতেন কোন্ জমিদারী কেমন। জমিদারী কেনার হেরফের তাঁর জানা ছিল। সরকারী চাকরি করাকালীন তিনি এক বিস্তৃত জমিদারীর জমিদার হয়ে বসলেন।১ রাজশাহীর কালিগ্রাম, পাবনার শাহাজাদপুর, রংপুরের স্বরূপপুর, দুরবাসিনী, জগদীশপুর ও কটকের সরবারা প্রভৃতি জমিদারী তিনি খরিদ করেন। শিলাইদহতে নীলকুঠি স্থাপন করেন। কুমারখালীতে রেশমকুঠি খরিদ করেন এবং পাবনা, বারুইপুর ও গাজীপুরে চিনির কল বসান। এ ছাড়া কয়লার খনি ও বীমা কোম্পানী চালিয়ে তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। কার ঠাকুর কোম্পানীর মাধ্যমে তিনি তাঁর আয় আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলেন। মোদ্দাকথা, তিনি ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র সফল ব্যবসায়ী। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্রে তিনি কোন অবদান রাখতে পারেননি। আন্দোলন করেছিলেন সমাজের একটা সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্যে। ইংরেজরা যাতে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে এবং দরিদ্র কৃষক জনসাধারণের উপর অবাধে শোষণ উৎপীড়ন চালাতে পারে তারই জন্যে যে পাকাপাকি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তাতে তিনি পরিপূর্ণ সহায়তা করেছিলেন। বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকার ব্যর্থ অনুকরণ করতে গিয়ে এদেশের প্রগতিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

পরিশেষে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, দ্বারকানাথ ও রামমোহন ছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ়করণের একনিষ্ঠ সহযোগী সমর্থক।২

---

১. দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫৭।
২. History of Political Thoughts : Mazumdur, P. 47.

## নীল বিদ্রোহে ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা

নীল বিদ্রোহেই দেশের লোককে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংঘবদ্ধ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিল। তাই এই বিদ্রোহ অন্য যে-কোন বিদ্রোহ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিদ্রোহে একমাত্র নীলচাষীরাই যোগদান করেছিল বটে কিন্তু সত্যিকার-ভাবে এটা ছিল জাতীয় অভ্যুত্থান। সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবন-মরণ সমস্যার প্রশ্ন। যে সমস্ত দাবী ও সমস্যার উপর ভিত্তি করে এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তা শুধুমাত্র চাষীদের সমস্যা ছিল না। মুনাফাখোর নীলকরদের অত্যাচারে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নীলকরগণ চাষীদের ধানের জমি নীল চাষের জন্যে বারাদ্দ করে রাখায় ধানসহ সকল খাদ্যবস্তুর উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। জনসাধারণ ভয়ানক এক খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়। ইংরেজ শোষক ও নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও দুর্নীতি-ব্যভিচারে বাংলার পল্লী অঞ্চল জুড়ে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে যায়। প্রচন্ড দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। দুর্নিবার জ্বালা-যন্ত্রণা আর ক্ষোভ-দুঃখে 'মরিয়ার মুখে মারণের বাণী' সোচ্চার হয়ে উঠলো। এখানে ওখানে খন্ড খন্ডভাবে হাঙ্গামা চলতে থাকলো।

কিন্তু তখনকার শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ব্যস্ত ছিল তাদের অন্যসব সমস্যা নিয়ে। চাকরির, চিন্তা, সমাজ সংস্কারের চিন্তা অথবা ইংরেজ প্রভুদের তুষ্ট করার চিন্তা, এমনি সব চিন্তা ও সমস্যা নিয়ে শিক্ষিত সমাজ তখন এতই ব্যস্ত ছিল যে দেশের বৃহত্তম সমাজ চাষীদের দুরবস্থার কথা নিয়ে চিন্তা করার অব-সর ছিল না তাদের। নীলকরদের অত্যাচার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিশাপ, জমিদার-মহাজনদের শোষণ-পীড়ন এসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করতেন না তারা। তাই শেষ পর্যন্ত একা চাষীরাই বাংলার মাটি হতে নীল-কর দস্যুদের বিতাড়িত করার দায়িত্ব নিয়ে যে বিদ্রোহের আগুন জেলেছিল, তা সমগ্র বাঙালী জাতিকে একটা বিরাট অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। সত্যি-

কারভাবে নীল চাষীরাই জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিল। তাই এদেশে ঘটিত অসংখ্য বিদ্রোহের তুলনায় নীল বিদ্রোহের গুরুত্ব অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিকভাবে একটা কথা সবার মনে আসতে পারে—বাংলাদেশে এ জাতীয় সংগ্রামে অন্য সকল শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল?

শ্রেণীগতভাবে তৎকালীন বাঙালী সমাজকে নিম্নরূপে বিন্যাস করা যায়ঃ (১) শহুরে ব্যবসায়ী, (২) শহুরে জমিদার, তালুকদার ও মহাজন, (৩) গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী, (৪) শহুরে মধ্যশ্রেণী ও (৫) কৃষক।

১. তৎকালে ধনী বলতে একমাত্র শহুরে ও জমিদার শ্রেণীকেই বোঝাত। শহুরে বাঙালী ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ছিল মুৎসুদ্দি ইংরেজদের দালাল। দেশ ও জাতির মঙ্গলকে উপেক্ষা করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের নেশায় এরা ছিল একান্তভাবে আত্মমগ্ন। একটা বিশেষ শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই তাদের সকল চিন্তাধারা প্রবাহিত হত। কাজেই নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের এ সংগ্রামকে তারা ভাবত অন্যায়; তাদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিকূল।

২. জমিদার, তালুকদার ও মহাজন ছিল নীলকরদের মতই স্বার্থপর এবং অত্যাচারী। চাষীদের কাছে এরা ছিল ভয়াবহ আতঙ্ক বিশেষ। স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের দুর্নীতিপরায়ণতার দরুন এদের সৃষ্টি। চাষীদের উপর জোর-জুলুম, অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে ইংরেজ সরকারের দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা এবং ইংরেজ প্রভুদের তুষ্ট রাখা ছিল এদের একমাত্র কাজ। নীলকরদের সাথে এদের স্বার্থগত একটা মিল ছিল। নীলকরদের কাছে উচ্চমূল্যে জমি পত্তনি দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত এরা। কাজেই এরা যে স্বাভাবিকভাবেই নীল বিদ্রোহের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অবশ্য নীলকরগণ যখন জোর খাটিয়ে অনেক জমিদার-তালুকদারের জমি-জমা দখল করতে থাকল, তখন কিছু জমিদার-তালুকদার নীলচাষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এ নিয়ে কোন কোন জমিদারের সাথে নীলকরদের সংঘর্ষও হয়েছিল। কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অধিকাংশ জমিদারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নীলকরদের সহায়তা করেছিলেন। নদীয়ার জমিদার শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিবুল্লাহ হোসেন বিদ্রোহ দমনের কাজে নীলকর লারমুরকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। পাঁড়ার জমিদার দেবনাথ রায়ের চক্রান্তে

তিতুমীরের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছিল। নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেব নীল কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে বলেছিলেন, "প্রত্যক্ষভাবে কোন জমিদারই বিদ্রোহে যোগদান করেননি। তাঁরা ইচ্ছা করলে কৃষকদের অনেক সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু সামর্থ্যের তুলনায় কিছুই করেননি তাঁরা। কয়েকজন জমিদার বিদ্রোহ দমনের কাজে নীলকরদের সাহায্য করেছিলেন।"[১] যশোহরের স্বনামধন্য তালুক-দার শিশির কুমার নীল বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন নীলকরদের সাথে বিবাদের ফলেই। নীলকুঠির সাথে জমি-জমা নিয়ে বিবাদ যখন চরমে পৌঁছলো তখন শিশিরকুমার একরকম বাধ্য হয়েই নীলকর বিরোধী হয়ে উঠলেন।

শিশিরকুমার নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার জন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাকে ধরার জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ শিশিরকুমারকে ধরতে পারেনি। এমন কি যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট ম্যালোনী ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ম্যালোনী স্কিনার শিশির-কুমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু তারা অনুমতি পায়নি।

শিশিরকুমার যশোহর থেকে হিন্দু 'পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকরদের অত্যা-চারের বিষয় নিয়ে রীতিমত চিঠিপত্র লিখতেন। এসব চিঠিপত্রে নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণের অনেক কথা জানা যায়।

১৮৬০ সালের ২৬শে মে তারিখে লিখিত শিশিরকুমারের এক পত্রে জানা যায়ঃ

"যশোহরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট যশোহরের কালোপল থানায় গিয়ে ঘোষণা করলেন যে, তিনি কৃষকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য এসেছেন। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় ৮,০০০ রায়ত একত্রিত হল। স্কিনার প্রথমেই তাদের নীল বুনতে বললেন। কৃষকেরা একবাক্যে তা অস্বীকার করলো। স্কিনার রায়তদের উগ্রমূর্তি দেখে ভীত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত দারোগা প্রসন্ন রায় তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। দারোগার পরামর্শমত বিভিন্ন গ্রাম থেকে মোড়ল শ্রেণীর ৪৯ জন লোককে বাছাই করা হল। বলা হল যে, এরাই রায়তদের পক্ষ থেকে

১. নীল কমিশন রিপোর্ট।

সাহেবের সাথে কথা বলবে। পরে ছল করে থানায় নিয়ে গিয়ে এদের উপর নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার করা হয়। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ৪৫ জন নীল বুনবে বলে একরারনামা দিয়ে মুক্তি পেলো। বাকী ৪ জনকে রাযী না হওয়ায় ৬ মাসের জেলে দেওয়া হয়। দারোগা বাবুর প্রমোশন হয়।"

এমনি আরও কয়েকটি চিঠিতে নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের বহু ছবি দেশবাসীর সামনে তিনি তুলে ধরেন।১

১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ-এ ১১ আইন জারি করে সরকার ঘোষণা করলো যে, যারা চুক্তি ভঙ্গ করবে, নীল বুনবে না তাদের জেলে যেতে হবে।১১ আইনের বদৌলতে হাজার হাজার কৃষককে জেলে যেতে হয়েছিল। পুলিশকে এ ব্যাপারে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সৈন্য আমদানী করা হয়েছিল। কৃষকদের উপর এ সময়ে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় (১৮৬০, ২৯শে ডিসেম্বর) শিশিরকুমার লিখেছিলেন, "যখন অনেক দেশের রাজা তাদের অন্যায়-অত্যাচারের জন্য সিংহাসনচ্যুত হচ্ছেন, তখন আমরা দু'-একজন পুলিশ অফিসারের ভয়ে চুপ থাকতে বাধ্য হচ্ছি। ...... একটা জাতির উপর আরেকটা জাতির অত্যাচার করার কোন অধিকার নেই।"২

শিশিরকুমারের মত একজন শিক্ষিত তরুণ যে নির্ভীক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনি যদি দেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজ নীল বিদ্রোহে সহায়তা করতো, তবে হয়ত চাষীদের দুর্দশার অনেকখানি লাঘব হত।

৩. শহুরে মধ্যশ্রেণীর চেয়ে গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী ছিল অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভয়ংকর ধরনের অর্থ-পিপাসু। এদের সৃষ্টি হয়েছিল স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের জমিদারী প্রথার কল্যাণে। এরা জগদ্দল পাথরের মত কৃষকের বুকের উপর বসে অমানুসিক শোষণ-পীড়ন চালিয়েছিল। নীলকরদের নায়েব-গোমস্তা-কেরানী ছিল এরাই। এরা ছিল নীলকরদের হুকুমের গোলাম। নীলচাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে আর দু'হাতে অর্থ উপার্জন করেছে এরাই।

---

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১০৫।
২. পূর্বোক্তঃ পৃঃ ১৯৭-১৯৮।

এ ছাড়া জমিদাররা অধিকাংশই ছিল শহরবাসী। তাদের জমিদারী চলত নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা আর লাঠিয়ালদের দাপটে। এরা জমিদারের খাজনা এবং নিজেদের দাবীকৃত অতিরিক্ত অর্থের জন্যে কৃষকদের ভিটে ছাড়া করেছে, তাদের হালের গরু বেচে দিয়েছে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মা-বোনদের ইযযত নষ্ট করেছে। কৃষকদের সর্বনাশ করেই এসব গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী আঙগুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মত ধনী হয়েছে। তৈরী করেছে অর্থের পাহাড়।

কুথ্‌বার্ট নামক একজন মিশনারী নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"আমি এমন একজন নীলকুঠির গোমস্তার কথা জানি, যে বেতন পেত অতি সামান্যই। কিন্তু সে বিশ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছিল। এরূপ আরেকজনের কথা জানি, যার মাসিক বেতন ছিল মাত্র ২৫ টাকা। কিন্তু কুঠিতে কাজ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা সঞ্চয় করেছিল।[১] Indigo Field নামক সংবাদপত্র লিখেছিল, কুঠির কর্মচারীরা বেতন পায় অতি সামান্য বা কিছুই পায় না। কিন্তু তারা ছিল জেলার সর্বাপেক্ষা ধনী।"[২]

'যশোর-খুলনার ইতিহাস'-এ নীলকুঠির কর্মচারীদের শ্রেণীগত স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেনঃ

"নীলকুঠিতে কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান, উহার বেতন ৫০ টাকা। সে আমলে উহাই বেতনের উচ্চ হার। নায়েবের অধীনে থাকিতেন গোমস্তা, রায়তদের হিসাবপত্রের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এজন্য উহারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে দস্তুরি বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ দু'পয়সা আয় করিতেন। সাহেবদের অবোধ্য অশ্লীল গালাগালি এবং সময় মত বুটের আঘাত উহারা বেশ হজম করিতে জানিতেন। এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাৎপদ না হইয়া ইহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়া দাঁড়াইতেন।"[৩]

এই ছিল মধ্যশ্রেণীর আসল চেহারা। এই নিম্ন জাতীয় সর্ব... মধ্যশ্রেণী নীল

---

১. Selection from 'Papers on Indigo Cultivation in Bengal'. P. 37.

২. Indigo Field : 21st August, 1858.

৩. যশোর-খুলনার ইতিহাস, ইতিহাস, পৃঃ ৭৬২।

বিদ্রোহের বিরোধিতা করেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস পেয়েছিল। এ'রা, তাদের প্রভু নীলকর বা জমিদারদের রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল এবং চাষীদের যে কোন সর্বনাশে অগ্রণী ছিল। নীল বিদ্রোহের সময় কৃষকদের এদেরও বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

৪. শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণীর ভিতর থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মাইকেল মধুসূধন দত্ত প্রমুখ বহু জ্ঞানী-গুণী পন্ডিত ও সমাজ-কর্মী আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ'রা সমাজের বিভিন্ন দিকে বিশেষ অবদান রেখে আদর্শ স্থাপন করেছিনেল। শিক্ষিত সমাজ চিরদিন তাঁদের কথা স্মরণ করবে। কিন্তু এ'দের কেউই নিজ নিজ গন্ডীর বাইরে যেতে পারেননি। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ নিয়ে এ'রা কেউ মাথা ঘামাননি। তাই বাংলার চাষীকুল স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর সংগ্রাম করে আসছিল, এ'রা পারেননি তাতে অংশগ্রহণ করতে, পারেননি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়তে, পারেননি নীল বিদ্রোহের সংকটময় মুহূর্তে চাষীদের পাশে এসে দাঁড়াতে।

এছাড়া উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, কেরানী বা সাংবাদিক এরা ছিল শহুরে মধ্যশ্রেণীর একটা বিরাট অংশ। এরা যদি সংগ্রামী কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করতো, তা'হলে অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকদের মহৎ উপকার সাধিত হত। নীলকর-দের অনুরোধে প্রচুর ঘুষ খেয়ে পুলিশ হাজার হাজার সংগ্রামী নীল চাষীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। উকিল মোক্তারের অভাবে দরিদ্র চাষীরা সেসব মামলা পরিচালনা করতে পারেনি। কোনো সহৃদয় ডাক্তার এগিয়ে আসেনি আহত সংগ্রামী চাষীদের চিকিৎসার জন্যে। বিনা চিকিৎসায় অনেক চাষী মৃত্যুবরণ করেছে। সাংবাদিকরা তাদের কর্তব্য সঠিক-ভাবে পালন করেনি। নীলকরদের অনেক অত্যাচার কাহিনী, নীলচাষীদের অনেক লাঞ্ছনার কথা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় স্থান পায়নি। মোট কথা, ভয়ংকর এই সংকট মুহূর্তে নীলচাষীরা যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে পর্যুদস্ত, শহুরে মধ্যশ্রেণী ভদ্রসমাজ তখন ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকার।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন মধ্য-শ্রেণীর এক মহৎ ব্যক্তি। এক আশ্চর্যজনক ব্যতিক্রম। নীলচাষীদের সেই ভয়াবহ দুর্দিনে তিনি ত্রাণকর্তার মত এগিয়ে এসেছিলেন। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন পরম বিশ্বান, সমাজ সংস্কারক এবং

জাতীয়তাবাদী, অর্থাৎ শহুরে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর কল্যাণ কামনায় অতিমাত্রায় সক্রিয়। গ্রামের অশিক্ষিত শতকরা ৯০ জন দরিদ্র জেলে, চাষী, কুমারের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি মোটেই প্রসারিত ছিল না। হরিশচন্দ্র ছিলেন এ'দের সবার ঊর্ধ্বে। একজন আদর্শ বিপ্লবী নেতা। দেশ ও সংগ্রামী চাষীদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্রের মত শহুরে মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন না তিনি। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল গ্রাম। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের শতকরা ৯০ জন হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের উন্নতি বিধান এবং ভয়ানক সঙ্কট হতে তাদের উদ্ধার করা। হরিশচন্দ্রই একমাত্র নেতা, যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী আর সুবিধাবাদী ভূস্বামীদের নিয়েই জাতি নয়। সমাজের শতকরা ৯০ জন কৃষকই হল জাতির মেরুদন্ড এবং গ্রামই হল জাতির প্রাণকেন্দ্র। তাই নিপীড়িত চাষীদের সমস্যাই হল সত্যিকার জাতীয় সমস্যা। তাদের সংগ্রামই হল আসল জাতীয় সংগ্রাম। তাই সংগ্রামী পুরুষ হরিশচন্দ্র সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন চাষীদের সংগ্রামে। চাষীদের অস্ত্র ছিল ধর্মঘট, তীর-বল্লম আর লাঠি। আর হরিশচন্দ্রের অস্ত্র ছিল তাঁর শক্তিশালী লেখনী এবং অফুরন্ত মনোবল।

তখনকার দিনে আরও পত্র-পত্রিকা ছিল। 'সংবাদ প্রভাকর', 'সোমপ্রকাশ' 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড', 'ভাস্কর' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা কেবলমাত্র দূর থেকে সমবেদনা প্রকাশ করেই পরম কর্তব্য পালন করেছিল। কিন্তু হরিশচন্দ্রের 'পেট্রিয়ট' সত্যিকার সংগ্রামী তেজ নিয়ে চাষীদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। পূর্বে বলেছি যে, চাষীদের কল্যাণে হরিশচন্দ্র নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কার্পণ্য করেননি।

যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের ভাষায়, "নীল হাঙ্গামার সময় হরিশচন্দ্রের গৃহ অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময় প্যাট্রিয়টের নিয়মিত খরচ চালাইয়া তাহার বেতনের যা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তৎসমুদয়ই নীলচাষীদের সেবায় ব্যয়িত হইত।"[১]

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশচন্দ্রের তেজোদ্দীপ্ত জ্বালাময়ী লেখায় নীলকর দস্যু ও স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকার অস্থির হয়ে উঠেছিল। কোন প্রকারে

১. ভারতের মুক্তি-সন্ধানী: যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৮১।

হরিশচন্দ্রকে জব্দ করার পথ খুঁজছিল তারা। এ সময় কৃষ্ণনগরের কৃষক-কন্যা হরমণিকে হরণ করল কুলছিকাটা নীলকুঠির ছোট সাহেব আর্চিবল্ড হিলস। হরিশচন্দ্র হরমণি হরণের কাহিনী জোরদার করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। হিলস দশ হাজার টাকা খেসারত দাবী করে হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করল।

পূর্বেই হরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। এ সময় নিদারুণ অর্থকষ্ট ও মানসিক যাতনায় ১৮৬১ সালের জুন মাসে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে হঠাৎ হরিশচন্দ্র মারা গেলেন। নীলকরগণ এবার হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। খেসারতের দায়ে পুলিশ বিধবার বাড়ী ক্রোক করল। নিরুপায় হয়ে হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নী এক হাজার টাকা ঋণ করে কোন প্রকারে দায়মুক্ত হলেন।

হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীর সেই চরম দুর্দিনে কলকাতার সমাজসেবী ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্য হতে একটা লোকও এগিয়ে আসেনি। অথচ কত বড় বড় মহীপাল ছিলেন তখন কলকাতায় নীলকর বন্ধু ও ইংরেজ সরকারের সহায়তায়। সামান্য একজন বিধবার সহায়তায় একটা লোকও এগিয়ে আসেনি সেদিন। নীলকর দস্যুরা যখন অসহায় বিধবাটির উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছিল তখন সামান্য একটা মুখের কথা দিয়েও কেউ চেষ্টা করেনি তাঁকে সাহায্য করার। এমনকি যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের হরিশচন্দ্র ছিলেন একজন বিশিষ্ট সভ্য, সেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনও এগিয়ে আসেনি। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাই অতি দুঃখ করে লিখেছিলেনঃ

"হিলস-এর পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন। হরিশের বিধবা পত্নীর পেছনে কেউ ছিল না। এ দেশীয়দের মধ্যে সে একতা কোথায়?"[১]

আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক সমাজসেবী, দেশ-হিতৈষী, স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা দেশ ও দশের অনেক উপকার সাধন

---

১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজঃ শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২২৩-২৪।

করেছেন। কিন্তু সাধারণ মধ্যশ্রেণী হতে আগত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সবার আদর্শ। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ যখন নীল বিদ্রোহের বিরোধিতা করে আসছিল, নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করার মত যখন এ দুর্ভাগা দেশে একটা প্রাণীও সাড়া দেয়নি, তখন সংগ্রামী পুরুষ হরিশচন্দ্র নীলচাষীদের সংগ্রামে সাহায্য করে দেশ ও জাতির যে উপকার সাধন করেছেন, তার তুলনা এদেশের ইতিহাসে আর আছে কিনা সন্দেহ।

হরিশচন্দ্রের মত রেভারেন্ড লঙ সাহেবও ছিলেন কৃষকদের দরদী বন্ধু। তাই হরিশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে এবং লঙ সাহেবের কারাদন্ডের ফলে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল তা ফুটে উঠেছে গ্রাম্য কবির গানেঃ

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলো ছারখার
অসময়ে হরিশ মলো
লংয়ের হলো কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

মধ্যশ্রেণী হতে আগত আরেকজন নির্ভীক পুরুষ ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ খান। যদিও সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আবদুল লতিফ খান নীল চাষীদের কোন উপকার করতে পারেননি। সংগ্রামী নেতা বা সমাজসেবীও ছিলেন না তিনি, তবুও একজন নির্ভীক সরকারী কর্মচারী হিসাবে চিরদিন তিনি পরিচিত থাকবেন।

১৮২৮ সালের মার্চ মাসে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে খান বাহাদুর নওয়াব আবদুল লতিফের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কাযী ফকির মোহাম্মদ ছিলেন কলকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন আইন ব্যবসায়ী। কথিত আছে যে, আবদুল লতিফের পূর্ব-পুরুষ আবদুর রসুল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ফতেহাবাদ, চাকলা ও ভূষণার (বর্তমান ফরিদপুর জেলা) কাযীর পদ লাভ করেন এবং সম্রাটের কাছ থেকে কিছু জমি লাখেরাজ প্রাপ্ত হন। তখন থেকেই কাযী পরিবার রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা। আবদুল লতিফের পিতা কাযী ফকির মোহাম্মদ একজন বিত্ত ব্যক্তি ছিলেন।

আবদুল লতিফ কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগ থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেকালে মুসলমানদের পক্ষে ভাল চাকরি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। তাই প্রথম জীবনে নিরুপায় হয়ে আবদুল লতিফ সিন্ধুর জনৈক আমীরের ব্যক্তিগত সহকারীর চাকরি গ্রহণ করেন। এক বছর পরে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এরপর কিছুদিন তিনি মিঃ স্যামুয়েলের কেরানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কলকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো এরাবিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ সালে বাংলার ডেপুটি গভর্নর স্যার হার্বার্ট মেডক তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল করেন। অবসর গ্রহণের পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

আবদুল লতিফ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনি 'খান বাহাদুর' কিংবা 'নওয়াব' প্রভৃতি উপাধি পেয়েছেন— এসব আবদুল লতিফের সত্যিকার পরিচয় নয়। নির্ভীক বিচারক ও সমাজসেবক এবং উনবিংশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন একগুঁয়ে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কাজে তাঁর যে অপরিমেয় অবদান রয়েছে, সেখানেই তাঁর সত্যিকার পরিচয়। কলকাতা মাদ্রাসা সংস্কার, মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপন, হিন্দু ছাত্র অধ্যুষিত হুগলী কলেজের কবল থেকে মহসীন তহবিল মুক্ত করা, বেকার মুসলিম আলিমদের জন্য ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের পদ সৃষ্টি, শিক্ষা কমিশনে সাক্ষ্য দান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা হতে মুসলিম বিদ্বেষযুক্ত পুস্তকসমূহ বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা এবং আরও বহু জনহিতকর আইন-কানুন প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি বহু ব্যাপারে আবদুল লতিফের যে অবদান তা অবিস্মরণীয়।

তৎকালে অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম পরিবারের অনেকেই উর্দু ভাষার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং উর্দু ভাষাতেই তাঁরা কথাবার্তা বলতেন। নওয়াব আবদুল লতিফের পরিবারেও উর্দুর প্রচলন ছিল। তবুও বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা যে বাংলা একথা তিনি স্বীকার করেন এবং বাংলা ভাষাকে মুসলমানদের শিক্ষার

মাধ্যম করার সুপারিশ করেন। বাংলা ভাষার মধ্যে দুরূহ সংস্কৃত শব্দাবলীর মিশ্রণের তিনি বিরোধিতা করেন। কারণ তা সাধারণের বোধগম্য নয়। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে তাঁর উদার মতবাদ ছিল। কলিকাতায় মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৮৯৩ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত নওয়াব আবদুল লতিফ স্মৃতি বার্ষিক সভায় বক্তৃতাদানকালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলেছেনঃ

"We all admire the great work of Sir Syed Ahmed the Anglo Oriental College at Aligarh ......... but before Sir Syed Ahmed was on the field, Abdul Latif was there, exhorting, supplicating, entreating, earnestly appealing to his co-religionists to give their sons English education if they wanted to hold their own in competition with Hindus."

নীল দস্যুদের অত্যাচারের মুকাবিলায় আবদুল লতিফের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি আবদুল লতিফকে নবগঠিত মহকুমা কালারোয়ায় (বর্তমান সাতক্ষীরা) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বদলী করেন।

সে সময় জিগারগাছা ও পাঁচপুরা কুঠির কুঠিয়াল হেনরী ম্যাকেনজী নীল চাষীদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করতে থাকে। চাষীরা আবদুল লতিফের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করল। একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে এ ব্যাপারে আবদুল লতিফের নীরব থাকারই কথা, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত থাকতে পারেননি। নীলচাষী আসানউল্যা মন্ডল, জাকের মন্ডল ও তোতাগাজী প্রভৃতির অভিযোগ অনুযায়ী তিনি নীলকর ম্যাকেনজীর কৈফিয়ত তলব করেন এবং পুলিশ পাঠিয়ে নীলকর লাঠিয়ালদের হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তিনি ম্যাকেনজীকে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দেন যে, তোমার কোন অভিযোগ থাকলে আদালতে নালিশ পেশ করতে পার, কিন্তু নিরীহ চাষীদের উপর এ ধরনের নির্মম অত্যাচার করার কোন অধিকার নেই তোমার।

ম্যাকেনজী গভর্নরের কাছে আবদুল লতিফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জানায় যে, আবদুল লতিফের মত ম্যাজিস্ট্রেট থাকলে আমাদের কাজের ভয়ানক অসুবিধা হয়।

গভর্নরের সেক্রেটারী মিঃ গ্রে এই অভিযোগ অনুযায়ী নদীয়া বিভাগের কমিশনার মিঃ বিডওয়েল-এর কাছে তদন্ত ও বিচারের জন্য সুপারিশ জানালেন। কিন্তু বিডওয়েল কোন প্রকার তদন্ত না করেই আবদুল লতিফকে বদলী করে তদস্থলে পাঠালেন বাবু কিশোরীকুমার মিত্রকে।

এ ব্যাপারে ১৮৯৩ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের Reis & Rayyet-এর মন্তব্যঃ

"…. Next January he (Abdul Latif) promoted by Lord Dalhousie in his capacity of Governor of Bengal, to a higher grade and placed in charge of the newly formed Sub-Division of Kalaroa, in the same District, which was afterwards called the Sub-Division of Satkhira, now in Khulna. There he at once showed his mettle, for it was the young Deputy Magistrate of Kalaroa who laid the seeds of the emancipation of the peasantry from slavery to Indigo. He was removed, but without a stain."

উল্লেখিত মন্তব্য অনুযায়ী নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের ক্ষেত্রে আবদুল লতিফের ভূমিকা যৎসামান্য নয়। ইংরেজ সরকারের বেতনভুক কর্মচারী হয়েও আবদুল লতিফ দেশপ্রেম ও জাতীতাবোধ যে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেননি, এ তারই উজ্জ্বল প্রমাণ। একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সে যুগে এভাবে নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করা ছিল অতিশয় দুঃসাহসের কাজ। অতিশয় সত্যানিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সমাজদরদী, দেশপ্রেমিক ও নির্ভীক না হলে এ ধরনের সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

# সাহিত্যে নীল বিদ্রোহ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তন্মধ্যে নীল বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। এ বিদ্রোহে বাংলাদেশের পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক যে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিল তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল। নীল বিদ্রোহের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষকরা যে সাংগঠনিক ও নৈতিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিল তা আর কোন দেশের কৃষকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। দরিদ্র, অশিক্ষিত, রাজনৈতিক জ্ঞান-বর্জিত ক্ষমতাশূন্য এবং নেতৃত্বহীন হয়েও তারা এমন এক ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল, গুরুত্বে ও মহত্বে যা যে কোন দেশের সামাজিক বিপ্লবের তুলনায় মোটেই তুচ্ছ নয়। গুরুত্ব ছাড়াও এর একটা রাজনৈতিক মূল্যবোধ ছিল। এমন সুস্পষ্ট পরিণতি এ দেশে সংঘটিত অন্য কোন বিদ্রোহে দেখা যায়নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসকরা যখন জমিদারী প্রথা প্রচলনের মাধ্যমে বাংলার চাষীদের উপর একটা স্থায়ী শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করলো, তখন থেকেই কৃষকরা এর বিরুদ্ধে একটা আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল। এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম থেকে যখন জমিদারের সাথে সাথে নীলকর দস্যুরাও নিরীহ চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকলো, চাষীরা রুখে দাঁড়ালো। তারা আর সহ্য করতে পারলো না ঔপনিবেশিকতার ভয়ঙ্কর গুরুভার। শুরু হল দেশের সর্বত্র প্রচন্ড সংগ্রাম। সামন্ত প্রথা আর ঔপনিবেশিকতার মূলে এমন ঐক্যবদ্ধ প্রচন্ড আঘাত এর আগে আর আসেনি। তাই নীল বিদ্রোহকে বাংলার প্রথম সার্থক স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত করা যায়। শহুরে দালাল, মুৎসুদ্দী ও মহাজন জমিদার শ্রেণীর কয়েকটা লোক ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। তাই এ সংগ্রাম বাংলার সকল গণমানুষের সংগ্রাম।

নীল বিদ্রোহ স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা এক ভয়ঙ্কর গণবিদ্রোহ। এ জাতীয় বিদ্রোহ আপন গতিপথে এমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে যে, তা কোন নেতৃত্বের ধার ধারে না। বিদ্রোহী কৃষকদের গণ-নেতৃত্বেই এটা সংগঠিত হয়েছিল। বাইরের ধার করা বা সর্বজনস্বীকৃত কোন নেতার প্রয়োজন হয়নি।

নীল বিদ্রোহের মূল কারণ—অর্থনৈতিক শোষণ-উৎপীড়ন। একদিকে উৎপীড়ক শাসক, অপরদিকে ভয়ংকর নীলকর দস্যু এই দ্বিমুখী উৎপীড়ন ও শোষণে চাষীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকার রব উঠলো। মার খেতে খেতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকলো তখনই নিরুপায় নিরীহ চাষীকুল ঐক্যবদ্ধ হয়ে কঠিন সংগ্রামের শপথ নিল। সর্বগ্রাসী সঙ্কটের মুখে এ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হল। সুপ্রকাশ রায় যথার্থ বলেছেনঃ বঙ্গদেশের কৃষক সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম বাঙ্গালীকে জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে দীক্ষা দিয়াছিল, জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ দেখাইয়াছিল এবং সমগ্র দেশের সম্মুখে জাতীয়তাবাদের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।"[১]

শিশির ঘোষ মোহাশয় বলেছেন, "এই নীল বিদ্রোহই' সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছিল। বস্তুত বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।"[২]

সবচেয়ে বড় কথা বিনা নেতৃত্বে চাষীদের সংঘবদ্ধ শক্তি ও স্বতস্ফূর্ত জাতীয় চেতনাবোধই চাষীদের এ সংগ্রামে দীক্ষা দিয়াছিল এবং অসাধারণ বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও অভাবনীয় ঐক্যই তাদের সংগ্রামে জয়ী করেছিল। শুধু বাংলাদেশে "নীলদর্পণ' তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৬০ সালে নীল কমিচিরদিন স্মরণ করার মত।

সর্বকালে সর্বদেশে এ জাতীয় গণ-বিদ্রোহের পর রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে একটা নূতন যুগের সূচনা দেখা দেয়। এদেশের কৃষক সমাজ চিরদিনই নিরক্ষর। তাই তাদের পক্ষে এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু নীল বিদ্রোহের স্বাভাবিক গতির টানে সমাজের কিছু

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৩৩৮।
২. Amritabazar Patrika: 22 May, 1874. (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)।

সংখ্যক প্রগতিশীল ব্যক্তি বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও গতিবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নীল বিদ্রোহের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে নীল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কিছু সৃষ্টি না হলেও যে অতুলনীয় সম্পদ আমরা পেয়েছি, পৃথিবীর ইতিহাসে তা তুলনাহীন। নীল বিদ্রোহের হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ, সংগ্রাম ও যন্ত্রণার উপর ভিত্তি করেই 'নীলদর্পণ' নামক বিখ্যাত নাটক রচিত হয়েছিল। আমেরিকার দাসপ্রথাকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস "Uncle Tom's Cabin" যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বাংলা দেশে 'নীলদর্পণ' তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৬০ সালে নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিন পরই দীনবন্ধু মিত্রের এ যুগান্তকারী নাটক প্রকাশিত হয়। এর আগে বাংলাদেশের কৃষকের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও আপোসহীন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য গ্রাম্য কবিয়ালদের কিছু কিছু ছড়া ও কবিতা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিল।

বাংলাদেশের কৃষকেরা চিরদিনই নিরক্ষর। বিশেষ করে চাষীদের শতকরা ৮০ জনই যেখানে মুসলমান, সেখানে শিক্ষার প্রশ্নই অবান্তর। কারণ পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের দারুণ অসহযোগ চলতে থাকে। ফলে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করাকে তারা বিশেষ ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত এমনি অসহযোগ চলতে থাকে ইংরেজদের সাথে। সব ছেড়ে তারা কৃষিকেই আঁকড়ে ধরে থাকলো। তাদের মূল উপার্জন ছিল কৃষিকাজ। অর্থনৈতিকভাবে এরা ছিল শোচনীয়-ভাবে দরিদ্র। মহাজনের দেনার দায়ে জর্জরিত। না খেয়ে মরবে তবুও ইংরেজের গোলামী করবে না। সুযোগ পেলে ইংরেজের টুটি চেপে ধরবে, সহযোগিতা করবে না। কাজেই শিক্ষা যেখানে নেই, সেখানে সাহিত্য সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী জমিদার শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বরাবরই ছিল ইংরেজ শাসক ও অত্যাচারী নীলকরদের সমর্থনপুষ্ট। এরা বরাবরই চেষ্টা করেছে সংগ্রামী চাষীদের দাবিয়ে রাখার। শুধুমাত্র কয়েকজন প্রগতিশীল সহৃদয় ব্যক্তি চাষীদের সংগ্রামী মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে

আসেন। তাঁদেরই কেউ কেউ বিদ্রোহের গতিবেগ, ব্যাপকতা ও সাফল্য দেখে সাহিত্য সৃষ্টি করারও চেষ্টা করেন. দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন তেমনি একজন দরদী মানুষ।

১৫০ টাকা বেতনের পোস্টমাস্টার দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন একজন কর্মঠ ও পরিশ্রমী মানুষ। সুদক্ষ কর্মচারী হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম ছিল। পোস্ট অফিসের কাজ নিয়ে তাঁকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হতো। নদীয়া ও যশোহর জেলায় তিনি অনেকদিন কর্মরত ছিলেন। সে সময় নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন নিজ চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। পোস্ট অফিসের কাজে যেখানে সংকট সৃষ্টি হতো সেখানেই ডাক পড়তো দীনবন্ধু মিত্রের। অথচ পরিতাপের বিষয় যে, একমাত্র 'রায়বাহাদুর' খেতাব ছাড়া ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আর কোন পুরস্কারই পাননি তিনি। প্রথমদিকে বিরোধিতা করলেও পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'নীলদর্পণ' ও দীনবন্ধু মিত্রের অনেক প্রশংসা করেছেন। নীল দর্পণকে কেন্দ্র করেই দীনবন্ধু মিত্রের সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "দীনবন্ধুর যেরূপ কার্যদক্ষতা ও বহুদর্শিতা ছিল তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক পূর্বেই পোস্টমাস্টার জেনারেল হইতেন এবং কালে ডাইরেক্টর জেনারেল হইতে পারিতেন।......পুরস্কার দূরে থাকুক শেষ অবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"১

দীনবন্ধু মিত্র যখন ঢাকায় পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখনই সর্বপ্রথম ১৮৬০ সালে নামহীন অবস্থায় 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয় এবং সে বছরই সর্বপ্রথম ঢাকায় মঞ্চস্থ হয়। বর্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ সেখানেই মঞ্চ তৈরি করে প্রথম রাত্রিতে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। নাটকখানি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে এক বছরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। কলকাতায় 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ হয় ১৮৬২ সালে।

---

১ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড। পৃঃ ৮২৭।

"বাংলাদেশের পেশাদারী নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়েই শুরু হয়। 'নীলদর্পণ' কেবলমাত্র সাধারণ মানুষ নিয়ে প্রথম নাটক হয়, তা জনসাধারণের জন্যও প্রথম নাটক। নীলদর্পণে যারা অভিনয় করতেন, তাঁদের সব সময় পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয় থাকত।"১

১৮৭২ সালে অর্ধেন্দু মুস্তাফিসহ কয়েকজন মিলে কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে টিকিট বিক্রি করে 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করেন। এর আগে কলকাতায় যেসব নাটক মঞ্চস্থ হত তাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবলমাত্র ধনী ব্যবসায়ী, জমিদার ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরাই নিমন্ত্রিত হয়ে তাতে যোগদান করতেন।

গিরিশচন্দ্র 'নীলদর্পণের' লেখক দীনবন্ধু মিত্রকে বাংলার রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্র 'নীলদর্পণে' অভিনয় করেন নি। ১৮৭৩ সালে টাউন হল মঞ্চে তিনি সর্বপ্রথম নীলদর্পণে অভিনয় করেন।

'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখার সময় উত্তেজিত হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় Mr. Rogue-এর ভূমিকায় অভিনয়কারী অর্ধেন্দু কুমার মুস্তাফিকে লক্ষ্য করে চটি জুতো খুলে মেরেছিলেন। অর্ধেন্দু বাবু সেই চটি জুতো মাথায় তুলে বলেছিলেন, এটাই "আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।" বিদ্যাসাগরের এই চটি জুতো সেদিন ছিল নীলকরদের বর্বরতার বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদের প্রতীক।"

লক্ষ্মৌতে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হওয়ার সময় একদল ইংরেজ টমী নগ্ন তলোয়ার নিয়ে মঞ্চে ধাওয়া করেছিল। অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "এক রাত্রি লক্ষ্মৌ নগরে ছত্রমন্ডিতে আমাদের নীল-দর্পণ অভিনীত হইতেছিল। সেই দিন লক্ষ্মৌ নগরের প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। যে স্থানে রোগ্ সাহেব ক্ষেত্রমণির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, তোরাপ দরজা ভাঙ্গিয়া রোগ্ সাহেবকে মারে, সেই সময়ে নবীন মাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়া চলিয়া যায়। একে তো 'নীলদর্পণ' পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে মতিলাল সুর তোরাপ, অবিনাশ কর মহাশয় মিস্টার রোগ্ সাহেবের অংশ অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেছিলেন।

১ নীলদর্পণের ভূমিকাঃ পৃঃ ১৭।

ইহা দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পড়িল এবং একজন সাহেব দৌড়িয়া একেবারে স্টেজের উপর উঠিয়া তোরাপকে মারিতে উদ্যত হইল।"১

নীলদর্পণ' নাটকের ক্রমবর্ধমান জনসমাদর দেখে ১৯০৮ সালে ইংরেজ বিদ্বেষী ও রাজদ্রোহী এই অজুহাতে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এ কথা সত্য যে, 'নীলদর্পণ' প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন, তারা যে কোন ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। প্রকাশনার দায়ে লং সাহেব কারারুদ্ধ হলেন। সীটনকার অপদস্থ হইলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করেছিলেন, একথা প্রথমে কারও জানা না থাকলেও পরে জানাজানি হয়ে যায় এবং তাঁর জন্য তাঁকে কম কথা শুনতে হয়নি। এমনকি তাকে সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী ত্যাগ করতে হয়েছিল।২ কারণ তখনকার তথাকথিত মধ্যবিত্তরা 'নীলদর্পণ'কে ভাল চোখে দেখেন নি। এসব মধ্যবিত্তরা ছিল বিদেশী শাসক ও নীলকরদের কেনা গোলাম। কৃষকেরা যখন বিদেশী শাসকের স্বৈরাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করে যাচ্ছিল, তখন এসব ধনী মধ্যবিত্তরা স্বেচ্ছায় অর্থের লালসায় বিদেশীদের দালালী করছিল, লুন্ঠন ও অত্যাচারে বিদেশীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছিল। তারা অর্থবান ব্যবসায়ী, ধনী মহাজন বা জমিদার হয়েছিল এমনি দুষ্কর্ম করেই। স্বদেশী ভাইদের মাথায় লাঠি মেরেই তারা বিদেশীদের প্রিয়ভাজন হয়েছে। কাজেই এদের কাছ থেকে কোন প্রকার প্রগতিশীল ভূমিকা আশা করা বৃথা। তাই এরা বিদেশীদের সাথে হাত মিলিয়ে নীলদর্পণের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছে। মধ্যবিত্তের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে প্রমোদ সেনগুপ্ত বলেছেন, "তথাকথিত মধ্যবিত্তরা ছিল বিদেশী বণিকদের কতগুলি ঘৃণ্য কেনা গোলাম ক্রীতদাসের চাইতেও অধম। নীলকররা কৃষকদের জোর করে ভূমিদাস করে ফেলেছিল। কিন্তু কৃষকরা তার বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ত, নিজেদের স্বাধীন করার চেষ্টা করত, বিদেশীদের লুণ্ঠন কাজে ও নিজের

---

১. 'আমার কথা' ১৩১৯, পৃঃ ২৯ ; (নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ হইতে গৃহীত, পৃঃ ১১৭)।

২. বঙ্কিম রচনাবলীঃ ২য় খন্ড, পৃঃ ৮২৬।

দেশের লোকের উপর অত্যাচারে বিদেশীদের সাহায্য করত ও এই প্রকার দুষ্কর্ম করে কিছু টাকা ও সম্পত্তি করত। এদের দ্বারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কোন প্রকার প্রগতিশীল কার্যই সম্ভবপর ছিল না।'[১]

এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যসেবীও নীলদর্পণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন নীলদর্পণের প্রচার বন্ধ করে দিতে। পরে অবশ্য 'নীলদর্পণ'-এর অভাবনীয় জনপ্রিয়তা দেখে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নীলদর্পণের সমস্ত ঘটনাই বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় যশোহর ও নদীয়া জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে যা যা দেখেছেন, তাই তুলে ধরেছেন 'নীলদর্পণ' নাটকে। অবশ্য বিরাট যে কৃষক বিদ্রোহ চলছিল সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে তার চিত্র 'নীলদর্পণ'-এ অনুপস্থিত। এমনকি যে নীল বিদ্রোহ নিয়ে এ নাটক, সে বিদ্রোহের চিত্রও স্থান পায়নি তাতে। শুধুমাত্র শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত দু'একটা চাষী পরিবারের চিত্রই ফুটে উঠেছে তাতে। তবু ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণে এ নাটক অভাবনীয়।

দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন মধ্যশ্রেণী হতে আগত প্রগতিশীল উদার মনের অধিকারী। তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বাংলার চাষীরাই বাংলার প্রাণ। বাংলার মানুষ মানে বাংলার চাষী। এরাই বাংলাদেশের প্রকৃত জনসাধারণ। চাষীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দীনবন্ধু মিত্রের মনের গভীরে আঘাত হেনেছিল বলেই তিনি এমন একখানা নাটক লিখতে পেরেছিলেন। 'নীলদর্পণ'-এর ভূমিকা লেখক শশাঙ্ক শেখর বাগচী মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়, "ভদ্র সমাজে যাহাদের সুখ-দুঃখের কথা এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, গল্প-উপন্যাস-নাটকে যাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম 'নীলদর্পণ'-এ তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছেন। কৃপা করিয়া নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়া, খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন সাধারণ নরনারীর ভাবে ভাবিত হইয়া তাহাদের আঘাত প্রত্যাঘাত মথিত হৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন।"[২]

---

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজঃ পৃঃ ১১৬।
২. নীলদর্পণ (ভূমিকা)ঃ পৃঃ ১৭।

'নীলদর্পণ'-এর ক্ষেত্রমণিই নীলকর আর্চিবল্ড হিল কর্তৃক অপহৃত নদীয়ার মাথুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ হরমণি। ১৮৬০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী আর্চিবল্ড হিল এবং তার সহযোগী ৩০ জন লোক হরমণি যখন একলা পুকুরে জল আনতে যাচ্ছিল, তখন তাকে জোর করে কচিকাটা কুঠিতে নিয়ে যায়। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার দোষীদের নামধাম উল্লেখ করে ঘটনা সত্য বলে রিপোর্ট করার পর ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল মোকদ্দমা নাকচ করে দেন। ম্যাজিস্ট্রেট কারণ দর্শালেন যে, ইতিপূর্বে মাথুর বিশ্বাস রাজীনামা লিখে দিয়েছিল যে, সে কোন মামলা করবে না। তাছাড়া ধর্ষণের গল্পটা একটা বানানো গল্প।১ এমন একটা প্রমাণিত সত্যকেও হার্সেল সাহেব অস্বীকার করে গেলেন, কারণ নীলকররা তার দেশীয় ভাই। তাছাড়া হার্সেল সাহেব সাহস করলেন না নীলকরদের বিরুদ্ধে যেতে।

শুধুমাত্র ক্ষেত্রমণি নয়। 'নীলদর্পণ'-এর প্রতিটি চরিত্রেই বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। 'নীলদর্পণ'-এর ননী মাধব ও বিন্দু মাধব এদের মত চরিত্রের অভাব ছিল না বাস্তবে। চৌগাছার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাসের সাথে এদের তুলনা করা চলে। তোরাপ ও রাইচরণ বাস্তবের বাইরের লোক নয়। প্রমোদ সেনগুপ্তের ভাষায়, "তোরাপ ও রাইচরণ উভয়েই অশিক্ষিত কৃষক। দুটি চরিত্রই বাস্তব। এরাই ছিল নীল বিদ্রোহের প্রতীক। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তোরাপ একটি অপূর্ব চরিত্র। নাট্যকারের সৃষ্টি-নৈপুণ্যে তোরাপের চরিত্র 'নীলদর্পণ-এ সর্বত্রই সব থেকে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।"২

নীলকররা যে কেবলমাত্র লুন্ঠন শোষণই করতো তা নয়। ক্ষেত্রমণি বা হরমণির মত বহু সর্বনাশ করেছে তারা। তা জোর করেই হোক আর অর্থের প্রলোভনে ভুলিয়েই হোক। 'নীলদর্পণ'-এ অঙ্কিত চিত্র সাধুচরণের মেয়েকে দেখে নীলকর আমিনের উক্তিঃ এ ছুঁড়িত মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে লুফে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারী পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব...।'

১. Indigo Commission Report, Appendix No, 12
২. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১১৪

নীলকররা জঘন্য চরিত্রের লোক এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে মানুষ নিজের পদোন্নতির জন্যে আপন বোনকে সাহেবের হাতে তুলে দিতে পারে, সে যে কত বড় নির্লজ্জ জঘন্য চরিত্রের হতে পারে তা-ই ফুটে উঠেছে 'নীলদর্পণ'এ। বস্তুত এ ধরনের স্বার্থপর জঘন্য চরিত্রের লোকেরাই ছিল সাহেবদের দালাল, খয়ের খাঁ। এমনি অপকর্ম করেই তারা হয়েছে অনেক টাকার মালিক। এবং এমনি করেই অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হল এবং আবির্ভাব ঘটল তথাকথিত মধ্যবিত্তের।

একথা সত্য যে সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ বাংলার মানুষের মনে একটা সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল, যার ফলে পরবর্তীকালে অনেক প্রগতিশীল সাহিত্য রচিত হয়েছিল। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক উপন্যাসে মীর মোশাররফ হোসেন নীলকর শোষিত ও অত্যাচারিত গ্রাম বাংলার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নীলকর অত্যাচারের একখানা দলিলী গ্রন্থ। কুষ্টিয়ার অত্যাচারী নীলকর টি,আই, কেনীর সাথে সুন্দরপুরের জমিদার প্যারী সুন্দরীর বিবাদ, অসংখ্য প্রজার সর্বনাশ, মামলা-মোকদ্দমা কুট-কৌশল আর ষড়যন্ত্র এই গ্রন্থের মূল উপাখ্যান।

শেষ দৃশ্য বর্ণনায় দেখা যায়, নিলাম হয়ে গেল অত্যাচারী কেনীর জমিদারী ও কুঠিবাড়ী। রোগাক্রান্ত হয়ে স্ত্রীর হাত ধরে কেনী আশ্রয় নিল কলকাতায়। মীর মোশাররফ হোসেন নীল বিদ্রোহ ও নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করেছেন। অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁরই রচিত 'জমিদার দর্পণ' নামক গ্রন্থ জমিদারদের অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নকশা'য় সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তরা যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল এবং নীলকরদের সময় ইংরেজ আইন আদালতের যে জঘন্য অবস্থা ছিল তাই তুলে ধরেছেন বিদ্রূপের কষাঘাতের মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্যে এমন একখানা গ্রন্থ সত্যিই অতুলনীয়। মধুসূদন দত্তের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' নাটকে অত্যাচারী জমিদারের জঘন্য চেহারা ও হিন্দু-মুসলমান কৃষকের একত্রিত সংগ্রামের রূপ ফুটে উঠেছে।

'নীলদর্পণ'-এর দু'বছর আগে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে টেকচাঁদ ঠাকুর নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

'নলীদর্পণ' ছাড়া নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়ন নিয়ে গ্রাম্য কবিদের লেখা বহু পল্লীগাথা ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে লোকের মুখে মুখে। সে সব লেখা একত্রিত করে সুধী সমাজে তুলে ধরতে পারলে সাহিত্যের একটা নতুন দিক উন্মোচিত হত। সাহিত্যকর্ম হিসাবে সে সব পল্লীগাথা মোটেই অবহেলার নয়।

হরিশচন্দ্রের অকাল মৃত্যু ও লঙ সাহেবের কারাবরণ নিয়ে লেখা গ্রাম্য গাথাঃ

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলো ছারখার,
অসময়ে হরিশ মলো
লঙের হল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

পাদ্রী ও নীলকরদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশঃ

জাত মাল্লে পাদ্রী ধরে
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে
ব্যাড়াল চোখে হাঁদা হেমদো
নীলকুঠির নীল মেমদো।

শহুরে মধ্যশ্রেণীর নিষ্ক্রিয়তা ও পৌরুষহীনতা দেখে বিদ্রোহী চাষীদের পরিহাসঃ

মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি
রইল সব হুদোর আঁটি।
কোলকাতার বাবু ভেয়ে
এল সব বজরা চেপে
লড়াই দেখবে বলে।

**গ্রাম্য কবির লেখা নীলের গানঃ**

মুল্লুকের গুড়াগুড়ি, কবিতার শুরু করি
যা করেন গুরু
শুন কুঠালের সমাচার, কালিদহে কুঠি যার,
ক্যানি সাহেব ক্যাজার কলু শুরু।
সে আউসের জমিতে বোনে নীল
সব রায়তের হল মুস্কিল
সব রায়তের মনে অবিস্তর,
দিলেতে পাইয়া ব্যথা, নালিশ করে কলিকাতা
দরখাস্ত দিল তিন সায়াল,
দরখাস্তে হল স্পষ্ট, লাট সাহেব হল ব্যস্ত
বাঙ্গালাতে পাঠাল গরনাল,
গরনাল এলো বাংলা পরে, ধুমাকালে নৌকা চলে
বলব কি সে নৌকা সাজের কথা।
তার দুই পাশে দুই চাকা ঘুরে—
চলে কেবল আগুন জোরে,
গোলই বাঁধা সোনা।
তার পাছা নায়ে নিশান গাড়া ধুমাকালে নস্কার জোড়া
মধ্য নায়ে যান ব্যস্ত পুরী
দোহাই ধর্ম-অবতার, তুমি কর সুবিচার
ঝাপ দিল সব ইছামতি জলে।
* *
তাডাযোর ছোট বাবু, কুঠাল দেখে বড়ই কাবু
ফরিদপুর সে দিয়াছে ইজারা,
**বড় তরফ বনওয়ারী লাল**, যার ডঙ্কা চিরকাল,
সাহেব মারে কল্ল ছারখার,
যে পুন্যা করে জ্যৈষ্ঠ মাসে, আম লাগাল সব চতুর্পার্শে
আগে বাঁধে লাঠির আগায় ফুল।[১]

---

১. রাজশাহীর ইতিহাস। শ্রীমঙ্গল সরকার নামক কবির দলে সরকার কর্তৃক রচিত।

এসব গ্রাম্য-গাথা ও গানে ফুটে উঠেছে নীল হাঙ্গামার খণ্ড খণ্ড চিত্র, রয়েছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনার ইংগিত। গ্রাম্য কবিদের এসব লেখাকে সাহিত্যের আসন হতে দূরে সরিয়ে রাখার ফলে ঘটনার অনেক মূল্যবান সূত্র নষ্ট হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে আরো কবিতা আর গান।

দেশীয় অনেক গণ্যমান্য সুধী মহাজন নীল বিদ্রোহের সমর্থনে বিমুখ থাকলেও ভিন্ন সমাজের বিদেশী বহু ব্যক্তি নীল বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। ব্রিটিশ মিশনারীদের কয়েকজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে এর সমর্থন যুগিয়েছিলেন। রেভারেণ্ড জেমস লং ছিলেন এদের অন্যতম। তিনি নীল বিদ্রোহের দ্বারা এতই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, তিনি নীলদস্যুদের অত্যাচার ও শোষণের ভয়ংকর রূপ উদঘাটিত করে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকায় তিনি নীল বিদ্রোহের বহু গান ও কবিতা সংকলিত করে-ছিলেন। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এ পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল।

নীল বিদ্রোহের সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা না বলে পারছি না। নীলদস্যুরা এ দেশের চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। সমগ্র দেশ জুড়ে হাহাকার উঠেছে নীলকরদের শোষণ-পীড়ন আর অত্যাচারে। সংঘ-টিত হয়েছে একটা বিরাট বিদ্রোহ। রচিত হয়েছে 'নীলদর্পণ'। লেখা হয়েছে অনেক কবিতা আর গান। তবুও একটা প্রশ্ন জাগে—এদের মধ্যে কি একটা লোক ভাল ছিল না? ছিল না কি কারও মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ববোধ, কিম্বা কোন সৎগুণ?

জোড়াদাহ কুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে হঠাৎ একটা নতুন জিনিস আমার দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠেছিল। জঙ্গলের মধ্যে আগাছায় ঢাকা একটা কবর দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। তথ্য সংগ্রহ করে জানলাম, জোড়াদাহ কুঠির ম্যানেজার ম্যাকডোলেন মনিয়ারের মায়ের কবর এটা। কবরের গায়ে লেখা রয়েছেঃ

Weep not friends and Children dear,
I am not dead, but sleeping here.

As you are now, once was I
As I am now, so you shall be,
Prepare for death and follow me.

এ যেন কোন মরমী ঋষির বাণী। সংসার-ত্যাগী কোন জীবনদর্শীর সতর্ক সংকেত! জীবন আছে, তার পাশে আছে মৃত্যু। এ যেন কোনমতেই, কোন অবস্থাতেই ভুলবার নয়। খোঁচা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেঃ ওরে বৎস, আমার মৃত্যুতে কেঁদে কি হবে? তোকেও যে মরতে হবে। তোরই মত গর্বে-বুক উঁচিয়ে একদিন আমিও চলেছি। আজ শুয়ে আছি কবরের অন্ধকার গহ্বরে। ওরে মূঢ়, তোকেও যে একদিন এমনি করে শুয়ে থাকতে হবে কবরে। সাবধান। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

সাহিত্যের চুলচেরা বিচারে উপরের পাঁচটি লাইনের কি কোন মূল্য নেই?

মনে হয়, অনেক খারাপ আর অসুন্দরের মধ্যেও কিছু একটা সুন্দর ছিল। অনেক মন্দের মধ্যেও একজন ভাল ছিল।

## লঙ সাহেব

'নীলদর্পণ'-এর কথা বলতে গেলে সবার আগে বলতে হয় পাদরী রেভারেন্ড জেমস্ লঙ-এর কথা। সাধারণের কাছে তিনি লঙ সাহেব নামেই পরিচিত।

'নীলদর্পণ' নিয়ে এত যে হৈ চৈ মামলা মোকদ্দমা, তার মূলে রয়েছেন লঙ সাহেব। রেভারেন্ড লঙ রুশ দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪০ সালে পাদরী হয়ে তিনি আসেন ভারতে। প্রথম থেকেই তিনি এ দেশে সমাজ উন্নয়ন ও মানব দরদী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন সত্যিকার পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লেখা পুস্তকে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ ছাপ রয়েছে।

নীল বিদ্রোহের সমর্থনে বিদেশীদের মধ্যে যাঁরা পরম দরদ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন লঙ সাহেব ছিলেন তাঁর মধ্যে অগ্রণী। তিনি নীলকরদের অত্যাচার-

উৎপীড়নের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং নীলকরদের শোষণের ভয়ংকর রূপ উদ্‌ঘাটিত করে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে সে পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল। নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও শোষণ নিয়ে গ্রামে গ্রামে যে সব গান ও কবিতা রচিত হয়েছিল সে সব গান ও কবিতা সংগ্রহ করে তিনি তাঁর পুস্তিকায় স্থান দিয়েছিলেন।

নীল বিদ্রোহের লেলিহান শিখা প্রশমিত করার শুভ পরিকল্পনায় তখন নীল কমিশন বসেছে। এমন সময় একদিন লর্ড সাহেবের হাতে এসে পড়ল দীনবন্ধু মিত্রের এককপি 'নীলদর্পণ'। ইংরেজী পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পড়ে এতদিন তিনি নীলহাঙ্গামা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করে আসছিলেন। 'নীলদর্পণ' পড়ে তিনি অবাক হলেন। ভুল ভাঙলো তাঁর। বাংলা সরকারের সেক্রেটারী সীটনকার ছিলেন একজন উদার প্রজা-দরদী ব্যক্তি। লর্ড সাহেব এই সীট-কারের সাথে আলাপ-আলোচনা করে 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৬১ সালে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে এক রাত্রির মধ্যে 'নীলদর্পণ'-এর অনুবাদ-কার্য শেষ করেন এবং রেভারেন্ড তা প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থে নাট্যকার বা অনুবাদক কারও নাম থাকলো না। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পাঁচশ' কপি পাঠানো হল বেঙ্গল অফিসে এবং বিলেতে বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে। বিলেতে যাঁরা এই বই হাতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন গ্লাডস্টোন, রিচার্ড করডেন ও জন ব্রাইট প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজী অনুবাদ বাজারে বের হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজ ভীষণভাবে ক্ষেপে উঠলো। নীলকর সমর্থক পত্রিকা 'ইংলিশ-ম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা' সর্বশক্তি দিয়ে লর্ড-এর পেছনে লাগল। অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা' নামক পত্রিকা দুটো হাজার টাকার বিনিময়ে নিরীহ প্রজাদের নীলকরদের অত্যাচারের মুলে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এ ছাড়া কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে নীলকর পত্নীদের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। যার ফলে ম্যাজিস্ট্রেটরা অন্যায়ভাবে নীল-করদের সমর্থন করতো—এ সব কথাও বলা হয়েছিল।[১]

১. প্রবাসী—১৩৫৬, কার্তিক সংখ্যা।

প্রথমে নীলকর বা ঐ দুটো পত্রিকার কেউ অনুবাদ 'নীলদর্পণ'-এর খবর জানতো না। বিলেতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পার্লামেণ্ট সদস্যদের যে কপিগুলো পাঠানো হয়েছিল তাতে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের সীল মারা ছিল। বাংলার বাইরে অন্যান্য স্থানেও ইংরেজী 'নীলদর্পণ' পাঠানো হয়েছিল। ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে লাহোর হতে এক কপি ইংরেজী 'নীলদর্পণ' কলকাতার নীলকর সমাজের মুখপাত্র ল্যান্ডহোল্ডারস এন্ড কমার্শিয়াল এসোসিয়েশন অব্ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত হল। তখনই সবাই জানতে পারল ইংরেজী 'নীল-দর্পণ'-এর খবর। এরপরই সর্বত্র একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সে সময় বাংলা সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন ই. এইচ. ল্যাসিংটন। নীলকর এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সরকারের সেক্রেটারীকে এক পত্র মারফত জানান হলো যে, এমন একখানা মানহানিকর নয়। তথাপি ছোটলাটের অনুপস্থিতিতে এবং বিনা অনুমতিতে ১৮৬১ সালের ৩রা জুন ল্যাসিংটন জবাবে জানালেন যে, পুস্তকখানা আদৌ মানহানিকর নয়। তথাপি ছোট লাটের অনুপস্থিতিতে এবং বিনা অনুমতিতে এরূপ করা ঠিক হয়নি। অসাবধানতা ও ভ্রমবশত এই সীল দেওয়া হয়েছে।

নীলকরদের তরফ থেকে 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা' এ নিয়ে আন্দো-লন শুরু করল।

পুস্তকে প্রকাশকেরও নাম ছিল না। শুধুমাত্র মুদ্রাকর হিসাবে নাম ছিল ক্লেমেণ্ট হেনরী ম্যানুয়েলের এবং ক্যালকাটা প্রিণ্টিং এন্ড পাবলিশিং প্রেসের। প্রকাশকের নাম না পেয়ে ম্যানুয়েলের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হল। ভাল মানুষ লঙ এবার আর চুপ থাকতে পারলেন না। কোর্টে হাযিরা দিয়ে জানা-লেন যে, ম্যানুয়েলের কোন দোষ নেই। সে মুদ্রাকর মাত্র। প্রকাশক হিসাবে সমস্ত দায়িত্ব আমার। ম্যানুয়েলকে ১০ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হল।

নীলকরদের সমস্ত রাগ পড়ল এবার পাদরী লঙ-এর উপর। সুপ্রীম কোর্টে লঙ-এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হল। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেক্রেটারী উইলিয়াম ফ্রেডারিক ফার্গুসন এবং সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে 'ইংলিশ-ম্যান' সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেট বাদীরূপে দাঁড়ালেন। ১৮৬১ সালের ২০শে জুন লঙ সাহেব স্বীয় বক্তব্য পুস্তিকা আকারে পেশ করলেন। পুস্তিকায় লঙ সাহেব বাংলা ভাষার জন্য কি কি করেছেন এবং ইংরেজদের মধ্য থেকে কোন্

তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, 'ভারতীয় আইন সভায় দেশীয় সদস্য
তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, 'ভারতীয় আইন সভায় দেশীয় সদস্য থাকলে সিপাহী বিদ্রোহ আদৌ ঘটতো কিনা সন্দেহ আছে।' বলা বাহুল্য, স্যার সৈয়দ আহমদও একদা একথা বলেছিলেন।

লঙ সাহেব বলতে চেয়েছিলেন যে, দেশীয় লোকেরাই দেশবাসীর মনোভাব ভালভাবে বুঝতে পারে। শাসন ব্যাপারে দেশবাসীর মনের প্রতিক্রিয়া তারা আগে থাকতেই জানতে পারত। তাতে সরকার সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেতেন। বিদেশী শাসকগণ বাংলা জানেন না, কাজেই বাঙালীর মনের ভাব বা প্রতিক্রিয়াও তাঁরা বোঝেন না। নীলকরদের অত্যাচার কোন্ কোন্ এলাকায় হচ্ছে এ খবরও তারা রাখেন না।১ লঙ-এর এ বিবৃতির ফলে ইউরোপীয়দের মনে কোন পরিবর্তন হল না। বাঙালীরা লঙকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। যথারীতি মামলা চলতে থাকল। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার আউল্ড ওয়েলস-এর এজলাসে মামলা রুজু হল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে এদেশীয়দের সাথে ইউরোপীয়দের মনের গরমিল শুরু হয়েছিল। ইউরোপীয়রা অন্তরে অন্তরে এদেশের মানুষের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করে আসছিল। বিচারপতি ওয়েল্স-এর মনের বিদ্বেষভাবও ধরা পড়ল। বিচার চলাকালে তিনি প্রকাশ্যভাবে বাঙালীদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করেছিলেন। ১৮৬১ সালের ১৯, ২০ ও ২৪শে জুলাই—এই তিন দিন ধরে মামলা চলছিল। মামলা চলাকালে সরকারী কর্মচারী, ইংরেজ ব্যবসায়ী, নীলকর, পাদরী ও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রত্যহ কোর্টে হাযির থাকতেন। ২৪ জন জুরীর মধ্যে ১৭ জনই মামলায় হাযির ছিলেন। তন্মধ্যে কলকাতার বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী ও দাতা রুস্তমজী কাওয়াসজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মানকজী রুস্তমজী ব্যতীত আর সবাই ছিলেন ইউরোপীয়।

---

১. "I solemnly declare that I know nothing more important for the future security of Europian in India and the welfare of the country than that all classes of Europian should watch the barometer of the native mind. I feel strongly that peace founded on the contentment of the native population is essential to the welfare of India and is folly to shut our eyes to the warnings the native press may give."
(প্রবাসী কার্তিক ১৩৫৬ঃ যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত প্রবন্ধ)

কোন ব্যক্তি বিশেষকে মানহানি করেন নি বলেই লঙ-এর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা আনা সম্ভব হয়নি। তাই ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছিল। নীলকরদের পক্ষে প্রসিকিউটার ছিলেন পেটারসন ও কাউই এবং লঙ-এর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন এগলিংটন ও নিউমার্চ। লঙ-এর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল ঃ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে লঙ ছিলেন সাংঘাতিক রকমের অপবাদের প্রচারক।

পেটারসন বলেছিলেন, "লঙ এদেশীয় ইউরোপীয়দের পেছন থেকে ছুরি মেরেছেন, যে ছুরি তিনি বহুদিন থেকে অন্ধকারে বসে বসে শানিয়েছেন। তিনি ইংরেজদের পশুর চেয়েও নীচু স্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। স্বদেশকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। আমরা এদেশে সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলন্ত অবস্থায় আছি। ভারতে অবস্থান যে আমাদের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তা কি সিপাহী বিদ্রোহের পরও আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি?"১ পেটারসন অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন 'নীলদর্পণ'-এর লেখক ও অনুবাদকের নাম জানার জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লঙ তাও প্রকাশ করেন নি।

এগলিংটন লঙ-এর পক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন যে, 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরার' সম্পাদকরা ভাড়াটিয়া লেখক। লাভের জন্যই তারা লেখে।

জেরার সময় 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি বাৎসরিক ১০০০.০০ টাকা নীলকরদের কাছ থেকে পেতেন।২ 'হরকরা'র সম্পাদক তো মাত্র দেড় বছর আগেও নীলকর ছিলেন। এগলিংটন আরও বলেছিলেন, যদি 'নীলদর্পণ' মানহানিকর হয়ে থাকে তবে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলিও মানহানিকর বলে ধরে নিতে হবে। মলিয়ের (Maliere)-এর বইগুলো হল ডাক্তার ও পাদরীদের বিরুদ্ধে লেখা; ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট' ওয়ার্ক হাউস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, 'নিকোলাস নিকোলবী' ইয়র্কশায়ারের স্কুলগুলোর

---

১. "Had we not seen by what tender thread we hang? Have not the late mutinies taught us how unsafe is our position?" Indigo Mirror, edited by Sudhi Pradhan, P. 124.

২ Indigo Mirror. P. 130.

বিরুদ্ধে এবং 'আঙ্কল্ টমস কেবিন' হল আমেরিকার দাস প্রথার বিরুদ্ধে লেখা। অথচ এসব বইয়ের কোনটার বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা আনা হয়নি।[১]

কিন্তু এগলিংটনের এ বক্তব্যকে বিচারকগণ আমল দেননি। ওয়েলস সরাসরিভাবেই নীলকরদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এবং বাঙালীদের একচোট গালাগালি দিয়ে মনের ক্ষোভ মিটিয়েছিলেন।

২৪শে জুলাই বিচারের শেষ দিন। বিচারপতি বার্নেস পীকস ও স্যার মরডান্ড ওয়েলস লঙ-কে কিছু বলার সুযোগ দিলেন। জুরীদের রায়ের পূর্বে ইচ্ছা করেই তাঁকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। লঙ প্রথমে 'নীলদর্পণ' প্রকাশের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন.; পরে বললেন, একজন পাদরী হিসাবে শান্তির পথ দেখানো কি আমার কর্তব্য নয়? ভারতের জনসাধারণের মঙ্গলের খাতিরে শান্তি স্থাপনের জন্যে একটা কিছু করা কি আমার কর্তব্য ছিল না? এশীয়দের অভিযোগ শুনে বা অন্যভাবে সংগৃহীত তথ্যাবলী হতেই আমি এ কর্তব্য করেছি। আমি বলছি সামনে বিপদ রয়েছে আমার স্বদেশবাসীদের মঙ্গলার্থে বা তাদের নিরাপত্তার খাতিরে তাদের মনে ব দিয়েই আমি তাদের এ বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।......মিউ টিনি শেষ হয়েছে। কে জানে ভবিষ্যতে কি হবে?"[২]

---

১. "If this was a libel, the finest literature of ancient and modern times must be shut out. Look at Maliere's works: they are but a series of venomous caricatures of the clergy and medical profession—Oliver Twist, for example, which was written with the sole Intent and purpose of doing away with the work-house-system as formerly carried out; it had been successful. Another work by the same author Nicholas Nickleby was intended to expose and crush the abuses in Yorkshire schools. Were any legal proceedings instituted against Mr. Dickens?" —Indigo Mirror, edited by Sudhi Pradhan, P. 144.

২. Indigo Mirror : P. 175.

'নীলদর্পণ' ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী প্রীতির অপরাধে লঙ-কে শাস্তি দেওয়া। এগলিংটন বেশ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, মানহানির জন্যে এ মামলা হয়নি, এর উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। 'নীলদর্পণ'-এর মত বই-এর প্রকাশনা নিয়ে নীলকররা মোটেই চিন্তিত ছিল না। যদি তাই হতো তবে বাংলা 'নীলদর্পণ' যখন বের হয়েছিল তখনই মামলা দায়ের করতে পারতো। যদি 'নীলদর্পণ' দ্বারা নীলকরদের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তা হয়েছে বাংলা 'নীলদর্পণ' দ্বারা।১

শেষ পর্যন্ত জুরীরা লঙ-কে দোষী সাব্যস্ত করলো। শাস্তিস্বরূপ এক হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। রায় দেও-য়ার সংগে সংগে কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় নগদ এক হাজার টাকা কোর্টে জমা দিয়ে দিলেন এবং পাইকপাড়ার জমিদার প্রতাপচন্দ্র সিংহ মামলার যাবতীয় খরচ বহন করলেন। লঙ-এর বিচার প্রহসন শেষ হল বটে, বিচারের প্রতিক্রিয়া চলল অনেকদিন পর্যন্ত। বিচারপতি ওয়েল্স যেভাবে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাতে তাঁকে বিচারক না ভেবে নীলকরদের উকিল ভাবাই স্বাভাবিক ছিল। হরিশ-চন্দ্র 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখেছিলেন, ওয়েল্স নীলকরদের উকিলের ভূমিকা পালন করেছেন। জুরীরা ছিল নীলকরদের হাতের পুতুল।

আরও বহু পত্র-পত্রিকা এ বিচার প্রহসনের তীব্র নিন্দা করল। ইংল্যাণ্ডে 'ডেইলী নিউজ', 'স্পেকটেটর' 'স্যাটারডে রিভিউ' 'হোল নিউজ' প্রভৃতি পত্রিকাও ওয়েল্স-এর এ জঘন্য বিচার প্রহসনের নিন্দা ও সমালোচনা করেছিল। টাইমস মন্তব্য করেছিল, "ওয়েলস-এর এ বিচার প্রহসন ভারতের কুশাসনের ইতিহাসে একটা কলংক রেখে যাবে।"

মর্ডাণ্ট ওয়েল্সের বাঙালীদের প্রতি অসংগত আচরণ ও গালাগালি বাঙালী-দের মনে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। এর প্রতিবাদে বাঙালীরা সভা করল

---

১. "He believed that there was another motive for the prosecution. And not the one alleged......if the planters had really felt themselves hurt, they would long ago have taken proceedings against the publishers of the native copies printed. If any copies did harm, surely they were the native ones."—Indigo Mirror : P. 142.

এবং তাতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল যে, ভারত সরকারের নিকট একটা স্মারকলিপি পাঠিয়ে এর প্রতিকার দাবী করা হবে। বিশ হাজার বাঙালী সেই আবেদনপত্রে সই করেছিল। আবেদনপত্র মুদ্রিত করা ও তাতে সই নেওয়া হয়েছিল অতি গোপনে। সেদিন বাঙালীরা এমনি একতাবদ্ধ হয়েছিল যে এককপি আবেদনপত্রের জন্য 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা' ৫০০ টাকা দিতে চেয়েছিল। তবুও একটা কপি সংগ্রহ করতে পারেনি তারা।[১]

নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে ছোটলাট কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করে মন্তব্য করেছিলেন, "সরকার যদি ন্যায়বিচার ও নীতি অগ্রাহ্য করেন এবং নীলচাষ অব্যাহত রাখেন তবে সরকারকে ভবিষ্যতে এক ভয়ংকর কৃষক অভ্যুত্থানের মুকাবিলা করতে হবে। আর এই অভ্যুত্থান ইউরোপীয় ও অন্যান্য মূলধনের উপর এরূপ বিধ্বংসী আঘাত হানবে, যা কল্পনাও করা যায় না।"[২]

ছোটলাটের এ মন্তব্য ও কৃষক সমর্থন নীলকরগণ সহ্য করতে পারেনি। তা ছাড়া সীটন্‌কার নীল কমিশনের সভাপতিরূপে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে নীলকররা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। নীল কমিশন চলাকালেই তারা ভারত সরকারের নিকট গ্রান্ট সাহেবের বিরুদ্ধে এক অভিযোগপত্র পেশ করে। তাতে তারা পরিষ্কার ভাষায় এই অভিমত ব্যক্ত করলো যে, ছোটলাট যেভাবে কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেছেন এবং মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যকার ঝগড়ার মধ্যে যেভাবে অবৈধ ও বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ করছেন তাতে নীল ব্যবসার সর্বনাশ হবে।

সুখের বিষয় এই যে, বড়লাট নীলকরদের ঐ অভিযোগ অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং গ্রান্টকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

এবার নীলকররা অন্যভাবে আন্দোলন চালাতে থাকল। লন্ডনে গিয়ে গ্রান্টের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে লাগল। লন্ডন থেকে "Brahmins and Pariah" নামে

---

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত ঃ পৃঃ ১২৬।
২. Buckland : Bengal Under the Lt. Government : Vol. 1. P.351

একখানা পত্রিকা বের করলো তারা। তাতে তারা লিখলো, "গ্রান্ট বিচারে হস্ত-ক্ষেপ করেছেন বলেই ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের পুঁজি ও ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে মারাত্মক বিদ্রোহ ও অগ্নিকান্ড শুরু হয়েছে, তা তিনিই ঘটিয়েছেন।" তারা গ্রান্টকে 'The Present high Priest of the Civil Service juggernaut' ও তার সহকর্মীদের 'Civil Lathials' বলে বর্ণনা করেছিল। বলেছিল, "গ্রান্টের মত একজন অজ্ঞ ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ স্বৈরাচারী শাসকের হাত থেকে তারা মুক্তি চায়। সে শাসক পৃথিবীর সুন্দরতম দেশটাকে শাসন করছেন।১

১৮৩০ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে নদীয়া জেলার কমিশনার ল্যাসিংটন বাংলা সরকারের কাছে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, যশোহর জেলার লক্ষ্মীপাশা নীলকুঠির অধ্যক্ষ জন ম্যাক আর্থারের প্ররোচনায় একটা দাংগা হয় এবং তাতে একজনের মৃত্যু ঘটে।

ইহা বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত একটা পুস্তিকায় স্থান পায়।

ম্যাক আর্থার গ্রান্ট সাহেবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করলেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে সুপ্রীম কোর্ট উক্ত মামলা খারিজ করে দেয়। ম্যাক আর্থার মামলায় হেরে গেলেন।

গ্রান্টের কার্যকলাপ বাংলার চাষীদের উৎসাহিত ও সংগ্রামী চেতনায় অনেক-খানি সহায়তা করেছিল। ভারত সরকার গ্রান্টের উদার নীতিকে সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। কিন্তু পরে নানা কারণে নীলকরদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে ভারত সর-কারের সাথে গ্রান্টের মতবিরোধ ঘটে। গ্রান্ট শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

পাদরী রেভারেন্ড জেম্‌স লঙ-এর মত সমাজসেবী ও মানব-দরদী ব্যক্তিকে নীলকর ও সরকারের বিচার প্রহসন যেভাবে অপদস্থ করেছে, তার ফলে গোটা ইংরেজ জাতিকে একটা কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে হয়েছে। লঙ শেষ পর্যন্ত নিজের বিবেক ও বিচার বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে নীলকরদের সাথে আপোস করতে পারেন নি। ১৮৬২ সালে তিনি এদেশ ত্যাগ করে বিলেত চলে যান।

---

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১২৭।

## ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহ

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে একশ' বছর ধরে যে শোষণ, উৎপীড়ন আর স্বৈরাচারী শাসন চলে আসছিল তারই শোচনীয় পরিণতি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। এই একশ' বছর ধরে ইংরেজ রাজশক্তি ক্রমাগতভাবে এ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। ফলে একমাত্র শোষণের ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়েছে এদেশ। ব্রিটিশ স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী শোষণ ও উৎপীড়নের যে নজীর সৃষ্টি করেছে তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী ও বৈদেশিক আক্রমণ ভীতি থাকা সত্ত্বেও একটা স্থিতিশীল অর্থনীতি ও সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম ছিল। ব্রিটিশ বর্বর শক্তির নিষ্ঠুর শাসনে সেই অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। লেনিনের ভাষায়, "ভারতে ব্রিটিশ শাসন মানে সীমাহীন শোষণ আর উৎপীড়ন।"১

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে স্যার জর্জ কর্নওয়াল লুইস ইংল্যাণ্ডের সাধারণ পরিষদে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, ১৭৬৫-১৭৮৪ সালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারের মত দুর্নীতিবাজ, বিশ্বাসঘাতক ও উৎপীড়ক সরকার সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।২,

---

১. "There is no end to the violence and plunder which is called British Rule in India."
(Inflammable Material in World Politics, 1908)

২. "I do most confidently maintain that no civilised government ever existed on the face of this earth which was more corrupt, more perfidious and more rapacious than the government of the East India Company from 1765 to 1784."
—Sir George Cornewall Lewis in the House of Commons, Feb. 12, 1858.

বাংলাদেশের নিরীহ কৃষক-জনসাধারণকে কি নিদারুণভাবে শোষণ করেছে ইংরেজ রাজশক্তি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম ছ'বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখলেই তা বোঝা যায়। প্রথম ছ'বছরে কোম্পানী মোট রাজস্ব আদায় করেছে ১,৩০,৬৬,৭৬১ পাউন্ড। তার মধ্যে খরচ হয়েছে মাত্র ৯০,২৭,৬০৯ পাউন্ড। বাদ বাকী ৪০,৩৭,১৩২ পাউন্ড পাঠান হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। অর্থাৎ মোট আদায়কৃত রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ।'১

১৭৬৫ সালে ইংল্যাণ্ডে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লিখিত ক্লাইভের এক পত্রে কোম্পানীর এক বছরের আয়-ব্যয়ের ও ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত অর্থের যে হিসাব পাওয়া যায়, তা আরও মারাত্মক। উক্ত বছরের আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকা। সামরিক ও বেসামরিক খাতে খরচের পরিমাণ প্রায় ৬০ লাখ টাকা। নবাবের পাওনা ৪২ লাখ টাকা। মোগল রাজ-দরবারে নজরানা ২৬ লাখ টাকা। সর্ব খরচ বাদে মোট আয় ১২২ লাখ সিক্কা টাকা। অর্থাৎ ১২২ লাখ সিক্কা টাকাই পাঠানো হয়েছে ইংল্যান্ডে।২ শোষণের কি ভীষণ রূপ!

শোষণের পরবর্তী রূপ হলো এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের অবাধ রপ্তানি। ইংরেজ ব্যবসায়ী বা তাদের দালাল বেনিয়ান ও গোমস্তারা এদেশের চাষী, তাঁতী বা ব্যবসায়ীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতো সামান্য মূল্যে বা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। অনেক সময় জোর করে কেড়ে নেওয়া হত। এবং তা রপ্তানি করতো ইংল্যাণ্ডে। ১৭৬২ সালে বাংলার নবাব ইংরেজ গভর্নরের কাছে প্রেরিত নালিশপত্রে যে বিবরণ পেশ করেছেন তাতে দেখা যায়, কোম্পানীর লোকেরা বা তাদের দেশীয় গোমস্তারা এ দেশের চাষী বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন প্রকার দাম না দিয়েই জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিত অথবা পাঁচ টাকার জায়গায় এক টাকা ছুঁড়ে দিত।৩

---

১. Indigo To-day : R. P. Dutta. P. 104.

২. Clive's Letter to the Directors of East India Company, September 30, 1765.

৩. "They forcibly take away the goods and commodities of the Ryots (peasants), merchants etc. for a fourth part of their value ; and by ways of violence an oppression they

পরবর্তী পর্যায়ে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর প্রয়োজন দেখা দিল এ দেশের শিল্প ধ্বংস করার। এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর বসিয়ে ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে একে একে এ দেশের শিল্প ও শিল্পীদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। পরিকল্পিতভাবে একটা রপ্তানীকারক দেশকে পরিণত করা হল আমদানীকারক দেশে। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যে ভারতের সুতীবস্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সেই ভারতই এখন আমদানী করছে ইংল্যান্ডের সুতীবস্ত্র।[১] ধ্বংস হলো দেশের সমস্ত তাঁত, আর চরকার চাকা। মানুষের অবস্থা ও সংগতির মান নেমে গেল অনেক নীচে। আমূল পরিবর্তন সাধিত হল দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার।

১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে ভারতে বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধির সমানুপাত হল ১ থেকে ৫২০০। ১৮২৪ সালে ব্রিটিশ মসলিন রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬০,০০,০০০ গজ। কিন্তু ১৮৩৭ সালে তা বর্ধিত হয়ে দাঁড়াল ৬,৪০,০০,০০০ গজে। অথচ তখন বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে ঢাকার লোকসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে কমে হয়েছিল মাত্র ২০,০০০ জন।[২]

ফলে দেশের শিল্প ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে শহরগুলোও ধ্বংস হল। শহরের লোক ছুটে গেল গ্রামে এবং গ্রামের লোকসংখ্যা বর্ধিত হওয়ার ফলে গ্রামে অর্থনৈতিক ভারসাম্য গেল নষ্ট হয়ে। অপরিসীম চাপ পড়লো কৃষির উপর এবং ক্রমাগতভাবে সেই চাপ বাড়তেই থাকল। আজ পর্যন্তও তা বেড়েই চলেছে। অপরদিকে কৃষিরাজস্বের হারও গেল অনেকগুণ বেড়ে। অথচ কৃষির উন্নতি বা কৃষকদের মঙ্গলের জন্যে কিছুই করলো না কেউ।[৩]

---

oblige the Ryots etc. to give five rupees for goods which are worth but one ruppee.

(Memorandum of the Nawab of Bengal to the English Governor, May 1762).

১. "It became necessary to transform India from an exporter of cotton goods to the whole world into an importer of cotton goods. (India To-day, P. 112).

(India To-day, P. 112)

২. Marx : The British Rule in India (Quoted from India To-day). P. 89.

৩. India To-day : P. 90

কৃষি ধ্বংস হল, শিল্প বন্ধ হল, বাণিজ্যের চাবিকাঠিও চলে গেল কোম্পানীর হাতে। কোম্পানীর পরিকল্পিত কারসাজিতে দেশে এলো ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। এর পর এলো মহামারী। অসহায় লাখ লাখ বনিআদম ঢলে পড়লো মৃত্যুর কবলে। যারা বেঁচে থাকলো, তারা পালালো ঘর-বাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে। কুমোর, তাঁতী, মিস্ত্রী হয়ে পড়লো বেকার। দেশ জুড়ে বিরাজ করতে লাগলো এক দুর্বিষহ মারাত্মক পরিস্থিতি। ইংরেজ ঐতিহাসিক এ ধ্বংসাত্মক কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন, "যে দেশীয় শিল্পের জন্যে ভারতের নাম পশ্চিম জগতে সম্ভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করতো, তা এখন অবলুপ্তির পথে। এক সময়ের সুবিখ্যাত ও বিপুলায়তন নগরগুলো বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ মাত্র; সে সকল স্থান এখন হায়েনা ও খেঁকশিয়ালের আবাসস্থলে পরিণত। ভারতের সে বিদ্যাপীঠগুলো এখন আর নেই। প্রাচ্যের সে সব সুখী ব্যক্তিদের নাম এখন কেবল রূপকথা আর ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ...... অসংখ্য পুকুর আর সরাইখানা ধ্বংস হয়ে গেছে। সেচ-ক্রিয়ার জন্যে তৈরী খালগুলো এখন ভরাট হয়ে যাচ্ছে। অনেক জেলা এখন জন-মানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ এবং বন্য জন্তুর আবাসস্থলে পরিণত। ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার ফলে বাসের অযোগ্য। ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস! সর্বত্র ধ্বংস আর চরম দারিদ্র্য ... সমস্ত দেশ যেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ধাবিত।"১

১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশ' বছরে ইংরেজ কোম্পানী পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিল এ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন ধারার মূল প্রবাহ।

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল থেকেই মুসলমানরা ইংরেজদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা পরিহার করলো। বর্জন করলো ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজ সংস্কৃতির স্পর্শ। হিন্দুরা তখন বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। 'ইংরেজ হিন্দুর শত্রু নয়, হিন্দুর শত্রু মুসলমান'— এই নীতির উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে ইংরেজদের সাথে সর্ববিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ালো তারা। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা হল নব্য কেরানী, ইংরেজের দালাল, বেনিয়ান আর মুৎসুদ্দি। অফিস-আদালতের চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে আসন দখল

১. Central India During the Rebellion of 1857-58 : Thomas Lowe Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ২৮৩।

করে বসলো তারা। ইংরেজের স্বৈরাচারী শাসন আর শোষণে কোন প্রকার প্রতি-ক্রিয়া পরিলক্ষিত হলো না হিন্দুদের মনে। দেশের শিল্প ধ্বংস হল, কৃষি উচ্ছন্নে গেল। লাখ লাখ মানুষ বেকার হল। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর কবলে পড়ে মরলো অগণিত মানুষ। সুদীর্ঘকালের সামাজিক আর অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু হিন্দু মধ্যশ্রেণী বা ভূস্বামী শ্রেণীর টনক নড়লো না তাতে। অপরদিকে মুসলমানরা অনবরত লেগে থাকল ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ সংঘটিত হল দেশের প্রতি কোণায় কোণায়।

সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়, "১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ এই একশত কাল ব্যাপিয়া মুসলমান জনসাধারণ ইংরেজ শাসক শক্তির সহিত বিরোধিতার পথ অবলম্বন করিয়াছিল, ওহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি বহু গণ-বিদ্রোহে মুসলমান জনসাধারণই বৈদেশিক শাসক শক্তির উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপরদিকে ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই হিন্দু সম্প্রদায় ছিল ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে ইংরেজ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান অবলম্বন।"১

ইংরেজ রাজন্তশি নানা প্রকার আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও হিন্দুদের সহায়তায় চেষ্টা করতে থাকল কি করে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীকে উৎখাত করা যায় এবং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের কোণঠাসা করে রাখা যায়। ইংরেজ অত্যাচার যত বেড়েছে, মুসলমান ক্ষিপ্ত হয়েছে তত বেশী। পেশোয়ার থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র দেশ জুড়ে সংঘবদ্ধভাবে মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে থাকলো।

হান্টার সাহেবের ভাষায়, 'বাংলার মুসলমানরা আবার এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। আমাদের সীমান্তে বিদ্রোহীদের উৎখাত চলছে বহু বছর যাবৎ। তারা একেক দল ধর্মান্ধকে পাঠিয়েছে, যারা আমাদের শিবির আক্রমণ করেছে, গ্রাম পুড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের হত্যা করেছে এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে তিন তিনটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আমাদের সীমান্তের ওপারে মাসের পর

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৩০৭।

মাস ধরে গড়ে ওঠা শত্রু বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রদেশসমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল, পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজির সংগে উষ্ণমণ্ডলীয় গংগা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে। সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা বংদ্বীপ অঞ্চল থেকে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দু'হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয় আমাদেরই তৈরী করা রাস্তা দিয়ে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিপুল সম্পদের অধিকারী বহু লোক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সুকৌশলে অর্থ পাচারের এমন এক পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করছে, যাতে রাজদ্রোহের চরম বিপদসংকুল অভিযান রূপান্তরিত হয়েছে নিরাপদ ব্যাংক ব্যবসার আদান-প্রদানে।

মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অধিক ধর্মান্ধ তারা এইভাবে রাজদ্রোহিতামূলক প্রকাশ্য তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। আর এই বিদ্রোহের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে প্রকাশ্যেই সলাপরামর্শ করছে গোটা মুসলমান সম্প্রদায়। বিগত নয় মাস যাবত বাংলার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলোর পৃষ্ঠাসমূহ ভর্তি হয়েছে রানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনায়। উত্তর ভারতে মুসলমানী আইন বিশারদ ব্যক্তিদের সমষ্টিগত অভিমত সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় একটি ফতোয়ারূপে। এর পরই বাংলার মুসলমানরা এই বিষয়টি সম্পর্কে এক প্রচারপত্র বিতরণ করে। ......... মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অধিক বেপরোয়া তারা বহু বছর যাবত প্রকাশ্য রাজদ্রোহিতায় লিপ্ত আছে। পক্ষান্তরে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা সর্বকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে আলোড়িত হচ্ছে। মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্যভাবে একটি অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোন-না কোনভাবে প্রত্যেকটি মুসলমানের প্রতি নির্দেশ জারি হয়েছে বিদ্রোহের প্রশ্নে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার। ......... ভারতের মুসলমানরা বহুদিন থেকেই ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতি একটা

অবিরাম বিপদের উৎসরূপে বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে। কোন-না-কোন কারণে তারা আমাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। অপেক্ষাকৃত নমনীয় হিন্দু সম্প্রদায় যেসব পরিবর্তন সানন্দচিত্তে মেনে নিয়েছে, মুসলমানরা সেগুলোকে মনে করেছে মহা অন্যায়।[১]

বস্তুত ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে মুসলমানরা ধর্মীয় আদেশ বা অনুশাসন এবং অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেছে বলেই দেড়শ' বছর ধরে তাদের বিরোধে আপোষহীন একটানা সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে পেরেছে। ফকীর বিদ্রোহ, ওহাবী বিদ্রোহ, ফারায়েষী বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং এমনি আরও অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের মূল সুর ছিল এই ধর্মীয় অনুশাসন। ইংরেজ তাড়াতে পারা বা বিধর্মীদের শাসন কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম মানেই ধর্মীয় কর্তব্য পালন করা,— এমনি একটা প্রচারণা ছিল বলেই অশিক্ষিত মুসলমানরাও বিদ্রোহে শরীক হতে পেরেছিল। বিদ্রোহী মুসলমান বিশেষ করে ওহাবীদের সাংগঠনিক তৎপরতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হান্টার সাহেব বলেছেন, "... ...... তারা যেখানে গিয়ে বসতি গেড়েছে, সেখানটাই বিদ্রোহী কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।[২]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি হিন্দুদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা না থাকলে হয়তবা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে বিদ্রোহীরাই জয়ী হতে পারত এবং ইংরেজদের তাদের তল্পিতল্পা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে হতো।

পরবর্তীকালে সমগ্র ভারত জুড়ে যখন অসহযোগ আন্দোলন এবং সন্ত্রাস-মূলক কাজের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুরা সংগ্রাম শুরু করলো, মুসলমানেরা তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি। তার একমাত্র কারণ পূর্ব-বর্তীকালে মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের অসহযোগ এবং হিন্দুদের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং হিন্দু-জমিদার-মহাজন কর্তৃক কৃষক নির্যাতন।

---

১. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স: (মূল : হান্টার ; অনুবাদ : এম. আনিসুজ্-জামান) পৃঃ ১-৩।
২. পূর্বোক্ত পৃঃ ৭০।

পক্ষান্তরে মুসলমানরা অসহযোগ আন্দোলন এবং সন্ত্রাসমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেনি বলে অনেককে বলতে শোনা যায়— স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের কোনো দান নেই। সম্ভবত একথা তাঁরা ভুলে যান যে, মুসলমানরা যেভাবে প্রায় সুদীর্ঘ দেড়শ' বছর যাবত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে একটানা সংগ্রাম করেছে এবং অসংখ্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে তার তুলনায় পরবর্তীকালের অসহযোগ আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রাম রক্তাক্ত তীব্রতায় ততখানি উল্লেখযোগ্য নয়— যদিও তাকে খুব বড় করে দেখানো হয়েছে।

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে একটানা দেড়শ' বছর মুসলমানরা সংগ্রাম করেছে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে। বিশেষ করে ওহাবীদের মত এমন একটা সংগঠিত রাজনৈতিক দল বোধ হয় আজও এদেশের বুকে গঠিত হয়নি। টেকনাফ থেকে শুরু করে সুদূর পেশোয়ার পর্যন্ত ওহাবীদের যে প্রবল আধিপত্য এবং প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জ জুড়ে যে কর্ম-কৌশল পরিব্যাপ্ত ছিল তা অকল্পনীয়। হান্টার সাহেবের সংগৃহীত তথ্যে জানা যায়, ওহাবী প্রচারকরা অত্যুৎসাহী যুবকদের, যাদের বয়স সাধারণত বিশ বছরের নীচে, রিক্রুট করে তাদের মধ্য থেকে হত্যাকার্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করতো। এসব যুবকদের রিক্রুট করা হতো বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা থেকে।[১]

অন্যত্র বলেছেন, "বাংলার কোন এক কারাগারে বর্তমানে এমন একজন বৃদ্ধ আলেম আটক আছেন যিনি সব দিক দিয়েই নিষ্কলঙ্ক জীবনের অধিকারী, তবে তিনি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহী। গত ত্রিশ বছর যাবত তাঁর রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন এবং তিনিও জানতেন যে সরকার তাঁর মতলব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ১৮৪৯ সালে তাঁকে সরকারীভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়। তারপর ১৮৫৩ ও ১৮৫৭ সালে তাঁকে উপর্যুপরি সতর্ক করা হয় এবং ১৮৬৪ সালে তাঁকে প্রকাশ্য আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তলব করে শেষবারের মত হুঁশিয়ার করা হয়। কিন্তু এসব সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত না করায় ১৮৬৯ সালে তাঁকে নজরবন্দী করা হয়।"[২]

---

১. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্ : (মূল : হান্টার ; অনুবাদ : এম. আনিসুজ্জামান) পৃঃ ৯৫।

২. পূর্বোক্ত : পৃঃ ৯৪।

এমন উদাহরণ সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অতি বিরল। এমন গভীর আত্মত্যাগ ও আত্মনিষ্ঠা ক'জন রাজদ্রোহী সংগ্রামী পুরুষের জীবনে দেখা যায়? এমনি আরও অসংখ্য আত্মত্যাগী বিপ্লবী বীরের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে অনাদরে অবহেলায়।

পাটনার ইমাম মৌলভী ইয়াহিয়া আলী ছিলেন ভারতীয় ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক পরিচালক, নিষ্ঠাবান সংগ্রামী বীর। তাঁর প্রধান কাজ ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত লোকদের অস্ত্রশস্ত্রসহ গোপনে মহাবনে অবস্থিত বিদ্রোহী কলোনীতে প্রেরণ করা। বাংলাদেশ থেকে বিদ্রোহী লস্কর সংগ্রহ করে তিনি সীমান্ত শিবিরে প্রেরণ করতেন। এসব বিদ্রোহীদের দু'হাজার মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হত সীমান্ত শিবিরে।১

থানেশ্বর বাজারের দলীল লেখক জাফর ছিলেন মনে-প্রাণে একজন ইংরেজ-বিদ্বেষী এবং সাহসী বিপ্লবী। আম্বালা কোর্টে জাফরকে দন্ড প্রদানকালে বিচারক স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস মন্তব্য করেছিলেনঃ এই আসামীর চরম শত্রুতা-মূলক মানসিকতা, রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ এবং নাশকতামূলক কাজের দক্ষতার দ্বিতীয় নজীর নেই।২ হান্টার সাহেব বর্ণিত 'নাশকতামূলক কাজ' ও 'শত্রুতামূলক মানসিকতার' অর্থ সহজেই অনুমেয়। এমনি কাজ ও মানসিকতার অপরাধে পরবর্তীকালে ক্ষুদিরাম ও সূর্যসেনের ফাঁসি হয়েছিল। আরও অসংখ্য বিপ্লবী দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল।

দিল্লীর কসাই মোহাম্মদ শফী ছিল উত্তর ভারতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের যুদ্ধ সময় থেকেই সরকারের সাথে এই পরিবারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তৎকালীন ভারতের প্রতিটি শহরে তার এজেন্সী ছিল। গ্রেট-নর্থ-রোড বরাবর ৭টি সেনানিবাসে শফী মাংস সরবরাহ করত। রক্তসূত্রে হোক বা বাণিজ্যসূত্রে হোক পাঞ্জাবের সব-চেয়ে ধনী ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর সাথে তার সম্পর্ক ছিল। মাংস সরবরাহ করে প্রতি বছর সে কয়েক লক্ষ পাউন্ড আয় করতো। লেন-দেন ও কারবারের ব্যাপারে

---

১. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স ঃ হান্টার ঃ অনুবাদ ঃ এম, আনিসুজ্জামান পৃঃ ৭৬-৭৮।

২. পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৭৬।

সে ছিল খুব বিনয়ী ও নিয়মানুবর্তী। কাজ-কারবারের দক্ষতা ও সততা গুণে সে যুদ্ধ দপ্তরের অফিসারগুলোকে হাত করে ফেলে।

শফী ছিল আসলে বিদ্রোহীদেরই একজন। ষড়যন্ত্রমূলক কাজের জন্যে সে অর্থ যোগান দিত। সেনাবাহিনীর লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠতার ফলে সৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে বিদ্রোহীদের গোচরীভূত করত।১

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ছিল বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা। হান্টার সাহেবের ভাষায়ঃ সর্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে ব্যাপক এলাকা জুড়ে সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে বিচক্ষণতা। সংগঠকদের কর্মতৎপরতা পরিচালনা-কালে গোপনীয়তা রক্ষায় কর্মীদের দক্ষতা এবং তাদের পরস্পরের প্রতি সঠিক বিশ্বস্ততা। তাদের সাফল্যের মূলে ছিল ছদ্মনাম গ্রহণের ব্যবস্থা এবং খবর আদান-প্রদানের জন্যে এক ধরনের গুপ্ত ভাষার প্রবর্তন। তাদের গুপ্ত ভাষায় যুদ্ধকে বলা হত মামলা, আল্লাহকে বলা হত মামলার তদবীরকারী। স্বর্ণের মোহরকে বড় লাল পাথর অথবা দিল্লীর স্বর্ণখচিত জুতা অথবা বড় লাল পাখী বলা হত। স্বর্ণের মোহর পাঠানোকে পাপড়িওয়ালা বড় গোলাপ পাঠানো এবং টাকা-কড়ি পাঠানোকে বই বা জিনিসপত্র পাঠানো বলা হত। ড্রাফট ও মনি-অর্ডারকে সাদা পাথর এবং অর্থের পরিমাণকে গোলাপের সাদা পাপড়ির পরিমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হত।২

এমনি আরও হাজার উৎসর্গিত মহৎ প্রাণের উদাহরণ দেওয়া যায়, যাঁরা নিজে-দের পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ী-আয়েশ-আরাম বিসর্জন দিয়ে স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসকদের উৎখাত করার ইচ্ছায় বিদ্রোহীরূপে আজীবন কাজ করেছেন। অনেকে ধরা পড়েছেন, বিচারে ফাঁসি হয়েছে অথবা হয়েছে দ্বীপান্তর কিংবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড। মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলী, দুদু মিয়া, তিতুমীর, শমসের গাজী প্রমুখ ছাড়া আরও বহু উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী বীর ছিল, যাঁদের কথা বা কাহিনী হিন্দু বা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে স্থান পায়নি। মৌলভী ইয়াহিয়া আলী, জাফর, মোহাম্মদ শফী ছাড়াও পাটনার আবদুল গাফ্ফার, রহিম

১. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌সঃ হান্টারঃ অনুবাদঃ এম, আনিসুজ্জামান পৃঃ ৭৯-৮১।

২. পূর্বোক্তঃ পৃঃ ৮৩।

বক্স, ইলাহী বক্স, হুসাইনী ইলাহী, কাযী মিয়াজান আবদুল করিম, মোহাম্মদ জাফর প্রমুখ বিপ্লবী বীরের কথা হান্টার সাহেব উল্লেখ করেছেন। হান্টার সাহেব এ'দের 'রাজদ্রোহী', 'ইংরেজ বিদ্বেষী', 'ষড়যন্ত্রকারী' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ'রাই ছিলেন মুক্তিপাগল বিপ্লবী বীর। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস অথবা বিপ্লবীদের নামের তালিকায় এ'দের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ শাসনের কবল থেকে মুক্তিলাভের ও হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারত জুড়ে যে মহাবিদ্রোহের ঝড় উঠেছিল, তার কারণ হিসাবে গো-চর্বি বা শূকর চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের প্রচার নিছক একটা উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এ বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলছিল আরও বহু পূর্ব হতে। স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী মুসলমানগণ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে এমনি একটা ব্যাপক বিদ্রোহের জন্যে গোপনে গোপনে কাজ করে আসছিল।

কলকাতা কলুটোলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমীর খাঁ বিচারে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত হয় এবং তাঁর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আমীর খাঁর বিচারের পর পরই ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসে এই মামলার বিচারপতি নম্যান সাহেব ওহাবীদের গুলীতে নিহত হন। এর কিছুদিন পর বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান ভ্রমণে যান। সেখানে তিনি দ্বীপান্তরিত একজন ওহাবীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন।১

ওহাবীদের মনোবল এবং কর্মপন্থাই পরবর্তীকালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কর্মীদের মনে অফুরন্ত কর্ম প্রেরণা যুগিয়েছিল।

হান্টার সাহেব এক জায়গায় বলেছেন, ১৮৪৭ সালে স্যার হেনরী লরেন্স এই মর্মে এক বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন যে, উক্ত খলিফাদ্বয় (ইনায়েত ও বেলায়েত আলী) পাঞ্জাবে ধর্মযোদ্ধা হিসাবে সুপরিচিত ছিল এবং সেজন্য তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশের হেফাজতে পাটনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫০ সালে সালে আমি তাদের দেখেছি সমতল বঙ্গের রাজশাহী জেলার রাজদ্রোহমূলক প্রচার

১. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৫২।

কর্ম চালাতে।......১৮৫১ সালেই তাদের আবার দেখা গিয়েছিল পাঞ্জাব সীমান্তে রাজদ্রোহের অগ্নি উদগীরণ করতে।[১]

অন্যত্র বলেছেন, "১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত আমরা ষোলটি অভিযান করতে বাধ্য হয়েছিলাম।"[২] বস্তুত সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই চলছিল বিদ্রোহীদের সাথে ইংরেজ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রস্তুতি চলছিল অনেক বছর ধরে—গোপন এবং সাবধানী প্রচার প্রস্তুতির মাধ্যমে। বহুপূর্ব হতে যারা এ বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসছিল তারা অধিকাংশই ছিল কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। পরে অবশ্য রাজ্যহারা রাজা-রাণী, লাখেরাজের চক্রান্তে পড়া জমিদার, জমি ও গৃহহারা কৃষক, তাঁত-হারা তাঁতী, কাজ-হারা কারিগর বেকার শ্রমিক মজুর সবাই এতে অংশগ্রহণ করেছিল। বলা বাহুল্য এদের প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। কারণ হিন্দুদের জমিদারী যাওয়ায় কৃষকের জমি হারাবার মত কোন কারণ ছিল না। অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর কিছু হিন্দু, যারা ছিল কুমোর, তাঁতী বা কারিগর, তারা পূর্ব হতেই মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে আসছিল। শিক্ষিত হিন্দুরা বরাবরই ইংরেজ শাসকদের সহায়তা করে আসছে। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী বা ঝাঁসীর রানীর মত লোকেরা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন অসহায় অবস্থার চাপে পড়ে। বিচারে প্রাণদন্ডাদেশ শাস্তির পর নানা সাহেব রাণী ভিক্টোরিয়া, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে এক আবেদন পত্র পেশ করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, এটা অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার যে যারা প্রকৃত হত্যাকারী তাদের তারা (কর্তৃপক্ষ) মার্জনা করেছেন, কিন্তু তিনি (নানা সাহেব) নিতান্ত অসহায় অবস্থার চাপে পড়ে বিদ্রোহে যোগদান করতে বাধ্য হলেও তাঁকে মার্জনা করা হল না।[৩] ঝাঁসীর রাণী বিদ্রোহের প্রথম দিকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর রসদ যোগান দিয়েছিলেন এবং আহত সৈন্যদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এত করার পরও যখন ইংরেজ প্রভুদের তুষ্ট রাখতে পারলেন না,

---

১. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ১৩।

২. পূর্বোক্তঃ পৃঃ ১৪।

৩. Political proceeding No. 63-70 : May 27, 1859.

তখন এক প্রকার বাধ্য হয়েই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন।[১] কাজেই একথা সুস্পষ্ট যে, বিদ্রোহে যারা অংশ নিয়েছিল, তারা মূলতঃ কৃষক বা কৃষক সন্তান। ভারতীয় সীপাহীরাও প্রধানতঃ ছিল কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলাদেশে অবস্থিত সিপাহীদের অধিকাংশ ছিল অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক।[২] সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়ঃ "রাজ্যহারা রাজন্যবর্গ ও ভূস্বামিগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিলেও ভারতীয় সিপাহিগণ এই মহাবিদ্রোহের পুরোভাগে থাকিবার জন্যই মহাবিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করা হইলেও উত্তর ভারতের কৃষক কারিগর প্রভৃতি শ্রমজীবী জনসাধারণই ছিল এই বিদ্রোহের মূল ও প্রাণশক্তিস্বরূপ।"[৩]

এ কথা সত্য যে, ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানীর কুশাসনের প্রারম্ভে সৈন্য বিভাগ হতে বহু মুসলমান সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়েছিল। নতুন আইনের বদৌলতে বহু মুসলমান জমিদার রাতারাতি জমিদারী হারিয়ে পথের ভিখেরী হয়ে পড়েছিল, শিল্প ধ্বংসের ফলে বহু কুমোর, তাঁতী, কারিগর বেকার হয়েছিল এবং এরাই বিভিন্ন সময়ের বিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছিল। এই মহাবিদ্রোহেও তারা বা তাদের বংশধররা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। সৈয়দ আহমদ খানের ভাষায়, "যাদের হারাবার মত কিছুই ছিল না, যারা শাসিত ও শোষিত তারাই ছিল বিদ্রোহী, দেশীয় শাসকরা নয়।"[৪]

নীলকরদস্যু, জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক সমাজ বহু পূর্ব হতেই ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিল। মহাবিদ্রোহের সময় তারা শুধুমাত্র কৃষক সন্তান সিপাহীদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। বস্তুত বহু পূর্ব হতে যে বিদ্রোহ চলে আসছিল ইংরেজ রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করে শাসনক্ষমতা দখলের জন্যে, সুপরিকল্পিতভাবে শূকরের ও গরুর চর্বি মিশ্রিত টোটার ধোয়া ছড়িয়ে সেই বিদ্রোহকে সশস্ত্র রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে পরিণত করা হয়েছিল মাত্র। কিম্বা বলা চলে এই মহাবিদ্রোহের মধ্যেই নিহিত

---

১. Political Proceeding No. 280 : Dec. 30, 1859.
২. An Account of the Mutinies in Oudh : M. R. Gubins, P. 59
৩. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ২৮৪।
৪. The Causes of Indian Revolt : P. 5.

ছিল স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা। তাই হয়ত বিদ্রোহীরা চেয়েছিল বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে এবং এরই ফলে দেখা যায় মধ্য ও উত্তর ভারতেই বিদ্রোহের প্রচণ্ডতা ছিল ব্যাপক। বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মধ্য ও উত্তর ভারতে ব্রিটিশ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছিল।১

পূর্বেই বলেছি, কৃষক সমাজ ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হতেই আপোসহীন অক্লান্ত সংগ্রাম করে আসছিল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। বিদেশী বিধর্মী একটা জাতি দেশের শাসনক্ষমতা দখল করে থাকবে এবং হুকুম জারি করতে থাকবে মুসলমানদের উপর। এটা মুসলমান জনসাধারণ বরদাস্ত করতে পারেনি বলেই তারা অনবরত সংগ্রাম করে আসছিল। তা ছাড়া ইংরেজ শাসকগণ যে নতুন ভূমিব্যবস্থা অবলম্বন করে কৃষকদের পর্যদস্তু করতে চেয়েছিল, সেই ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের কৃষক জনসাধারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পন্থা অবলম্বন করেছিল।

একটা অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়েছিল এ বিদ্রোহে। গত একশ' বছর ধরে ইংরেজ শাসকগণ সর্ববিষয়ে হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিল এবং মুসলমানদের পরম শত্রুরূপে গণ্য করে আসছিল, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করে আসছিল। এই বিদ্রোহে সেই হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়েই সংগ্রাম করেছিল।

ঐতিহাসিক লো'-এর মতে, "শিশু হত্যাকারী রাজপুত, গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ধর্মোন্মাদ মুসলমান, বিলাস-প্রিয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহারাষ্ট্রীয় সবাই একই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।২ এবং এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির আক্রমণের ফলে প্রথম দিকে সর্বত্রই বিদ্রোহীদের সাফল্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, এই অভাবনীয় ঐক্যই বিদ্রোহে ব্যর্থতার কারণ হয়ে দেখা দিল। যে সব রাজা বা ভূস্বামীর নিজেদের স্বার্থহানি ঘটেছিল বলে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জনের সাথে সাথে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। সাফল্য অর্জনের সাথে সাথে তারা নিজ নিজ আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে সচেষ্ট হল। ফলে যত সহজে ঐক্য গঠিত হয়েছিল, তত

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ২৮৭।

২. Central India during the Rebellion of 1857-58: Thomas Lowe. p. 24.

সহজে সে ঐক্য ভেঙে গেল। বিদ্রোহীরা যখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করলো, মোগলের চিরশত্রু মহারাষ্ট্রীয়গণ সাথে সাথে তাতে তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

প্রতিক্রিয়াশীল রাজা-মহারাজা এবং ভূস্বামীরাই অশিক্ষিত কৃষক ও সৈনিকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারা দেখলো যে, কৃষক সিপাহীদের আত্মত্যাগের ফলেই বিদ্রোহে সাফল্য অর্জিত হচ্ছে এবং এভাবে যদি কৃষক জনতার ক্ষমতার অধিকার অর্জিত হয়, তা হলে পরে ভূ-সম্পত্তি লাভের কোন আশাই তাদের থাকবে না। কারণ কৃষক জনসাধারণ ভালভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল ভূ-স্বামী ও রাজন্যবর্গের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত। তাদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণই হল এসব ভূ-স্বামী ও রাজা-মহারাজা। কৃষক জনসাধারণদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের নিজেদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে এ দেশের কৃষক জনসাধারণ বহু পূর্ব হতেই জমিদার, তালুকদার, মহাজন ও নীল দস্যুদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সংগ্রাম করে আসছিল। কৃষকদের সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামই সিপাহীদের হঠাৎ উত্তেজিত শক্তির সাথে মিলিত হয়ে মহাবিদ্রোহে পরিণত হল। কাজেই জমিদার, তালুকদার ও মহাজনরা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারলো যে এই অভ্যুত্থানে যদি ইংরেজ শাসনের বিলুপ্তি ঘটে তা হলে জমিদারী ও তালুকদারী উঠে যাবে এবং কৃষক জনসাধারণ অবশ্যই তাদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করবে। এই শুভবুদ্ধি উপলব্ধির পর তাদের ইংরেজ-প্রীতি আরও বর্ধিত হল এবং সংগ্রামে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বিদ্রোহীরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। তখনকার পাঞ্জাবের প্রাদেশিক শাসক এবং সেনানায়ক স্যার জন লরেন্স স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, "সিপাহীদের মধ্যে যদি একজনও প্রতিভাবান সেনানায়ক থাকত, তবে আমাদের সর্বনাশ হত।"[১]

যারা কৃষক জনসাধারণের নেতৃত্ব দিতে পারত এমন কয়েকজনকে ইংরেজ সরকার পূর্ব হতেই আটক করে রেখেছিলেন। বাংলাদেশে ফারায়েযীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে না উঠতে তাদের নায়ক দুদুমিয়াকে আলীপুর

১. Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ পৃঃ ২৯৪।

জেলখানায় আটক করে রাখা হল। বীরভূম জেলার রঞ্জন শেখ ও করিম খাঁ চেষ্টা করেছিলেন জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের বিষ ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু ইংরেজের বিচারে তাদের হল ফাঁসি। মেদিনীপুরের বৃন্দাবন তেওয়ারীকে একই অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং মীর জম্গু ও শেখ জমিরুদ্দীন কারাদন্ড ভোগ করলো।[১]

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এদেশের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী। তারা ছিল পুতুলের মত নীরব দর্শক মাত্র। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী পরিচালিত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার অভিমত বা মন্তব্য আরও ভয়ঙ্কর। অথচ পরবর্তীকালে এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং মুসলমানরা তাতে অংশগ্রহণ করেনি বলে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। অথচ একথা স্বীকার করতে তারা লজ্জাবোধ করেন যে, ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসন উৎখাত করার সংকল্প নিয়ে একটানা সংগ্রাম করেছিল মুসলমান কৃষক জনসাধারণ এবং তাদের সেই অসাধারণ সংগ্রামের পথ অনুসরণ করেই চলেছিল পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং অসহযোগ আন্দোলন। এ দেশের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী মহাবিদ্রোহকালে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যশ্রেণী তথা বুদ্ধিজীবীরা বিদেশী ইংরেজ সরকারের মঙ্গল চিন্তায় কতখানি ব্যাকুল ছিলেন বা ইংরেজ পদলেহন কর্মে কতখানি পারদর্শী ছিলেন তারই স্পষ্ট ছাপ রয়েছে তাতে। বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল বলে প্রচন্ড ঘৃণা উদগারিত হয়েছে বিদ্রোহীদের প্রতি ১৮৫৭ সালের ২০শে জুনের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়ঃ কয়েকজন অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনাহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা প্রকাশ পূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যব্যাপী শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবারাত্র জগদ্দীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, এই দন্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ববত শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর। তুমি সমুদয় বিঘ্নহর, সকল উপদ্রব নিবারণ কর, প্রজাবৎসল সুধার্মিক সুবিচারক বৃটিশ গভর্নমেন্টের জয় পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর। অত্যাচারী অপকারী বিদ্রোহকারী দুর্জনাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর। যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক

---

১. Civil Rebellion in the Indian Mutinies: S. B. Chowdury. P. 202.

হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদিগকে প্রদান কর।"

যে স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসন আর শোষণের তীব্র হলাহলের প্রচণ্ড জ্বালায় সমগ্র ভারত জুড়ে হাহাকার উঠেছে, বিদ্রোহের দাবানল জ্বলেছে দেশের প্রতি কোণায় কোণায় সেই ইংরেজ শাসকরা হল প্রজাবৎসল, সুধার্মিক আর সুবিচারক! তার কারণ—"যবনাধিকারে আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই, সর্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত। মহররমের সময়ে সকল হিন্দুকে গলায় 'বদি' অর্থাৎ যাবনিক ধর্ম সূচক একটা সূত্র বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে হইত, গমি অর্থাৎ নীরব থাকিয়া 'হাসান' 'হোসেনের' মৃত্যুর জন্য শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্নিশ করিয়া 'মোচ্চে' নামক গান করিতে হইত। তাহা না করিলে শোণিতে সমুদ্র প্রবাহিত হইত।"[১]

এমন জঘন্য মিথ্যা প্রচার কোন ইতিহাসে স্থান পেয়েছে কিনা সন্দেহ। যে ইংরেজরা মুসলমানদের কবল থেকে রাজ্য কেড়ে নিল বা যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা অনবরত সংগ্রাম করেছিল, তেমন কোন ইংরেজ লেখকও বোধ হয় এমন জঘন্য নীচুস্তরের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

মুসলমানরা ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। সংহার করেছিল নিজেদের জ্ঞাতি ভাইকে। হত্যা করেছিল সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেনি তারা। মহাবিদ্রোহেও মুসলমান কৃষক জনসাধারণ এবং কৃষক সন্তনরাই অংশ গ্রহণ করেছিল। সাময়িকপত্রে তার আভাস আছে, "অবোধ যবনেরা[২] উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গভর্নমেণ্টের সাহায্যাথে

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ম খন্ড): বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২২৭।

২. 'যবন' অর্থে মুসলমান। বহু পূর্ব হতেই হিন্দুরা মুসলমানদের যবন নামে আখ্যায়িত করেছে। পরবর্তীকালেও এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে।

"হিন্দু ভ্রাতাদের অনেকের ধারণা মুসলমানেরাই যবন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহাদের কেহ কেহ কথাবার্তায় ও প্রবন্ধাদির মধ্যে বেচারী মুসলমান দিগকে 'যবন' নাম দিয়া গালাগালির প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন।

(সাম্যবাদী, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩১ "সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত": মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পৃঃ ২৭৫)

কোন প্রকার সদানুষ্ঠান না করাতে তাহাদিগের রাজভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতা-চরণ প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞও জানিয়েছেন।"১ "বিজ্ঞ লোকেরা" মুসলমানদের অকৃতজ্ঞও মনে করেছেন। এসব বিজ্ঞ ব্যক্তি কারা? এরা হলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতই দেশপ্রেমিক (?) বিজ্ঞ ব্যক্তি—যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তায় এদেশে ইংরেজ রাজশক্তি প্রবল হয়েছে, নীলকর দস্যুদের মত অত্যাচারী ইংরেজ এ দেশের বুকে স্থায়ী আস্তানা পেতে বসতে পেরেছে।

বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রতি নানা প্রকার ধিক্কারজনক কটূক্তি বর্ষণের পর তাদের পূর্বের কৃতজ্ঞতা ও বীরত্বের (বিশ্বাসঘাতকতা) কথা স্মরণ করে সাময়িক পত্র আক্ষেপ করেছে "ঐ সৈন্যেরা বৃটিশ শক্তির অধীন হইয়া এই ভারত ভূমিতে অস্ত্র ধারণপূর্বক বিপক্ষ বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজাজ্ঞায় অনায়াসেই তৎক্ষণাৎ কেহ আপন ভ্রাতার, কেহ আপন পিতার, কেহ আপন পুত্রের, কেহ কেহ আপন জ্ঞাতির মস্তক ছেদন করিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র দয়ামায়া প্রকাশ করে নাই...সেই প্রভুভক্ত সৈন্যরাই আবার প্রভুবিনাশে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।"২ অর্থাৎ মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাদ, রাজবল্লভের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাদের অধীনস্থ সৈন্যরা নবাব সিরাজউদ্দৌলা বা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। সংহার করেছিল নিজেদের জাতি ভাইকে। হত্যা করেছিল আপন ভ্রাতা-ভগ্নিকে। তারা আজ কিসের তাড়নায় 'প্রভু' ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো? হঠাৎ তাদের চোখ খুললো কেন?

ভাবতেও অবাক লাগে, এসব শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর লোকেরাই হলেন স্বদেশ-প্রেমিক! স্বাধীনতা যুদ্ধের সাহসী নেতা! মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী হিন্দুদের সংখ্যা যে অতি নগণ্য ছিল, এ সত্যও প্রকাশ পেয়েছে সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে, "কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে এতাদৃশ বিষমতর বিদ্রোহ বিধায়ক বিলাপ বিঘটিত বিষাদ বিশিষ্ট বিপদের ব্যাপারে এক ব্যক্তিও

---

১. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্রঃ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৩৬।
২. পূর্বোক্ত (১ম খন্ড)ঃ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৩৭।

বাঙ্গালী[১] বিযুক্ত হয় নাই এবং বিদ্রোহী দলভুক্ত হিন্দুর সংখ্যাও অতি অল্প।"[২]

বিদ্রোহে দারুণ ব্যর্থতা এবং ইংরেজ প্রভুদের চোখে রাজভক্ত প্রজারূপে চিহ্নিত হওয়ার ফলে এদেশের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী (হিন্দু-জনসাধারণ) কি অভাবনীয় আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন তারও প্রতিফলন ঘটেছে সাময়িকপত্রে, "হিন্দু, বিশেষত হিন্দুর মধ্যে বাঙালী জাতিরা একান্ত প্রভুভক্ত, এ বিষয়টি সুপ্রমাণকরণের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না, সর্বসাধারণ দূরে থাকুক রাজ-পুরুষদিগ্যে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হবেই হবে। শ্রী-শ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী বিশ্বমাতা ভিক্টোরিয়া, বিলাতের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ, ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কানিং বাহাদুর এবং অপরাপর রাজপুরুষ মহোদয়রা একথা বারম্বার শ্লাঘাপূর্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব প্রকৃত রাজভক্ত কৃতজ্ঞ নামধারণ করণের অপেক্ষা আমাদিগের অধিক সুখ সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে?[৩] আশ্চর্য! এদের রাজভক্তি! কর্তা 'শালা' বলেছেন, তাই আনন্দের আর সীমা নেই। এদের স্বদেশ প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা আর ইংরেজ-গোলামী সবই একসূত্রে বাঁধা।

মহাবিদ্রোহে ব্যর্থতার পর মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্রূপ-টিপ্পনি আরও মর্মান্তিক। সাময়িক পত্রে তার ছবি, "বেগম স্বজার ও জারজ প্রসূত ও অন্যান্য প্রায় লক্ষাধিক বিদ্রোহী...নেপাল দেশের অরণ্যে পর্বতাদি স্থানে 'কিলাবিল' 'কিলাবিল' করিতেছে। দুরাত্মাদের দুরাবস্থা দৃষ্টে কান্না পায়, দুঃখও বোধ হয়, আবার রঙ্গরস দেখিয়া হাসিতেও হয়, কেননা কথায় বলে "অরগুণে নয়, বরগুণে দড়" তাই ইহাদের কান্ড, এদিগে অন্নবিনা লালায়িত, দাঁড়াইবার স্থান নাই, যুদ্ধ-সামগ্রীর তো কথাই নাই......তথাপি পাপাত্মাদের আস্থা যায় নাই; প্রায় ভাবতেই কেহ জেনেরল, কেহ কর্নেল, কেহ কাপ্তেন ইত্যাদি উপাধি ধারণ করিয়াছে, জনাব দৌলা খাঁ বাহাদুরের তো ছড়াছড়ি হই-য়াছে, আবার দুই চারিজন নাক কান কাটা "কমান্ডার ইন চিফ বাহাদুর" এবং "লর্ড গবর্নর জেনেরল সাহেব" ইত্যাদি হইয়াছে, বাবাজীদের রাজাতো পাঁচ

---

১. বাঙালী অর্থে হিন্দু।
২. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ম খণ্ড): বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৪৮।
৩. পূর্বোক্ত: পৃঃ ২৪৯।

পোয়া কিন্তু কলেকটর, মেজিস্ট্রেট, জজ, দেওয়ান, খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে, আহা! নেড়ে চরিত্র বিচিত্র, ইহারা অদ্য জুতা গড়িতে গড়িতে কল্য 'সাহাজাদা' 'পরিজাদা' 'খানজাদা' 'নবাবজাদা' হইয়া উঠে, রাতারাতি একে আর হইয়া বসে, যাহা হউক বাবাজীদের সুখের মতন হইয়াছে, জঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া অন্তরঙ্গভাবে গদ গদ হইয়াছিলেন, এদিকে জানেন না যে বাঙ্গাল বড় হে'য়াল।"১ এসব পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরাই ছিলেন তথাকথিত মধ্যশ্রেণী ভূ-স্বামী ও মহাজনগোষ্ঠীর সমগোত্রীয় দালাল। মোগল আমলের এরা ছিল দালাল শ্রেণীর গোলাম, ব্রিটিশ আমলেও ছিল তাই, এখনও তেমনি আছে। এদের চরিত্র সর্বকালে সর্বস্তরে অপরিবর্তনীয়। কিন্তু আকারে পাত্র উপযোগী। মহাবিদ্রোহের মাত্র তিন বছর পর সংঘটিত হয় নীল বিদ্রোহ। প্রকৃতপক্ষে নীল বিদ্রোহের আগুন জ্বলাতে শুরু করেছিল ১৭৭৮ সালের পর থেকে অর্থাৎ নীলচাষ আরম্ভ হওয়ার পর-পরই নীলকর দস্যুদের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে চাষীরা মাথা নাড়া দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

বস্তুত যখন থেকে ইংরেজ শাসকগণ চাষীদের উপর জমিদারী-শোষণ ব্যবস্থা চাপিয়ে দিল তখন থেকেই স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রাম শুরু হল। এরপর এলো নীলকর গোষ্ঠী শোষণের নিত্য নতুন রূপ নিয়ে। তখন থেকে শুরু হল সামন্ত প্রথা ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে চাষীদের আপোসহীন সংগ্রাম। ইংরেজ শাসক ও নীলকর জমিদার গোষ্ঠী অভিন্ন জাতীয় শত্রুরূপে চিহ্নিত হল। তাই চাষীদের এ সংগ্রামকে শুধুমাত্র কৃষি-বিপ্লব বা নীলকর ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বললে ভুল হবে। সংগ্রাম ছিল মূলত রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে চাষীদের সমর্থন ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও সর্বক্ষেত্রে সর্বাত্মকভাবে তারা এ সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেনি। কারণ বহু পূর্ব হতেই চাষীরা একটা ব্যাপক কৃষিবিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মহাবিদ্রোহ তাদের সেই প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করল এবং দুর্বার সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাল। নীল বিদ্রোহের গুরুত্ব ও আবেদন অপরিসীম। সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়, "নীল বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে অন্যতম সফল গণ-বিদ্রোহ। বাংলাদেশের সকল কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে নীল বিদ্রোহ সামাজিক গুরুত্বে, ব্যাপকতায়, সংগঠনে, দৃঢ়তায়

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ম খন্ড) : বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৫৩।

ও পরিণতিতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সম্পূর্ণ সচেতন না হইলেও ইহা ছিল তৎকালে সামন্ত প্রথা ও ঔপনিবেশিকতার মূল ভিত্তির উপর প্রচন্ডতম আঘাত। সুতরাং ইহা পরোক্ষভাবে বাংলার কৃষকের তথা বংগদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। নীল বিদ্রোহ পূর্বগত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী গণ-সংগ্রামেরই ঐতিহ্যবাহী।"১

একথা অনস্বীকার্য যে, নীল বিদ্রোহ বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধতার মন্ত্রে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে-ছিল। এতদিন শুধু মুসলমানরাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে আসছিল। হিন্দুরা পাশে থেকেও ছিল আলাদা। কিন্তু নীল বিদ্রোহে মুসল-মানদের সাথে সাথে হিন্দুরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। বিশেষ করে মধ্য-বিত্ত শ্রেণী হতে আগত কিছু সংখ্যক শিক্ষিত উদার ব্যক্তি এ সংগ্রামে চাষীদের সহায়তা করেছিল। তার কারণঃ

১. নীলকরদের অত্যাচার শুধুমাত্র নিরীহ মুসলমান চাষীদের উপর সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু চাষী এবং জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিল।

২. মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে মুসলমানরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস পেয়েছিল। তার ফলে হিন্দুদের অবাধ সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ সংকুচিত হওয়ার ভয় ছিল। আশঙ্কা ছিল হিন্দু-মুসলমান বিরোধের। আসন্ন বিরোধ এড়িয়ে চলার তাকীদে নীল বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল।

৩. হিন্দুদের দৃষ্টিতে নীল বিদ্রোহ শুধুমাত্র নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক জাতির বিদ্রোহ রূপেই প্রতীয়মান ছিল। এর পেছনে যে রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার বা প্রভু তাড়াবার উদ্দেশ্য ছিল তা সেদিন হয়ত তারা বুঝতে পারেনি।

সমসাময়িক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত আবেদনপত্রে এ সত্য আরও স্পষ্ট "......আমাদিগের সুবিচারক রাজপুরুষগণের সমক্ষে আবেদন করি-

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ রায়, পৃঃ ৩৩৭।

তেছি যে তাহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে অত্র প্রদেশের প্রতি কৃপাবলোকন দ্বারা আমাদিগের সকল সন্তপ্ত হরণ করুন। এবং শান্তিরস প্রদান দ্বারা আমাদিগের মনে শান্তির সংস্থাপন করুন। যদ্দ্বারা আমরা অত্যাচারী নীল-করদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখে জীবনযাত্রা সুনির্বাহ করিব। ...আমাদিগের সুবিচারক রাজকর্মচারীগণ এদেশের কাঙগালী প্রজাপুঞ্জের উপর দয়া প্রকাশ করিয়া ইহাদিগের মনে হর্ষ প্রদান করিতে পরাঙ্‌মুখ না হয়েন, কারণ "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" তাহারা ব্যতীত ইহাদিগের আর কেহই নাই।"১ ভক্ষক সমীপে রক্ষার আবেদন! বলা বাহুল্য, নীলকর দস্যু ও স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসকদের মধ্যে প্রভেদ অতিসামান্য, এ সত্য উপলব্ধি করতে পারলে হয়ত মধ্যশ্রেণীর যে কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিরা নীল চাষীদের এ সংগ্রামে সমর্থন জানিয়েছিলেন তারা তা জানাতেন না।

নীল কমিশনের প্রহসন দেখে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলার চাষীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বজাতীয় নীলকরদের ক্ষতি সাধন করা সরকারের উদ্দেশ্য ছিল না। সদাশয় গ্রান্ট সাহেব নীল চাষের কুফল দিব্যচক্ষে অবলোকন করেছিলেন এবং চাষীদের করুণ আবেদন নিবেদনও শুনেছিলেন। তিনি কি ইচ্ছা করলে নীলকরদের কঠোর হস্তে দমন করতে পারতেন না? নীল কমিশন বসিয়ে একটা প্রহসন সৃষ্টি কি অপরিহার্য ছিল?

এসব প্রশ্নের উত্তর নীল বিদ্রোহের পূর্বের একশত বছর এবং পরবর্তীকালের ইংরেজ শাসন-নীতি এবং এদেশীয় প্রজাদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের আচরণের মধ্যেই স্পষ্ট বিদ্যমান। একচোখো দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা তা দেখতে পাননি বা দেখার চেষ্টা করেননি। কারণ মূল প্রশ্ন ছিল অন্যত্র।

তবুও একথা সত্য যে নীল বিদ্রোহ হিন্দু মুসলমানকে একত্রিতভাবে সচকিত করে তুলেছিল। শিশির কুমার ঘোষ যথার্থ বলেছিলেন, 'নীল বিদ্রোহই সর্ব প্রথম এদেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সংঘবন্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছিল।"২

---

১. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ম খন্ড) ঃ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১০৫-৬।
২. Amritabazar Patrika : May 22, 1874.

অবশ্য দালাল বেনিয়ান মুৎসুদ্দি শ্রেণীর লোকেরা পূর্বের মতই নির্বিকার এবং নিষ্ক্রিয় ছিল।

নীল বিদ্রোহ নতুন করে প্রমাণ করলো যে কৃষক সংগ্রামের নেতৃত্ব সংগ্রামের মধ্য হতেই গড়ে ওঠে। বস্তুত এমন ব্যাপক বিস্তৃত বিদ্রোহকে নির্দিষ্ট কোন নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করা সম্ভবপর ছিল না। সতীশ চন্দ্র মিত্রের ভাষায়, 'এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে। যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল, সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত গ্রামবাসীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিল তাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস।'[১]

নীল বিদ্রোহের ভয়াবহতা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্যে ছোটলাট গ্রান্ট নদীপথে ভ্রমণকালে গড়াই নদীর উভয় তীরে লক্ষ লক্ষ জনতার উগ্রমূর্তি ও দৃঢ়তা দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। উত্তাল বেগবতী গড়াই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রান্ট সাহেবকে বাধ্য করেছিল স্টীমার কূলে ভিড়াইতে। এর একটা বিহিত করবেন বলে গ্রান্ট সাহেব চাষীদের কথা দিয়েছিলেন। রিপোর্ট পেশ করার সময় গ্রান্ট সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, 'ন্যায়নীতি উপেক্ষা করে যদি সরকার এখনও নীল চাষ অব্যাহত রাখে তবে ভবিষ্যতে একটা ভয়াবহ কৃষক বিদ্রোহ ঘটতে পারে। আর এই বিদ্রোহ ইউরোপের ও অপরাপর মূলধনের উপর এমন এক ধ্বংসাত্মক আঘাত হানবে যা কল্পনাতীত।'[২]

কিন্তু সদাশয়(?) ইংরেজ সরকার নীল চাষীদের অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়ার পরও নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পরন্তু যখন কৃষকেরা বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হল বা বিদ্রোহ শুরু করল তখন তাদের দমন করার জন্যে সেনাবাহিনী তলব করেছিল। নীলকররা গুণ্ডা লাঠিয়াল দল দ্বারা চাষীদের উপর অত্যাচার করেছিল।

---

১. যশোর-খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড) : পৃঃ ৭৭৯।
২. Bengal Under Lt. Governor: Buckland, Vol. 1. P. 251. (Quoted from ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)।

এরপর লড়াই ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সশস্ত্র সরাকরী বাহিনীর সাথে লড়াই করা চাষীদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তবুও তারা পিছু হটেনি। লড়াই করেছে। অনেক লড়াইয়ে তারা জিতেছে। আবার অনেক লড়াইয়ে হেরেছে। কত লোক মরেছে, কত লোক জেলে গেছে। তবুও নতি স্বীকার করেনি। ঘরবাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করেছে, তবুও নীল চাষ করতে রাজী হয়নি। এমন ঐক্য ও দৃঢ়তা ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল।

ইংরেজ শাসকগণ মহাবিদ্রোহের ভয়াবহতা দেখে যে পরিমাণ আতঙ্কিত হয়েছিল, নীল বিদ্রোহের ব্যাপকতা দেখেও তেমনি আতঙ্কিত হয়েছিল। বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর এক চিঠিতে তার স্পষ্ট আভাস রয়েছে,

"I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi ... felt that a short fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in lower Bengal in flames." ২

বড়লাট সাহেব আতংকিত হয়েছিলেন নীলকরদের জন্যে, তার কুঠির জন্যে এবং সংঘটিত বিদ্রোহের ভয়াবহতায়। কিন্তু চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার জন্যে কোন মাথাব্যথা ছিল না বড়লাটের।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন, নীল চাষীদের উপর মহাবিদ্রোহের কোন প্রভাব পড়েছিল কি না, এ প্রশ্ন একান্তই অবান্তর। আগেই বলেছি, মহাবিদ্রোহের বহু পূর্ব হতেই নীল চাষীদের সংগ্রাম চলে আসছিল এবং ব্যাপক একটা সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছিল তাদের মধ্যে। ইতিমধ্যে মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ায় তাদের সেই ইচ্ছা বা প্রস্তুতি আরও দৃঢ় ও ত্বরান্বিত হল।

আবার অনেকের ধারণা মহাবিদ্রোহে চাষীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি, এ কথা আংশিক সত্য কারণ চাষীরা সে সময় নীলদস্যুদের অত্যাচারে যেভাবে পর্যুদস্ত, সে অবস্থায় হঠাৎ তাদের পক্ষে অন্যদিকে সার্বিকভাবে ঝুঁকে পড়া সহজ ছিল না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, চাষীদের পূর্ণ সমর্থন

১. Quoted from নীল বিদ্রোহঃ পৃঃ ১৪০।
(Hiron Mukherjee: Indigo Riots of 1859-60.)

২৫—

ছিল এবং তারা বহুলাংশে সাহায্যও করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নিয়ে বসেছিল সুযোগের অপেক্ষায়।

বহরমপুরে যে দিন সিপাহীরা টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করল, সেদিন মুর্শিদাবাদের হাজার হাজার লোক শুধু-মাত্র একটা লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায়। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর ফেরেদুন খাঁ।[১]

বহু পূর্ব হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খন্ড খন্ড কৃষক বিদ্রোহ চলে আসছিল। কাজেই শাসকদের ভয় ছিল এমতাবস্থায় দেশের আপামর জন-সাধারণ এতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশ থেকে রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ করা সর-কারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। স্বেচ্ছায় কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। যার জন্য যানবাহন ও রসদ সংগ্রহের জন্যে সরকারকে Impressment Act পাস করতে হয়েছিল।

দেশের জমিদার মহাজন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রকাশ্যভাবে সরকারকে সাহায্য করেছিল। মহাবিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ উভয় ক্ষেত্রে এরা সরকারের মদদ যুগিয়েছিল। তবে মহাবিদ্রোহের সময় রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী নিষ্ক্রিয় ছিল। তাদের সমর্থন ছিল না এতে। তার কারণ ব্রিটিশ শাসনের ভয়াবহ রূপ তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। আধা সামন্ত প্রথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল তাদের ভোগ করতে হয়নি। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের আসল মূল্য যোগাতে হতো দেশের সাধারণ মানুষকে।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিচালিত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিমত হল এই ঃ "জগদীশ্বর না করুন, আজি যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে এই উন্নত সভ্য, মানী-কৃতিবিদ বাঙ্গালী জাতি ভারতে অন্যান্য জাতির মধ্যে সর্বাগ্রে

১. 'There were thousands in the city who would have risen at the signal of one who, weak himself, was yet strong in the prestige of a great name'.

.. Kaye: & History of the Sepoy War. 1. P-498.

পতিত, নিগৃহীত এবং সর্বাপেক্ষা দলিত হইবে। তখন বক্তৃতার তরঙ্গ, সভ্যতার করণ্ড উন্নতির সোপান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সবই শূন্যে মিলাইবে। বাঙ্গালী জাতি এখন বরং মহাসুখে আছেন,......।"১

ব্রিটিশ রাজশক্তি সম্বন্ধে এমনি যাদের অভিমত, তারা কি ব্রিটিশ তাড়াবার কাজে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারে? প্রমোদ সেনগুপ্ত অনেক তথ্য উদ্ধার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মহাবিদ্রোহে বাঙ্গালীরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। বাঙ্গালীরা অংশগ্রহণ করেছিল ঠিকই তবে তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান কৃষক এবং কৃষক শ্রেণীভুক্ত নগণ্য সংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু।

বাঙালীর (মুসলমান নয়) বল বুদ্ধির উপায় খুঁজতে গিয়ে যারা বলতে পারে, "......উদার হৃদয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যতদিন না আমাদিগের এই নির্জীবতায় কাতর হইয়া বলোৎকর্ষ সাধনের জন্য যত্ন করিবেন ততদিন বাঙ্গালী জাতির বল বুদ্ধির অন্য উপায় নাই।"২ তারা কি করে বিদ্রোহ করবে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে? যে জাতি বলতে পারে, " ইংরেজকে রাজা করিব" কিংবা "আমরা পরাধীন চিরদিন পরাধীন থাকিব,"৩ সে জাতি ইংরেজ দমনের কাজে হাতে অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়াবে একথা যেমনি অবাস্তব তেমনি হাস্যকর!

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্মের কথা বলতে গিয়ে সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত বলেছেন, ১৮৫৭ সালের জনোত্থানের সময় বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ বাঙালী বাবুদেরও ইংরেজদের মতোই দেশের শত্রু বলে মনে করত। ১৮৫৭-র জনোত্থানের ফলে বাঙালী পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী খুবই বিপন্ন বোধ করে, কেননা এই উত্থান ছিল সর্বতোভাবে তাদের স্বার্থ ও স্বপ্নের বিরোধী। তাই যখন এই উত্থানকে দমনে ইংরেজরা সমর্থ হলো তখন উল্লসিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেনঃ

> ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
> মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।।

এর থেকে সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ব্রিটিশের সহযোগী মানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, অথবা বাবু সম্প্রদায়ের মানে ভদ্রশ্রেণী অর্থাৎ প্রগতিশীল হিন্দু

---

১. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ম খন্ড) বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৫৭।
২. পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ২৫৯।
৩. আনন্দমঠ।

সম্প্রদায়ের যথার্থ মনোভঙ্গি অনুমান করা যায় এবং এই মনোভঙ্গিসম্পন্ন সমাজের মানসেই জন্ম হয় তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের। ১

তবে একথা সত্য যে, পরবর্তীকালে বাঙালীদের মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রধানত এই মহাবিদ্রোহের ফলে। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, "সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল, এক নবশক্তির সূচনা হইল, এক নব আকাংক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।"২

শুধুমাত্র মহাবিদ্রোহে নয়, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফারায়েষী আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন প্রভৃতি বিদ্রোহের ফলে সাধারণ মানুষের (বাঙালী) মনে এক নবচেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানরা প্রথম থেকে ইংরেজ তাড়াবার কাজে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু হিন্দুদের মনে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে মহাবিদ্রোহের পর থেকে। সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায়, "১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। এই একশত বৎসরকাল ব্যাপিয়া মুসলমান জনসাধারণ ইংরেজ শাসক শক্তির সহিত বিরোধিতার পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ওহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি গণবিদ্রোহে মুসলমান জনসাধারণই বৈদেশিক শাসক শক্তির উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপরদিকে ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই হিন্দু সম্প্রদায় ছিল ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে ইংরেজ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান অবলম্বন।

মহাবিদ্রোহের পর হইতে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। হিন্দু ধনিক শ্রেণীর আবির্ভাব ও উহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উন্মেষে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া শাসকগণ ক্রমশ হিন্দু বিরোধী নীতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং অপরদিকে চিরবিদ্রোহী মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষা, সরকারী চাকুরী প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া তাহাদিগকে নবজাগরণোন্মুখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই সময়

---

১. ইসলাম ও ভারতবর্ষ: সুরজিৎ দাসগুপ্ত, পৃ: ১৬৯।
২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ: পৃ: ২১৮।

হইতেই শাসকগোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাকে একটি প্রধান অস্ত্র রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।"১

শিক্ষিত হিন্দু ধনীশ্রেণী শুধুমাত্র ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতা করেনি, তারা মুসলমানদের সর্বদা এড়িয়ে চলারও চেষ্টা করেছে। মুসলমানরা যাতে কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে-- ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় সে বিষয়ে তারা সর্বদা সচেষ্ট ছিল।২

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর চেতনার উন্মেষ ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের সক্রিয়ভাবে ইংরেজ বিরোধিতা আরম্ভ হয় ১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকে। মুসলমানরা তখন কিছুটা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। সুদীর্ঘকাল একটানা সংগ্রামে লিপ্ত থেকে যা হারিয়েছে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রত থাকায় সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিতে পারেনি বা নেয়নি। মুসলমানদের উদাসীন মনোভাবের জন্যে প্রকৃতপক্ষে দায়ী হিন্দুদের স্বার্থপর সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি। এ বিষয়ে নতুন করে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় যে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি এতে কোন সন্দেহ নেই।

মহাবিদ্রোহের মাত্র তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। মহাবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত মনোভাবের ফলেই হিন্দু ধর্ণাঢ্য শ্রেণী নীলচাষীদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল। তাই বলে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বিরাট কিছু করে ফেলেছে তা বলা যায় না। তাদের এ সহানুভূতি ছিল একান্তভাবে মৌখিক। কার্যক্ষেত্রে তা বিশেষ কোন ফল লাভ করেনি। অবশ্য পত্র-পত্রিকা বা পুস্তক-পুস্তিকা মারফতে নীল চাষীদের সংগ্রামে সহযোগিতা যুগিয়েছিল কিছু হৃদয়বান ব্যক্তি। দীনবন্ধু মিত্র, হরিশচন্দ্র ও শিশির কুমার প্রমুখ ব্যক্তি নীলচাষীদের সমর্থনে যে মহৎ ভূমিকা পালন করেছেন ইতিপূর্বে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ৩০৭।

২. Sayed Mainul Haque: The Great Revolution of 1857. p. 30-31.

শিক্ষিত সমাজের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে প্রমোদ সেনগুপ্ত বলেছেন, "যখন নীলকর ও সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা ধর্মঘট করে হাজারে হাজারে জেলে যাচ্ছিল, তখন তাদের সাহায্যার্থে মাত্র দু-একজন মোক্তার কোলকাতা থেকে গিয়েছিলেন। এই কারণে কৃষ্ণনগরে একজন মোক্তারের ৬ মাস কারাদন্ড হওয়ার পর আর কোন উকিল মোক্তার কৃষকদের সমর্থনে অগ্রসর হয়নি। শহরবাসী শিক্ষিতরা কোথাও সভাসমিতি করে বা অন্য উপায়ে কৃষকদের সমর্থন করেছেন কিংবা অর্থ সংগ্রহ করে তাদের সাহায্য করেছেন বলে জানা যায় না। তখনকার বাঙালী শিক্ষিতদের একমাত্র সংগঠন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'ও এতে বিশেষ কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য নিয়মিত সংবাদদাতারূপে মফস্বলের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি না পেয়ে বালক শিশির কুমার ও মনোমোহনকে ঐ কাজে নিযুক্ত করেন। পাষন্ড নীলকর আর্চিবল্ড হিল্‌স যখন হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার অসহায় ও নিঃসম্বল বিধবার বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল, তখন তাকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষিত বাঙালীরা তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। শিক্ষিতদের সহানুভূতি মৌখিকই থেকে গিয়েছিল, বাস্তব আকার ধারণ করেনি। তাই যারা বজরায় চড়ে নীল চাষীদের লড়াই দেখতে যেতেন কলকাতার সেই "বাবু ভেয়েদের" উপলক্ষ করে বাংলার চাষীরা বিদ্রূপ করে গান করত।"১

নীল বিদ্রোহ ছিল নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন। রাজশক্তির হস্তক্ষেপ ও চাষীদের অটুট সংগ্রামী মনোবলের জন্যে পরে তা সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ জনগণের মনে যে সাড়া জাগিয়েছিল, যে সাহস যুগিয়েছিল তারই ফলে নীল বিদ্রোহের সময় অত্যাচারিত সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছিল। জনগণ সাহসী হয়েছিল একই সাথে নীলকর ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে। কোন নেতৃত্ব ছাড়াই সমগ্র দেশে বিদ্রোহের ভয়াবহ আগুন জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিদ্রোহে সফলতার একমাত্র কারণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনা ও অপরাজেয় বৈপ্লবিক শক্তি।

---

১. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৪৮।

# গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা


সুপ্রকাশ রায়ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।

সুপ্রকাশ রায়ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।

সুপ্রকাশ রায়ঃ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক।

বদরুদ্দিন ওমরঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক।

হেমচন্দ্র কানুনগোঃ বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা।

গোপাল হালদারঃ সংস্কৃতির রূপান্তর।

আবদুল গফুর সিদ্দিকীঃ শহীদ তীতুমীর।

অতুল চন্দ্রগুপ্তঃ জমির মালিক।

বিনয় ঘোষঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বিহারী লালঃ তীতুমীর।

আবুল মনসুর আহমদঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর।

প্রবোধ চন্দ্র ঘোষঃ বাঙ্গালী।

ডঃ আবদুল করিমঃ ঢাকাই মসলিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ কালান্তর।

চৌধুরী শামসুর রহমানঃ বাংলার ফকীর বিদ্রোহ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খন্ড।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ আনন্দমঠ।

প্রমোদ সেনগুপ্তঃ নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা।

যোগেশ চন্দ্র বাগলঃ জাতি বৈর।

গোলাম মোহাম্মদঃ জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত।

পন্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রীঃ বাংলার পারিবারিক ইতিহাস, ৬ষ্ঠ খন্ড।
সতীশচন্দ্র মিত্র ঃ যশোর-খুলনার ইতিহাস।
শ্রীমঙ্গল সরকারঃ রাজশাহী জেলার ইতিহাস।
কুমুদনাথ মল্লিকঃ নদীয়া কাহিনী।
ডঃ সুনীল কুমার গুপ্তঃ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ।
নবীনচন্দ্র সেনঃ আমার জীবন।
কেদারনাথ মজুমদার ঃ ময়মনসিংহের ইতিহাস।
ডঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস।
প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্মাঃ বগুড়ার ইতিহাস।
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী।
দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তঃ সাহিত্যের কথা।
শিবনাথ শাস্ত্রীঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।
বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড।
দীনবন্ধু মিত্রঃ নীলদর্পণ।
ওয়াজীর আলীঃ মুসলিম রত্ন হার।
মুস্তাফা নূরুল ইসলামঃ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত
হান্টারঃ পল্লী বাংলার ইতিহাস (অনুবাদ, বাংলা একাডেমী)।
রাধারমণ সাহাঃ পাবনা জেলার ইতিহাস, ৩য় খন্ড।
সুরজিৎ দাশগুপ্তঃ ভারতবর্ষ ও ইসলাম।
ডঃ ওয়াকিল আহামদঃ উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা।
আজিজুল হকঃ মুসলিম বাংলার শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা।
বিশ্বকোষ।

## ইংরেজী

Colonel G. B. Malloson : The Indian Mutiny of 1857.

Karl Marx: Future Results of British Rule in India.

Karl Marx: British Rule in India.

Young Husband: Transaction in India (1786).

W. W. Hunter : Annals of Rural Bengal.

A.K. Mukherjee : Land Problem in India.

R.P. Dutta : India to-day.

J. Field : Land-Holdings.

M. Raymond : Sayor-al Muthakhkherin (English Translation).

N. K. Sinha : Economic History of Bengal from palassy to Permanent Settlement. Cal. 1956.

Sir Arther Cotton : Public works in India.

K. S. Shelvankor : Problems of India.

W. W. Hunter : The Indian Musalmans.

W. W. Hunter : Statistical Accounts of Bengal.

Larry Collins and Dominique Lapierre : Freedom at Midnight.

Brooks Adams : The Law of Civilization & Decay.

W. S. Lilley : India and its Promlem

H. H. Wilson : History of British India.

Ray Bahadur J. M. Ray : Fakir and Sanyasi Raiders in Bengal.

M. R. Gubins : An Account of the Mutinies in Oudh.

Buckland : Bengal Under the Lt. (Governors. Vol. I & II.)

G. Watt : Pamphlet on Indigo.

Blair B. Kling : The Blue Mutiny.

W. Milleurn : Oriental Commerce. (London 1813)

Lal Bihari Dey : Bengal Peasant Life.

H. C. Chakladar : 'Fifty years ago' (an article, Dawn Magazine July, 1905)

L.S.S.O. Mally : Bengal, Bihar and Orissa under British Rule.

Wilfred Cantwell Smith : Modern Islam in India.

A. R. Mullick : British Policy.

Wylie : Bengal as a Field Mission.

Dr. James Wise : The Eastern Bengal.

Dr. James Wise : Sariyatulla and the Farazis (articles)

E. Thornton : History of India, Vol. V.

Henry Beveridge : District of Bakharganj : its History and Statistics, Lon. 1876.

James Taylor : Topography.

J. E. Gastrell : Jassore, Faridpur, Backerganj.

Muin-ud-Din Ahamed : History of Faraidi Movement in Bengal.

Shahi Bhushan Chowdhury : Civil Disturbances in India, 1765-1857.

Sudhi Prodhan : Indigo Mirror.

A. Karim B. A. : Muhammadan Education in Bengal.

Thomas Lowe : Central India During the Rebellion of 1857-58.

J. Kaye : History of the Sepoy War.

Sayed Mainul Hoque : The Great Revolution of 1857.

The Columbia Encyclopedia, Vol. 3.

New Calcutta Directory, Cal. 1857.

M. A. Rahim : Muslim Society and Politics in Bengal.

A. R. Mullick : British Policy and the Muslim.

R. C. Mazumdar : Bengal in the Ninteenth Century.

Ram Gopal : Indian Musalmans.

Hunter : Report on the Indian Education Commission.

## পত্র-পত্রিকা

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারের প্রতিক্রিয়াঃ ডঃ সিরাজুল ইসলাম)

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ; ৩য় বর্ষ, ১৩৮২, (ডঃ আহমদ শরীফ লিখিত প্রবন্ধ—বঙ্কীম বীক্ষাঃ অন্য নিরিখে)

প্রবন্ধ—বঙ্কীম বীক্ষাঃ অন্য নিরিখে)

সাহিত্য পত্রিকা, ১৩০৮ বাং, ১২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

সংবাদ প্রভাকর, ১২.৩.১৮৬০

দৈনিক আজাদ, ১৭ই আগস্ট, ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ, ৯ই জুলাই, ১৯৬৯

সংবাদ কৌমুদী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮

প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৫৬

দৈনিক বার্তা, ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৬ ইং

Calcutta Review, 1844

Calcutta Review, 1848

Calcutta Review, 1849

Calcutta Review, 1860

Calcutta Review, 1861

Hindu Patriot, 12th May, 1860

Hindu Patriot, 17th March, 1860.

Hindu Patriot, 11 Feb. 1860

Hindu Patriot, May 19, 1860

Indian Field, 21st August, 1858

Amritabazar Patrika. 22 May, 1874

## সরকারী রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিলপত্র

Fourth Parlimentary Report (1773)

Bengal Irrigation Committee Report, 1930

Report of Mr. P. Nolan, S. D. O. Serajganj dt. 23. 4. 1874
Indian Famine Commission Report, 1880
Census Report, 1951 (India) Vol. VI.
Indigo Commission Report, Evidences.
Report of Lord Bantick, 30th May, 1929.
Census of India Report, 1911 Vol. I, Part I.
West land's Report on Jessore, Khulna.
Speech of Lord William Bantick, dt. Nov. 8, 1829.
Letter despatched from Sey. to State for India to the Govt. of India, July 1862
Memorandum on Parmanent Settlement.
Secret Department Proceeding, dt. 21 Jan. 1773
Letter from the Superviser of Natore to the Council of Revenue, dt, 25th Jan. 1772.
Mr. Francis Gladwin's Letter to the Provincial Council of the Company.
Letter to Revenue Board dt. 5th Dec. 1763.
Letter wrote to the Governor General by the Court of Director dt. 28th Aug. 1800.
Bengal Board of Trade (Indigo) Proceedings, 1793-1833
Papers relating to Indigo Cultivation in Bengal,
Letter dt. Sept. 1856 to the Sey of Governor from Mr. F. Goulds Burrey, Commissioner, Rajshahi Div.
Selections from the record of the Govt. of Bengal.
Commercial System of East India Company.
Journal of Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIII. Part. III. No. I.
Parliamentary Papers, Vol. XVII. 1861
Memorandum of the Nawab of Bengal to the English Governor, May. 1762

Politioal Proceedings Nos ; 63-70, 280

Journal of Asiatic Society of Bengal, 1903

Minutes by Lord Macauley, 17th Oct. 1835

Minutes of Sir Chales Thomes Metcalfe, dt. 19th Feb. 1929.

J. A. S. P., Vol III

Minute of Sir V. P. Grants, dt. 17th Sept. 1860

Clive's Letter to the Directors of East India Company, Sept. 30, 1765

Mymensingh D. G.

Faridpur D. G.

Jessore D. G.

Nadia D. G.

Pabna D. G.

Imperial Gazetteer, East Bengal, Assam.

Trial of Dudumiah.

Establishment, Dacca University (M. S. Khan)

# নির্ঘণ্ট


অ

অক্ষয় কুমার দত্ত ১৯৬, ২০৩
অজিত গিরি ১২৩
অর্ধেন্দু মুস্তাফি ৩৪৫
অবিনাশ কর ৩৪৫
অমৃত বাজার ৩০০
অযোধ্যা ১৫৫ ১৫৬ ৩১৬
অরবিন্দ ঘোষ ৩৮, ৩৯
অশোক মিত্র ৬৫

আ

আউন্ড ওয়েলস, স্যার ৩৫৬
আকবর দপাদার ১৭৯
আওরঙ্গজেব, সম্রাট ৩৩৭
আওরঙ্গবাদ ২১৪
আগ্রা ১৫৫ ১৫৬
আর্চিবল্ড হিলস ২১০, ২২১, ২৪৩, ২৯৯, ৩৪৮
আজিমাবাদ ৬৮
আজিম উদ্দিন ২৬০
আনন্দ মোহন ১৬০
আনন্দ মঠ ১০৮, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩২
আফাজুদ্দি ২৭৬
আফরা ২৪৩
আফ্রিকা ১৪৫, ১৫৭, ১৫৮
আবদুল মনসুর ৫২
আমীর আলী, সৈয়দ ৭৪, ৮৮, ৯০
আজিজুল হক, স্যার ৯২
আবদুল লতিফ, নবাব ৮৮, ৯০, ১৭৯, ১৮০, ২১৫, ২১৬, ২৯৭, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০
আবদুল আলী, নওয়াবজাদা ১১১
আবদুল জলিল ২৫৯
আবদুল গাফফার ২৭০, ৩৭১
আবদুর রসুল ৩৩৭
আবদুর রহমান ২৮৬
আভ্‌লক্‌ ফন্‌ ৩১৭
আভিরী ১৪৬
আবদুল করিম ৩৭২
আমেরিকা ১৫০, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৮৯, ৩৪৮
আমীর খাঁ ২৪৭, ৩৭২
আমিরুদ্দিন ২৬৭
আলীগড় ৯০
আলীপুর ৩৭৬,
আন্দামান ৩৭২
আলেপ শাহী ২
আলীবর্দি খাঁ ৪
আলম চান্দ ৩
আর্ট আইন ৩১৬
আরব ৯৬, ৯৯
আরাণী ২৩৬

আলেকজান্ডার কোং ১৬০
আলেকজান্ডার স্মিথ ২১৬, ২৫৬
৩০৪
আলেকজান্দ্রিয়া ১৪৮
আশুতোষ দেব ৩২০
আসান নগর ২৯১
আসাদ উল্লাহ মন্ডল ১৭৯
আসাম ৮৬, ২৬১
আহামদ শরীফ ১৩৩
আহাসান উল্লাহ মন্ডল ৩৩৯
আম্বালা ৩৭০
আহাম্মদ খান, সৈয়দ ৩৭৪
আফগান ৭৯
আমানত উল্যা, চৌধুরী ১২০
আর্থার ব্রুস ২২১, ২৭২
আসিক মিয়া ২৫৮

ই

ইছামতি ২৪১
ইনায়েত ৩৭২
ইউসুফ বিশ্বাস ২২১
ইন্ডিয়ান ফিল্ড ১৮৮, ২৮০, ৩৩৫
ইন্ডিকভ ১৪৭
ইটালী ১৪৮
ইন্দ্রনাথ নন্দী ৩৮
ইডেন, লেসলী ১৮৩, ১৮৪, ১৮৮
১৮৯, ১৯২, ২১৩, ২৭৮
ইজিলপুর ২৩৬
ইরাবতী ১৪৬
ইলাইপুর ২৭৪
ইলিয়ট ১৮০, ২৭৩
ইসলামপুর ২৩৬
ইস্কান্দারপুর ২২০
ইস্ট ইন্ডিয়া কোং ২৪, ৪৯
৭৯, ১০১, ১৫২, ১৫৬, ২৩৩,
২৪২, ৩৬৩, ৩৭৩
ইয়াহিয়া, মীর ৮৪
ইয়র্ক শায়ার ৩৫৭
ইয়াহিয়া আলী, ইমাম ৩৭০, ৩৭১
ইয়ং হাসব্যান্ড ১২
ইংলিশম্যান ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭,
৩৬০
ইংল্যান্ড ২৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯,
৬০, ১২৯, ১৪৫, ১৪৮, ১৫৩,
১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬২,
১৬৩, ১৬৯, ১৭০, ১৭৪, ২৯৬

ঈ

ঈশা খাঁ ২
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৬৪, ১৩৯, ৩৭৯

উ

উইলিয়াম ২৪২
উইলফ্রেড, অধ্যাপক ২৪৭
উইন গেট, জর্জ ১৩৪
উমিচাঁদ ২, ৩, ৪, ৬, ৩৭৯
উমিদ রায় ৩
উড়িষ্যা ২৮, ৫৬, ১১২, ১১৩
উইলিয়াম কেরী ৮০

ঋণ সালিসি বোর্ড ৫৩

এ

এগলিংটন ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯
এ্যাডামস্, ব্রুক্স ৫৭
এডওয়ার্ড টমসন ১১৭
এন্ডারসন, মিঃ ১৫৪, ২৩৮
এনেস্টি ২৪৭
এলিজাবেথ, রাণী ১৪৯
এশিয়া ১৫৭, ১৫৮
এশিয়াটিক জার্নাল ১১১
এহছান খাঁ ২৬৩

ও

ওনীল ২৫৬
ওকান ২৯৮
ওলন্দাজ ৫৬, ১৪৯
ওয়াইজ, জে, পি, ১৫৪, ২২২
ওয়াটসন কোং ২৩৬
ওয়াটস ১৮৮
ওয়াল্টার রেট্ ৩৫৫
ওয়াজীর আলী ২৭০
ওহাবী আন্দোলন ১০০, ১৩৩
১৩৪, ২৫৮, ৩৭২, ৩৮৮

ক

করিম খাঁ ৩৭৭
কলুটোলা ২৪৭
কলিন ১৬৪
কর্ণওয়াল লুইস, স্যার জর্জ ৩৬২
কর্ণওয়ালিস, লর্ড ১৬, ১৯, ২১,
২৬, ৩২, ৫৩, ৫৪, ১৫২, ২০১
৩২০, ৩৩৬, ৩৭০
কর্নেল সুট ৪
কটক ৬৮, ৩২৮
কংগ্রেস ৫১
কর্কবার্ন ২০৮, ২০৯
কলিকাতা মাদ্রাসা ৮০, ৮১, ৮২
করম আলী চৌধুরী ২৪৩
কাশিম বাজার ১১০
কানপুর ১১১, ১২৫
কারুন দোষী ১৪৬
কানাড়ী ১৪৬
কান্তে ১৪৮
কালারোয়া ২১৫, ৩৩৯
কাপাস ডাঙ্গা ২১২
কালু মন্ডল ২০৮, ২০৯
কালু চুনিয়া ২২১, ২৭১, ২৭২
কালাচাঁদ ভট্টাচার্য ২২১
কালি কিশোর ২২২
কালিদাস খালি ২৩৬
কানুঘাট ২৩৬
কাটগড়া ২৩৬ ২৮৬
কালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২৫৫
কালি প্রসাদ কাঞ্জিলাল ২৬৬, ২৬৯
কাদির বক্স ২৬৬
কাঁচি কাটা ২০৯
কানাইপুর ২৬৫
কাগমারি ২৭৫

কালি গঙ্গা ২৯৬ ৩০৫
কাশিনাথ রায় ৩২০
কালি গ্রাম ৩২৮
কালি প্রসন্ন সিংহ ৩৪৯ ৩৫৯
কাউই ৩৫৭
কিশোরী কুমার মিত্র ৩৪০
কিং সাহেব ২৭৫
কিঙ্কর সেন ৩
কিষণ মোহন ১৬০
কীরাত চান ৩
কুচবিহার ১২০
কুর্জ ১৪৬
কুমিল্লা ১০৮, ১৫৪, ২৬১
কুতুবুদ্দিন ২০৯
কুমিদপুর ২৩৬
কুমারখালি ৩২৮ ২৪২
কুমারগঞ্জ ২৪৩
কুমুদ মল্লিক ২৪৬
কুইন্স ক্যান্ড ২৭৬
কুষ্টিয়া ৮০, ২৯৪, ২৯৬, ৩৪৯
কুথবাট, মিশনারী ৩৩৩
কেরোলিনা ১৫১
কেনি, টি, আই ২৯৮, ৩৪৯
কোলিন্নাম ১৪৮
কৃষ্ণদেব রায় ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫
কৃপানাথ ১২০
কৃষ্ণমোহন বড়াল ৩২০
কৃষ্ণপ্রসাদ রায় ২৯৮, ৩০০
কৃষ্ণনগর ২১১, ২৪৪, ২৪৫
২৫৬, ২৯১
কৃষ্ণবল্লভ ৫
ক্যানিং, লর্ড ১০১, ২২৯, ২৭৭
৩৮০, ৩৮৫
ক্যারেল শ্লুম ১৫২
ক্যাম্পবেল ২৭৯
কৈলাশ চন্দ্র ২৪৫, ২৪৬
ক্লাইভ, রবার্ট ৬, ৮, ৩৭৭
ক্যালকাটা জার্নাল ৮০
ক্যালিফোর্নিয়া ১০৫
ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৫, ২০৫
২৭৮, ২৯৭, ২১৫
ক্রম্পটন ৫৮

খ

খড়গড়া ২৩৭
খান মামুদ জোলা ২৭৬
খুলনা ২৩৬, ২৪১, ২৭৫,
২৮৭, ২৯০, ৩০০
খাজুরা ২৭৯
খাল বোয়ালিয়া ২৩৬, ৩২০
ক্ষেত্রমণি ৩৪৫, ৩৪৮
ক্ষুদিরাম ৩৭০

গ

গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ ২৬
গঙ্গা গোবিন্দ ১৬০
গয়রাতুল্লা ২৭৬
গান্ধিজী ৪১, ৪২, ৪৩
গারো বিদ্রোহ ১৩৭
গাজীপুর ১৯৪

গিরীশচন্দ্র ঘোষ ২৭৮, ৩০৩, ৩৪৫
গোপাল হালদার ৩০, ৯৫, ৯৬
৯৭, ৯৯
গোয়ালিয়র ১১৫
গোপাল মন্ডল ১৭৯
গোউল্ডস বেরী ১৮১
গোপাল লাল মিত্র ১৮১
গোবিন্দপুর ২১১, ২৫৫
গোপালপুর ২৪৪
গোবর ডাঙ্গা ২৫৪
গোলকনাথ রায় ২৭৫
গোলাম রইছ খাঁ ২৯৩
গুরোতেমালা ১৫১
গুরুদাসপুর ২০৬
গুলজার খাঁ ২৯৩
গৌরিপুর ৩৭
গ্যাবাট, জে, টি, ১১৪
গ্যালি ১৪৮
গ্রীস ১২৯
গ্রান্ট, জন পিটার ১৭৫, ১৭৬, ১৮৮
২৯৫, ৩০৫, ৩০৬, ৩১২, ৩১৬
৩১৭, ৩৬১, ৩৮৩, ৩৮৪
গ্রে ১৮০, ২১৪, ২২৫, ৩৪০
গ্ল্যাডস্টোন ৩৫৪
গৌর ধোপা ২৭৬

**ঘ**

ঘোড়াখালি ২৪৪

**চ**

চলনবিল ২৯৩
চট্টগ্রাম ৮৪, ৯০, ২৬১
চন্দ্রশেখর ১২৮, ২৯০
চন্দন নগর ১৫২
চন্দ্রকুমার পাইন ১৬০
চন্দ্রপুর ২০৬
চন্দ্রা ২০৬
চন্দ্রকান্ত দত্ত ২৭৬
চন্দ্র মোহন চ্যাটার্জি ৩০৭, ৩০৮
চান্ডপুর ৩০০
চব্বিশ পরগনা ২৪২, ২৮১, ৩২৮
চারঘাট ২০৬
চাঁদপুর ২৭৯
চার্লস উড ২৯৬
চাকলা ৩০৭
চিনরায় ৩
চীন ১৪৫
চেরাগ আলী ১২০, ১২৪, ৩৭১
চুন্না ২০৮
চৌগাছা ২৭৩, ২৮৫

**ছ**

ছালকোপা ২৯৮
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১১, ১২
ছুটি খাঁ ৯৮
ছোবহান আলী ১২৪

জ

জগৎ শেঠ ২, ৩, ৬, ৩৭৯
জয় নারায়ণ ঘোষ ২৬৫
জগদীশপুর ৩২৮
জন ব্রাইট ৩৫৪
জলপাইগুড়ি ১২০, ১২৩, ২৩১
জহুর শাহ ১২৪
জন হুইগেন ১৪৭
জব চার্নক ১০৪
জন শোর ১৫৫
জয়চাঁদ পাল ১৮৮, ১৯২
জতর কাঠি ২৪৪
জমিদার দর্পণ ৬৬, ১২৯, ১৩১, ৩৪৯
জমির উদ্দিন, শেখ ৮০, ৩৭৭
জমির উদ্দিন, জন ৮০
জেমস ওয়াইজ ২৫০, ২৫৮, ২৬৪, ২৬৯
জামালপুর, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ১০৮, ২২১, ২৭৪, ২৭৫
জাফর ৩৭০, ৩৭২
জার্মানী ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০
জাকের মন্ডল ১৭৯, ৩৩৯
জাহানাবাদ ১৮০
জাহাঙ্গীর নগর ৩, ৬৮
জানকী রায় ৪
জানোবিয়া ২৪২
জালাল উদ্দিন মোল্লা ২৬৪, ২৬৫
জাহান্দার খাঁ ২৯৩
জোড়হাট ৩০৪
জোড়াদাহ ৩৫২
জ্যাকসন ২০৮
জোড়াসাঁকো ৮৫

ঝ

ঝাঁসীর রাণী ১৩৯, ৩৭৩
ঝাউদিয়া ২৪৩
ঝিকরগাছা ১৭৯, ১৮০, ৩০০, ৩৩৯

ট

টেকচাঁদ ঠাকুর ৩৫০...
টেম্পল, আর ৩০৭
টেইলার ২৩৭
ট্রেভলেন, চার্লস ৬২
টাফট, মিঃ ১৫৪, ২৩৭
টামবুল ১৮২
টাভারনিয়ার ১৪৬
টুইড ২০৮, ৩০৪
টেকনাফ ৩৬৯

ড

ডালহৌসি, লর্ড ৮২, ৩৩৯
ডানবার ৬১
ডায়োসকরিডেস ১৪৭
ডাইড হেরেন ১৪৯
ডানলপ ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮
ডালহৌসি, লর্ড ৩৩৯, ৮২
ড্যাম্বেল ২২০, ২২১
ডিকেন্স ৩৫৭
ডিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন সাহেব) ২১৯
ডেভিডসন ১৫৯, ১৮২

ডোভ্রিস ২৫৫
ডেইলী নিউজ ৩৫৯

ঢ

ঢাকা ৬১, ৬২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ১১৪, ১১২, ১১৬, ১২০, ১৫৪, ১৫৬, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭১

ত

তত্ত্ববোধিনী ৩৩, ৩৪, ১১৬, ২০০
তালডাঙ্গা ১৫২
তাজু মন্ডল ১৯৩
তাঁতিয়াটোপি ২৮১, ৩৭৩
তীতুমীর ৪৪, ১৩৭, ১৩৯, ২৪৬, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৭৪, ৩২৪, ৩৩৫, ৩৭৩
তুজার ডাঙ্গা ২৪৩
তোরাপ ৩৪৫, ৩৪৮
তোঁতা গাজী ১৭৯, ৩৩৯
ত্রিপুরা ১৩৭, ১৩৮
ত্রিবাঙ্কুর ১৪৮
তুখমে নীল ১৪৫
তিলক ২৮৬
ত্রিহুত ৮৩

থ

থানেশ্বর ৩৭০
থর্নটন, ডি ২৫৩

দ

দমদমা ২৩৬
দর্পনারায়ণ-ঠাকুর ৩২০
দাবিস্তান ১১১
দামুর হুদা ২১২, ২১৩
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৫৩, ৬৯, ৭১, ১৭১, ১৭২, ১৮৩, ২০০, ২০২, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৭১
দিল্লী ১৩৭, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৭৬
দিগম্বরপুর ২৪৪
দিগম্বর বিশ্বাস ২৮৫
দিলপৎ সিং হাজারী ৩
দিগাপাতিয়া ২
দিনাজপুর ১১৯, ১২২
দীনবন্ধু মিত্র ১৩২, ২০২, ৩০০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৫৪, ৩৮৯
দেবী চৌধুরাণী ১২০, ১২৫, ১৩১
দেলাতুর ১৯৫
দেওয়ানগঞ্জ ২৩৬
দেবনাথ রায় ২৫৫, ৩৩০
দেবী (প্রসাদ) সিংহ ১০, ১১, ২৬, ২২৫
দুদুমিয়া ৪৪, ২৫৮, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৮৫, ৩০০, ৩৭১, ৩৭৬
দুর্গাপুর ২৩৬
দুরমুট ২৩৬
দুয়বীন ৭৩

দুরবাসিনী ৩২৮
দৌলতপুর ২৪৪
দৌলত চৌকিদার ২৯০
দোয়াব ৩১৬

ধ

ধুল্যাউর্ত্তর ২৩৬
ধোবরা খোল ২৩৬
ধোপাদি ২৪৩

ন

নওয়াব আলী চৌধুরী ৮৭
নদীয়া ১৫৪, ১৭৮, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২০৯, ২১৭, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৯, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬ ২৫৭, ২৭৩, ২৮০, ২৮১, ২৮৫, ২৯৯, ৩৩০, ৩৪৭, ৩৪৭, ৩৬১,
নগেন্দ্রনাথ বসু ১২০
নন্দলাল ৩
নন্দনকুমার ৩, ৬
নর্মণস, বিচারপতি ৩৭২
নন্দকুজা ২৩৬
নন্দগাছি ২৩৬
নবীন মাধব ৩৪৫
নন্দনপুর ২৩৬
ন'হাটা ২৩৭, ২৪২
নড়াইল ২৩৭, ২৪৩
নাজিমউদ্দৌলা ৬৮
নবকৃষ্ণ ৬, ৭০
নবীনচন্দ্র সেন, কবি ২৭০
ননী মাধব ৩৪৮
নীলদর্পণ ৬৬, ১২৯, ১৩২, ৩০০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯
নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ৫১
নিশ্চিন্তপুর ১৫৪, ২৩৭
নিউ মার্চ ৩৫৭
নীলগঞ্জ ১৫৪, ২৩৮
নাটোর ২, ১১৭, ১৮১
নাড়িবাড়ী ২৩৬, ২৯০
নান্দিনা ২২১, ২৩৬
নাভুন নীল ১৪৫
নারায়ণগঞ্জ ২৬৬
নারিকেল বেড়িয়া ২৫৬, ২৫৭
নানা সাহেব ১৩৯, ২৮১, ৩৭৩
নারায়ণপুর ২৮৬
নুরেনবার্গ ১৫০
নোয়াখালী ৮৫, ২৬১, ২৬৫
নোয়া মিয়া ২৭০

প

পর্তুগীজ ১৪৯, ১৫১
পক্ষীমারি ২২১, ২৩৬, ২৭২

পলদিয়া ২৪৩
পল্লশ্রী ৩, ৪, ৭, ৫২, ৫৭, ৬০, ৬৮, ১০১, ১১০, ৩৬২, ৩৬৯
পরাগল খাঁ ৯৮
পাইকপাড়া ৩৫৯
পান সাগর ২৩৬
পাখাইল খাড়া ২৩৬
পাঁচ চর ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮
পারাগ্রাম ২৬৭
পাকুল্যা ২৭৫
পাঁচপুরা ৩৩৯
পাটনিঘাট ২৭৬
পাঞ্জাব ৮৮, ১৫৬, ৩৭২, ৩৭৬
পাটনা ৩৭১, ৩৭১, ৩৭২
পাবনা ৫৯, ৭৭, ১১৬, ১১৯, ১৪০, ১৫৪, ১৮০, ২১৬, ২৩৬, ২৬৬, ২৮১, ২৯৫, ২৯৭, ৩২৮
পাঁচু শেখ ২৯৮
পামার, জন ৩২১
পামার কোং ১৬০
পাথর ঘাটা ২১১
পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ৭
পেটারসন ৩৫৭
পেয়ারপুর ২৩৬
পেশোয়ার ৩৬৯
পোড়াঘাট ২৩৬
পোড়াদাহ ২৩৭
পুকুরিয়া ২
পুর্ণিয়া ৭৭
প্রিনসেপ ১৫৩
প্রতাপচন্দ্র সিংহ ৮৫, ৩৫৯
প্রমথনাথ রায় ৩২০
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২৩৪, ৩১৯, ৩২১
প্রেস্ট উইচ ১৮৪
প্রাণকৃষ্ণ পাল ২৬৬
প্রুশিয়া ৩৪৮
প্যারী সুন্দরী ২৯৪, ২৯৫, ৩৩৬
প্রমোদ সেনগুপ্ত ২৯৬, ৩৩৬, ৩৮৭, ৩৮৯
প্রজাস্বত্ব আইন ৫৩
পিয়ারসন, মে ৮০

ফ

ফজলুল হক ৮৮, ২০০
ফরাসী ৫৬, ১৪১, ১৫৩
ফরায়েজী আন্দোলন ১০৩, ১০৭, ২৭১, ২৭৫
ফকীর মোহাম্মদ, কাজী ৩৩৭
ফকির বিদ্রোহ ১০০, ১০৪, ১১০, ১১১, ১১৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৬, ২২০, ৩৬৮
ফকীর হাট ২৬১
ফকীর মামুদ ২৭৬
ফতেহাবাদ ৩৭২
ফরিদপুর ৭৬, ১৬৮, ১৭৬, ১৯৪, ২৫০, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৪, ২৬৮

২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১, ২৭৫, ২৮১, ৩০০, ৩৫১
ফারলং ২৪১
ফার্গুসন, উইলিয়াম ফ্রেডারিক ২৯৮, ২৯৯, ৩০৭, ৩০৮, ৩৫৫
ফেনী, টি, আই, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬
ফেন্টন ২৯২
ফেরেদুন খাঁ ৩৮৬
ফ্রেডারিক সুড়, পাদ্রী ২১২, ২১৩
ফোর্ড, নীলকর ১৯৫
ফুরফুরা ২৫৯
ফ্রান্সিস, রাজা ১৪৯
ফ্রান্স ১২৯, ১৪৫,
ফর্বস ১২৯, ১৪৫
ফিলিপ জে, হারটগ ৮৭
ফিলিপস, জন ১৫১
ফিল্ড, জে, ২৬, ২২৯

ব

বর্ধমান ২, ৭৬ ৮৩
বঙ্গদর্শন ১৩২
বহরমপুর ৩৮৬
বগুড়া ৭৬, ১২২, ১২৩, ১২৪, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০
বদীউদ্দিন, দরবেশ ১১১
বসরিয়া ১১১
বঙ্গ-ভঙ্গ ৪০, ৪১,
বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ৫১, ১৪০
বঙ্কিমচন্দ্র ৫৩, ১০৭, ১২০
১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ২০০, ২৮৯, ২৯০, ৩১৯, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৭৯,
বরিশাল ৭৭, ১০৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৬, ২৮৫
বঙ্গদূত ১৭৭
ব্লন্ড, মিঃ ১৫৪, ২০৭
বনগ্রাম ২৪১
বহিরদিয়া ২৭৬
বার্কল্যান্ড ১৪০, ২০০, ২০৯
বাগদাদ ১৪৮
বারুন্দি ১৫৪, ২০৭
বারাসাত ১৫৪, ১৮৩, ১৮৯, ২৪৭, ২৫৬, ২৫৮, ২৭৮, ৩২৪
ব্যারাকপুর ১০৮
বাকুড়া ১৭০, ১৮৬
বাকের আলী ১২০
বারপাখিয়া ২৯২
বার্নেট ১৬০
বাঁশবেড়িয়া ২১৩
বাবুখালি ২০৭
বাউলিয়া ২৪৩
বামনদাশ ২৪৪
বারুইপুর ৩২৮
বাশরত আলী ২৬৯
বাখরগঞ্জ ২৬৫
বাহাদুরপুর ২৬৬, ২৭০

বামনদি ২৭৯
বারুইখালি ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯
বার্নেস পিক্‌স ৩৫৮
বাহাদুর শাহ, সম্রাট ৩৭৫, ৩৭৬
বিনোদিনী দাসী ৩৪৫
বিন্দুমাধব ২৮৫
বিহার ১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ২৪, ২৮, ৬০, ৬৭, ১০০, ১১৩, ১১৭, ১২০, ১২৪, ১৬৩, ১২১, ২২৩, ২৬০, ৩১৬
বিপীন বিহারী গাঙ্গুলী ৩৮
বিবেকানন্দ, স্বামী ৫৩, ১০৫
বিবেকানন্দ, স্বামী ৫৩, ১০৫
বিবেকান্দ, স্বামী ৫৩, ১০৫
১৯৭, ৩৩৪
বিশ্বম্ভর ১৬৫
বিউফোর্ড ১৮০
বিষ্ণুঘোষ ২২০
বিড়ালদহ ২৩৬
বিজলিয়া ২৩৭, ২৯৮, ৩০৪
বিলধারিয়া ২০৬
বিহারী লাল ২৪৭
বিক্রমপুর ২৭১
বিশ্বনাথ ২৭৩, ২৭৪
বিষ্ণু চরণ ২৮৫
বিমান বিহারী মজুমদার ৩২৪
বিদ্যাসাগর ৩৩৪, ৩৪৫
বিডওয়েল ৩৪০
বিপীন চন্দ্র পাল ১০৮
বীরদত্ত ৩
বুড়িগঙ্গা ১২১
বুলিয়া ২০৬
বেনারস ৭
বেন্টিক, লর্ড ২২, ২২৬, ২০২, ২৫৭, ২৫৮, ৩২২
বেলজিয়াম ১৫০
বেলনাবাড়ী ২১৬
বেলপুকুরিয়া ২২১
বেঙ্গল হরকরা ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৬০
বেলায়েত আলী ৩৮৭
ব্রেনাল, লেঃ ১২৪, ১২৫
বোরহানা ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৯
বাঁরা বাড়িয়া ২৩৬
বীরভূম ৮০, ৮৩, ৮৬, ১৭০, ৩৭৭
বীর নগর ২৪৪
ব্যারেটা ১৬০
ব্রহ্মদেশ ১৪৬
ব্রজপাল চৌধুরী ২২১
ব্রাহ্মণপাড়া ২০৬
বৃন্দাবন সরকার ২০৮
বৃন্দাবন তেওয়ারী ৩৭৭
বৃন্দাবন দত্ত ২২১
বোম্বাই ২৫, ৮৮, ১৫৬, ১৬২, ২৯০
বিরাহিমপুর ৩২৭
ব্রোড্রিক ২২০

ভ

ভবানী পাঠক ১২০, ১২৪
ভগীরথ পাঠক ২২২
ভাগি বিবি ২৮৮
ভারত ৫৮, ৬২, ৬৭, ৮৩, ৯৫, ৯৬, ১০৫, ১০৬, ১১৩, ১২৯, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ২৪৯, ২৫২, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৮৯, ৩১৫, ৩২৪, ৩২৫, ৩৬৫, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭২, ২৭৩, ৩৭৪, ৩৭৮
ভাগলপুর ৭৬
ভাওয়াল ২২২
ভাজনঘাট ২০৬
ভাস্কর ৩৩৫
ভূপেন্দ্র দত্ত ২৪৭
ভূষণা ৩৩৭
ভূপৎগিরি ১২৩
ভূপৎ রায় ঐ
ভিক্টোরিয়া, রাণী ৩৭৩
ভৈরব চন্দ্র মিত্র ২৭৬

ম

মতিউল্লা ১২৪
ময়মনসিংহ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৭৭, ১২২, ১২৩, ১২৪, ২২১, ২৩৬, ২৬০, ২৬১, ২৭৫
মহাম্মদ মহসীন, হাজী ৮৩
মহাজনী আইন ৫৩
মহাভারত ৯৮
মজনু শাহ ফকীর ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৩০
মস্তানীড় ১১৯, ১২০
মঙ্গলপান্ডে ১৩৮
মথুরা মোহন দে ১৬০
মজুমিদন ২১৬
মনাষ্টিসোর ২১৫
মহিষকুন্ড ২৩৭, ২৪৩
মদনধারী ২৩৭
মদন নারায়ণ ঘোষ ২৬৫
মক্কা ২৬০
মহেশচন্দ্র চট্ট ২৯৯
মথুরা নাথ আচার্য ৩০০
মধুসূদন দত্ত, মাইকেল ৩৩৭, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৪
মতিলাল সুর ৩৪৫
মাস্কিয়ের ৩৫৭
মারভান্ড ওয়েলস, স্যার ৩৫৮, ৩৫৯
মল্লিকপুর ২৯৮
মনোমোহন ৩১০
মাদ্রাজ ৬, ৮৮, ১৬২, ৩১৬
ম্যাঞ্চেস্টার ৬২
মাসুমে ২৫৭
মার্হানপুর ১১১, ১২৪
মানিক চাঁদ ৩, ৬

মালদহ ১২০, ২৫১, ২৮৬, ৩০০
মার্কোপলো ১৪৮
মার্সাই ১৪৮
মাহমুদশাহী ২, ১৫৪, ২০৮
মাধব চরণ দে ১৬০
মানভূম ১৬৮, ১৭০
মাদারীপুর ২৫৯, ২৭০
মাথুর বিশ্বাস ৩৪৮
মেদিনীপুর ১৬৮, ৩৭৭
মেটকাফ, চার্লস ২৩২
মেহেরুল্লাহ, মুনশী মোঃ ৮০
মেঘাই সর্দার ২৯১
মেহেরপুর ৮০
মেকেলে, লর্ড ৮, ৬৩, ৬৪, ৮২, ১৮৩, ১৮৪, ২০২, ৩১৮
মুর্শিদকুলি খাঁ ৬৯, ৭৮
মুঙ্গের ২৬০
মুর্শিদাবাদ ১, ৪, ১২, ১৩, ৬৮, ৬৯, ৮০, ৮৮, ১৫৪, ১৫৫, ২১৬, ২৫৯, ৩৮৬
মুহম্মদ, হযরত (সঃ) ৯৬,
মুসা শাহ ১২০, ১২৪, ১২৫, ৩৭১
মুন্ডা বিদ্রোহ ১৩৩
মুসলিম লীগ ৫১
মুনিম ২০৮
মুদাফ্য ২২২
মেয়ো, লর্ড ৩৭২
মিশর ১৪৬
মিলবার্ন ১৬০
মিন্টো, লর্ড ১৭৬
মিলার, মিঃ ৩২৭
মিয়াজান, কাজী ৩৭২
মীর জুম্মা ৩৭৭
মীর কাশেম ৮, ৩৭৯
মীর জাফর ৮, ৬৮, ৩৭৯
মীর মোশাররফ ১৩১, ১৩২, ৩৪১
মীরজান মন্ডল ১১৭
মীরগঞ্জ ২৯৮
মোল্লাহাটি ১১৩, ২০৬, ২৪১, ২৫৫, ২৭৯, ২৮৪, ৩৫০
মোহাম্মদ আলী, মাওলানা ৮৭
মোড়েল, নীলকর ২৮৭, ২৮৮, ২৯০
মোড়েলগঞ্জ, ২৮৭, ২৯০
মোহাম্মদ শফী, কসাই ৩৭০, ৩৭১
মোহাম্মদ ওয়াহিদ, আবু নাসের ৮৭
মোহন লাল ৩
মোমেনশাহী ২
ম্যাকার্থার, জন ২১৮, ২৯৮, ৩৬১
ম্যাকেঞ্জি, হেনরী ১৮০, ২১৫, ২১৬, ৩৩৯, ৩৪০
ম্যাকলিন ২৯৯
ম্যাকডোনেল মনিয়ার ৩৫২
ম্যাক্সয়েল, ক্লেমেন্ট হেনরী ৩৫৫
ম্যালকম, স্যার জন ৭২
মেলিয়া পোতা ২১৮

য

যশোহর ২, ৮০, ১৫৪, ১৫৫,

১৭৫, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ২০৪
২০৭, ২৩৩, ২৩৮, ২৩৬, ২৪২
২৪৩, ৩৮১, ২৯০, ২৯৮, ৩০০,
৩০৪, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৬১
যদুনাথ, উকিল ৩০৪
যশোবন্ত রায় ৩
যামিনী মোহন ঘোষ ১১২, ১২৩
যুগান্তর ৩৮

যোগেশচন্দ্র বাগল ৩৩৫

র

রঘু নন্দন ৩
রঞ্জন শেখ ৩৭৭
রবীন্দ্র নাথ ৯৫, ৯৯
রংপুর ১১৯, ১২২, ৩২৮
রমযান শাহ ১২৪
রসভাইটিস, পাদ্রী ২১০
রবার্ট শরীফ, জেমস ২৩৭
রফিক মন্ডল ২৮৬, ২৮৭, ৩০০
রহীমুল্লাহ ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯
২৯০, ৩০০
রহীম বক্স ৩৭১
রঘুনাথ গোস্বামী ৩২০
রমানাথ ঠাকুর ৩২০
রামমোহন রায়, রাজা ৫৩, ৬৪
৬৬, ১৭১, ১৮০, ২০০, ২৪৩,
৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩,
৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮,
৩৩৪, ৩৩৫, ৩৭৯
রামরাম চক্রবর্তী ২৫৪
রাজবল্লভ ৩, ৩৭৯
রাজশাহী ৭৭, ৯৮, ১১৯, ১২০,
১৫৪, ১৫৫, ২০৮, ২৩৬, ২৫৯,
২৮১, ৩২৭, ৩৭২
রাজীব লোচন ৪
রাম জীবন ২
রামবাস সিংহ ৩
রানী ভবানী ১২২
রাজসিংহ ১৩১
রাজমহল ২৫১
রামায়ণ ৯৮
রাম রতন রায় ২৪২, ২৪৩
রাধা মোহন ১৬৯
রাম নারায়ণ ১৬০
রাণাঘাট ১৮৮, ১৯২
রাম গোপাল ২১৯
রামচন্দ্র মিত্র ২৭৬
রামচন্দ্র রায় ২২২
রাজাপুর ২৩৬, ৩৩৭
রামচন্দ্র পুর হাট ২৩৬
রাম নগর ২৩৭
রাইচরণ ২৮৫ ৩৪৮
রাচুখালী ২৪২

রাধা মাধব ব্যানার্জি ৩২০
রায় চাঁদ বোস ৩২০
রায় দুর্লভ ৬
রাধাকৃষ্ণ মিত্র ৩২০
রাইস, মিঃ ৩২৭
রেগুলেটিং এ্যাক্ট ৭
রেজা খাঁ ১০, ১১, ২৬, ২২৫
রেভিনিউ বোর্ড ২২৫
রেভারেন্ড ডাফ্ ১৮৯
রেনী, নীলকর ২৭৫, ২৭৬ ২৭৭
রেনেসাঁস ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ১০০, ২০০, ৩১৭, ৩১৮, ৩২৩
রোগ সাহেব ৩৪৫
রোম ১২৯
রিচার্ড কর্ডেন ৩৫৪
রুডলফ ১৪৯
রুদ্রপুর ২৩৬
রুস্তমজী কাওয়াসজী ৩৫৬
রুপদিয়া ১৫৪, ২৩৭
রুপগিরি ১২৩
রুস্তমজী মানকজী ৩৫৬

ল

লফোর্ড, বি. এইচ. ১৮১
লতাফত হোসেন ২০৯, ২১০, ২৩৮
লং, পাদরী রেভারেন্ড ৩২৬, ৩৪৬, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬১
লক্ষ্ণৌ ৩৪৫
লরেন্স, স্যারজন ৩৭৭
লাট্টু বাবু, জমিদার ২৫৪
লারমুর ২৩৫, ২৪১, ২৪৪
লালপুর ২০০, ২৩৬
লাহেড়ীমল ৩
ল্যাংকাশায়ার ৫৭
ল্যাসিংটন, ই. এইচ. ৩৫৫, ৩৬১
লিডেন হল স্ট্রীট ৫৬
লিসেস্টার ১২১, ১২২
লোকনাথপুর ২৭৯
লুই বাম্নো ১৫১
লো, টমাস ৩৭৫
লিসবন ১৪৯
লেয়ার্ড ২১৬
লোহাগড়া ২১৮
লেভিয়ার্ড ২৭৪

শ

শরীয়তুল্লাহ ৪৪, ২৩৬, ২৫০, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৯
শম্ভুনাথ ২৪৩, ২৪৪
শশাঙ্ক শেখর বাগচী ৩৪৭
শমসের গাজী ১৩৭, ১৩৮, ৩৭১
শাহামাদার ১১১
শাহসুজা ১১২, ১১৪
শান্তিপুর ২১০, ২২০
শালঘর মধুয়া ২৯৪, ২৯৬
শাজাদপুর ৩২৮
শ্যামনগর ২০৬, ২০৭

শ্যামসুন্দর ৩
শ্যামচন্দ্র পাল ২০১, ২০৯, ২৪৪, ৩৩০
শ্যামপুর ২১৩
শ্যামাইল ২৫৮
শিবচর ২৬৭
শিবনাথ ২৭৬, ২৭৭
শিশির কুমার ২৮২, ২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩৩১, ৩৩২, ৩৫৬, ৩৮৩, ৩৮৯, ৩৯০
শিবাজী ১০৭
শিকদার, জমিদার ২৬৬
শিমুলিয়া ২৬৬
শিলাইদহ ৩২৮
শিবনাথ শাস্ত্রী ৩৩৬
শৈলকুপা ২৪৩
শ্রীকোল ২০৭
শ্রী খন্ডি ২৩৭, ২৪৩
শ্রীকান্ত ১০৯
শ্রীরামপুর ২৪৩

স

সমাচার দর্পণ ১৭২, ২১৭
সংবাদ প্রভাকর ১৭৩, ২০৪, ২০৫, ২২৬, ২৩৯, ২৯৮, ৩৩৫, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৮৬
সরবারা ৩২৮
সংস্কৃত কলেজ ৮১
সবির বিশ্বাস ১৯৭
সরদাহ ২৩৬
সরফরাজপুর ২৫৪
সংবাদ কৌমুদী ৩২২
সতীদাহ ৩২৭
সতীসচন্দ্র মিত্র ২৮১, ২৮৪, ৩৩৩, ৩৮৪
সলিমুল্লাহ, স্যার ৮৬
সাইফুত শা'জাদা ১৩
সাধুহাটি ৩০০
সাদুল্লাহ ২৮০
সাদেক মোল্লা ২৭৬, ২৭৭
সারিয়াকান্দি ২৯৮
সিরাজগঞ্জ ৩৫, ৩৬, ১৪০, ১৪১, ২০৮
সিরাজউদ্দৌলা নবাব ১১১, ৩৭৯
সিন্ধু ১৬২, ৩৩৮
সিন্দুরিয়া ২০৯, ২৩৬
সিদ্ধেশ্বরী দেবী ২২২
সিধুজী ২৩৬
সিংভূম ১৬৮, ১৭০
সিরাজুল ইসলাম, নবাব ৮৭
স্টীভেনসন ২১৬
সীতাব রায় ১০, ১১
সীটনকার ৩০৭, ৩১৬, ৩৪৬, ৩৫৪, ৩৬০
স্কোনস ১৭৮, ২১৪, ২১৫
স্কীনার, ম্যালোনী ৩৩১
স্কট, জে. পি. ১৫৩
সুজাউদ্দিন ৩
সুজাউদ্দৌলা ৩
সুধীর, সরকার ৩৮
সুপ্রকাশ রায় ৩৭, ৩৯, ৬৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ২০০, ৩০৫, ৩৪২,

৩৬৬, ৩৭৪, ৩৮১, ৩৮৮
সুরজিৎ দাস গুপ্ত ৮৩, ১০৯, ৩৮৭
সুন্দরবন ৭৩, ২৩১
সুবলচন্দ্র পাল ১৬০
সুবলচন্দ্র নন্দী ১৬০
সুবাগাছি ২০৮
সুনীল কুমার গুপ্ত, ডঃ ২৫১
সুসোময়ী রাণী ২১৬
সুন্দরপুর ৩৪৯
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১০৭, ৩৩৯
সূর্যসেন ৩৭০
সেন্ডিটা ১৬০
সেভোখান, হাবিলদার ২৯৭
সেইল, পাদরী ৩০৭, ৩০৮
সোম প্রকাশ ৩০৩, ৩৩৫
সৈয়দ আহম্মদ, স্যার ৮৮, ৮৯, ৯০, ৩৫৬
স্বরূপপুর ২, ৩২৮
স্যামুয়েল ফেডী ২৭৩, ২৭৪, ৩৩৮
স্যাটারডে রিভিউ ৩৫১
স্পেকটেটর ৩৫৯
সাঁওতাল বিদ্রোহ ৪৭, ১৩৭, ১৩৮, ৩২৩, ৩৮৮
স্কট কোং ১৬০
স্মিথ, নীলকর ২১১

হ

হরমণি ৩৪৮
হল্যান্ড ১৪৮, ১৪৯, ১৫০
হ্যামস্লে ১২৯, ১৪৫
হরগোবিন্দ শীল ১৬০
হরচাঁদ মন্ডল ১৯৪
হরিপুর ২৩৭
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০৬, ২৮৩, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৭, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩৫০, ৩৮৯, ৩৯০
হরিণা ২৯৮
হরিরায় ৩০০
হরি নারায়ণ ঘোষ ৩০০
হার্কার্ট এডওয়ার্ডস, স্যার ৩৭০
হান্টার ১৩, ১৪, ১৯, ২০, ২৫, ৪৭, ৫৬, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৫, ৯০, ৯১, ৯২, ১১১, ১১৫, ১১৮, ১২৭, ২৩৬, ২৫২, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২
হারগ্রীবস ৫৮
হাবরা ১৮৪
হারানচন্দ্র চাকলাদার ১৯৬
হার্সেল ২০১, ২২০, ২৪০, ২৪৫, ২৪২, ২৮৫, ২৯১, ৩০২, ৩৩১, ৩৪৮
হার্ডিঞ্জ, লর্ড ৮২
হাওড়া ৭৭
হাবিবুল হোসেন ২৪০, ২৪৪, ৩৩০
হারলে ৮০
হাজরাপুর ২৩৬, ২৪২

হাবিব উল্লাহ ২০৯
হার্বার্ট মেডক, স্যার ৩৩৮
হিন্দু প্যাট্রিয়ট ২০৬, ২১০, ২৭৮, ২৮৩, ২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৭, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৯০
হিলি ২৯, ২৮৮, ২৯০, ৩৫৯
হিজলবাট ২৩৬
হীল, জেমস ১৫৪, ৩৩৬
হেমচন্দ্র কানুনগো ২৪
হেস্টিংস, ওয়ারেন ২৯, ৬৮, ৮১, ১১৩, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৫, ২২৫, ৩২০, ৩৭০
হেনরী লরেন্স ৩৭৬
হেনরী ম্যানুয়েল ৩৫৫
হেভেন, রবার্ট ১৫৩
হানিফ মুনশী ১৯৪
হোড, ডাঃ ১৫৪
হোগলা ২৭৫
হোল নিউজ ৩৫৯
হুসেন শাহ ৯৮
হুগলী ৩, ৮৩, ৮৬, ৮৭, ১০৪, ১৫৬, ২৫৮, ৩৩৮
হুইলার ৩২০
হুসাইন এলাহী ৩৭২
হুতোম পেঁচার নক্সা ৩৪৯